বাংলার লোক-সংস্কৃতি

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা-২

প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশন
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশনের
মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
এম. এ., পি-এইচ. ডি.
শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রস্তাবনা

লোকসাহিত্য লোকমনের ফসল। লোকসাহিত্য সচেতন মনের বাণী-সাধনা নয়। সযত্ন ও সুচিন্তিত মানসফসল হলে জনগণ তাদের সৃষ্টিকে কেবলমাত্র লোকস্মৃতি নির্ভর করে রেখে দিত না, এগুলিকে স্থায়িভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করত। লোকসাহিত্য তাদের সুখদুঃখের বাস্তব অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লোকসাহিত্যের কোন শাখাতেই তেমন নেই। লোকমনের কৌতূহল বেশী, সামর্থ ও সাধনা কম। এজন্য লোকজীবনের তথ্য ও তত্ত্ব সুশৃংখলভাবে তাদের রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। অধিকাংশ রচনা অতিকথন ও অসংলগ্ন উক্তিতে পূর্ণ, যেমন লোককাহিনী, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি। মেয়েলীগীতি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। লোকসঙ্গীত আবেগ-ধর্মী। কেবল পালাগানগুলি কিছু সংহত এবং তথ্যপূর্ণ রচনা; প্রবাদও সংহত অভিজ্ঞতার প্রকাশ। অসংস্কৃত ও অসংলগ্ন লোকরচনা থেকে লোকজীবনের বিচিত্র রূপরহস্যের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উপরন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি দীর্ঘকাল এ অংশের উপর তেমন গুরুত্ব দেননি। লোকসাহিত্য পরিবর্তনশীল; এজন্য লোকসাহিত্য যে সময় সংগৃহীত হয়, কেবল সেই সময়ের লোকজীবনের রূপটি তাতে ধরা পড়ে। শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ এবং চেষ্টার দ্বারাই লোকরচনার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্ভব। তাঁদের উপেক্ষার ফলে অবহেলিত লোকসমাজ তাই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে।

আমাদের দেশে লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদ্বান সমাজের কৌতূহল জেগেছে বলতে গেলে সাম্প্রতিককালেই। ইউরোপ থেকে এ প্রেরণা এসেছে। ইউরোপে বেশ কিছুকাল আগে থেকে এ আগ্রহ জেগেছে এবং সুধীমণ্ডলীর সাধনায় কার্যকরী ফল পাওয়া গেছে। বাংলা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে প্রথম আলোচনা ও প্রকাশ

শুরু করেছিলেন ইংরেজ সুধীজন ও পণ্ডিতগণই। রাজকার্য পরিচালনায় শাসকবর্গ ও খ্রীস্টানধর্ম প্রচারণায় মিশনারিগণ এদেশের জনসাধারণের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য লোকজীবনের তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ কাজে যাঁদের নাম স্মরণীয়, তাঁরা হলেন রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লং, রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন, গেবর্ণ হেনরি ডমন্ট, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, এইচ ব্রেভারিজ, উইলিয়াম উইলসন হান্টার, এডওয়ার্ড টুইট ডাল্টন, হার্বার্ট রিজলি, জেম্‌স্‌ ওয়াইজ, উইলিয়াম ক্রুক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁরা কেউ সংকলন ও আলোচনা গ্রন্থ, কেউ মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে বাংলার নৃতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে, গ্রিয়ার্সনের 'Linguistic Survey of India' (five vols.), 'The Songs of Manik-chandra ' (1873), 'The Songs of Gorakshanath' (1877), হান্টারের 'Annals of Rural Bengal, (1868), ডাল্টনের 'Descriptive Ethnology of Bengal' (1872), ওয়াইজের 'The Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal' (1883), ক্রুকের 'The Popular Religion and Folklore of Northern India' (two vols., 1893) প্রভৃতি রচনায় বাঙালী লোকসমাজ ও উপজাতির নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। এগুলির অধিকাংশ উনিশ শতকের শেষার্ধের রচনা।

ইংরেজদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা অগ্রসর হন এবং লোকসাহিত্য-শিল্প সংগ্রহ ও আলোচনা করে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় প্রচেষ্টায় লোকরচনার মর্যাদা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম চেতনা জাগ্রত হয়। তখন থেকে শুরু করে লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র মিত্র, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুশীলকুমার দে, গুরুসদয় দত্ত, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ডঃ মযহারুল ইসলাম প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী এ বিষয়ে আলোচনা এবং গবেষণা করেন; গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আকারে তাঁদের সাধনার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের অনেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকে রচনা শুরু করেন। দু'একজন ছাড়া তাঁদের রচনা প্রায় আবেগধর্মী। প্রবন্ধের আকারে কিছু কিছু আলোচনা বিশ্লেষণমুখী হয়েছে। কিন্তু

প্রবন্ধের আলোচনা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন—সামগ্রিকতা এবং পূর্ণাঙ্গতার দাবী সেখানে উঠে না। উপরন্তু এসব রচনায় হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির কথা বেশী আলোচিত হয়েছে। মুসলমানদের বিষয় নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি বললেই চলে। অথচ এদেশে মুসলমানদের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই। বাংলার লোকসমাজে তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এসব দেশীয় এবং বিদেশীয় গুণীজ্ঞানীজনের প্রকাশিত লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনা গ্রন্থ থেকে বক্তব্যের অনুকূলে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছি। বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত লোকসাহিত্য সংগ্রহশালা থেকেও তথ্য আহরণ করেছি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু কিছু উপাদান ব্যবহার করেছি। তথ্যাদির প্রমাণ সাপেক্ষে সংখ্যাধিক মৌলিক আলোকচিত্র ও রেখাচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লোক-সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সর্বত্র মৌলিকভাবে লোকতথ্যেরই উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকাসহ বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ মোট আটটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা। এতে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং বিশেষভাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় চিত্র ও নকশায় আছে 'মানসসংস্কৃতি'র উপকরণ। বিবিধ নিদর্শন বিচার করে লোকচিত্র ও নকশার মটিফ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে এ ধরনের একত্রে আলোচনা আমি অন্যত্র সন্ধান পাইনি।

তৃতীয় অধ্যায় লোকনৃত্যে মানসচর্যার পরিচয় আছে। মুসলমান সমাজে প্রচলিত লোকনৃত্যের কোন কোনটিতে ভাবে ও উপলক্ষে ইসলামী প্রভাব পড়লেও নৃত্যভঙ্গিতে এদেশীয় প্রচলিত ধারার রীতি-প্রকৃতি অব্যাহত থেকে গেছে। এসব ক্ষেত্রে সম্পর্কসূত্র ও সমন্বয়সূত্র অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় লোকবাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র হল 'মূর্তিমান সংস্কৃতি'র নিদর্শন। এখানে সাধারণভাবে লোকসমাজে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের সাধারণ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেবল সঙ্গীত ও নৃত্য নয়, লোকজীবনের অন্যান্য দিকেও এগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত লোকাচার 'আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'শিশু-জন্ম', 'বিবাহ', 'ব্যাধি ও মৃত্যু', 'ফসল ও চাষাবাদ' এবং 'গবাদি পশু' —এরূপ পাঁচটি অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত আচারগুলির সাধারণ পরিচয় এবং তৎসঙ্গে সেগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। custom dies hard—প্রথা সহজে লোপ পায় না। জাতীয় জীবনের কোন না কোন অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে প্রথা বা আচার গড়ে উঠে। জাতির রক্তের সাথে প্রথার নিবিড় যোগ-সম্পর্ক। সুতরাং আচারগুলি বিশ্লেষণ করে জাতির প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করা যায়। এগুলিতে বহু প্রাচীন সংস্কারের বীজ আছে। জাতির নৃতত্ত্বের বিচারে এগুলি মূল্যবান উপকরণ। বহুবিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত লোকমনস্তত্ত্বের আকরভূমি আচারগুলি।

লৌকিক পীরবাদ শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে কতক ঐতিহাসিক, কতক পৌরাণিক এবং অধিকাংশ কাল্পনিক পীরপীরানীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বাঙালীর লোকমানসিকতায় কিভাবে দেবতুল্য স্থান গ্রহণ করে প্রভাব বিস্তার করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। পীরপীরানী সম্পর্কিত দেশপ্রচলিত আচার-সংস্কারাদির বর্ণনা করে লোকজীবনে তাঁদের প্রভাবের মূল্যায়ন নিরূপণ করেছি। এতে এদেশের লোকধর্মের স্বরূপটি ধরা পড়েছে। অসহায় মানসোদ্ভূত আদি ধর্মচিন্তারই প্রবহমান ধারায় রূপ-রূপান্তর তা।

লোক-সংস্কার ও লোক-বিশ্বাস শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে বাঙালী জাতির নৃতত্ত্বের বহু উপাদান আলোচিত হয়েছে। 'এনিমিজম', 'ম্যাজিক', 'ট্যাবু', 'টোটেম' ইত্যাদি বিশ্বের আদিম ধর্মমতের রহস্যের সন্ধান এসব লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে আছে। আদিম চেতনাসুলভ লোকমনস্তত্ত্বের বহুবিধ পরিচয় এগুলিতে পাওয়া যায়। বাংলার জনগণ পুরুষপরম্পরায় কোথাও পরিচ্ছন্নভাবে কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বধারারই অনুসরণ করে চলেছে এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়ে লৌকিক খেলাধূলার সাধারণ বর্ণনা আছে। আমোদ-প্রমোদ ও অবসরবিনোদনের উৎস খেলাধূলাগুলি। এগুলিতে জাতির স্বীয় অতীত জীবনের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বহু প্রচ্ছন্ন উপকরণ আছে। গোষ্ঠিকেন্দ্রিক আদিসমাজ এবং সামন্তকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের নানা ছবি জীবাশ্মের মত ছড়িয়ে আছে।

বাংলার মুসলমান সমাজের লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহের জড় জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত, যুগের প্রভাবে সেগুলির ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে— আলোচ্য অধ্যায়গুলি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা এ সত্যই উদ্‌ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। আর তা'ই একটি জীবন্ত লোক-সংস্কৃতির ধর্ম। বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে বাঙালী জাতির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র রূপরহস্যের পরিপ্রকাশ ঘটেছে। অনেক উচ্ছ্বাস-আবেগের স্তূপ, বিশ্বাস-সংস্কারের অরণ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ ও শ্রেণীবিন্যাস করে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। এদিক দিয়ে এ বিষয়ক এবং এ ধরনের আলোচনা গ্রন্থ আমাদের দেশে এটিই প্রথম। নতুন ক্ষেত্রে নতুন প্রয়াস বলেই গ্রন্থটির যা কিছু মূল্য সুধীজনের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এবং তা হলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য

মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত

আনোয়ার পাশার জীবন ও শিল্প কথা (যন্ত্রস্থ)।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

চিত্রসূচী

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সাধারণভাবে সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি চারু ও কারু শিল্পকলাকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলি রূপায়ণে শুধু সংস্কৃতিই নয়, সংস্কৃতির বাহনও বটে। মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকলা সংস্কৃতির অঙ্গ, কিন্তু সংস্কৃতির বাহনরূপে যে জগৎ ও জীবনের পরিচয় ফুটে উঠে— সংস্কৃতির উপকরণ সেখানেও বিদ্যমান।

সাহিত্য-শিল্প মূলতঃ জীবন ও জগতের প্রতিচ্ছবি। এরিস্টটল শিল্পকে প্রাণিজগৎ ও জড়বস্তুর অনুকরণ (imitation) বলেছেন। এখানে অনুকরণ অর্থ জীবন ও জগতের অনুলিপিমাত্র নয়, শিল্প হল বাস্তব অভিজ্ঞতার বাঙ্ময়, রূপময়, ধ্বনিময় অথবা ভঙ্গিমাময় অভিব্যক্তি।

অনুকরণের তারতম্য থাকতে পারে— কোথাও বাস্তবানুগামিতা, কোথাও কল্পনাশ্রয়িতা, কোথাও কল্পনা-বাস্তবের মিশ্রণে অনুভবের সঞ্চরণ। কল্পনা যতই উত্তুঙ্গ হোক, কোন শিল্পই বাস্তবতাকে একেবারে অস্বীকার করে না অথবা অতিক্রম করে যায় না। রূপকথার লঘু কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতাও বাস্তবতাবিরোধী নয়; বস্তু-জ্ঞান ও বাস্তব-অভিজ্ঞতা কোন রূপে না কোন রূপে সেখানে আত্মপ্রকাশ করে। পরীর কল্পনায় ডানা ছাড়া পুরোপুরি মানবীর রূপ এসেছে; আবার তার ডানার রূপাঙ্কনে পাখির ডানার প্রভাব পড়েছে। এরূপ 'মৎস্যকন্যা'র কল্পনায় উর্ধ্বাঙ্গ মর্তমানবীর ও নিম্নাঙ্গ মৎস্যাকৃতির ছায়াপাত ঘটেছে। শিল্পীর ইচ্ছাশক্তিতে ও কল্পনানুরঞ্জনে বস্তু বিকৃত হয় কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। এদিক থেকে 'শিল্প অনুকৃতি' সংজ্ঞাটি বিশেষ তাৎপর্যবোধক।

পরবর্তীকালে ক্রোচে শিল্পকলাকে 'প্রকাশ' (expression) তথা সৃষ্টি (creation) বলেছেন। এ সৃষ্টি অবাস্তব অলৌকিক নয়, জগৎ ও জীবনের প্রচ্ছায়ে নব প্রকাশমূর্তি। মানবশিল্পের মধ্য দিয়ে বিশ্বসৃষ্টির পুনর্জন্ম হয়।

সংস্কৃত পণ্ডিত বলেছেন, মানুষের শিল্প দেবতার অনুকরণ— 'দেব শিল্পানাম অনুকৃতিঃ'।[১] এ শিল্পসৃষ্টিতে প্রাণীর প্রাণস্পন্দন এবং জড়বস্তুর প্রতিবিম্বন ধরা পড়ে।

জীবন ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ নেই। এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম হলে চলে না, সজীব, সবাক ও সক্ষম হওয়া আবশ্যক। প্রাণহীন জড় প্রকৃতির সংস্কৃতি নেই। প্রাণী হয়েও অচল, অবাক উদ্ভিদের সংস্কৃতি নেই। আবার মানবেতর প্রাণীর কোন কোন শ্রেণীর জীবনস্পন্দন, কণ্ঠ-ধ্বনি, এমন কি বাসস্থান ও দলবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। কোকিল সুমধুর গান করে, বাবুই সুদৃশ্য বাসা নির্মাণ করে, হাতি দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। তোতা, ময়না মানুষের কণ্ঠ পর্যন্ত নকল করে। তথাপি এদের সংস্কৃতি নেই। সুতরাং সংস্কৃতি এমন একটা রূপ যা শুধু জীবন-সম্পৃক্ত হলেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায় না, জীবনচর্যার মধ্যে এমন গুণ, শক্তি ও কর্ম সাধনার প্রয়োজন যা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও উপলব্ধিগম্য করে তোলে। মানুষের মননশক্তি, চিন্তাশক্তি ও সৃজন শক্তির গুণেই মানবসংস্কৃতি রূপ লাভ করেছে।

প্রাণের ধর্ম আত্মপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশ। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদের মত মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না সে কিছু বাচিয়ে রাখে। তার এই বেঁচে থাকার রূপময়তা এবং বাঁচিয়ে রাখার ফলশ্রুতি উভয়কেই সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যায়। এদিক দিয়ে সংস্কৃতি মানবজীবনাচার বটে, আবার জীবন ধারণের উদ্ভাবিত উপকরণও বটে। মানুষ ব্যবহারিক জীবন যাপনের পথে যা কিছু সৃষ্টি করেছে ও করছে সেসব বস্তু স্বরূপে সংস্কৃতির স্বরূপ। আবার মনোজগতে আর এক সৃষ্টিলীলা নিয়ত চলেছে ও চলছে, তার চিন্তাধারা, জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কল্পনা-অনুভূতির প্রকাশ নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে শিল্পলোকে, সৃষ্টিকলায়। প্রথমটি ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থার সহায়ক বস্তু-উপকরণ, দ্বিতীয়টি অন্তর্লোকের উৎকর্ষবিধায়ক মানস-উপকরণ।

মোট কথা, সংস্কৃতি জীবনসম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্ভূত। সংস্কৃতি একাধারে জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি, যথা— আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা,

১. উদ্ধৃত: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী: রূপা এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯৬২, পৃঃ ২৬৭

আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ; অন্যদিকে জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ, তথা— ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলংকার ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ মানসফসল, যথা— সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হল সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।

সংস্কৃতির প্রকৃতি বিচারে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উপরি-উক্ত তিনটি রূপের কথাই বলেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সমালোচক ই. বি. টাইলরের অনুসরণে নিম্নরূপ বিভাগ সমর্থন করেছেন :

১, মূর্তিমান সংস্কৃতি (Material Culture)
২. অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি (Functional Culture)
৩. অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি (Spiritual Culture)[১]

মূর্তিমান সংস্কৃতি মুখ্যতঃ ব্যবহারিক জীবন প্রয়াসের মধ্যেই প্রকট। সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নিয়ত যে সংগ্রাম চলছে, তাকেই বলা হয় জীবনপ্রয়াস। জীবনপ্রয়াস সৃষ্টিধর্মী। পশুপক্ষীর জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া অন্য সংগ্রাম নেই। থাকলেও তা সম্পূর্ণ নৈসর্গিক প্রভাবের অধীন। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে উঠার জন্য অন্তর্জীবনে ও বহির্জীবনে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে অনুকূল প্রতিবেশ রচনায় মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবন ও উৎপাদন ক্রমাগত সৃষ্টির উৎসদ্বার উন্মোচিত করে চলেছে। মানুষের এই উদ্ভাবনশক্তি ও উৎপাদন-ব্যবস্থা তার সংস্কৃতির বিকাশের প্রধান ভিত্তি ও মুখ্য রূপকার। হস্তশিল্প, যন্ত্রশিল্প, গৃহনির্মাণ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এই জীবনপ্রয়াসের প্রয়োজন-অনুকূলেই উদ্ভাবিত বস্তুসামগ্রী।

ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মনোলোকেও সৃষ্টির লীলা চলছে। মানুষের মন ও মনন জীবনরসে অভিষিক্ত হয়ে শিল্পে,

---

১ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারত-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৩-১৫। সুনীতিবাবু 'বস্তুসংস্কৃতি', 'অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি,' 'মানসসংস্কৃতি' শব্দত্রয় ব্যবহার করেছেন, আমরা যথাক্রমে 'মূর্তিমান সংস্কৃতি,' 'অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি' ও 'অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি, শব্দত্রয় ব্যবহার করতে চাই।

কাব্যে, চিত্রে, নৃত্যে, সংগীতে সুচারু চিৎপ্রকর্ষের আনন্দলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছে। লোকালয় ত্যাগ করে অন্ধকার পর্বতগুহায় কঠিন ফলকে দিবারাত্র দেবমূর্তি ও মানবমূর্তি খোদিত এবং মন্দির-তোরণ, গৃহ-প্রাকার চিত্রশোভিত করার পেছনে ব্যবহারিক জীবনের কোনই প্রয়োজন ছিল না. কিন্তু মানুষ যদি তা না করত, তবে তার জীবনসাধনা ব্যর্থ হত, মানবনাম মিথ্যা হত। চিত্রে, নৃত্যে, সংগীতে, সাহিত্যে তার একই মনোভাব ক্রিয়া করছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবন আচরণের মধ্যে মানবসংস্কৃতির সূক্ষ্মতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। মনোলোকের এই চিন্তার ফসলকে অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ একে 'আত্মসংস্কৃতি' বলেছেন— 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'।[১]

মূর্তিমান সংস্কৃতি হোক কিংবা অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি হোক উভয়ই জীবনচর্যার 'উপসৃষ্টি' (by-product)। মানবজীবনের ছায়ান্তরালে মানব-মনের জিয়নমন্ত্র এবং মানবহস্তের যাদুস্পর্শ পেলে তবে এ সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠে। মাটি ভূখণ্ডের উপাদান। মানুষ মাটি দিয়ে পূজার দেবমূর্তি, খেলার পুতুল, বসবাসের ঘরবাড়ি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের বাসনপত্র তৈরি করে। ফিলিপস ব্রুকস লিখেছেন, The hills are full of marble before the world blooms with statues.[২] ভাস্কর্যমূর্তি নির্মিত হওয়ার আগে পাহাড় শিলাখণ্ডে পূর্ণ ছিল। প্রয়োজনে হোক, অপ্রয়োজনে হোক, মানুষ মনের মাধুরী মিশিয়ে শিলাখণ্ডকেই অখণ্ড শিল্পসৌন্দর্যে পরিণত করেছে। আর এখানেই তার সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ ঘটেছে। বাঁচার সাথে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতা ও প্রয়াসের ফল তা।

মানুষের বাইরে এক লীলা চলছে— নানা ব্যবহারিক কাজের মধ্যে তার প্রকাশ; তার মনের গহনে আর এক লীলা চলছে— বিচিত্র শিল্পে তার প্রকাশ। সে কাজ করে আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমোদ-স্ফূর্তি করে। কখনও কখনও কাজ এবং আমোদ একই সঙ্গে চলে। যেমন ক্ষেতে চাষী কাজ করে আর কাজের উৎসাহ ও আমোদ ব্যঞ্জক সারি গায়। নৌকাবাইচে মাঝিমাল্লা দাঁড় টানে আর সারি গায়। হিন্দুর ব্রতানুষ্ঠানে

১. উদ্ধৃত : ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— সাংস্কৃতিকী, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৮
২. Quot. from The Home Book of Quotations, ed. by Burton Stevenson, Newyork, 1956, P. 1165

আচার, গান ও চিত্রের ত্রয়ী সমাবেশ। বিয়েতে পল্লীরমণী গীত গায় এবং অনুষ্ঠান পালন করে। তার সঙ্গীতচর্চা, আচার পালন আমোদ স্ফূর্তি একই সঙ্গে চলে। এসব স্থলে কাজ, গান, আমোদ, অনুষ্ঠান একাকার হয়ে আছে। ক্রিয়ানির্ভর এরূপ আচার-আচরণে, আমোদ-প্রমোদে ও খেলাধূলায় অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ফুটে উঠছে।

সংস্কৃতির এ তিন রূপকে ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য 'ত্রিসঞ্চয়' বলেছেন, যথা— দ্রব্য-সঞ্চয়, শিল্প-সঞ্চয় ও সত্য-সঞ্চয়। তিনি লিখেছেন :

> "দ্রব্য-সঞ্চয়ে মানুষের অর্থনৈতিক চাওয়া পাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, শিল্প-সঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার প্রকাশব্যাকুলতার রূপ, আর চিন্তা বা সত্য-সঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার ভাব-ভাবনা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয়। মোটামুটি এই তিন উপকরণের হিসেবই সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির হিসেব।"[১]

সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা সীমিত ধারণা আছে, তা হল 'পরিমার্জনশীলতা'। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে বিচারে এর পরিমার্জনশীলতা বা সংস্কারধর্মের কথা স্বীকার করতে হয়।[২] এ মতের সমর্থনে ডক্টর সুনীতিকুমার সংস্কার ও সংস্কৃতিকে সমার্থবাচক বলে উল্লেখ করেছেন। গোপাল হালদার সুনীতিবাবুর মত প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন, উন্নতমান, উৎকর্ষবিধায়ক ও সুমার্জিত রুচির পরিচয় সমাজজীবন ব্যবস্থা ও তার পারিপার্শ্বিক বস্তুসম্ভারের মধ্যে না থাকলে তা সংস্কৃতি পদবাচ্য হতে পারে না। তাঁর মতে 'প্রিমিটিভ কালচার' মানুষের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র, এবং 'ফোককালচার' লোককৃতি বিশেষ।[৩] তিনি এগুলিকে 'আদিমসংস্কৃতি' ও 'লোকসংস্কৃতি' বলতে নারাজ। কিন্তু এ ধারণা তর্কাতীতভাবে স্বীকার্য নয়। সংস্কৃতির আপেক্ষিকধর্মী রূপময়তার বিচারে এর অর্থপ্রসারতা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী ভাষায় Culture শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছাড়িয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছে। এজন্য প্রিমিটিভ কালচার, ফোককালচার

---

১. ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য— নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩২

২. সম্যকরূপে সাধিত কৃতি সংস্কৃতি। ল্যাটিন মূল 'kultura' হতে নিষ্পন্ন Culture শব্দের অর্থ কর্ষণজনিত উৎকর্ষসাধন।

৩. গোপাল হালদার— বাঙালীর সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ২

উভযই স্বীকৃত ও আলোচিত হয়েছে। পরিশীলন অর্থে যদি সংস্কৃতি ধরা হয়, তবে তা হবে পরিমার্জিত একটি বিশেষ রূপ, নির্বিশেষ রূপ নয়। কিন্তু সংস্কৃতি জীবনের রূপাঙ্গিকতা হিসেবে নির্বিশেষ রূপকেই সূচিত করে। শুভ ও সচেতন বুদ্ধির অনুশীলনে সংস্কার সাধিত হয়। সংস্কৃতি স্বভাবজ। শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ সব কিছুকে নিয়ে সংস্কৃতির সমগ্র পরিচয়। সংস্কার সংস্কৃতিব মানোন্নয়নের উপায বিশেষ। ক্রমোৎকর্ষগুণ যদি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হয়, তবে তা সংস্কারের দ্বারাই সম্ভব হয।

সংস্কৃতির দোসব শব্দ হিসেবে বাংলায় 'কৃষ্টি' শব্দের ব্যবহার আছে। সংস্কৃত 'কৃষ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কৃষ্টি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত ইংরেজী কালচার শব্দের মূলগত অর্থের সাদৃশ্য আছে। ভূমিকর্ষণ সাদৃশ্যে জীবনকর্ষণজনিত যে ফসল বিকাশ লাভ করে তাতেই কৃষ্টির উদ্ভব হয়। মূল অর্থেব বিচারে কৃষ্টির প্রয়োগ অধিক সংগত হলেও অধুনা শব্দটির ব্যবহাব কমে গেছে। কর্ষণ দ্বারা ভূমিব উর্বরতা শক্তি বাড়ে কিন্তু শস্যোৎপাদনক্ষমতা ভূমির নিজস্ব। সেরূপ কেবল চিৎপ্রকর্ষ ও মনোৎকর্ষ নয়, জীবন বিকাশের মূলে যে আত্মশক্তি ক্রিয়া করছে তার সামগ্রিক মূল্যায়নেই সংস্কৃতির পরিচয়।

ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের জীবনচর্যার নিয়ম ও জীবনচর্চাব ফসল একত্রে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলে। সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী কিন্তু ঐতিহ্যনিষ্ঠ নয়। ঐতিহ্যের অনেক উপকরণ সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান, কিন্তু সব উপাদানই বিরাজমান নয়। ক্রমোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যের গুণে সংস্কৃতি যখন রূপান্তরিত ও বিবর্তিত হতে থাকে তখন জীবনযাত্রার প্রতিকূলে ঐতিহ্যের যে অংশ অচল হয়ে দাঁড়ায়, যুগধর্ম ও জীবনধর্মের তাগিদেই তা স্খলিত হয়ে পড়ে যায়। নতুনের স্বচ্ছন্দতায় পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন হয়। এ অর্থেই সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী হলে চলে না। অচল অতীতপ্রীতি সংস্কৃতির মৃত্যুর কারণ। জীবন্ত সংস্কৃতির মূল থাকে ঐতিহ্যের মর্মতলে কিন্তু গতানুগতিক অনুবর্তন উপেক্ষা করে ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রগতিশীল হয়ে উঠে। বিশেষজ্ঞের ভাষায়— Culture is a conscious striving toward progress and perfection.'[১] সংস্কৃতি হল প্রগতি ও পূর্ণতা লাভের একটি সচেতন কর্মপ্রয়াস।

১. E. B. Tylor—Primitive culture, London, 1873

সভ্যতার সহিত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও উভয়ে সমার্থবাচক নয়। সভ্যতার ইংরেজী পরিভাষা civilisation। ল্যাটিন civis (নগর) থেকে civilisation শব্দের উৎপত্তি। আরবী তমদ্দুনও নাগরিকতার সহিত জড়িত। সভ্য মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যা জড়িত তাই সভ্যতার বিষয়। সভ্যতা মূলতঃ নগরজীবনভিত্তিক। জনাব হুমায়ুন কবীর সভ্যতাকে বলেছেন, organisation of life এবং সংস্কৃতিকে বলেছেন, Expression of life।[১] সভ্যতা হল বিশেষ জীবনসংস্থা আর সংস্কৃতি হল নির্বিশেষ জীবনপ্রকাশ। সংস্কৃতির উদ্ভবের প্রধান শর্তই হল জৈবিক উপযোগিতা-বোধ। সভ্যতা উন্নতমান জীবনব্যবস্থা। যাযাবর জাতির জীবনাচার আছে বলে তার সংস্কৃতি আছে, কিন্তু নগর নেই বলে তার সভ্যতা নেই। অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের ফলে কোন মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নির্দিষ্টমানে ও বিশিষ্ট রূপে গড়ে উঠলে তা সভ্যতা নামে অভিহিত হয়। সভ্যতার সহিত সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, Culture is the essence of civilisation.[২] সংস্কৃতি হল সভ্যতার সারনির্যাস। গৃহনির্মাণ করে বসবাস সভ্যতার পরিচায়ক। পর্বতগুহা, পর্ণকুটীর, মৃত্তিকা-গৃহ, অট্টালিকা সভ্যতার বিভিন্ন মানকে সূচিত করে। এগুলি নির্বিশেষ মানব সভ্যতার উপকরণ। সংস্কৃতি এর মধ্যে আরও কিছু অনুসন্ধান করে। শুধু গৃহনির্মাণ নয়, গৃহটি উত্তরমুখী কি দক্ষিণমুখী হবে এ সম্বন্ধে প্রথা সংস্কার অথবা বিধিনিষেধ থাকলে, ঘরের ছাদ এক বা একাধিক করে নির্মাণ করার কোন বিশেষ প্রবণতা সৌখিনতা কিংবা কল্যাণচিন্তা থাকলে, দেওয়াল চিত্রিত ও রঞ্জিত করার মধ্যে সৌন্দর্য-রুচি অথবা ধর্মচিন্তা জড়িত থাকলে, এসবে দেশ-কাল-পাত্রের নির্বাচনে মানবপ্রকৃতির চিহ্নসূচক যে একটা বিশেষ রূপাদর্শ ধরা পড়ে তাতেই সংস্কৃতির স্বরূপ ফুটে উঠে। এ অর্থে সংস্কৃতিকে সভ্যতার সারনির্যাস বলা যায়। তবে এরূপ সূক্ষ্ম গুণগত আপেক্ষিক ভেদ ছাড়া উপকরণের দিক দিয়ে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বেশী পার্থক্যরেখা টানা যায় না।

---

১. Humayun Kabir— The Indian Heritage, Bombay, 1962, pp. 37-38

২. Ibid, p. 38

সাধারণ বিশ্বাস, শিক্ষা ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ হয় না। একথা স্বীকার করলে বলতে হয়, কেবল শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি আছে, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অসভ্য বর্বর আদিম এবং বর্তমানের বহু উপজাতি শিক্ষার আলোক পায়নি বলে তাদের কোন সংস্কৃতি নেই, তা নয়। জীবনমানের পার্থক্য থাকলেও শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সমাজ ও অজ্ঞানতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ উভয়েরই সংস্কৃতি স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতিব মান উন্নত করে ও পূর্ণতা সাধন করে।

অন্ধ পরানুকরণ বা সনাতন নিয়মানুবর্তন সংস্কৃতিব বৈশিষ্ট্যবিরোধী। সংস্কৃতির উপকরণ হিসেবে পাখির নীড় আর মানুষেব কুটীরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না যদি নির্মাণকৌশল ও গঠনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য ও রূপান্তর না থাকত। নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ উদ্ভাবনের মধ্যে মানবসমাজের বিভিন্ন পরিসরে এ রূপান্তর ও বিবর্তন ক্রমাগত চলছে। সামগ্রিক বিচারে উদ্ভাবন দ্বারাই মানবসংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিকাশ; রূপবিবর্তন অনুশীলনের ফল। তারতম্য ভেদে এবং তুল্যমূল্যবিচারে একের প্রভাব দ্বারা অপর সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিবর্তন সাধিত হয়। অনাবশ্যকবোধে পুরাতন বিষয় লোপ পায়। লয়, স্থিতি ও উৎপাদন এ তিনের পর্যায়ক্রমে সংস্কৃতির প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জন দ্বারা চলমানতা (mobility) না থাকলে সংস্কৃতির ক্রমোৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। মার্কিন বিশেষজ্ঞ ফ্রান্স বোয়াস একেই সংস্কৃতির বিস্তৃতিতত্ত্ব (Theory of diffusion) বলেছেন। সুতরাং চলমান ও প্রগতিশীল মানব জীবনধারা এবং জীবনব্যবস্থার রূপরূপান্তরকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা চলে, সংস্কৃতি মূলত: ঐতিহ্যানুগামী কিন্তু গতানুগতিকতা বিরোধী, বৈচিত্র্যপন্থী ও ক্রমোৎকর্ষধর্মী। এর একটির অভাবে সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এগুলি সংস্কৃতিব সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব গুণবৈশিষ্ট্য যখন একটি বিশেষ ভূখণ্ডের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনাচার জীবিকাপদ্ধতি ও ব্যবহারিক বস্তু উপকরণের আলোকে বিকাশ লাভ করে তখন সেগুলি একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির অভিধা প্রাপ্ত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠী তথা জাতির প্রাণকেন্দ্র থেকে

উদ্ভূত সংস্কৃতি বিশেষ মূর্তি হিসেবেই ভারতীয় সংস্কৃতি, মিশরীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সংস্কৃতি, রুশসংস্কৃতি প্রভৃতি স্বতন্ত্ররূপে পাওয়া যায়।

শিল্পীর মনোবৃত্তি ও রুচিবোধ দেশ কাল সমাজধর্মের অনুকল্পে গড়ে উঠে। তার সৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'নৌকা সব দেশেই নৌকা, রথ সব দেশেই রথ, কিন্তু বর্মাদেশের নৌকা, বাংলাদেশের নৌকা, মিশর দেশের নৌকা, গ্রীসদেশের নৌকা সবার ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রণালী রয়েছে।'[১]

বাহন হিসেবে নৌকার আবিষ্কার মানব সভ্যতার অঙ্গ— দেশের সুলভ বস্তু-উপাদান, জাতির মানসরুচি এবং কালের দীক্ষা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জন্ম দেয়। 'ময়ূরপঙ্খী' কি 'মকরমুখী' নৌকা বাংলাদেশের সম্পদ, বাংলার সংস্কৃতিতে ময়ূরের ও মকরের প্রভাব আছে। এরূপ গৃহপ্রাঙ্গণে ব্রতের আলপনায়, কুলাচিত্রে ও পিঁড়িচিত্রে যে চিত্রবস্তু ও চিত্রভঙ্গিমা ধরা পড়ে তা বাঙালীরই জীবনচর্যা ও রূপচর্চার ফল। বাঙালীর নিজস্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে এর প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদেশে এরূপ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মানুষ প্রাণধারণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু সকল মানবগোষ্ঠীর আহরণ ও আহার পদ্ধতি একরূপ নয়। দুধভাত, মাছভাত, শাকভাত, পান্তাভাত বাঙালীর চিরকালের প্রিয় খাদ্য। চীনের অধিবাসী সাপ, ব্যাঙ খায়; বাঙালীর এগুলি অখাদ্য। ইংরেজ জাতি যে কেক তৈরি করে বাঙালীর পিঠার সঙ্গে তার মিল নেই। পিঠা, আচার, আমসত্ত্ব ইত্যাদি খাদ্যে বাঙালীর রুচি ও চিন্তার ছাপ পড়েছে। বিশেষ করে নকশী পিঠা ও ছাঁচকৃত আমসত্বে বাঙালীর রসনাবোধের সাথে রসচেতনা ও রূপচেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ কতকগুলি অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক অবদান, ধর্মীয় বিধিবিধান সামাজিক রীতিনীতি, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গঠন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ভৌগোলিক তথা পারিপার্শ্বিক প্রভাব এবং প্রাকৃতিক অবদান দ্বারা সংস্কৃতি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত হয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য

---

১. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ—১৬১

হল, পারিপার্শ্বিকতার সহিত সামঞ্জস্যবিধান। প্রকৃতিলোকের সহিত মানবলোকের আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সংস্কৃতি দূরের কথা, জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। মূর্তিমান সংস্কৃতিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়ে বেশী। বিশেষজ্ঞের অভিমত :

'Material culture is the most closely allied to environment factor. It deals with such material things as clothing, ornament, food, habitations and implements. All raw material for food, clothing, shelter and implements depend on natural products.[১]

মানুষের আহার্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক অবদানের উপর নির্ভর করে।

জাতির মন ও চরিত্রগঠনেও প্রকৃতির প্রভাব ন্যূন নয়। ভূ-প্রকৃতির রুক্ষতা অথবা রমণীয়তা, আবহাওয়ার শুষ্কতা অথবা আর্দ্রতা মানবদেহে ও মানবমনে গভীর প্রভাব মুদ্রিত করে।

বাংলার প্রকৃতি ও প্রতিবেশ বাঙালীর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন উভয়কেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার জলবায়ুর আর্দ্রতা ও ভূপ্রকৃতির নমনীয়তা বাঙালীর দৈহিক গঠনে কমনীয়তা এনে দিয়েছে, চরিত্রেও কোমলতা দান করেছে। অন্তর্জীবনের আবেগ ও বহির্জীবনের নমনীয়তাকে যখন শিল্পে রূপায়িত করেছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নিস্তরঙ্গ মন্ময়তার সুর ধ্বনিত হয়েছে, উত্তুঙ্গ চিত্তবিক্ষেপ প্রকাশিত হয়নি। সমতলবাসী ও পর্বতবাসী, মরুবাসী ও মেরুবাসীর জীবনপদ্ধতি কখনও এক রকমের হতে পারে না। তারা প্রকৃতির কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পায়। সুতরাং তাদের সংস্কৃতিতে প্রকারভেদ ঘটতে বাধ্য। প্রকৃতির অবদানকে স্বীকার করে, ভূপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সমতলবাসী গরু, পর্বতবাসী ঘোড়া, মরুবাসী উঠ এবং মেরুবাসী কুকুরকে বস মানিয়ে বাহনের কাজে লাগিয়েছে। হ্রদবাসীর এর কোনটাই কাজে লাগে না, ভাসমান নৌকাই তার বাহন এবং বাসস্থান।

১. Krishna Iyer and Bala Ratnam—Anthropology in India, Bombay, 1961, p. 113

ধর্ম মানব জীবনের একটি অবিভাজ্য ও অপরিত্যাজ্য বিষয়। ধর্মীয় বিধান ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী এক এক জাতির যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব বেশী।

ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডের একই জাতির জীবনাচরণে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতিতে ও মুসলমান সংস্কৃতিতে তার প্রমাণ আছে। মুসলমান নিরাকার এক ঈশ্বরের উপাসনা করে। তাদের কাছে স্রষ্টা রূপে নয়, অরূপেই আরাধ্য। কিন্তু হিন্দু সাকার ও বহুদেবতাবাদে বিশ্বাসী। দেবায়তন হতে দেবমূর্তি, পূজারতি, নৈবেদ্য ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের ধর্মাচারের বিচিত্ররূপ প্রকাশ পায়। মসজিদ ইসলাম ধর্মচর্চার স্থল। মসজিদের নির্মাণকৌশল মন্দির থেকে ভিন্ন। এতে কোন দেবমূর্তি অঙ্কিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না; ফুলফল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা অথবা ক্যালিগ্রাফির কারুকার্য খচিত থাকে। এগুলি মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ। এখানে নামাজ পাঠ হয়, কোরান-হাদীসের চর্চা ও প্রচার হয়। একরূপে বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধসংস্কৃতির বিকাশ। সেখানে আছে অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তি, আছে ভিক্ষু-শ্রমণের মন্ত্রপাঠ, ভক্তি-প্রণতি। ধর্মীয় চেতনায়-উদ্বুদ্ধ মানবমন স্ব স্ব বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মসজিদ, মন্দির ও মঠের গঠন, প্রক্রিয়া ও পরিবেশ গড়ে তুলেছে; এগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে। আবার ধর্মীয় রীতিনীতি মানবচরিত্র এবং জীবনধারাকে প্রখরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অনুদার, পরমত-অসহিষ্ণু, রক্ষণশীল ধর্মীয় মতবাদ মানুষের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তোলে। ধর্মের নামে এক কালে মানুষ নরবলি দিত। এখন পশুবলি, কোরবানী দেয়। ধর্মের নামেই শুচাশুচি ভেদ, সহমরণ, বৈধব্যবরণ ও বৈরাগ্যবরণ। মানুষের ইহকালচিন্তা, পরকালচিন্তা, ধর্মের নির্দেশেই গড়ে উঠে। মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ সদ্ধর্মের কারণেই জাগ্রত হয়। সুতরাং ধর্ম জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতির অর্থনীতিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকার্য; বর্তমান ইউরোপের অর্থনীতির ভিত্তি যন্ত্রশিল্প। কৃষিজীবন তথা গ্রামজীবনের আদর্শ এবং শিল্পজীবন তথা যান্ত্রিক নগরজীবনের আদর্শ এক নয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার জন্য

গ্রামজীবন সমগ্র জাতির চেয়ে সীমিত গোষ্ঠীর প্রতি অধিক অনুগত। কিন্তু নগরজীবনে জীবিকার্জনের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক বলে তা একটা বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। কৃষিকাজ ব্যাপক ও মেয়াদী। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া কৃষির আর সব উৎপাদনই কাঁচামাল। এ কাঁচামাল যায় কলকারখানায় শিল্পের কাজে। প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণের উপর জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। কোন এক বিষয়ে উৎপাদন-অক্ষমতা অথবা স্বল্পোৎপাদনের জন্যে চাহিদা পূরণে জাতিকে পরনির্ভরশীল হতে হয়। সুতরাং অর্থনীতির ভারসাম্য সমাজজীবনের আদল রক্ষা করে। এই সমাজব্যবস্থার পটভূমিকাতেই সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর ঘটে থাকে। একটি দুঃস্থ পরিবার ও একটি ধনী পরিবারের রূপ ও অবস্থা যেমন এক নয়, তেমনি একটি ধনী দেশ ও একটি দরিদ্র দেশের পরিস্থিতি এক হতে পারে না। ধনসম্পদ একটা শক্তি-স্বরূপ যা জাতির বাইরের ও ভেতরের রূপ-রুচি-আদর্শকে পাল্টাতে পারে।

দেশের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি রাজশক্তির উপর নির্ভর করে। জাতির ভালমন্দ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও কল্যাণকামী পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য সংস্কৃতির বিকাশে রাজনীতিরও ভূমিকা স্বীকার্য। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক মতবাদ এক রূপ নয়। এগুলির রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় রাষ্ট্রীয় জনগণের জীবনধারা ও চারিত্রনীতি ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। রাজতন্ত্রে রাজার স্বার্থেই প্রজার স্বার্থ; সমাজতন্ত্রে প্রজার স্বার্থেই সরকারের স্বার্থ; সুতরাং উভয় শাসনতন্ত্রে জনজীবনের মান ও মর্যাদা কখনও এক রকম হতে পারে না। ধনতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বার্থ ও গণতন্ত্রে সমষ্টি-স্বার্থ রক্ষিত হয় বলে উভয় সরকারের শাসনাধীনে জনজীবনের ধারা দ্বিমুখী হতে বাধ্য। এবং বস্তুতঃ তাই হয়ে থাকে।

লোক-সংস্কৃতি

নগর-সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান-প্রকরণ সমান অর্থাৎ উভয়ই ত্রিসঞ্চয়ের সমন্বয়। তবে উভয়ের মানের ভেদ আছে। নগর-সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র, বিমিশ্র, মার্জিত, শোভনীয় ও মননাশ্রিত। সমাগম, যোগাযোগ, সংমিশ্রণ, সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি কারণে নগর-সংস্কৃতি দ্রুত

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিকাশের শর্ত যে 'মবিলিটি' এখানে তার সুযোগ-সুবিধা বেশী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য আধুনিক নগর-সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।

লোক-সংস্কৃতিতে এসব গুণের অভাব আছে। লোক-সংস্কৃতি স্থূল, সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। যথাযথ শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব এর অন্যতম কারণ। লোকচর্চায় যত্ন ও শ্রম কম। লোকে সহজ প্রবৃত্তির বশে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনায়াসে যা পায় তাই গ্রহণ করে। লোকে আগ্রহাতিশয্যে নতুনকে বরণ করে কিন্তু অবিকলভাবে তা আত্মস্থ করতে পারে না। উপজাতির লোকেরা বিদেশী উপকরণ সহজে গ্রহণ করে না; বিদেশী উপকরণ গ্রহণে লোকমনে বাধা নেই, কিন্তু সীমিত বোধশক্তিতে সর্বাংশে তা আয়ত্ত করতে পারে না। যেটুকু তার চৈতন্য ও বুদ্ধিতে ধরা পড়ে, সেটুকু গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়। বিদেশী ভাববস্তুকে নিজ অভিরুচি ও অভিলাষ অনুযায়ী সাঙ্গীকরণের চেষ্টা করে। দেশাচার, লোকপ্রথা, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা যা তারা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখে ও শুনে লাভ করে, তাই লোক-সংস্কৃতির সম্পদ। অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি প্রধানতঃ ঐতিহ্যনির্ভর। পৈতৃক সম্পত্তির মত এগুলি বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে গ্রহণ করে ও পালন করে। গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না। লোক-সংস্কৃতি স্থূল ও জটিলতাহীন। স্থূলতা ও অশালীনতার কারণে এর নন্দনতত্ত্বের আবেদন তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ অভ্যাস ও আচরণ লোকজীবনে খুব কম, এজন্য লোক-সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায় না। লোক-সংস্কৃতি মননশীল নয়। এতে স্বভাব ও প্রবৃত্তির ছাপ বেশী পড়ে। এজন্য লোক-সংস্কৃতি অকৃত্রিম। সরলতা ও স্বাভাবিকতা লোক-সংস্কৃতির ভূষণ। জনসাধারণের অক্ষর-জ্ঞান নেই বলে তারা কোন কিছু গ্রন্থিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লোকজ্ঞানের প্রধান উৎস। লোক মুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত উপাদান লোক-সংস্কৃতিতে প্রবহমান থাকে। সুতরাং একটি দেশের একটি জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় তার লোক-সংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি তিন শ্রেণীর— নগর-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও আদিম-সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দরবার-সংস্কৃতি বা কোর্ট-কালচার ছিল, এযুগে নগর-সংস্কৃতি হয়েছে। বাংলার নগর-সংস্কৃতি আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্যপ্রভাবপুষ্ট। নগর-সংস্কৃতি স্বরূপে সংস্কারধর্মী এবং সঙ্করধর্মী। এখানকার চাকুরি, শিল্প, ব্যবসায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের সহিত নিরন্তর যোগাযোগ, মেলামেশা, প্রভাব দ্রুত পড়ে। শিক্ষিত লোক শীঘ্রই এসমস্ত উপকরণ রপ্ত করে নেয়। লোক-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ-সংস্কৃতি অংশতঃ রক্ষণশীল। গ্রামবাসী অভ্যস্ত জীবনধারা সহজে ত্যাগ করে না। এখানকার জীবনের সহিত বাইরের জগতের যোগাযোগ অল্প। কৃষিনির্ভর স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনে তা আরও সীমিত। ফলে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব এতে বেশী পড়েনি। বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আর্থনীতিক দুর্দিন ও ধর্মীয় বিপ্লবেও অকস্মাৎ বিধ্বস্ত বা আমূল বিবর্তিত হয়নি তা। ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বিস্তারের ফলে জীবনাচারে বিভেদ দেখা দিল বটে, কিন্তু আর সব আনুষঙ্গিক প্রকার-প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ইংরেজ আমলেও সামাজিক কাঠামটি মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল এবং জীবন ও জীবিকা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি। উপজাতির সংস্কৃতি পুরামাত্রায় রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী। বহির্জগতের সহিত উপজাতির জীবনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। তারা স্বীয় ধর্ম, আচার, বিশ্বাস এবং জীবনরীতিতে শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান। তাদের জীবিকা চাষ, শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ। তারা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের বাইরে অন্ধকার আদিম জীবনসাধনায় রত, পশ্চাৎপদ আদিবাসীর অনুগত অনুকারী হিসেবে পূর্বপুরুষের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করে চলেছে। গ্রহণ-বর্জনের রীতি না থাকায় উপজাতির সংস্কৃতির কোন অভিনব বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে না। আনাগোনা ও লেনদেনের অভাবে উপজাতির লোকেরা যেখান থেকে জীবন শুরু করেছিল, প্রায় সেখানেই থেমে আছে। মেলামেলা ও শিক্ষাদীক্ষার ভেতর দিয়ে চাকমা ও মণিপুরীরা

ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠছে এবং লোকসমাজের সাথে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু সাঁওতাল, গারো, হাজং প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা এখনও পূর্বপুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত আদিম সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে। উপজাতির আদিম সংস্কৃতি, বৃহত্তর লোকগোষ্ঠীর লোক-সংস্কৃতি এবং আধুনিক শহরবাসীর নগর-সংস্কৃতির সম্পর্কের কথা বলতে গেলে বলা যায়, লোক-সংস্কৃতি চলমান ধারায় আদিম সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আর নগর-সংস্কৃতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ধারায় প্রায় অভিনব সৃষ্টি। লোক-সংস্কৃতি উপকরণে ও স্বভাবে অন্তর্দেশীয় (national), নগর-সংস্কৃতি আন্তর্জাতীয় (international)।

আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এবং বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট নগরবাসীর একটি গৃহের পরিচায় হল—বেডরুম, ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন রুম, বাথরুম, পার্লার, গ্যারেজ, গার্ডেন প্রভৃতি নামীয় কক্ষ এবং চত্বর; তার আসবাবপত্র—পালঙ্গ, আলমারি, ওয়ারড্রোব, ডেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, বুক শেলফ, সো-কেশ, মিডশেফ, ট্রাংক, ইলেকট্রিক ফ্যান, ইলেকট্রিক হিটার, ত্রিপয়, টেলিভিশন, ট্রানজিসটর, রেফ্রিজারেটর, স্ক্রিন, ফরাস, জাজিম, গ্লাস, প্লেট, কাপ, স্পুন, প্যান, গ্লাস, বোতল, সুরাই ইত্যাদি। এগুলি আধুনিক নগর-সংস্কৃতির মূর্তিমান উপাদান। এতে জাঁকজমক, চাকচিক্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন আছে। গৃহের বাইরে আছে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকানপাট, সিনেমা-থিয়েটার, মিল-ফ্যাক্টরী, হোটেল-রেস্তরাঁ, ক্লাব, পার্ক, স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, এয়ারপোর্ট; বন্দর, বাস-ট্রাক ইত্যাদি। এসব মিলেমিশে একটা যান্ত্রিক, ব্যস্ত-সমস্ত কর্মমুখর, ভোগসর্বস্ব, কৃত্রিম জীবন-ধারার সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ নগরসংস্কৃতির এ চেহারাটা আন্তর্জাতিক স্বভাবসম্পন্ন; কোন দেশের নিজস্ব ধারায় তার স্বাতন্ত্র্য নেই। বিভিন্ন দেশের উপাদান সম্ভারে এ সংস্কৃতির গঠন ও সমৃদ্ধি।

এদিকে পল্লীর নিভৃত শান্ত প্রকৃতির কোলে গ্রামবাসীর না আছে উচ্চ দালান, না আছে চকচকে আসবাবপত্র। দেউড়ি, শোয়ারঘর, হেঁসেলঘর, বৈঠকঘর বা বাংলাঘর, গোলাঘর, গোয়ালঘর, উঠান—এগুলি নিয়ে পল্লীর একটি পরিবারিক গৃহের পরিচয়। এর মাটির দেওয়াল, ছনের ছাউনি, খড়ের বেড়া। অতি সাধারণ তৈজসপত্র—খাট, চকি, কাঁথা, কাঠের বাক্স, মাটির হাঁড়িপাতিল, কাঁসার থালাবাসন,

শিকা, পাটি, মোড়া, পিঁড়ি, হুঁকো, কল্কি, হাতা, খুন্তি, দা, কাতি, ছুরি, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি। চাষীর ঘরে আছে লাঙল, জোয়াল, মই, দড়ি, পাঁচনি, দাউলি, হেঁসে, কাস্তে, গাড়ি প্রভৃতি। জেলের আছে বিচিত্র জাল, বানা, হোঁচা, কোঁচ, পলই, বিত্তি, ছিপ, তেকাঠি, পচ্কা ইত্যাদি। হেলের নৌকা, হাল, পাল, মাস্তুল, দাঁড়, সেঁউতি, নোঙর, গুণ, লগি ইত্যাদি আছে। জোলা বা তাঁতির আছে তাঁত, মাকু, চরকা, তকি প্রভৃতি; কামারের আছে হাফর, হাতুড়ি; কুমারের আছে চাকা, ছিলকা; ছুতারের নিহান, বাটালি, করাত, রেঁদা প্রভৃতি। এরাই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ। এসব নিয়ে এদের আবহমান কর্মজীবন চলছে। তাদের ছেলেমেয়ে উঠানে অথবা রাস্তায় খেলা করে, গরুর গাড়ি ধূলা উড়িয়ে চলে যায়। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ধ্বনি উঠে, মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় ঘন্টা বাজে, মুসলমানেরা নামাজ পড়ে, হিন্দুরা প্রতিমা প্রণাম করে; মুসলমান শিশু মক্তবে যায়, আরবী কায়দা-সেফারা শিখে, হিন্দুর শিশু টোলে যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শ্লোক শিখে, দরগায় ও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে; গ্রামের মেলা উৎসবে গানের আসর বসে. ঢাক-ঢোল বাজে; হাট-বাজার বসে; অসুখ-বিসুখে ঝাড়ফুঁক অথবা গাছ্গাছড়ার ব্যবস্থা হয়— এটাই বাংলার গ্রামজীবনের সনাতন রূপ; তার সংস্কৃতির পরিচয় এখানেই নিহিত আছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত পল্লীর এরূপই ছিল। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও আছে। গত কয়েক দশকের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হওয়ায় এবং আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় বেতার ও খবরের কাগজ মারফত নগরের প্রভাব পড়তে শুরু করে। এখন গ্রামবাংলার পরিবর্তনের পালা চলছে। তবে পুরাতন ধারা মোটেই শেষ হয়নি, শেষ হবেও না। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিতে বসবাসের মধ্যে বাংলার পল্লীবাসীর সহজ, সরল জীবনপ্রবাহ প্রাচীনকাল থেকে ঈষৎ রূপরূপান্তরের ভিতর দিয়ে চলে আসছে। বাংলার লোকজীবন থাকলে তার লোক-সংস্কৃতিও থাকবে।

বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি

কোন জাতির সংস্কৃতি ভুঁইফোড়ের মত অকস্মাৎ গজিয়ে উঠে না; জাতীয়জীবনের দীর্ঘকালের সাধনা ও সৃষ্টির সংরক্ষণ দ্বারা এর স্বতন্ত্র ও

সম্পূর্ণ রূপ গড়ে তোলা সম্ভব। বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। জাতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সূচনা থেকে এদেশের নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনে পারিপার্শ্বিকতাব প্রভাবে যুগে যুগে স্তর পরম্পরায় জীবনধারার অনুবর্তন-বিবর্তন দ্বারা আপন মানসিকতার আদর্শে একটি অনন্যসদৃশ অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছে। নৃতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিবাসীরা আজকের উপজাতির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গোষ্ঠী জীবনে' (triballife) অভ্যস্ত ছিল। এরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সব আদিম লোকের মত বস্তুপূজা ছিল এদের ধর্ম। এর পর একই প্রকৃতি-পরিবেশে একই উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক এক অঞ্চলে এক একটি 'জনপদ' গড়ে উঠতে থাকে। প্রাক-মুসলিম যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূত্রে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদগুলি অনার্যরাই গড়ে তুলেছিল। 'রাঢ়' শব্দ অস্ট্রিক 'লাড়' বা 'লাঢ়' শব্দজাত। প্রাকৃত জৈনগ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গসুত্তে' রাঢ় বুঝাতে লাড় শব্দের প্রয়োগ আছে। অস্ট্রিক লাড় শব্দের অর্থ 'সাপ'। 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা-জাত। পুণ্ড্র শব্দের অর্থ ইক্ষু। 'তাম্রলিপ্তি' অথবা 'দামলিত্তি' অনার্য ভাষার শব্দ। আর্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও প্রমাণিত হয়, ঐসব জনপদ অনার্যদের দ্বারাই গড়ে উঠেছিল। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে 'অসুর ভাষা' বলা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে পুণ্ড্রদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই আছে, দস্যুরা অনার্য শ্রেণীভুক্ত। 'বোধায়নধর্মসূত্র' গ্রন্থে আছে, অনার্য অধ্যুষিত সংস্কারবর্জিত দেশ বঙ্গ-পুণ্ড্রে কেউ গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 'ভাগবতে' সুহ্মদের 'পাপ' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, অসুর, দস্যু, পাপ প্রভৃতি শব্দ অনার্যদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। আর্য কর্তৃক বিজিত ও প্রভাবিত হওয়ার পর কোন কোন শক্তিশালী শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণে দুএকটি জনপদ একই স্বার্থের অধীনে একত্র ও সম্মিলিত হতে থাকে। বিভিন্ন জন-পদের মিলন ও একত্রীকরণের একটা গতিও পাওয়া যায়। শেষের দিকে

দেখা যায়, রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এই তিনটি জনপদ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাঢ় জনপদের সঙ্গে মিশেছে সুহ্ম, বজ্র, তমলুক, দণ্ডভুক্তি প্রভৃতি। বঙ্গ জনপদের সঙ্গে মিশেছে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি। মুসলমান আমলের গোড়াতে গৌড় ও বঙ্গ নামই অধিক প্রচলিত ছিল। আকবরের আমলে দুটিতে মিলে 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ্'তে পরিণত হয়। মৌর্যযুগ (খ্রীস্ট-পূর্ব তিন শতক) থেকে আর্যীকরণ শুরু হয়, গুপ্তযুগে (খ্রীস্টীয় পাঁচ-ছয় শতক) তা পূর্ণতা লাভ করে। মৌর্যসম্রাট অশোকের ক্ষমতা তাম্রলিপ্ত ও পুণ্ড্রবর্ধনে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। সমতট পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। আর্যরা এশিয়া মাইনর থেকে এসেছিল। তারা মূলে ছিল শক্তির উপাসক। সাত শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক 'গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আট শতকে পালদের অভ্যুদয় হয়। সামন্তগণের মনোনয়নে গোপালদেব সিংহাসন পান। গৌড়বাসী যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহতি লাভ করেছিল, এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একশো বছরের 'মাৎস্যন্যায়ে'র পর তারা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক জন রাজার নেতৃত্ব স্বীকার করছে তখন তা জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার অভিপ্রায় মাত্র নয়, তাতে সম্মিলিত রাষ্ট্রচিন্তাও ক্রিয়া করেছে, বলতে হয়। পালদের রাষ্ট্রীয় সীমানা বাংলার বাইরেও প্রসারিত ছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা অনেকে দক্ষ সুশাসকও ছিলেন। তথাগতের মৈত্রীবাণী ও অহিংস আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণ সহাবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এযুগে রাজা-প্রজার সম্পর্ক দূরের ছিল না বলে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। ময়নামতি-মহাস্থানগড়ের 'টেরাকোটা' শিল্পকলা এর একটি প্রামাণিক নিদর্শন। শেষের দিকে লৌকিক ভাষায় সাহিত্যচর্চাও হয়েছে, যেমন চর্যাপদ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের মত গৌড়বাসীর সাংস্কৃতিক জীবনও দানা বেঁধে উঠেছিল পালযুগে। বলা যায়, তখনই একটা আগৌড় স্থিতিশীল লোকসমাজ গড়ে উঠেছিল। বার শতকে গৌড়বঙ্গে সেনরাজারা অধিষ্ঠিত হন। সেনদের ক্ষমতা কলিঙ্গ ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ মুখ্যত রক্ষণশীল। সেনরা এদেশে পুরোপুরি রাজতন্ত্র কায়েম

করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ রক্ষায় তাঁরা খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁদের রুদ্ররোষে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়।* ধ্রুপদী ভাষা-শিল্প-সাহিত্য ছিল তাঁদের লক্ষ্য। বিবিধ ধর্মানুশাসন ও কঠোর সমাজবিধি প্রবর্তন করে তাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। ফলে রাজা-প্রজার সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের রূপ নেয়। বস্তুতঃ কর্ণাট দেশীয় সেনরাজারা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন চালাতেন।

তথাপি এদেশের গ্রামীণ সমাজের মূল কাঠামোটি নষ্ট হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ, তর্জন-গর্জনকে স্বীকার করে বাঙালী নিজেদের বিভিন্ন বৃত্তি, জীবিকা, ধর্মকর্ম নিয়ে নিজস্ব মূর্তিটি রক্ষা করে চলেছিল। লৌকিক জীবন ধারা যে নষ্ট হয়নি, তার প্রমাণ পাই মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে হিন্দু সমাজের রূপ দেখে। উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ লোকের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে মিশে যাচ্ছেন আর জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে একাত্মতা স্থাপন করছেন। বিশেষ করে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা অবাধে লৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন। লৌকিক দেবদেবী অভিজাত লোকের পূজা পেয়েছেন। তাঁদের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করে ভদ্রসাহিত্য রচিত হয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ব্রাহ্মণ কবিপণ্ডিতরাই রচনা করেছেন। স্বর্গের দেবকুমার ও দেবকুমারী অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন অস্পৃশ্য ব্যাধ গৃহে ও দরিদ্র পল্লীগৃহে। ব্রাহ্মণ কবিরা এসব কাহিনী লিখতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। এতে লোকসমাজের দাবী ও শক্তির পরিচয় নিহিত আছে। মুসলিম বিজয়ের পর বাঙালী সমাজ আরও সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। জনশক্তি রাষ্ট্রস্বার্থে লাগতে পারে, মুসলমান সুলতানেরা স্বাধীন বঙ্গদেশের পত্তন করে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে দেন। চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে পাঠান সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ এটি করেছিলেন। ষোল শতকে মুঘলদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পাঠানরা স্বাধীন ভাবে এদেশ শাসন করেন। গৌড় ছিল তাঁদের রাজধানী। পাঠান আমলে বাংলাদেশ

*মুসলমানদের 'চণ্ডনীতি'র ফলে বৌদ্ধরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কথাটা ঠিক নয়, এজন্য যে মুসলিম বিজয়কালে হিন্দুরাই ক্ষমতাসীন ছিল, বৌদ্ধরা নয়; হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সংঘর্ষে বিজিত হিন্দুদের ধ্বংস হওয়ার কথা অথবা বৌদ্ধ-হিন্দু উভয়েরই। মুসলমানরা বেছে বেছে বৌদ্ধ নিধন করেননি। মুসলিম পূর্ব যুগে হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষের বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

একটা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পেলেও দেশের জনগণের যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জেগেছিল, তা বলা যায় না। মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে বার ভূঁইয়াদের প্রচেষ্টায় জনগণের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে পারত; কোন কোন সামন্ত ভূঁইয়ার স্বার্থ, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতাবোধ তীব্রই ছিল; তাঁরা কেউ কেউ এক সময় মিলিত স্বার্থে একের (যেমন ঈশা খানের) কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল একান্ত ভাবে সামন্তস্বার্থ, এতে প্রজাস্বার্থ যুক্ত হয়নি। ফলে তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি। মুঘল বিজয়ে বাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল বটে, কিন্তু বৃহৎ বাংলার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সীমানা তিরোহিত হল না। বরং রাজকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আকবর বাদশাহ্ মুঘল সাম্রাজ্যকে কতকগুলি সুবায় বিভক্ত করলেন। বস্তুতঃ আকবরের আমলেই বাংলা প্রথম প্রাদেশিক নাম পায়— 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ্'। ভারতরাষ্ট্রের পটভূমিতে নির্দিষ্ট দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলা ও বাঙালী রূপ পায়, স্বীকৃতি পায়। মুসলমানরা ইসলামধর্মাবলম্বী ছিল। আরবভূমি এ ধর্মের উৎপত্তি স্থল। তারা মুখ্যতঃ ধর্মভিত্তিক মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে তোলে যা ক্রমশঃই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা; শেষের দিকে স্বাধীন নবাবেরা মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন।

আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। ইংলণ্ড তাদের মাতৃভূমি; তারা খ্রীস্টধর্মের অনুসারী। শ্বেতকায় ইংলণ্ডবাসী নিজেদের রাজার জাত মনে করত; তাদের কাছে ভারতীয়রা ছিল 'নেটিভ'। নেটিভদের শাসন করা যায়, শোষণ করা যায়। এই নীতিতে তারা এদেশে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়েছে। আর্য হিন্দু, সেমীয় মুসলমানরা ভারতকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ইংরেজরা ভারতকে কখনও মাতৃভূমি ভাবেনি। প্রায় দুশো বছর তাদের শাসন-শোষণ চলে। এক সময় ইংরেজরাই বর্তমান বাংলার প্রাদেশিক সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়। বিহার ও উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা প্রদেশ রূপে চিহ্নিত হয়। প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে এরূপ বিভাগ হয়। মোটামুটি বাংলার ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়ায় এরূপ: উত্তরে হিমালয়ের অরণ্যবেষ্টিত পাদদেশ ও আসামভূমি, পূর্বে-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-পার্বত্যচট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে রাজমহল ছোট নাগপুরের মালভূমি, দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর। এর মধ্যবর্তী নদনদী, বিল-হাওর,

টিবি-টিলা, বন-বাদাড়, পথ-ঘাট, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর আর্কী বিস্তীর্ণ পাললিক সমতল ভূমি নিয়েই বাংলার দেহ গঠিত। কলিকাতা হয় রাজধানী। ইংরেজদের দ্বারাই আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক রাজধানী নয়, সকলের বাসোপযোগী নগরের পত্তন হয়। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। পত্র-পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রচারের ফলে জ্ঞানের প্রসার বেড়ে যায়। বাঙালীর বহির্জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্তর্জীবনের নানা বৃত্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই বাঙালীর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সংহত ও সংগঠিত জাতি হিসেবে বাঙালীর পরিচয় সুচিহ্নিত ও সুনিরূপিত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ফলে ইংরেজ আমলে লোকসমাজেও পরিবর্তন শুরু হয়, তবে আমূল পরিবর্তন কখনও হয়নি। ইংরেজ শাসনমুক্তির কালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়। ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, হিন্দু এবং মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এ বিভাগ নিরূপিত হয়েছে।[১]

সুতরাং জনতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী জনসাধারণের দেহে প্রধানতঃ ত্রিবিধ রক্তধারা প্রবাহিত: অনার্য, আর্য ও সেমীয়। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের ত্রিমুখী প্রভাব পড়েছে।[২] বর্ণবাদীর পাশে আছে অসংখ্য ব্রাত্য জনগণ, শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশে বহুবিধ লৌকিক ধর্মমত। বাংলার অনার্যসমাজে মূলতঃ অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় ও নেগ্রিটোর মিশ্রণ আছে। এদের মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের সংখ্যা বেশী।

---

১. সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাবলী:
- ক. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব
- খ. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড
- গ. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা-সাহিত্য
- ঘ. ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড
- ঙ. J. C. Ghosh—Bengali Literature.

২. বাঙালীর দেহে ইংরেজ রক্ত নগণ্য। বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজের মিশ্রণ খুব কম হয়েছে। নগরজীবনে কিছু এ্যাঙ্গলো বাঙালী ছিল, গ্রামজীবনে এদের সংখ্যা তেমন ছিল না। ধর্মান্তরিত বাঙালী খ্রীস্টান মিশনারীর চৌহদ্দি অতিক্রম করে সমাজের সাধারণ স্তরে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। জাতীয় জীবনে ইংরেজদের প্রভাবটা হয়েছিল প্রধানতঃ জ্ঞানকর্ম ও বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়ে। হিন্দু বাঙালী, বৌদ্ধ বাঙালী, মুসলমান বাঙালী আছে কিন্তু খ্রীস্টান বাঙালী নেই বললেই চলে।

অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর লোকেরা কৃষিকাজ জানত, দ্রাবিড়রা নগরজীবনেও অভ্যস্ত ছিল। মধ্য এশিয়ার যাযাবর আর্যরা কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিল। অনার্য-আর্যের মিশ্রণেই ভারতে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অনার্যের বস্তু ও প্রতীক পূজা এবং আর্যের শক্তি উপাসনা একত্রে প্রতিমা পূজার জন্ম দেয়। বস্তুর প্রতিমূর্তি অথবা প্রতীকমূর্তিতে শক্তির অধিষ্ঠান, এটাই হল, সমন্বয়ের ধরন ও প্রকৃতি। অনার্যের স্থূল বস্তুধর্মের উপর আর্যের মননশীলতা ও সৃজনশীলতার এক অতি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম তা। এটাই বহুদেবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধারণ হিন্দুধর্ম। ভারত উপমহাদেশের মাটিতেই জড়বস্তুপূজা, প্রাণিপূজা, প্রতিমাপূজার উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রচলন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধিতা করে ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বৌদ্ধধর্ম শূন্যবাদী ; বৌদ্ধরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। আরব পারস্যের মুসলমানরা সঙ্গে ইসলামধর্ম নিয়ে আসে। নিরাকার একেশ্বর আল্লাহ্ তাদের উপাস্য, আরাধ্য। শারীয়তপন্থীরা উপাসনা করে, মারীফতপন্থীরা আরাধনা করে। বাঙালীর লোক-জীবনে ও লোক-সংস্কৃতিতে এসবের বিবিধ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে।

মানবসংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আদিম স্তরে দৈব-নির্ভরতা, কুসংস্কার এবং আচারবিধি অধিক প্রভাব বিস্তার করে। এটা জগৎ-নিয়মের কার্যকারণবিধি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই অথচ জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ আছে, এমন অবস্থা থেকে আসে। বাঙালীর লোকজীবনে ধর্মের অনুশাসন বরাবর প্রবল ছিল। বিশেষত: হিন্দুর জীবন ধর্মের নিগড়ে বাঁধা। একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম স্বচ্ছ ও মুক্ত জীবনের আদর্শ বহন করলেও দীর্ঘদিনের একত্রবাস এবং মজ্জাগত সংস্কারবশত: মুসলমানের জীবন প্রকৃতিতে অনৈসর্গিক আচরণ প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীর সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশের বিকাশ ধর্মকেই আশ্রয় করে। অপ্রাকৃত দৈবশক্তিতে বিশ্বাস থেকেই নানা ধর্মসংস্কারের উদ্ভব। দৈবনির্ভরতার বশবর্তী হয়ে স্মরণাতীত যুগ থেকে বাঙালী কত মত, পথ, তত্ত্ব, নীতি, শাস্ত্র, বিশ্বাস, সংস্কার গড়ে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য থেকে নির্জীব জড়বস্তু-পূজা, দেবমূর্তিপূজা, উদ্ভিদপূজা, প্রাণিপূজা, নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির বিকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। বাঙালীর লোকমানসিকতা রক্তমাংসের মর্তমানবকেও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যথাবিধি পূজা করেছে। আবার শাস্ত্রীয় দেবতাকে স্বর্গের আসন থেকে

টেনে এনে মাটির পৃথিবীতে মানবীয় লীলাকীর্তি আরোপ করে ভজনা করেছে। ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলার কথা ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার আচরণবিধির মধ্যেও বাঙালীর ধর্মীয় মানসিকতার প্রাধান্য ঘটেছে। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে সুরমা, করতলে মেহেদি ধারণ ও রঞ্জনে বাঙালী রমণীর প্রসাধনচর্চার আন্তরবাসনাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, এতে শুভাশুভ সংস্কারও জড়িয়ে আছে। জারি, সারি, মুর্শিদী, মর্সিয়া, গজল, বাউল, কীর্তন, ব্রত, পট, প্রতিমা, অলপনা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, বস্ত্রালঙ্কার, আহারবিহার সর্বত্রই ধর্মের চিহ্ন, অধর্ম কোথাও নেই।

বাঙালীর ধর্ম-প্রাণতার অন্যতম কারণ, শ্রমকাতর ও সংগ্রামবিমুখ জনজীবনে ও জীবিকার্জনে অতিমাত্রিক প্রকৃতিনির্ভরতা। দৈবনির্ভরতা নয়, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সফলতা অর্জনের সাথে সাথে যে আত্মপ্রত্যয় জন্মে তাতে অকারণ বিধিবিড়ম্বনার বন্ধন দূরীভূত হয়, বাস্তব জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য ছিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝঞ্ঝা, কীটদংশন, পশ্বাঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি বাঙালীর দুর্বল মনে এক একটি ভীরু, অন্ধ, অশাস্ত্রীয় আচার ও কুপ্রথার জন্ম দিয়েছে। জীবনকে সে ভালবাসে কিন্তু জীবন রক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার আয়ত্ত হয়নি। এজন্য জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের জন্য সে কেবল পূজা করেছে, প্রতিরোধের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

কর্মহীন জীবন ও ভাবালুতা বাঙালীর ধর্মভীরুতার আর একটি উল্লেখ-যোগ্য কারণ। স্বর্ণপ্রসূ বাংলার উর্বর মাটি অনায়াসলভ্য জীবিকার্জনের অফুরন্ত সুযোগ দিয়ে তার সন্তানকে কেবল অকর্মণ্য, অপদার্থ করে তোলেনি, বাংলার নদীনালা, খালবিল, শ্যামল প্রান্তর, সবুজ বনানী, স্নিগ্ধ বাতাস, নীল আকাশ তার অবসর যাপনকে অলস চিন্তায় ভারাতুর করে তুলেছে। কোন বলিষ্ঠ জীবনবেদ, কর্মনিষ্ঠা, জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সামনে ছিল না বলে বাঙালীমানস সংস্কার ও বিশ্বাস ভাবে প্রণত হয়েছে, প্রেম-ভক্তিরসে অবগাহন করেছে। সে স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানুষ ছাড়া কিছুই দেখিনি। কিন্তু মানবজীবনানুভূতি তীব্র এবং অন্তর্গামী হলেও

মর্তকল্পনার আদর্শ প্রতিষ্ঠার অভাবে পরকালসর্বস্ব জীবনাতির অকারণ পুলকাতিশয্যে সবকিছু দেবচৈতন্যে সমীভূত হয়েছে, মানবিকতার সংবেদন দেবলীলার ও পরকালচিন্তার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে বাঙালীর কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিকতায়, আচার-আচরণে এই একই আন্তর-অভীপ্সা সক্রিয় ছিল।

বাংলার লোকজীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্তি। প্রভুত্ব, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, পালন ইত্যাদির মিলিত চক্রকে 'রাজনীতি' নাম দেওয়া যেতে পারে। শব্দতাত্ত্বিকের মতে রাজনীতি হল একটা কর্মরত শক্তিবিশেষ যার দ্বারা রাষ্ট্রদেহ গঠিত হয় এবং তার শারীরবৃত্তি নিরূপিত হয়।[১] অর্থাৎ রাজনীতি হল কতকগুলি মতাদর্শের সমন্বয়। সে আদর্শ অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠিত হয় এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়।

অধুনা রাজনীতির ব্যবহার ও প্রচার যত সহজ হয়েছে, পূর্বকালে সেরূপ ছিল না। রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ সমাজজীবনের উপরি মহলের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর; নীচের তলার বৃহত্তম অংশ এর আওতার বাইরে ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের ফলে রাজনীতির হাওয়া কেবল রাজধানী বা রাজসভার সীমিত ক্ষেত্রেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। এ ছিল প্রাসাদের রাজনীতি, দেশের জনগণের নয়। জনগণের সাথে এর একটা যোগাযোগ ছিল তা কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত (fiscal) আর বিচার-সংক্রান্ত (Judicial)। কর পেলেই রাজা খুশী: শাসক-শাসিতের সম্পর্কে সম্পদের মালিকানা ও ভোগস্বত্ব নিয়ে জটিলতা ছিল না। সামন্তপতিরা প্রজার উপর কর্তৃত্ব ফলানোর চেয়ে প্রজার কাছ থেকে কর আদায়ের দিকে বেশী নজর রাখতেন। ভূমি রাজার, তিনি যেই হন তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সময় মত কর রাজভাণ্ডারে পৌঁছে দিলেই প্রজাদের খালাস; তারা ভূমির মালিকানা নিয়ে রাজার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি। ইউরোপে এ সংগ্রাম ছিল। এখানে রাজার বদল হলেও প্রজারা ছিল অবিচল। জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন থেকে রাজা বা সামন্তপতিরা সম্পূর্ণ সামরিক

১. The forces at work which form the anatomy and determine the physiology of states.
Quot. from encyclopeadia of social science, Vol. 11, p. 228

শক্তির উপর নির্ভর করতেন। দেশের যুবক সম্প্রদায় নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হলেও তারা প্রধানতঃ ভাড়াটে সেনার কাজ করত। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ বলতে তেমন কিছু ছিল না। দেশের অন্তর্বিপ্লব দমন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পররাজ্য আক্রমণ ইত্যাদি কাজে রাজা সৈন্যদের ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি রাজস্বার্থেই ব্যবহৃত হত। ঝঞ্ঝা, প্লাবন, মহামারী ইত্যাদি দুর্দিনে প্রজার পাশে তারা দাঁড়াত না। সুতরাং এও ছিল রাজপ্রাসাদেরই একটা যন্ত্র। প্রজার সাথে সামরিক (martial) সম্পর্ক বিচ্ছিন্নই ছিল। রাজনীতির এসব কুটিল ধূম্রজাল ও জটিল আবর্তের বাইরে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের আয়োজন করে সেকালের বাঙালী আপন চেতনার পরিবেষ্টনে ছোটবড় সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার মাঝে স্বীয় ভাবনা-কল্পনাকে নিয়োজিত করেছে। রাজধানীর বুকে একের পর এক সামন্তপতি, রাজা, সুলতান, সুবেদার, নবাবের বদল হয়েছে কখন নির্বিঘ্নে, কখন রক্তাক্ত বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে, তবু বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ আলোড়ন জাগেনি। এর মূলীভূত কারণ হিসেবে সুধীজন বাংলার গ্রামজীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরতার উল্লেখ করেছেন।[১] আর্থনীতিক ও ব্যবহারিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলে আত্মকেন্দ্রিক মনোভঙ্গি বাঙালীর জীবনদৃষ্টিকে বহির্জগৎ থেকে টেনে এনে সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যে রেখে দিয়েছে। স্যার মেট্‌কাফ স্বনির্ভর বাংলার গ্রাম্যসমাজকে 'ছোট ছোট গণরাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত— 'তাদের যা প্রয়োজন সবই তারা নিজেরাই সরবরাহ করে, বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে হয় না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। রাজ্য ভাঙে গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সকলের প্রভুত্ব একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু গ্রাম্য সমাজের কোন পরিবর্তনই হয় না।'[২] কার্ল মার্কস্ এশিয়ার সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, বাংলার গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধেও তা সম্পূর্ণ খাটে। তিনি লিখেছেন— 'ভেঙ্গে গেলেও এই গ্রাম্যসমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।...মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের

---

১. বিনয় ঘোষ— বাঙালীর নবজাগৃতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ২৫

২. উদ্ধৃত : ঐ, পৃঃ ৩০

ঝড়ঝঞ্ঝার নীচে এশিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে থাকে।'[১] ইংরেজ প্রভুত্ব সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার মান উন্নত ছিল বলে এযুগে বাঙালীর আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছিল।[২] কিন্তু এটি আংশিক সত্য, সমগ্র বাংলার গ্রামজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ ইংরেজের অপরিমিত শোষণনীতির ফলে গ্রামশিল্পের এবং কৃষিজীবনের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। রাজধানী ও কতিপয় শিল্পকেন্দ্র ছাড়া দেশের সর্বত্র শোচনীয় দুরবস্থা অব্যাহত ছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হাশেম শেখ ও রামা কৈবর্তের যে নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছেন,[৩] তার একশো বছর পরেও তাদের বংশধরের যে বেশী পরিবর্তন হয়নি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হাঁটু অবধি কাদামাটিতে হীনবল দুটি গরু নিয়ে হিন্দু নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষক আজও লাঙল ঠেলে শস্য ফলায়, কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। গ্রাম্যচাষীর কৃষিপদ্ধতিতেও বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অধুনা সার, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সুযোগ দেশের ক'জনে পায়। অধিকাংশ স্থলে আগের নিয়মেই চাষাবাদ চলে আসছে।

বাংলার কুটীরশিল্প বা হস্তশিল্প ছিল নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য। কুটীর শিল্পী বলতে যাদের বুঝায় অর্থাৎ তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার, চামার, সেকরা প্রভৃতি সকলেই সরাসরি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। চাষী ক্ষেতের তুলা দিয়ে জোলার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়েছে, ফসলের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে চাষের যন্ত্রপাতি, কুমারের কাছে হাঁড়িপাতিল, ছুতারের কাছে গাড়ি-পাল্কি, সেকরার কাছে গহনাপত্র নিয়েছে। এক কথায়, তারা পরস্পর পরস্পরের উৎপাদন বিনিময়ে জীবন নির্বাহ করত। এর ফলে গ্রামজীবনের সীমানা প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা।

বৃত্তির দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী

১. বিনয় ঘোষ— বাঙালীর নবজাগৃতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ২৪

২. ঐ, পৃঃ ৩০-৩১

৩. বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ২৮৮ (২য় সং), 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১] অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে আছে মাঝিমাল্লা, জেলে, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার, সেকরা, কাঁসারী, চুনারী, তেলী, মালী, গোয়ালা, ময়রা, কাহার, কাঠুরে, ঘরামী, পটুয়া, বারুই, বেদে, দর্জি, কবিরাজ, কসাই, ধোপা, নাপিত, ডোম, চামার ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে সমস্ত সমাজদেহকে সজীব ও সচল করে রেখেছে। এদের সকলের জীবনের মান, রুচি, ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণ এক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য রেখাটি বেশ স্পষ্ট। সকলের সামাজিক মর্যাদা সমান নয়। বৈবাহিক সম্পর্কে তারা বিচ্ছিন্ন। কৃষক-মজুর ক্ষেতে কাজ করতে করতে যে সারি গায়, তার সুর ও ভাব এবং মাঝিমাল্লা দাঁড় টানার সময় যে সারি গায়, তার সুর ও ভাব এক নয়।[২] অথচ উভয়ই কর্মসংগীত। গাড়োয়ানের ভাওয়াইয়ার সুর ও ভাব এবং নৌকা-মাঝির ভাটিয়ালীর সুর ও ভাব এক নয়। গাড়োয়ান ভাটিয়ালী গায় না, মাঝি ভাওয়াইয়া গায় না। বৈষ্ণব বৈরাগীর ভজনগান, মুসলমান ফকিরের মারফতী গান, বাউলের মরমীগান এক শ্রেণীর নয়। অথচ তারা সবাই ভিক্ষোপজীবী। জেলের যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম ও জোলার যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম এক নয়। তাদের তুলনায় কৃষকের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কামার, কুমার, ছুতার, সেকরা এরা সকলেই কারিগর, এদের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি এবং শিল্পবস্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। তেলীর সমস্যা ও মালীর সমস্যা এক নয়। সুতরাং জীবিকার এক এক ধারা অনুযায়ী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদান। অবশ্য গ্রামবাংলায় সামাজিক জীবনে এ বিভেদ থাকলেও কোথাও বিরোধ নেই। ব্যবহারিক জীবনে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, স্বার্থসংশ্লিষ্ট। একের আনন্দ সমাজের আনন্দ, একের অভাব সমাজের অভাব। সমন্বয়ের ধর্ম বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতির ধর্ম। দেশের জীবন, জীবিকা ও জলবায়ুতে এ সমন্বয় ও স্বচ্ছন্দতার গুণ আছে।

---

১. ১৯২১ সালে বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষক ও চাষী-মজুরের সংখ্যার হার ছিল শতকরা ৮৫·১৮ জন।
W. H. Thompson— Census Report of India, vol., V., Bengal, part 1, 1921, p. 381

২. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোক সাহিত্য, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৯০-৬০০

উপরের আলোচনা থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির নিরূপক ও নিয়ামক যে সব দিক আছে তার কতকগুলিতে কিছু হেরফের হয়েছে, আবার কতকগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে, গ্রামবাংলার আর্থনৈতিক ভিত্তিটি প্রায় অভিন্ন। উৎপাদন উপকরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন সম্পর্ক—এই ত্রিবিধ বিষয় একটি জাতির সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের কৃষি ভিত্তিক উৎপাদনে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং উৎপাদন সম্পর্কে তেমন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি বলে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও দেখা যায়নি। শ্রমবিমুখতা, দৈবনির্ভরতা, ভোগবাদ ইত্যাদি কারণে ধর্ম, কর্ম, চিন্তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অধিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। দেশের ভূমি, সম্পদ, প্রকৃতি, আবহাওয়ার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলার সংস্কৃতি একটা স্থিতিস্থাপক গুণ অর্জন করেছে এবং স্বাভাবিক ধারায় স্বনিয়মে স্বপথে বিকাশ লাভ করেছে। এজন্য এর নিজস্ব রূপ-বৈশিষ্ট্য আকারে-প্রকারে প্রায় অভিন্ন থেকে গেছে।

বাংলার লোকসাহিত্য

প্রকাশ মাধ্যম ভেদে লোকসৃষ্টির দুটি প্রধান শাখা হিসেবে মূর্তিমান সংস্কৃতি (material culture) ও বাকশিল্প (formalised culture) এ যাবৎ আলোচিত হয়ে আসছে। বস্তু-আশ্রিত সকল প্রকার লোকশিল্প প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। মুখে মুখে প্রচলিত বিচিত্র লোক রচনা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই দ্বিতীয় শাখাই লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে লোকমানসের ও লোকজীবনের ছবি আছে। নন্দনতত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক উপযোগিতা ও আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব লোকসৃষ্টিতে বেশী। এজন্য জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান উপাদান এতে পাওয়া যায়।

ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বাসনকোসন, যন্ত্রপাতি, পুতুল-খেলনা, আলপনা, পটচিত্র, মূর্তি প্রভৃতি মূর্তিমান সংস্কৃতির বিষয়। লোককাহিনী, লোকগাথা, গান, বারমাসী, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ, প্রবচন, লোকবিশ্বাস, কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপাদান। লোকাচার, লোকোৎসব, লোক-নৃত্য, গ্রামীণ খেলাধূলা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়াভিত্তিক। এগুলি তৎকালিক জীবন-অভ্যাসে প্রকাশ পায়, সাহিত্যে ও শিল্পে এ সবের ছায়াপাত ঘটে।

বাংলার লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও বিপুল। লোকসাহিত্যের এক এক শাখার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। লোককাহিনীর মধ্যে রূপকথা, পুরাকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ভাগ আছে। ছড়ায় আছে ছেলে ভুলান ছড়া, ব্রতের ছড়া, মাগনের ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি। লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য অধিক। বাঙালীর আবেগপ্রবণ মনে গীতিসুর বেশী ধ্বনিত হয়েছে। জারি, সারি, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, ঝাটু, জাগ, মালসী, বাউল, বিচার, আলকাপ, টুসু, ভাদু, গম্ভীরা প্রভৃতি বাংলার জনপ্রিয় সঙ্গীত। এগুলি প্রধানত: পুরুষের গান। অন্তঃপুরে নারী-কণ্ঠেও বিচিত্র মেয়েলীগীত আছে। ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদও বৈচিত্র্যধর্মী। জীবনের বিচিত্র দিক স্পর্শ করে লোকসাহিত্যের এসব শাখা গড়ে উঠেছে। লোকসৃষ্টি স্বভাবজ। জাতীয় জীবনের গভীরে এর মূল প্রোথিত। এজন্য কোন না কোন সূত্রে জাতির মর্মলোকের রহস্য এতে অনুসন্ধান করা যায়। লোকসাহিত্য স্বরূপত: লোক-সংস্কৃতিরই অঙ্গ, আবার এগুলির বিষয়বস্তুতে লোক-সংস্কৃতির উপাদানও ছড়িয়ে আছে।

লোকসৃষ্টিকলার কাল নির্ণয় করা যায় না। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিচার করে কোন কোন শাখার প্রাচীনতা অনুমান করা যায়। নানা প্রকার লৌকিক সংস্কার, লোকাচার, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন হতে পারে। এগুলিতে যে মানসিকতার ছাপ পড়েছে, নৃতত্ত্বের বিচারে তা প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। মন্ত্র যাদুবিদ্যা প্রসূত। যাদুবিদ্যায় আদিম সংস্কৃতির উপাদান আছে। সর্ববস্তুতে আত্মার আরোপ করে তার কাছে সুফল কামনা, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় যা 'এনিমিজম', যাদুবিদ্যা সে স্তরের মানসফসল। মন্ত্র ও মন্ত্রাচার তখন থেকে যাত্রা শুরু করে কালে কালে যুগের প্রভাব অঙ্গে মেখে নিয়ে চলে আসছে। পরবর্তী কালে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এর আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব শিথিল হয়েছে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও লোকমানসে তার প্রভাব থেকে গেছে।

অনেক লৌকিক নাচ ও আচারে গোষ্ঠী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। দলবদ্ধ যুদ্ধনাচে আত্মরক্ষার অথবা আক্রমণের অভিনয় আছে। কামনাকে সফল করার জন্য অনেক আচারনৃত্যে অনুকরণের ধর্ম আছে। ডাকনাচ, লাঠিনাচ, ব্রতনাচ প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। জৈবিক প্রেরণাজাত যুদ্ধনাচে

এবং যাদুপ্রভাবজাত আচারনাচে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে দল বেঁধে মাগন করে আচার পালন করা হয়। এটা বারোয়ারী ব্যাপার। ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা দেবতার পূজার রীতি অনার্য চেতনাসম্ভূত বলে বিশেষজ্ঞ মনে করেন।[১] বাঙালী বংশ পরম্পরায় আজও এসব অনুসরণ করে আসছে। লোকসৃষ্টির কতক শাখা অর্বাচীন কালের হতে পারে। বাংলার গীতিকাগুলিতে সংহত চিন্তার ছাপ আছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি দুর্বল হলেও কাহিনীর বিষয়বস্তু তুচ্ছ নয়। কোন কোন গীতিকায় ইতিহাসের উপাদান আছে। এতে যে সমাজজীবনের ছবি ধরা পড়েছে তা অনুধাবন করে যুগের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। মুসলমানী ভাবের যে সব গান, গাথা, গল্প আছে সেগুলি এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর রচিত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কোন কোন বিষয়ে আবার প্রাচীন ধারার মিশ্রণ থেকে গেছে। আল্লাহ্, রসুল, ফাতেমা আলী, পীর, দরবেশের নামের দোহাই দিয়ে যেসব মন্ত্র আছে সেগুলি মধ্যযুগেরই রচনা, কিন্তু মূল প্রেরণা প্রাচীন মন্ত্রের আদর্শ থেকে এসেছে। কেবল ভাব ও ভাষা নতুন কিন্তু মনোভাব ও প্রকাশভঙ্গি প্রাচীন ধারার অনুবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুসলমান সমাজে পীরপীরানী সম্পর্কিত ধারণা মধ্যযুগে গড়ে উঠেছে। লোকমনে পীরপীরানীর যে স্থান, হিন্দুর দেবদেবীর সাথে তা প্রায় সমতুল। লৌকিক দেবদেবীর স্থলে মুসলমানরা পীরপীরানীর কল্পনা করে একাধারে কামনাবাসনা সফল ও অন্যধারে ধর্মরসপিপাসা নিবৃত্ত করেছে। বৃষ্টির কামনায় ছড়া বলে ও গীত গেয়ে মেঘারানীর কাছে আবেদন জানান ব্যাপারটা প্রাচীন প্রকৃতিপূজার লক্ষণাক্রান্ত। মুসলমান সমাজে এর অবাধ চল আছে। এর সম্পূর্ণটা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া, শরীয়তী ইসলামধর্মে এর কোন স্থান নেই।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির বিকাশের যাত্রা প্রাচীন কাল থেকে শুরু, যুগে যুগে গ্রহণ-বর্জন, শোষণ-মিশ্রণের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা ক্রমশঃ পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। আর তা'ই প্রবহমান সজীব সংস্কৃতির ধর্ম।

১. Sarat Chandra Mitra— On the Cult of Sonaraya in Northern Bengal, JDL, Vol. VIII, 1822, Calcutta, p. 143.

বাংলার লোক-সংস্কৃতির উৎস

বাংলার লোক-সংস্কৃতি বাংলায় বসবাসকারী উপজাতিদের আদিম সংস্কৃতির বংশধর, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। এরা অনার্যদেরই উত্তর পুরুষ। বাঙালীর দেহে যে ভাবে অনার্য রক্তধারা সঞ্চারিত হয়েছে. তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতেও সেভাবে অনার্য-উপাদান সঞ্চালিত হয়েছে। সুতরাং বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে হলে আদিম অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় জানা দরকার। এ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা যায়।

একথা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর লোকসমাজের মূল ও প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে দুই দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রান্ত ও প্রত্যন্ত সীমানায় বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে। মিলন-মিশ্রণেব কাজ এককালে সম্পন্ন হয়নি, আবহমানকাল ধরে তার পালা চলেছে; মিলনের পালা আজও চলছে। সাঁওতাল, গারো, মণিপুরী, চাকমা প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা আচার-আচরণে, পোশাকে, শিক্ষায় লোকসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। নানা দিক থেকে নদনদী জলধারা বহন করে যেভাবে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেরূপ নানা উপজাতির লোকেরা একত্র হয়ে বাংলার বিপুল জনসমুদ্রে মিশে গেছে। পলির দেশ বাংলার সমতলভূমি নদীবাহিত পলি দিয়েই তৈরি, অনুরূপ বাংলার লোকসমাজ-লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন উপজাতির জীবনের পলি দিয়ে গড়ে উঠেছে। সহাবস্থান, সহযোগিতা, আদানপ্রদান, বিবাহ, জীবিকা ইত্যাদি কারণে এ মিলন যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকারেই হয়েছে। এবং এর ফলে উপজাতীয় উপাদানে বাঙালীর সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও মিলনের পর আর উপজাতীয় ধর্ম বজায় থাকেনি, বরং তা এক স্বতন্ত্র মূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করে। আর এটাই হল আবহমানকালের বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা।

বাংলাদেশে যে কয়টি উপজাতি আজও আছে সেগুলির নাম— সাঁওতাল, ওরাঁও, রাজবংশী, গারো, হাজং, মণিপুরী, খাসিয়া, চাকমা, মগ, মুরং, কুকি, লুসাই, টিপরা, খুমী, সেন্দুজ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে আছে— সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওরাঁও, মাল, মণিপুরী, নাগা, খাসিয়া, বীরহোড় কোচ, গঁড় প্রভৃতি।

এরা প্রধানতঃ পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে বাস করে। চাকমা, মগ, মুরং, টিপরারা থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে, মণিপুরী, খাসিয়া থাকে মণিপুর ও শ্রীহট্টের পাহাড়ী এলাকায়, নাগা, কুকি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা নাগা-ভূমিতে, গারো, হাজংরা থাকে ময়মনসিংহের জৈন্তিয়া পাহাড় ও টাঙ্গাইলের মধুপুর অরণ্যভূমিতে, কোচ, রাজবংশী কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির পাহাড়ী ভূমিতে, সাঁওতাল, ওরাঁও, মাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা ছোট-নাগপুর, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে।

নরতত্বের দিক থেকে এসব উপজাতির স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা গোষ্ঠীর লোকদের মাথা গোল, চুল কোঁকড়া, নাক খাঁদা, ঠোঁট মোটা, গায়ের রং কাল, দেহের উচ্চতা মাঝারি। ওরাঁও, মালতো, ভূমিজ গোত্রের মানুষের মাথা চোকা, কান লম্বা, চোখ অসমান্তরাল, নাক ছোট ও মোটা। অনুরূপভাবে গারো, খাসিয়া লোকদের চেহারা গৌরবর্ণ ও খর্বাকৃতি। এদের গোঁফদাড়ি বিরল, নাক চ্যাপ্টা, ভুরু ভারী ও নির্ভাঁজ। চাকমা, মগ, মুরং মণিপুরীদেরও মোটামুটি ঐরূপ বৈশিষ্ট্য। স্পষ্টতঃই এরা মোঙ্গলীয় রক্তধারার মানুষ। প্রথমটি অস্ট্রিক ও দ্বিতীয়টি দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী পরিভাষায় অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় রক্তের নরগোষ্ঠী যথাক্রমে Austroloid, Dravinian ও Mongoloid. আর্যভাষায় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা 'নিষাদ' এবং মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা 'কিরাত' নামে অভিহিত হত।[১] মোঙ্গলীয়-দের অপর নাম 'মোঙ্গল-প্রতিম'। সিংহলের ভেড্ডাদের চেহারার সাথে দ্রাবিড়দের মিল আছে, এজন্য তারা 'ভেড্ডা-প্রতিম' নামেও পরিচিত। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে এসব রক্তধারার মানুষ ছড়িয়ে আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর রক্ত আছে; অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধভাবেই পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলায় অস্ট্রিক, পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় দ্রাবিড় এবং পূর্ব ও উত্তর বাংলায় মোঙ্গলীয়দের সংখ্যা বেশী।[২] প্রাগৈতিহাসিককালে আর এক

১. 'ভাগবতে' কিরাত ও 'রামায়ণে' নিষাদ জাতির কথা আছে। রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণে' কিরাত জাতির উল্লেখ আছে।

২. বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ৪০ (৭ম সং)।

শ্রেণীর রক্তধারার আদিবাসী এদেশে ছিল, তাদের নৃতাত্ত্বিক নাম হল 'নিগ্রোবটু' (Negroid)। বর্তমান নাগারা নিগ্রোবটুর বংশধর। আন্দামানের আদিবাসীরাও নিগ্রোবটু। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এদের অবস্থানের কথা অনেকে স্বীকার করেছেন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগদীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, ময়মনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোন কোন স্থানে ক্বচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় উর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়।'[১] এদের 'নিগ্রো-প্রতিম' এই নাম দেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে নিগ্রোবটুর প্রভাব অতি নগণ্য। অনেকের অভিমত, এরাই ভারত উপমহাদেশের আগত আদিমতম অধিবাসী। এর পরে অস্ট্রিকরা আসে, পরে দ্রাবিড়, আরও পরে মোঙ্গলীয়রা। আর্য পূর্বযুগে এরাই ছিল বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী। আর্যেতর জাতি হিসেবে এরা 'অন্-আর্য' বা 'অনার্য' নামে অভিহিত। অস্ট্রিকরা চাষবাস ও শিকার দুই করত। দ্রাবিড়রাও কৃষিজীবী ছিল। তারা নগরজীবনেও অভ্যস্ত ছিল। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা। এখানকার ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নতমানের সীলমোহর পাওয়া গেছে। এর ভাষার পাঠোদ্ধার হয়নি। নগরবাসী দ্রাবিড়রা সুসভ্য ছিল। এটা খ্রীস্ট-পূর্ব দুই হাজার-আড়াই হাজার বছর আগের কথা। ঐ সময় অথবা আরও কিছু পরে মধ্য এশিয়া থেকে নর্ডিক রক্তধারার মানুষ আর্যরা ভারতে আগমন করে। আর্যদের বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, কটা চোখ। আর্যরা যাযাবর পশুপালক ছিল। ভারতে এসে দ্রাবিড়-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকদের পরাভূত ও বশীভূত করে ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করে। আর্য-অনার্যের মিলনে ভারতে হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা। আর্যদের পরে এসেছে আরও জাতি— শক, হুন, গ্রীক, পাঠান, মোগল, ইংরেজ প্রভৃতি। শকদের চওড়া গোলমাথা, ঈষৎ হলদে চোখ ও টিকালো নাক। এর পরে উল্লেখযোগ্য মধ্যপ্রাচ্যের সেমিটিক রক্তধারার মানুষ

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৪০-৪১

আরব-পারস্যের মুসলমানদের আগমন ও আধিপত্য বিস্তার। এরাও গৌরবর্ণ, উঁচু ও বলিষ্ঠ দেহের মানুষ। মোগলরা মোঙ্গলীয় গোত্রের মানুষ। পাঠান ও মোগলদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শেষের দিকে আসে ইউরোপ থেকে কয়েক শ্রেণীর মানুষ— ডাচ, ওলন্দাজ, ইংরেজ। এদের মধ্যে ইংরেজরাই বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রভুত্ব করে ও প্রভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ খুব কম হয়েছে, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

এক অতি স্থূল রেখায় এটাই হল বাঙালীর জাতিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত। শহর-গ্রাম, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈহিক গঠনে ঐসব রক্তের বীজ কোন না কোন প্রকারে ছড়িয়ে আছে।

আজকের উপজাতিদের মধ্যে অনেকে আছে যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রীস্টান ধর্ম পালন করে, কিন্তু উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস, আচার-রীতি, ভাষা ত্যাগ করেনি। সাঁওতাল, গারোরা প্রধানতঃ হিন্দু-ধর্মাসক্ত; তারা ক্রমশ হিন্দুসমাজে মিশে যাচ্ছে। মগ, চাকমারা বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগী। মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্মভুক্ত। রাজবংশীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আনুগত্য পোষণ করে মিশে যাচ্ছে। ওরাঁও, খাসিয়ারা প্রধানতঃ হিন্দুভাবাপন্ন। খ্রীস্টান মিশনারীদের চেষ্টায় বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারিত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অধিকাংশ উপজাতি পূর্বপুরুষের আচার-সংস্কার নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তারা এখনও বাস্তু-দেবতা, গ্রামদেবতা, গোত্রদেবতা ইত্যাদির পূজা করে। গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক বস্তু দেবতারূপে পূজা পায়। তাদের উদ্দেশ্যে যথাবিধি পূজাচার, নৈবেদ্য, পশুবলি আছে। ভূতপ্রেত, মৃতাত্মা ও অন্যান্য অলৌকিক অশরীরী আত্মার পূজা প্রচলিত আছে। সাঁওতালদের বড়দেবতা 'চাঁদুবোঙা' বা 'সূর্যদেবতা'। 'মারাঙবুরু' বা পাহাড়-দেবতা তাদের গোত্র বা কুলদেবতা (totemic god), গারোদের বড়দেবতা 'তাতারা রাবুগা', তারপরেই আছে 'সালজং' (সূর্য), 'ছোছুম' (চন্দ্র), 'গোয়েরা' (বজ্র) প্রভৃতি।[১] আত্মাবস্তুজ্ঞানে এসব জড়বস্তুপূজা আদিম ধর্মচেতনা সর্বপ্রাণবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্ম তো

১. আবদুস সাত্তার— আরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৮৩

জড়োপাসনাই— জড়বস্তুপূজা, আত্মাপূজা, প্রতীকপূজা, প্রতিমাপূজা এরূপ একটা ক্রমবিবর্তন আছে। যখন শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়নি সে সময় অর্থাৎ অনার্যযুগে ঐসব উপজাতির লোকেরা এসব ধর্মাচার পালন করত। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি জড়োপাসক বা বস্তুপূজারী ছিল। আর্যরা শক্তিপূজারী ছিল। অগ্নি, সূর্য শক্তিজ্ঞানে পূজা পেত। আর্য কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর বিবাহাদি সম্পর্কে রক্তধারার মিশ্রণের সাথে ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা, জীবিকা ইত্যাদি বিষয়েও বিনিময় ও মিলন সাধিত হয়েছিল। আর তারই ফলে গড়ে উঠেছিল নিখিল ভারতীয় হিন্দুধর্ম। চাকমা, মুরং, টিপরা, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি এখনও জুম চাষ করে জীবিকা অর্জন করে। সাঁওতাল, ওরাঁও গোষ্ঠির লোকেরা চাষ ও শিকার উভয় প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করে। কৃষি-নির্ভর উপজাতিদের অধিকাংশ পূজোৎসব ঋতু বিষয়ক ও শস্যবিষয়ক। গারোদের শস্যদেবতা 'চোরাবুদি'। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং ভাল ফলনের জন্য পশুবলি প্রথা কমবেশি সব উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পাঁঠা, শূকর, মোরগ, খরগোশ, গরু, এমন কি মহিষ পর্যন্ত বলি হয় ক্ষেত্রদেবতার উদ্দেশ্যে। মৃত আত্মারও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষমতা আছে বলে অনেক উপজাতির সংস্কার আছে। এজন্য তারা মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ অথবা হাড় আনুষ্ঠানিকভাবে মাটিতে পুঁতে দেয়।[১] গারো, চাকমা, মগ, লুসাই, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতিরা জুম চাষ এবং লাঙল চাষের উদ্দেশ্যে এরূপ আচার পালন করে। ওরাঁওরা যে 'সহরুল' ও 'হরি-আরি' উৎসব পালন করে তা জমিকে উর্বর ও শস্যকে ফলবতী করার জন্যই। 'হরি-আরি' উৎসবে রীতিমত ধানচারার বিয়ে দেওয়া হয়।[২] মেঘবৃষ্টিকে দেবতাজ্ঞান এবং তদোদ্দেশ্যে পূজাচার প্রায় সব উপজাতির মধ্যেই আছে। সাঁওতাল, ওরাঁও, গারো, টিপরা, রাজবংশী বৃষ্টিদেবতাকে খুবই মান্য করে এবং নৃত্যগীতাদি সহকারে পূজা করে। রাজবংশীদের 'হুদমা দেয়া' বৃষ্টির দেবতা। বৃষ্টি কামনায় নারীরা ক্ষেতে গিয়ে নগ্ন হয়ে নাচ-গান করে। তাদের রূপকথা আছে বজ্র-বিদ্যুতের রূপকে।[৩] বৃষ্টিকামনায় আচার

১. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১৯০
২. ঐ, পৃঃ ৩২০-২১
৩ ঐ, পৃঃ ৩৭৩-৭৫

পালনের রীতি সাঁওতালদের মধ্যেও আছে। ফসল তোলার পর তারা পৌষ মাসে যে সোহ্‌রাই উৎসব পালন করে তার লক্ষ্যই হল ফসলের দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।[১] পশ্চিমবঙ্গের ওরাঁও জাতির 'করম উৎসবে'র মৌলিক উদ্দেশ্য শস্যোৎপাদন; করম গাছের ডাল দিয়ে এ উৎসব পালিত হয়।[২] হিন্দুকুমারীদের ভাদুব্রত করম-পূজার প্রভাবজাত।[৩] এসব ধর্ম-বিশ্বাস, আচারপালনের মূল উৎস যাদুবিদ্যা। উপজাতিদের মধ্যে যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব জীবনের নানা স্তরেই— সন্তান জন্মে (childbirth), রোগব্যাধির চিকিৎসায়, শুভাশুভ চিন্তায় ও সুফল কামনায় সর্বত্র। মনসা সর্পাঘাত থেকে রক্ষাকারিণী দেবতা, আবার প্রজনন দেবতাও বটে। দ্রাবিড় মূল 'মঞ্চা' থেকে মনসাদেবীর নামের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যে অধিক সন্তান কামনায় মনসাদেবীর পূজা হয়।[৪]

সমাজব্যবস্থার দিক থেকে কোন উপজাতি পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal), কোন উপজাতি মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal)। সাঁওতালরা পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থায় বাস করে, কিন্তু গারো, খাসিয়া, হাজং উপজাতি মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত। মাতৃপ্রধান সমাজে নারী সম্পত্তির মালিক এবং সন্তানের পরিচয় মাতৃকুল দিয়েই। পুরুষ বিয়ে করে শ্বশুরগৃহে অবস্থান করে। তার শ্রমোপার্জিত অর্থ স্ত্রীর দখলে যায়। আর্থিক নির্ভরতা এলে তবে তারা নিজ পরিবার গঠন করে। গারোদের মধ্যে এরূপ নিয়ম আছে। অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ দ্বারা যৌন সম্পর্ক সিদ্ধ হয়। কোন কোন উপজাতির যুবক-যুবতীর মধ্য বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হয় বটে, তবে বিবাহোপলক্ষেই বর-ক'নে নির্বাচনের জন্য। সাঁওতাল, ওরাঁও, লুসাই, নাগা, মুরিয়াদের মধ্যে এরূপ রীতি আছে। এ উদ্দেশ্যে তাদের স্বতন্ত্র ঘর বা আড্ডাখানা আছে। অন্যথায় যৌনব্যাপারে কড়াকড়ি বিধিনিষেধ মানা হয়। কোথাও গোত্রবিবাহ, কোথাও অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ

১. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ৩০৪
২. সুধীর কুমার করণ— সীমান্ত বাঙলার লোকযান, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ১০৪
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম,খণ্ড, পৃঃ ৪০
৪. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১৴ (ভূমিকা)

বিবাহসংক্রান্ত নানা প্রথা চালু আছে। লিঙ্গপূজার উৎস অনার্য ধর্মে : লিঙ্গ অস্ট্রিক ও 'পূজা' দ্রাবিড় শব্দ। উৎপাদন ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও লাঙ্গল সমতুল্য। উভয় শব্দ কোলদের ভাষাগত।[১] পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়তলীতে ছোট ছোট পল্লী রচনা করে পার্বত্য উপজাতিদের বাস। হিংস্রপ্রাণী ও অরণ্য বেষ্টিত অঞ্চলে উপরে কাঠের মাচা বেঁধে ঘর তৈরি করে। গাঁয়ের মোড়ল-পুরোহিত গণ্যমান্য ব্যক্তি। চাকমাদের প্রধান ব্যক্তি রাজাতুল্য। রাজা, মোড়ল বা সর্দার সমাজ শাসন করে, পুরোহিত ধর্মকর্ম পালন করে ও মন্ত্রাদিতে চিকিৎসা করে। উপজাতিদের মধ্যে এখনও দু শ্রেণীর জীবিকা বিরাজ করছে— চাষাবাদ ও শিকার। জুম চাষ ও হলচাষ উভয় প্রকারের ব্যবস্থা আছে। শিকারের ক্ষেত্রে বনবাদাড়ে খরগোশ, ইঁদুর, শূকর, সাপ, বনকুক্কুট ও নানা প্রকার পাখি এবং খালবিলের মাছ ধরা। উভয় কাজে হাতিয়ার সামান্যই— লাঙল, দা, ছুরি, তীর, ধনুক, বর্শা, বাঁটুল ইত্যাদি। গৃহস্থালির কাজে সাজসরঞ্জাম খুবই সামান্য ও তুচ্ছ— মাটির হাঁড়ি-পাতিল, বাঁশখড়ের ঝুড়ি, চুপড়ি, চ্যাঙারি। তারা খড়কুটা অথবা বাঁশবেতের চাটাই-পাটি বিছিয়ে মাটিতে শয্যা পাতে। খাবারের মধ্যে ভাত, মাছ, তরিতরকারী, ফলমূল, মাংস প্রধান। ভাত পচিয়ে যে মদ তৈরি হয় বা তাদের খুব প্রিয়। 'হাড়িয়া' নামের মদ সাঁওতালরা উৎসব-অনুষ্ঠানে ঘটা করে খায়। তারা তামাক খায় ও বনের পাতা দিয়ে চুরুট বানিয়ে ধূমপানের নেশা মেটায়। ধান ছাড়া তুলার চাষ ছিল। তুলার তৈরি 'কর্পট' (কাপড়) এবং ভেড়ার লোমের তৈরি 'কম্বল' নাম অস্ট্রিক ভাষায় পাওয়া যায়। 'শিম্বল' (শিমুল) শব্দটিও অস্ট্রিক শব্দ। আর্যীকৃত 'তাম্বুল' কোলদের তম্বল্ শব্দজাত। পান সম্পর্কিত 'বারুই' এবং 'বরোজ' শব্দদ্বয় অস্ট্রিক ভাষাগত। 'কদলী' শব্দটিও পরে আর্যীকৃত হয়। কদলী, গুবাক নারিকেল প্রভৃতি শব্দমূল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা।[২] বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এগুলির যথেষ্ট কদর আছে। বিয়েতে পান-সুপারির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কলা, নারিকেল, তণ্ডুল হিন্দুর পূজাচারে অত্যাবশ্যক। এগুলি কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতির অবদান।

---

১. বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ৬০-৬১
২. ঐ, পঃ ৬০

সাঁওতাল, মণিপুরী, গারো, চাকমারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নাচ-গান করে। মণিপুরীদের জাতীয় নাচ 'মণিপুরী' এবং সাঁওতালদের জাতীয় নাচ 'ঝুমুর' শহরের শিক্ষিত লোকেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লৌকিক ও সামাজিক নাচগানে বাস্তবজীবনের প্রেম-ভালবাসা, আমোদস্ফূর্তি ও আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ পায়। ঢাক, ঢোল, বাঁশী সাধারণ বাদ্যযন্ত্র। বাঁশী সাঁওতালদের প্রিয় বাদ্য। ঢাক-ঢোল অনার্যশব্দ। সকল উপজাতির মধ্যে নিজ নিজ গান, কথা, কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদ, ধাঁধা আছে আর এগুলিই হল তাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, বিশ্বাস-সংস্কার প্রকাশের উপায়! মৃতব্যক্তিকে কোন কোন উপজাতি পুড়িয়ে ফেলে, কোন কোন উপজাতি পুঁতে ফেলে অর্থাৎ দাহ ও দাফন উভয়প্রথাই তাদের মধ্যে প্রচলিত। মৃতের আত্মাকে অনেকে পূজা ও ভোগ দেয় পূর্বপুরুষকে খুশী করার জন্য।[১] পূর্বপুরুষই তার বংশধরের জন্য বেশি মঙ্গল সাধন করতে পারে; এরূপ বিশ্বাসেই মৃতাত্মার পূজা। হিন্দুদের পিণ্ডদান প্রথা এরই রূপান্তর বিশেষ।[২] তাদের পোশাকপরিচ্ছদ ঐতিহ্যবাহি, নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। তারা বনের ফল, ফুল, লতা, পাথর অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে।

আজকের উপজাতিদের জীবনধারা বিশ্লেষণ করে মোটামুটিভাবে এরকমই একটা ছবি পাওয়া যায়। আর যেহেতু উপজাতির লোকেরা নিজেদের স্বভাব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের বহিরাগমন ও মেলামেশা কম, শিক্ষাদীক্ষা বলতে তেমন কিছুই নেই, উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রমনিয়োগ ও সম্পদবৃদ্ধির তেমনকিছু পরিবর্তন ঘটেনি সেহেতু অনুমান করা যায়, তাদের জীবনের সূচনাতেও কমবেশি একই রকম পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। গ্রহণ-বর্জন দ্বারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, আদান-প্রদান দ্বারা চলমানতা, উদ্ভাবন ক্ষমতার দ্বারা নব্যোৎপাদন ইত্যাদি না থাকলে সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন ও প্রগতি হয় না। এবং তা না হলে কোন জাতির পক্ষে সভ্যভব্য হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের আদিকালের প্রতিবেশী উপজাতির লোকেরা সভ্যতার এসব সূত্রধরে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু আমাদের লোকসমাজ এদেরই জীবন, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির

১. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১৮৯
২. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৭৩

পুঁজি নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল তা গ্রহণ-বর্জন, আদান প্রদান, নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবর্তন ধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজকের বৃহত্তর লোকসমাজে উত্তীর্ণ হয়েছে। কালে কালে নতুন জাতি, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে, তাতে এ লোকসমাজ অবগাহন করেছে, নিজের মতন করে গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে, উন্নত হয়েছে। এ মিলনধারায় আর্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জীবনোপকরণ সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং বাংলার লোকসমাজ ও লোক-সংস্কৃতির মূল উৎস ও ঐতিহ্য অনার্যজীবন ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী। বাঙালী উপজাতির স্থিতিশীল সংস্কৃতি বাংলার 'আদিম-সংস্কৃতি' আর পল্লীবাসী বৃহত্তর জনগণের গতিশীল সংস্কৃতি বাংলার 'লোক-সংস্কৃতি'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্র ও নকশা

প্রকাশরীতি ও সৃষ্টিকর্মের বিচারে চিত্রকলা 'আত্ম-সংস্কৃতি'র অন্তর্ভুক্ত। মানবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এক সৃষ্টিশীল অনুভূতির প্রেরণায় কথা দিয়ে, সুর দিয়ে, রঙ দিয়ে, মূর্তি দিয়ে তার মানস-ফসলকে তুলে ধরে। চিত্রকলা রঙ ও রেখার লীলাবিন্যাস।

ইংরেজী Painting এবং Sketch-এর বাংলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'বর্ণাঢ্যচিত্র' এবং 'নকশা' গ্রহণ করা যায়। যখন বস্তুর প্রতিচ্ছবি রঙের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন তা বর্ণাঢ্যচিত্রের বিষয়, আর যখন রেখার বিন্যাসে বস্তুর প্রতিভাস সৃষ্টি করা হয়, তখন তা নকশার বিষয়। লোকচিত্রে উভয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। অবশ্য লোকচিত্রের আলোচনায় কেবল চিত্র ও নকশার কথা আসেনি, সূচীকর্ম (embroidery), বয়নশিল্প (weaving) আদর্শায়ন (modelling), ভাস্করণ (engraving), বিখচন (inlaying) ইত্যাদির কথাও আলোচিত হয়েছে। শিল্পকলার এসব নিদর্শন নিখুঁতভাবে এবং অবিমিশ্রভাবে সর্বত্র আছে এমন নয়, কতক ক্ষেত্রে শিল্পকলার প্রচলিত পথ ধরে চলেনি। নকশী পিঠা ও নকশী পুতুল একাধারে আদর্শায়ন আবার নকশাও। উল্কির ছাপকে পুরোপুরি বিখচন অথবা তুলিচিত্র বলা চলে না। সূচীকর্ম বা বয়নশিল্প হোক, আদর্শায়ন বা বিখচন হোক এগুলির মূল লক্ষ্য হল, বস্তুজগৎ ও জীবজগতের ছবি ফুটিয়ে তোলা। উপকরণ ও আধারের ভেদ থাকলেও রসবোধ ও সৌন্দর্যসাধনার দিক থেকে এগুলি লোকচিত্রের আবেদন বহন করে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য লোকশিল্পের উদ্ভাবন। প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরি করতে গিয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছে। এতে লোকমনের রঙ ও হৃদয়ের স্পর্শ লেগেছে। লোকশিল্পের প্রধান পরিচয় হল প্রতীকে এবং মটিফে। প্রাচীন পূজা-সংস্কার, আঞ্চলিক

আচার-উৎসবের ধারা প্রতীক ও মটিফের মধ্যে প্রবাহিত। অর্থাৎ লোকশিল্পের এক মুখ অতীতের স্মৃতি মন্থনের দিকে, অপর মুখ সমসাময়িক জীবনের প্রয়োজন সাধনের দিকে। এ দু'ধারার সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে ঐতিহ্যবোধ। সাধারণতঃ ভাবকল্পনা ও কামনার বিষয়গুলি প্রতীকের সাহায্যে রূপাভিব্যক্তি লাভ করে। বাংলার আলপনা চিত্রে এর নিদর্শন আছে। শিল্পকে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে লোকায়ত মটিফগুলি। বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক, একটা নির্দিষ্ট রূপরীতি গণমানসে স্বীকৃতি লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠে— লোক-রচনায় তা'ই মটিফ। মটিফের সাংকেতিক, প্রতীক, রূপক ও গূঢ় অর্থ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। গূঢ়ার্থবাহী মটিফগুলি জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। এজন্য এর রূপের যেমন অপরিবর্তনীয় স্থিতি আছে, তেমনি দেশময় ব্যাপ্তিও আছে। লোকচিত্রের রূপরীতিতে রঙ, রেখার যে সূক্ষ্ম ব্যবহার আছে, 'ষড়ঙ্গে'র[1] বিন্যাসে তাতে সমতা রক্ষিত হয় না এবং বর্ণের আলোছায়ার অভাবে চিত্রবস্তুর অতিরিক্ত ভাবমূর্তি পাওয়া যায় না; সুর, তাল, লয় ও ভাব মিলে যেমন গানের সম্পূর্ণতা, তেমনি রূপভেদ-প্রমাণ-ভাব-লাবণ্যাদি মিলে চিত্রের অপূর্বতা সম্পাদিত হয়। চিত্রের রূপ, গড়ন, আয়তন, ওজন প্রভৃতি বহিরঙ্গের সহিত ভাব, লাবণ্য, গতি প্রভৃতি অন্তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সকল তাৎপর্যগুলি বিন্যস্ত হয় না বলে আমরা অনেক সময় লোকচিত্রে কেবল বস্তুর দেহ পাই, বাণী পাই না। অর্থাৎ রূপে-রঙে-রেখায় বাস্তবের প্রতিবিম্বন থাকলেও জীবনের স্পন্দন থাকে না।

সাধারণতঃ পরিচিত জগতের রূপ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তুর ছবি লোকচিত্রে স্থান পায়। এতে বিমূর্ত চিত্রের কল্পনা প্রায় অনুপস্থিত।[2] ইন্দ্রিয়বোধের প্রত্যক্ষতাই গণচিত্রের বৈশিষ্ট্য। রূপ, বর্ণ, অবয়ব এবং আস্বাদনে অতীন্দ্রিয় আবেদন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না, কারণ লোক শিল্পীর

১. রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— এগুলিকে চিত্ররচনার 'ষড়ঙ্গ' বলে। কানাই সামন্ত— চিত্রদর্শন, পৃঃ ৬

২. আলপনার কোন কোন চিত্রে এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপকল্পের অবকাশ আছে। যেমন, সেঁজুতি ব্রতের 'হাতে-পো-কাঁখে-পো' আলপনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বাংলার ব্রত দ্রষ্টব্য

মানসগঠনে এবং চিত্র নির্মাণে তেমন প্রশিক্ষণ থাকে না। চিন্তাকর্মের অভাব থাকায় চিত্রবস্তুর স্থূলতাই ধরা পড়ে, সূক্ষ্মব্যঞ্জনা আসে না। প্রকৃতিলোক থেকে গাছ, পাতা, ফুল, ফল, জীবজগৎ থেকে মানুষ, পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, সৌরজগৎ থেকে সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি চিত্রিত হয়। গৃহস্থালীর কাজে কুলা, কাঠা, সরতা, পাখা, মই, লাঙল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়— লোকচিত্রে এগুলির ছায়া পড়ে। এছাড়া বাড়িঘর, দেবদেবী এবং জ্যামিতিক নকশাও দেখা যায়।

বাংলার লোকচিত্রের কতকগুলি স্বতন্ত্র মটিফ পাওয়া যায়, যথা— পদ্ম, কলকা, সজীব গাছ, বর্ফি, বুটি, পুষ্পিত লতা, পেঁচানো ফুল, পেঁচানো রেখা, এককেন্দ্রিক বৃত্ত প্রভৃতি।

পদ্ম বাংলার নিজস্ব ফুল: পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, হাওরে পদ্ম-শাপলার অন্ত নেই। এ ফুলের সঙ্গে নরনারীর অহরহ পরিচয়। সুতরাং চিত্রে পদ্ম আঁকার প্রেরণা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। 'পদ্মদল' বা 'পদ্মচক্র' কেবল লোকচিত্র নয়, উন্নত চিত্রেরও উল্লেখযোগ্য মটিফ। বিষ্ণুপুরাণে পদ্ম লক্ষ্মীর আসনরূপে কল্পিত হয়েছে। বৌদ্ধদের কাছে পদ্ম পবিত্রতার চিহ্ন। অজন্তার গুহাচিত্রে পদ্মের প্রাধান্য দেখা যায়।[১] সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ মানসিকতায় পদ্ম সম্পর্কে ধর্মীয় সংস্কার আছে। সাধারণভাবে পদ্ম সৌন্দর্যের প্রতীক। লোকচিত্রের মধ্যে কাঁথা, আলপনা এবং ভাস্করণে পদ্মচক্র মটিফটি বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ আধারের মাঝখানে পদ্মদল স্থান পায়, তাকে ঘিরে অন্যান্য ছবির বিন্যাস।

'কলকা'[২] আরও একটি জনপ্রিয় মটিফ। চিত্রিত আধারের প্রান্তভাগে বা কোণায় কলকার স্থান। এতে ফুল, পাতা, পালক, শিখা ইত্যাদির

---

১. অজন্তার গুহাচিত্রের ফুলগুলির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই পদ্ম
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪২০

২. কলকার আভিধানিক অর্থ 'মোরগফুল'। তুর্কী কলগী থেকে হিন্দিতে 'কল্গা' বাংলায় 'কলকা'। এখন কল্গীর আকৃতিবিশিষ্ট যে-কোন নকশা কলকা মটিফে দাঁড়িয়ে গেছে। মূলে কলকার সাজ তাজ বা পাগড়িতে ছিল। পরে ছাপা কাপড়ে এটি স্থান পায়। সেখান থেকে লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর মধ্যযুগের কোন এক সময়ে কলকার চিত্রকল্প প্রচার লাভ করে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস— বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ৪৬০

বাস্তব অথবা বাস্তবকল্প চিত্র থাকে। নকশী কাঁথা ও আলপনায় কলকার ব্যবহার বেশী। কখন কখন কলকার স্থলে মটিফ হিসেবে 'সজীবগাছ' (life tree) দেখা যায়। ডাল-পাতা-ফুল-ফলসহ বাস্তবকল্প গাছের চিত্রই সজীব গাছের মটিফ।

'বর্ফি' জ্যামিতিক চৌকোণা ছক। কাঠ, পাথর প্রভৃতি ভাস্করণে বর্ফি মটিফ প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয়।[১]

'বুটি' বয়নশিল্পের জ্যামিতিক নকশা। পাখা ও পাটিতে বুটি দেখা যায়।

'তরঙ্গিত পুষ্পিতলতা' (wavy floral creeper) চিত্রিত বস্তুর কিনারায় স্থান পায়। ফুল-পাতাসহ লতা এর উপাদান, তরঙ্গের ছন্দে এটি চিত্রিত হয়। নকশী কাঁথায় এবং ভাস্করণে এর ব্যবহার আছে।

'পেঁচানো ফুল' (Coiled flower) ও 'পেঁচানো রেখা' (scroll) প্রধানতঃ আলপনার চিত্র-মটিফ। কাঁথার চার পাশে কিনারায় তা দেখা যায়।[২] পেঁচানো রেখা ইরানী চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য।[৩]

বৃত্ত হল জ্যামিতিক নকশা। একই কেন্দ্রে একাধিক বৃত্ত এঁকে নানা প্রকার ডিজাইন করা হয়। কখন পদ্মপাপড়ি, কখন পুষ্পিতলতা, কখন রৈখিক জালি দিয়ে বৃত্তের ডিজাইন আঁকা হয়। এটিকে 'এককেন্দ্রিক বৃত্তদল' (eccentric circles) বলা যায়। কাঁথায়, আলপনায়, কাঠের কাজে এ ধরনের বৃত্তদল দৃষ্টিগোচর হয়। বৃত্তদল উন্নত শিল্পেরও জনপ্রিয় ডিজাইন।

উন্নত চিত্রকলার বিভাগ করা হয় রঙ-তুলির দিক থেকে ; যথা : তৈলচিত্র, জলরঙ, চিত্র, পেন্সিল স্কেচ, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি। আবার চিত্ররূপ

---

১. বর্ফির আকারের মিষ্টান্ন 'বর্ফি' নামেই এদেশে প্রচলিত আছে। এটি ফারসী শব্দজাত, বর্ফ+ই। ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল সংকলিত 'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ' দ্রষ্টব্য

২. Dr. Muhammad Shahidullah and Muhammad Abdul Hai ed.— Traditonal Culture in East Pakistan, Dacca, 1963 p. 118.

৩. ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার— বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি, ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৩৫

থেকেও এর স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, যেমন পোর্ট্রেট, ল্যাণ্ডস্কেপ, স্টীললাইফ ইত্যাদি। লোকচিত্রকে অঙ্কনের উপকরণ অথবা চিত্ররূপ দিয়ে বিভাগ করা যায় না। এর বিভাগটা আসে আধার বা ক্যানভাসের দিক থেকে। কাঁথার জমিনে চিহ্নিত ছবি সূচীকর্মের বিষয়। পাটি বয়নশিল্পের মধ্যে পড়ে। লোকসমাজে এগুলি 'নকশী কাঁথা' ও 'নকশী পাটি' নামে অভিহিত। এরূপ পটের উপর অঙ্কিত হয় বলে 'পটচিত্রে'র নাম, রঙ-রেখার আলিম্পন থেকে 'আলপনা'র নাম। আধার থেকে আলপনার নামকরণ চলে না। তবু কতক আলপনা আছে যার সাধারণ পরিচয় আধারকে অবলম্বন করেই, যেমন— 'কুলাচিত্র', 'পিঁড়িচিত্র' প্রভৃতি। মোটামুটি এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে লোকচিত্রের বিভাগ করে নিম্নের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। নকশী কাঁথা, নকশী পাখা, নকশী পাটি, নকশী শিকা, নকশী পিঠা, নকশী ছাঁচ, নকশী, পুতুল, আলপনা, ঘটচিত্র, পটচিত্র, মুখোশচিত্র, দারুচিত্র ও অঙ্গচিত্র।

লোকচিত্রগুলি কোনটি কত প্রাচীন তা ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারণ এগুলির প্রাচীন নিদর্শন কোথাও রক্ষিত হয়নি। কেবল পরোক্ষ-ভাবে একটা সম্ভাব্যকাল অনুমান করা হয়। চিত্র আঁকার উপলক্ষ, চিত্রমটিফ বা প্রতীকের ব্যঞ্জনা অথবা কোন প্রাচীন রচনায় উল্লেখ থেকে অনুমান-সূত্র খোঁজা হয়। ব্রতের আলপনায় হিন্দু গৃহস্থ নারীর কামনার ছবি ফুটে উঠে। ব্রতের লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কীয় আচার-সংস্কার অনার্যমানসসম্ভূত। কামনার নকল ছবি এঁকে দেবতার কাছে আসলবস্তু প্রার্থনা করার মধ্যে সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের ক্রিয়া আছে। এটি অতি প্রাচীন ধর্মমত।[১] অঙ্গে উল্কি পরার মধ্যেও খুব প্রাচীন কালের ধর্মীয় সংস্কার আছে।[২] বৌদ্ধভিক্ষু ও নাথযোগীরা কাঁথা ব্যবহার করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৩] জাতিতত্ত্ব ও চিত্ররহস্য ব্যাখ্যা করে ডক্টর দীনেশচন্দ্র

---

১. 'আলপনা' অংশ দ্রষ্টব্য

২. 'অঙ্গচিত্র' দ্রষ্টব্য

৩. মুখলেসুর রহমান—বাংলার লোকশিল্প-নকসী কাঁথা, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৭, পৃঃ ৯১

গোবিন্দচন্দ্র যখন রাজসাজ ত্যাগ করে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন তখন 'ঝুলিকাঁথা' ঘাড়ে নিয়েছিলেন বলে গোপীচন্দ্রের গানে উল্লেখ আছে। এটি প্রাচীন নাথ

সেন পটচিত্রকে বৌদ্ধযুগের অবদান বলে অনুমান করেছেন।[১] পুতুলের গঠনভঙ্গিতে প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি বা টেরাকোটার প্রভাব আছে। পাল যুগের বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে টেরাকোটার নিদর্শন আছে। এগুলি লোকায়ত আদর্শে রচিত।[২] লোকশিল্পের ধারা প্রবহমান, এর চিত্রণরীতিও গতানুগতিক। তবে এতে যুগে যুগে নতুন চিত্রবস্তুর আমদানী হতে পারে। যে সব চিত্রে ধর্মের প্রভাব আছে সেগুলিতে সাধারণত: বস্তু বা মটিফের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যেখানে বস্তু নির্বাচনে শিল্পীর স্বাধীনতা আছে, সেখানে যুগোপযোগী প্রভাব এসে যায়। লোকচিত্রে পদ্ম মটিফটি প্রাচীন কালের, পেঁচানো রেখা, কলকা এবং বাকি মটিফত্রয় মধ্যযুগেয় অবদান। কলকা তুর্কী মুসলমানরা আমদানী করে। অন্যত্র যেখানে ভাবের পরিবর্তন হয়নি অথবা নতুন প্রভাব পড়েনি সেখানে প্রচলিত রীতিপ্রকৃতি অব্যাহত।

নকশী কাঁথা

'নকশী কাঁথা' বাংলার নিজস্ব শিল্পসম্পদ। গ্রামের মেয়েরা এর রূপকার। দেশের প্রায় সব অঞ্চলে কাথার ব্যবহার আছে, তবে সূক্ষ্ম নকশার কাজে পূর্ববঙ্গের পল্লীরমণীরা অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছে।[৩]

পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মাপের কয়েক ফালি সাজিয়ে কাঁথার 'জমিন' তৈরি করা হয়। শাড়ির পাড়ের সুতা বা তাঁতীর সুতা

সাহিত্য। অবশ্য লোকসাহিত্য আকারে কাব্যখানি উনিশ শতকে সংগৃহীত হয়। দীনেশচন্দ্রসেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত—গোপীচন্দ্রের গান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৬ আলাওল বিরচিত পদ্মাবতীকাব্যে যোগীখণ্ডে রত্নসেনকে 'কান্থা' ধারণ করতে দেখা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত—পদ্মাবতী, পৃ: ১০৭

১. 'পটচিত্র' দ্রষ্টব্য

২. নীহাররঞ্জন রায—বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৭৮১-৮২ (২য় সংস্করণ)

৩. ডক্টর সেন ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে ৫০খানি কাঁথার কথা বলেছেন, সেগুলি ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। বৃহৎবঙ্গ, পৃষ্ঠা ৪৩২। স্তেলা ক্রমরিশ একটি প্রবন্ধে যে ১৪খানি কাঁথার কথা বলেছেন, সেগুলি ময়মনসিংহ ও যশোর থেকে সংগৃহীত। JISOA. VOL. VII, 1939. p. 158 বাংলা একাডেমীর 'লোকশিল্প' সংগ্রহের নকশী কাঁথাগুলির 'পরিচিতিপত্রে' ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার উল্লেখ আছে

চার-পাঁচ 'নরি' একত্রে পাকিয়ে সেলাই করা হয়। নকশার কাজে সূচের এক একটি 'ফোঁড়'ই মূলশক্তি।[১] অর্থাৎ কাঁথার জমিনে প্রয়োজনীয় দূরত্বে ছোটবড় ফোঁড়ের কৌশল বিন্যাসে অভীষ্ট ছবি বা নকশা তোলা হয়। এদিক থেকে নকশী কাঁথা সূচীকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

লোকজীবনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাঁথার প্রচলন আছে। ব্যবহারের দিক থেকে নানা প্রকার আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়। কবি জসীমউদ্দীন একটি প্রবন্ধে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসহ সাত প্রকার কাঁথার নাম করেছেন।[২]

ক. পান-সুপারী রাখার 'খিচা'

খ. তসবী বা জপের মালার 'থলিয়া'

গ. ফকিরের ভিক্ষার 'ঝুলি'

ঘ. বালিসের 'বেটন'

ঙ. সারিন্দা-দোতারা রাখার 'আবরণী'

চ. কোরান শরীফ রাখার 'ঝোলা'

ছ. গায়ে দেওয়ার 'কাঁথা'

গুরুসদয় দত্ত একটি প্রবন্ধে ব্যবহার ভেদে সাত শ্রেণীর কাঁথার বর্ণনা দিয়েছেন।[৩] যথা— আরশিলতা, ওয়ার, দুর্জনি, বেটন, লেপকাঁথা ও সুজনিকাঁথা। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'কাঁথা', 'গোলাপ' ও 'বটুয়া' —এ তিন শ্রেণীর নাম উল্লেখ করেছেন।[৪]

বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহে নিম্নলিখিত দশ রকমের কাঁথা আছে,[৫] যথা— নকশী কাঁথা, সুজনি কাঁথা, লেপ কাঁথা, নকশী আসন,

---

১. কবি জসীমউদ্দীন কাঁথার কারুকাজের মূলকৌশল রূপে এই ফোঁড়ের কথাই বলেছেন। তিনি বরকা ফোঁড়, তেরসী ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড় প্রভৃতি নামকরণ করেছেন। পূর্ববঙ্গের নকসী কাঁথা ও শাড়ী-- মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৮, পৃঃ ৩৮১ মুর্শিদাবাদে এই নামগুলি প্রচলিত— ভাঙা ফোঁড়, গোটা ফোঁড়, বাঁক ফোঁড় কারফা ফোঁড় প্রভৃতি। নিজস্ব সংগ্রহ

২. ঐ, পৃঃ ৩৮১

৩. The art of the Kantha— Modern Review, October, 1939, pp· 457—58

৪. বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪২৬

৫. কাঁথার পরিচিতিপত্রে এ নামগুলি আছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তার বিবরণ নেই

জায়নামাজ, দস্তরখানা, গাঁটরি, বোচকা বা বুগইল, বালিশের ছাপা-এবং বস্তানী।

উপরের তালিকার কোন কোন কাঁথার উদ্দেশ্য একই, কেবল বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন খিচা, বটুয়া, বুগইল, আরশিলতা, দুর্জনী প্রায় একই শ্রেণীর কাঁথার বিভিন্ন নাম। কোনটির তিন কোণা ভাঁজ করে থলে করা হয়, কোনটি ভাজ করা হয় না। কাঁথাগুলিতে পান-সুপারি, তসবী-মালা, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা রাখা হয়। বালিশের খোল, ছাপা, গেলাপ প্রভৃতি সমার্থবাচক শব্দ। কাঁথার ব্যবহারিক বিভিন্নতা সত্বেও আধারের বিভিন্নতা লক্ষ্য করে নিম্নের বিভাগগুলি স্মরণযোগ্য :

ক. কাঁথা ও সুজনি— শয্যাবরণী।

খ. লেপকাঁথা— গাত্রাবরণী।

গ. ছাপা ও খোল— বালিশেব আবরণী।

ঘ. জায়নামাজ ও আসন— নামাজ ও পূজার জন্য।

ঙ. দস্তরখানা— খাওয়ার জন্য।

চ. আরশিলতা, বটুয়া ও বুগইল— আয়না-চিরুনি, পান-সুপারি রাখার জন্য।

ছ. গাটরি ও বস্তানী— বই ও তৈজসপত্র রাখাব জন্য।

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই নকশী কাঁথার অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে একটির সঙ্গে অপরটির তেমন মিল নেই। নকশা ও চিত্রের দিক থেকেও এক একটিতে বেশ পার্থক্য আছে। কাঁথা, সুজনি, আসন, গাঁটরি ইত্যাদি আকারে বড় হয়। লেপকাঁথা বেশ পুরু ও প্রশস্ত।[১] জায়নামাজ প্রস্থে ছোট দৈর্ঘ্যে লম্বা। দস্তরখানা দৈর্ঘ্যে আরো লম্বা। ছাপা ছোট আয়তাকার বিশিষ্ট। বটুয়া, দুর্জনি প্রভৃতি আরো ছোট। বটুয়ায় সাধারণতঃ ছবি থাকে না, ঘনবুনটে সরল রেখায় জ্যামিতিক ছক থাকে।

কাঁথার পরিমাপের যেমন নির্দিষ্টতা নেই— প্রয়োজন মত ছোট বড় হতে পারে, তেমনি নকশারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। চিত্রের দিক

১. গুরুসদয় দত্ত লেপকাঁথার পরিমাপ দিয়েছেন ৬$\frac{১}{২}$′ × ৪$\frac{১}{২}$′, সুজনির ৬′ × ৩$\frac{১}{২}$′ এবং বেটন ৩′ × ৩′, Modern Review, October, 1939, p. 458.

থেকেও কাঁথার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যেমন— লহিরা, চারচালা, ক'তরখুপি, পিঁপড়াসার, বফি, বিট ও চট কাঁথা।[১] 'লহিরা' (<লহরী) ঢেউতোলা কাঁথা অর্থাৎ ফোঁড়গুলি এমনভাবে সাজান যাতে সারিবদ্ধ ঢেউয়ের মত মনে হয়। 'চারচালা' কাঁথা চারচালা ঘরের চালের মত। কবুতরের খোপের মত নকশার কাঁথার আঞ্চলিক নাম, 'ক'তরখুপি'। 'পিঁপড়াসার' নামেই প্রমাণ করে সারিবদ্ধ পিঁপড়ার মত নকশা। 'বফি' উল্লেখযোগ্য মটিফ। 'বিট' কাঁথায় ত্রিভুজ নকশা থাকে। চটের মত ঘন বুনটের কাঁথাকে 'চট' কাঁথা বলা হয়। এগুলি এক এক ডিজাইনের কাঁথা। এগুলিতে চিত্রবৈচিত্র্য নেই, চিত্র ধর্মও তেমন স্পষ্ট নয়।

নকশী কাঁথার চিত্রের স্বরূপ বর্ণনায় জসীমউদ্দীন সাহেব বলেছেন, কাঁথাতে সাধারণতঃ মাছ, পাতা, ধানের ছড়, চন্দ্র, তারা, ঘোড়া, হাতী, দেবদেবীর ছবি অথবা কোন গ্রাম্য ঘটনার ছবি বুনট করা হয়।[২] দীনেশচন্দ্র সেন নকশীকাঁথার চিত্রের মধ্যে পদ্ম, ধানের শিষ, পাতা, ফুল প্রভৃতি নিত্য পরিচিত বস্তু ছাড়াও রাজা, প্রজা, রথ, হস্তী, অশ্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।[৩]

বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহ থেকে যে কাঁথাগুলির আলোকচিত্র (মোট ছয়টি) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে গাছ, লতা, পাতা, ফুল, পাখি, ঘোড়া, মাছ, কুলা, সরতা কাঁকই, পাখা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি অঙ্কিত আছে।

বিভিন্ন কাঁথা লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞরা কাঁথার কয়েকটি চিত্রমটিফ নির্ণয় করেছেন। যেমন, কাঁথার মধ্যস্থলে পদ্মদল বা পদ্মচক্র। পদ্মচক্র এজন্য যে, কোন কোন চিত্রে একই কেন্দ্রবিন্দু অবলম্বনে পদ্মের চারপাশে কয়েকটি বিষমবৃত্তে অন্য চিত্র-নকশা আছে। গুরুসদয় দত্তের মতে, শতদল পদ্মের চারপাশের বৃত্তে শঙ্খলতা ও কলসলতার চিত্র থাকে।

১. মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলায় কাঁথায় এরূপ নাম পাওয়া যায়। নিজস্ব সংগ্রহ
২. তিনি তাঁর আলোচনায় এসব চিত্রের প্রমাণরূপে কোন কাঁথার আলোকচিত্র অথবা লোকরচনার উল্লেখ করেননি। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮০
৩. তিনি তাঁর গ্রন্থে যে দুখানি কাঁথার লিপিচিত্র দিয়েছেন তাতে তাঁর বিবরণের আংশিক প্রমাণ দেখা যায়। তাঁর চিত্রগুলি হিন্দু ঐতিহ্যের পরিচায়ক। বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪৩০-৩১, চিত্র সংখ্যা ৪৩০(ক) ও ৪৩০(খ) দ্রষ্টব্য

তিনি একে 'পদ্মমণ্ডল' বলেছেন।[১] পদ্ম, লতা, বৃত্তের সমন্বয়ে রচিত পদ্মচক্রটি কোন বাস্তবের নকল নয়, বাস্তবের ছায়ায় লোকশিল্পীর মানস-প্রসূত একটি ডিজাইন। এজন্য দীনেশ বাবু একে 'মানসপদ্ম' বলেছেন।[২]

কাঁথার চার কোণায় কলকাচিত্র থাকে। ৫ নং চিত্রে জায়নামাজে চার কোণায় কলকা চিত্রিত হয়েছে। ৪ নং চিত্রে বস্তানীতে বড় আকারের কলকা আছে। প্রথমটি দেখতে জ্বলন্ত দীপশিখার মত, দ্বিতীয়টি আধ-ফালি লাউয়ের মত। এর ভেতরে ও বাইরে নকশা আছে। কলকাদ্বয় কাল্পনিক ডিজাইন বলে প্রতিভাত হয়।

কলকার স্থলে ফুল-ফল-পাতাসহ সজীব গাছ অঙ্কিত হতে পারে। কাঁথায় (১ নং ও ২ নং চিত্র) সূর্যমুখী গাছ এবং গাটরিতে (৬ নং চিত্র) কদম গাছ অঙ্কিত দেখা যায়। যেখানে কলকা ও গাছপাতা একত্রে এসেছে, সেখানে মটিফটি 'কলকা-সজীব গাছ' নামে অভিহিত হয়।

তরঙ্গিত পুষ্পিতলতা কাঁথার আর একটি পরিচিত মটিফ। গোলাকার বৃত্ত অথবা আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিবেষ্টন হিসেবে এরূপ নকশার প্রয়োজন হয়।

সাধারণত: শঙ্খলতা, কলসলতা, মোচালতা, কলাছড়, শিষলতা প্রভৃতি বর্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লতাগুলি বাস্তবের প্রচ্ছায়ে শিল্পীমানসের নব সৃষ্টি। ফুলপাতাসহ লতার ঢেউ বা বাঁকগুলি অসমকৃত হলেও স্বচ্ছন্দতা আছে।

কাঁথায় বর্ফি মটিফও দেখা যায়। কোন কোন পদ্মচক্র যেমন এক-কেন্দ্রিক কয়েকটি বৃত্তের সমাহার, কাঁথার বর্ফি তেমনি একাধিক চৌকোণা ছকের সমাহার। একে 'বর্ফিচক্র' বা 'বর্ফিমণ্ডল' বলা যায়।

এরপর কাঁথার নির্দিষ্ট কোন মটিফ পাওয়া যায় না। কাঁথার সমস্ত জমিনে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু থেকে জ্যামিতিক নকশা, প্রাণিজগৎ ও সৌর-জগতের নানা চিত্র এঁকে ভরাট করে দেওয়া হয়। মনুষ্যলোক, দেবলোক, প্রাণিজগৎ, বস্তুজগতের চিত্রগুলির বিন্যাস সকল সময় সুসমঞ্জস হয় না, কারণ কাঁথাখানি সুসজ্জিত করার চেয়ে কাঁথার জমিন ভরাট করার দিকে লোকশিল্পীর নজর বেশী। কাঁথার কোন অংশই ফাঁকা রাখা চলে না।

১. Modern Review, 1939, p. 459

২. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪২০

শূন্য স্থান ভরাট করার জন্য অনেক সময় যা আঁকার কথা নয়, তাই এঁকে পূর্ণ করতে হয়। ৩ নং চিত্রে কাঁথার মাঝখানে পদ্ম। পদ্মের বাইরে দুটি কলমীলতার আবেষ্টনী। কলমীলতার বৃত্তদ্বয়ের মাঝে চার কোণায় চারটি মাছ, মাছের পাশাপাশি ছোট আকারের পাখি এবং পানপাতা। এসবের বাইরে মাধবীলতার পরিলেখ। কাঁথার প্রান্তিক কোণায় চারটি কলকাচিত্র। কলকার আশেপাশে কয়েকটি পাখি, পাতা ও তারা আছে। কাঁথার বর্ডারে আছে জ্যামিতিক ছক। এতে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ রঙের সূতা ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ম, লতা, মাছ ও কলকার সন্নিবেশে সামঞ্জস্য আছে। পাখি ও পানপাতা এখানে সেখানে থাকলেও এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বলে সংগতি নষ্ট করেনি। রঙের ব্যাপারে বস্তুর প্রকৃত বর্ণসম্পাত ঘটেনি। প্রায় ছবিই স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে। বিশেষত: লতাগুলি বাস্তবানুগ ও জীবন্ত হয়েছে।

১ নং চিত্রে কাঁথার প্রান্তিক কোণায় লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বারটি সজীব গাছ আছে। মাঝখানে পুঁতির মালায় ঘেরা আয়তাকার অংশে সাধারণ মটিফ হিসেবে পদ্ম নেই, তার স্থলে আছে দুটো ময়ূর, তিনটি ঘোড়া, আয়না, কাঁকই, সরতা, পাখা, কুলা, পানপাতা, খেজুরপাতা, পাখি, মেকুর ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ময়ূরের চিত্র চিত্তাকর্ষক হয়েছে। মাঝের আয়তক্ষেত্রের বাইরে চারদিকে পুঁতির মালার পরিলেখ। কাঁথার সূতার রঙ সাদা, কাল, লাল, গোলাপী ও হলুদ। চিত্রবৈচিত্র্য থাকলেও স্থান নির্বাচনে ও চিত্র সন্নিবেশে বিশেষ ভুল হয়নি। মাঝের চিত্রগুলি ঘন ও পাতলা ফোঁড়ের দ্বারা সূঁতার পরিমাণ কমবেশি করে কোনটি স্পষ্ট ও কোনটি অস্পষ্ট করে লোকশিল্পী বর্ণজ্ঞান ও রূপচেতনার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুর গুরুত্ব হিসেবে বর্ণের ঘনত্ব বা অস্পষ্টতা রক্ষা করা হয়েছে।

নকশা পরিকল্পনায় ১ নং চিত্রের লেপকাঁথার সঙ্গে ২নং চিত্রের বিছানার কাঁথার বেশ সাদৃশ্য আছে। চার কোণার সজীব গাছ, দুপাশে কলকা-সজীব গাছ, চারপাশে পুঁতির মালার বেষ্টনীর বিন্যাসরীতি উভয় কাঁথায় এক ও অভিন্ন। চারটি সজীব গাছের তিনটি সূর্যমুখী ও একটি পানগাছ। মালার বেষ্টনীর ভেতরে বর্গাকার ক্ষেত্রে একটি তাজিয়া, একটি আনারস, একটি সরতা, একখানা পাখা, একখানা নকশী কাঁথা, দুটি ঢোলক ও একটি পাখি আছে। এর বাইরে একদিকে একখানা কুলা, একখানা তালপাখা,

একটি পাখি, একটি কদমফুল ও সম্ভবতঃ একটি আগন— বেশ ছাড়াছাড়ি ভাবে বিন্যস্ত। ফুলা ও পাখার ছবি স্পষ্ট ও বাস্তবানুগ হয়েছে। বিপরীত দিকে একস্থানে একটি আয়তাকার ঘেরের মধ্যে একটি সরতা, নীচে মসজিদ বা স্মৃতিসৌধের চূড়া, একটি ভ্রমর ও একটি পাখি। মসজিদের গম্বুজদ্বয় বেশ স্পষ্ট। দেশীয় ঐতিহ্য ফুলা, পাখাদির সাথে মসজিদ, তাজিয়া ইত্যাদি ইসলামী ঐতিহ্যের একত্র সমাবেশ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের নজির বহন করে।

নকশী কাঁথা চিত্ররূপের বৈশিষ্ট্য ও রসসার্থকতা সম্বন্ধে সমঝদার বলেছেন, 'এই কাঁথাগুলির মধ্যে বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে এসে শিল্পী মনে যে ভাবের সমাবেশ হয়েছে, তার অনেকখানি এই কাঁথার নকশায় ধরা পড়েছে।··· কাঁথার মধ্যে হয়ত কয়েকটি পদ্ম অথবা পাখির নকশা বুনট করা হয়েছে, কিন্তু সেই নকশাগুলির স্থান এবং রঙ নির্বাচনে শিল্পী তার মনের খুশীটুকু অতি অপূর্বভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন।'[১] লোকশিল্পীর অকারণ পুলকবোধ মাত্র নয়, কাঁথাগুলি অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে পরম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা ক্রিয়া করে তাতেই এর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ছাড়া পায়। অপূর্বতা ও অনির্বচনীয়তা সৃষ্টির জন্য যে সূক্ষ্ম বর্ণসম্পাত ব্যঞ্জনাধর্মী রসমূর্তির উদ্ভব হতে পারে এমন শিক্ষা ও দীক্ষা লোকরমণীর নেই। এর আর্টটুকু পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখে শেখা, আবার যা শিখে তাও শিল্পকলার উন্নত মানের নিদর্শন নয়, সেক্ষেত্রেও যখন কাঁথায় কাঁথায় স্বতন্ত্র অভিরুচির আনন্দকে ও অভিলাষকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয় তখন বুঝা যায়, এর পেছনে পেশাগত বহিঃপ্রেরণা নেই, আছে আত্যন্তিক আগ্রহে শুচিতার কাছে, সুন্দরের কাছে ও প্রেমবৃত্তির কাছে আত্মনিবেদনের প্রবুদ্ধ মন। তাই একখানি কাঁথা সেলাই করতে যত সময় লাগুক[২] না কেন, যত্নলালিত নিষ্ঠার জোরে তা প্রয়োজনের তাগিদকে উপেক্ষা করেও শিল্পলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী রাখে।

---

১. পূর্বোক্ত, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫৮, পৃঃ ৩৮১

২. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, কোন কোন কাঁথা সমাপ্ত করতে তিন পুরুষ লেগে যায়। বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪৩২

নকশী পাখা

নকশী কাঁথার মত নকশী পাখা বাংলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম বাতাস পাওয়ার জন্য পাখার ব্যবহার। পাখা ব্যবহারিক জীবনে এরূপ স্থূল ও বাস্তব উদ্দেশ্য সাধন করলেও নির্মাণকালে সেটিকে কেবল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে যেমন-তেমন প্রকারেই তৈরি করা হয় না, লোকনয়নরঞ্জক নানা চিত্রে শোভিত করে তোলা হয়।

পাখার চিত্ররূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে পরিদৃশ্যমান জগতের পরিচিত বস্তু গৃহীত হয়েছে—ফুল, লতা, পাতা, গাছ, চাঁদ, তারা, পাখি, মানুষ, হাতী প্রভৃতি। কোন কোন পাখায় বাংলা হরফও ফুটিয়ে তোলা হয়।[১] হাতপাখার স্বল্প পরিসরে বিচিত্র চিত্রের সমাবেশ সম্ভব নয়, উপরন্তু এর চিত্রণপদ্ধতির জটিলতা ও চিত্রোপকরণের স্থূলতার দরুন কাঁথার সাথে তুলনায় পাখার চিত্রে বৈচিত্র্য আনা যায় না।

চিত্ররূপের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে পাখার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। 'পূর্বদেশে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নিম্নের কয়েকটি নকশী পাখার নাম পাওয়া যায়।[২]

ক. ভালবাসা
খ. কাঁকইর জালা
গ. গুয়াপাতা
ঘ. পালংপোষ
ঙ. সুজনিফুল
চ. বলদের চোখ
ছ. শঙ্খলতা
জ. কাঞ্চনমালা
ঝ. ছিটাফুল
ঞ. তারাফুল
ট. মনবিলাসী
ঠ. মনবাহার
ড. বাঘবন্দী
ঢ. ষোল কড়ির ঘর
ণ. মনসুন্দরী
ত. লেখা
থ. সাগরদীঘি
দ. হাতী, ফুল ও মানুষ

নাম থেকেই প্রতীত হয়, এগুলি চিত্রজ্ঞাপক। অর্থাৎ এসব পাখার মধ্যে কাঁকই, গুয়াপাতা, শঙ্খলতা, তারাফুল, সুজনিফুল, ছিটাফুল, পালংপোষ,

---

১. বাংলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে এরূপ একটি পাখা আছে। লেখা-পাখার বাণী উপদেশাত্মক। এটি আধুনিক কালের নিদর্শন

২. মোহাম্মদ সাইদুর— লোকশিল্পে নকসী পাখা, পূর্বদেশ, ৩রা আষাঢ়, ১৩৭৪

বলদের চোখ, বাঘবন্দী এবং ষোল কড়ির ঘরে বস্তুর প্রতিকৃতি ও জ্যামিতিক নকশা অঙ্কিত হয়েছে। কাঞ্চনমালা, ভালবাসা, মনবাহার, মনবিলাসী নামগুলি ভাবাত্মক। উক্ত প্রবন্ধের সাথে পাখার যে কটি আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে কাঞ্চনমালা ও মনসুন্দরী পাদনামের পাখায় সুদৃশ্য জ্যামিতিক ছকই লক্ষ্যগোচর হয়।[১]

বাংলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে বিভিন্ন নামের নকশী পাখা রক্ষিত আছে।[২]

সুতার তৈরি : শঙ্খলতা, সুজনি ফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি

বাঁশের তৈরি : গুয়াপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, কাঁকইর জালা, ভালবাসা, গম্বুজ-তোলা, হাতী-ফুল-মানুষ, লেখা

বেতের তৈরি : পালংপোষ, পাশার দান

বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহে পাখার নাম তালিকায় 'গম্বুজ-তোলা' ও 'পাশার দান' এ দুটি স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। অন্যান্য পাখার নাম আগের তালিকার সহিত মিল আছে। একটি মেয়েলীগীতে বাঁশের পাখায় যুগলহাঁস ও যুগলময়ূরের উল্লেখ আছে।[৩]

এসব নামের পাখাচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একই পাখায় চিত্র বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু এক এক চিত্রের বিভিন্ন পাখা আছে। কদাচিৎ দু'একটা পাখায় একাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, 'হাতী-ফুল-মানুষ' নামক পাখা (৪ নং চিত্র)। এতে আছে দুপাশে মুখোমুখি দু'টি হাতীর সম্মুখভাগ, ফুল (প্রকৃতপক্ষে সজীব গাছ) এবং নীচে মানুষ।

---

১. ঐ, প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট পাখার আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

২. পাখাগুলি কিশোরগঞ্জ ও সিলেট থেকে সংগৃহীত হয়েছে, পরিচিতিপত্রে তার নির্দেশ আছে

৩. সেইনা পাংখাত লেইখা গো থইছে
হাঁসা হাঁসির জোড়া গো।
সেইনা পাংখাত লেইখা গো থইছে
মউরা মউরীর জোড়া গো।—কিশোরগঞ্জ

লোক সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭২, পৃঃ ১২১

লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই এখানে মানুষের হাত দু'টি প্রসারিত।[১] এছাড়া পাখার গায়ে তারা ছড়ানো আছে। Traditional Culture in East Pakistan গ্রন্থে লোকশিল্পের আলোচনায় প্রদত্ত আলোকচিত্রে (২৬ নং প্লেট) একটি পাখায় আছে একটি সজীব গাছ, গাছের শাখায় কয়েকটি টিয়া পাখি, গুড়ির দু'পাশে বাঁধা মুখোমুখি দুটি হাতী, নীচে স্খলিত পাতা ও জ্যামিতিক নকশা। পাখাখানি বেশ সুদৃশ্য।[২] 'গাছে-বসা-পাখি' মুঘল চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একেও একটি মটিফরূপে ধরা যায়। নকশা পাটিতেও 'গাছে-বসা-পাখি' মটিফটি দেখা যায়। ঐ প্লেটের আর একটি পাখায় বহু দল বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত হয়েছে।

পাখার একটি সাধারণ চিত্রমটিফ বুটি। এটি বয়নশিল্পের সাধারণ মটিফ বলা যেতে পারে। জ্যামিতিক বৃত্ত, আয়তাকার, ত্রিভুজ বা ঝালর বিশিষ্ট বুটি ছোট বড় আকার ও সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন চিত্রনাম গ্রহণ করে। যেমন, তারাফুল, গুয়াপাতা, বলদের চোখ প্রভৃতি চিত্র প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বুটির বিন্যাস কৌশল। বুটির বাইরে বর্ফির পরিলেখ। পাখার নকশায় রঙের স্থান আছে, কিন্তু তা তুলি দিয়ে আঁকা হয় না, পাখা যেসব উপকরণ দিয়ে তৈরি সেগুলিকে বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে নিয়ে বুনন কৌশলে ছবি তোলা হয়। কাঁথার যেমন সুতার এক একটি ফোঁড়, পাখার তেমনি সুতার বা বেতির এক একটি 'চেলা'। বুনন কালে রঙিন খিলগুলি পাল্টে নিয়ে সুবিধামত দীর্ঘ-হ্রস্ব চেলা দিয়েই পাখার নকশা তোলা হয়।

নকশী পাখার উপকরণ প্রধানত: পাঁচটি: সুতা, বাঁশ, বেত, তাল-পাতা ও শণ। ময়ূরের পাখা, চন্দন কাঠের পাখা প্রভৃতি এদেশে প্রচলিত আছে। ময়ূরের পালক সুদৃশ্য, এতে অন্য নকশার দরকার হয় না, ঘর সাজানোর বিলাসোপকরণ হিসেবে ময়ূরপাখা ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধী চন্দন পাখাতেও নকশার অবকাশ নেই, চন্দনের ছোবড়াগুলিকে গুছিয়ে পাখার আকারে বাঁধা হয়। একটি আস্ত শুকনো তালপাতা বা নারিকেল পাতা খিল খিল করে ছড়িয়ে নিয়ে যখন বুনা হয় তখন

১. JISOA, Vol. VII, 1939, P. 165
২. Traditional Culture in East Pakistan, XXVI. চিত্রপ্লেট দ্রষ্টব্য

নকশার সুযোগ আসে। সুপারির খোলের নকশী পাখা তৈরি করা হয়।[১] এছাড়া আবের পাখারও প্রচলন আছে।[২]

চিত্র বা নকশার মূল আকর্ষণ হল বর্ণসম্পাত। নকশী পাখার রঙের বৈচিত্র্য আছে। রঙের ব্যবহার সর্বত্র বস্তুকল্প নয়। কোথাও কোথাও বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য রাখার চেষ্টা আছে। পালংপোষে হলুদ ও সবুজ রঙের বেত ব্যবহৃত হয়েছে। গাছের সজীবতা সবুজ রঙে ধরা পড়েছে। পাখার তানা বা জমিন হলুদ রঙের। অন্যান্য পাখায় রঙের ব্যবহার দ্বারা বস্তুকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে বিভিন্ন রঙে সুদৃশ্য করার প্রতি ঝোঁক বেশী দেখা যায়। শঙ্খলতায় সাদা, লাল, নীল ও সবুজের মিশ্রণ, গুয়াপাতায় লাল, সবুজ ও হলুদের মিশ্রণ আছে। বস্তুর আসল রঙ এতে ধরা পড়েনি। পাখার এসব রঙের ব্যবহারে বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, কেবল পল্লীশিল্পীর রুচির উপর নির্ভর করে।

নকশী টিপা

নকশী পাখার মত নকশী পাটি চিত্রীকরণের মূলে আছে দক্ষ হাতের বুননকৌশল অর্থাৎ বেতের সরু খিল অথবা বাঁশের চিকন বেতা দিয়ে নকশা তোলা হয়। এজন্য পাখা ও পাটির চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অভিন্ন। নল-বেত-বাঁশ হল পাটির উপকরণ। এতে সুতার ব্যবহার নেই।

পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ ও জীবজগতের ছবি নকশী পাটিতে আঁকা হয়। গাছপালা, লতাপাতা, পশুপাখির অবয়ব ছাড়াও জ্যামিতিক ছক ও বাড়িঘরের নকশা থাকে। জনৈক প্রবন্ধকার পাটির নকশার মধ্যে ঘর, মসজিদ, মসজিদের চূড়া, পালকি, নৌকা, কাঁকই, হাঁড়ি প্রভৃতি বস্তু ও স্থান, হাঁস, কবুতর, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু এবং নানা ফুলফল, লতাপাতা এবং জ্যামিতিক নকশার কথাই বলেছেন।

---

১. পূর্বোক্ত, পূর্বদেশ, ৩রা আষাঢ়, ১৩৭৪

২. দৃষ্টান্ত : আপন মন্দিরে গিয়া বিবি
আবের পাংখার বাতাস করইন কি।
—কিশোরগঞ্জ

লোক সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

তাঁর মতে নকশায় লাল, কাল ও খয়েরী রঙ বেশী ব্যবহার করা হয়।[১]

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দুটি পাটির আলোকচিত্রের[২] একটিতে আছে, একটি বড় ও পূর্ণাঙ্গ সজীব গাছ। গাছের উভয় পাশে সমভূমিতে দুটি গৃহচূড়া। পাটির গায়ে ছোট ছোট বুটি ছড়ান। অপর পাটি চিত্রে চার সারিতে মোট ছটি গৃহচূড়া বড় করে আঁকা হয়েছে। সজীব গাছগুলিকে করা হয়েছে ছোট। তারা সদৃশ্য বুটি ও বৃন্তচ্যুত পাতা পাটির গায়ে ছড়ান।

জায়নামাজ, বসা বা শোয়ার আসন হিসেবে পাটির ব্যবহার বাংলায় সর্বত্র রয়েছে। চালাঘরের ভেতরের ছাদ নকশী পাটি দিয়ে আবৃত করা হয় বলে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন।[৩] নকশী পাটি ছাড়াও সাধারণ পাটি আছে। সামাজিক উৎসবে ও লৌকিক উপঢৌকনে যেখানে আনন্দ উপভোগের আয়োজন আছে সেখানে নকশী পাটির ব্যবহার দেখা যায়। বিয়েতে বরের আসন পাতা হয় 'কামরাঙ্গা-পাটি'তে।[৪] কনের যৌতুক থালাবাসন, খাটবিছানা প্রভৃতি তৈজসপত্রের সঙ্গে নকশী পাটি দেওয়ার রেওয়াজ আছে।[৫]

---

১. প্রবন্ধকার 'সিলেট জেলার বালাগঞ্জে তৈরি নকশী শীতল পাটি' পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন। এতে জ্যামিতিক নকশা, পাশার ছক, বুটি, কবুতর, সজীব গাছ প্রভৃতি ছবি আছে। মোহাম্মদ সাইদুর—লোকশিল্পে নকশী শীতল পাটি, পূর্বদেশ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

২. বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহ থেকে আলোকচিত্র দু'টি গৃহীত। পরিচিতি লিপিতে এগুলিকে জায়নামাজ বলা হয়েছে

৩. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৫৯

৪. আসুক আসুক দেটির দামান
কিছুর চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি
কামরাঙ্গা পাটি নারে।

উদ্ধৃত: জসীমউদ্দীন—নকসী কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪২
কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বিবাহে 'কামরক্সের পাড়ি'তে বরের আসন পাতা হয়। লোক সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫২

৫. পূর্বোক্ত, পূর্বদেশ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

বিভিন্ন জেলায় পাটির বিভিন্ন নাম। সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলায় 'মূর্ত্তারা' নামক বেতের সরু মসৃন খিল দিয়ে তৈরি পাটির সাধারণ নাম 'শীতল পাটি'।[১] ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় নলখাগড়ায় তৈরি 'তালাইপাটি'র ব্যবহার আছে।[২] বেত, নল ছাড়া বাঁশ, তাল পাতা দিয়ে 'চাটাই পাটি' তৈরি হয়, কিন্তু এতে নকশা করা হয় না। এগুলি বেতের মত নরম, দীর্ঘ ও শক্ত নয়। কারুকৃতির জন্য শীতল পাটিই প্রসিদ্ধ।

বুটি পাটির একটি সাধারণ চিত্র মটিফ।[৩] বুনন পদ্ধতি অনুযায়ী এরূপ নকশা সহজেই এসে যায়।

নকশী শিকা

সুতা ও পাট শিকার দু'টি প্রধান উপকরণ। হাঁড়ি, সরা, কৌটা, বাটা বা সাজিতে খাদ্যদ্রব্য রেখে শিকায় তুলে রাখা হয়। লাঠির দু' প্রান্তে শিকা বেঁধে কাঁধে ভার বহার রীতিও পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়। চলতি কথায় একে 'বাঁক' বলে।[৪]

আলগা পাঠ বা সুতার গোছায় লরি জড়িয়ে ফাঁস তৈরি করা হয়। লরি জড়ানর সময় আঙুল দিয়ে পরিমিত পাক দিয়ে নেওয়া হয়। শিকার নীচে থাকে চাক বা বেড়ি। বেড়ির সহিত ফাঁস তুলে তুলে শিকার মূল দেহ গড়া হয়। উপরের অংশ চুলের বেণীর মত গেঁথে মাথায় একত্রে একটি গিঁটে বেঁধে দেওয়া হয়। পাট বা সুতার সাথে পুঁতি, কড়ি বা ঝিনুক গেঁথেও শিকা তৈরি করা হয়।

---

১. ঐ।

২. নলশিল্প, দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মাঘ, ১৩৭৪

৩. এই পাটিত পাটি নয়রে
আবো পাটি চাই
সেই পাটিব মইধ্যে মইধ্যে
বুটা তোলা যায়। —চট্টগ্রাম

ওহীদুল আলম সম্পাদিত—চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, ১৯৬৩, পৃঃ ৫২

৪. সুভ সুবর্ণাব বাঁকখানি বেল্লাপাটে শিকে।
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।

গুরুসদয় দত্ত সংকলিত—পটুয়া সঙ্গীত, পৃ: ১৮

শিকায় নকশা বিন্যাস ফাঁস তোলার ও বিনুনি গাঁথার কৌশলের উপর নির্ভর করে। শিকার গায়ে ছবি ফুটিয়ে তোলা শক্ত। ফুল ছাড়া অন্য চিত্র খুব কম দেখা যায়। ফুলের নামানুসারে কয়েকপ্রকার শিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন তারাফুল, পুঁতিফুল, চঁড়াফুল, টাকাফুল ইত্যাদি। ফাঁসের কৌশলে টাকার মত চাকতি, পুঁতির মত দানা অথবা তারার মত বুটি দিয়ে যথাক্রমে টাকাফুল, পুঁতিফুল ও তারাফুলের শিকা তৈরি হয়। বাংলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে একটি শিকার গায়ে পদ্মফুলের নকশা আছে। প্রতিটি পদ্মে আটটি করে পাপড়ি আছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'বাঙ্গালার নানা স্থানে শিকার মধ্যে শুধু ফুল, লতা, পল্লব নহে, রাধাকৃষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূর্তি সুতা দিয়া নির্মিত হয়।'[১]

আকৃতি প্রকৃতির দিক থেকে কয়েক প্রকার শিকার নাম পাওয়া যায়,[২] যথা—

ক. মুঠাশিকা	গ. চাকশিকা
খ. নেংটাশিকা	ঘ. কড়িশিকা

নীচে মুঠা দিয়ে যে শিকার গোড়া তোলা হয় তাই 'মুঠাশিকা'। 'নেংটা-শিকা'র গোড়ায় কোন বেড়ি থাকে না। 'চাকশিকা'র গোড়ায় বেতের চাক জড়ান থাকে। লরির গায়ে কড়ি গেঁথে যে শিকা তৈরি হয় তাকে 'কড়িশিকা' বলে।

নকশী পিঠা

পিঠা পল্লীবাংলার সর্বত্র প্রচলিত। 'পৌষপিঠা' বা 'পিঠাপরব' বলে একটা লোকাচার গ্রামসমাজে পালন করা হয়। নবান্ন উৎসবে 'পুলিপিঠা'

---

১. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৬৬
তিনি এখানে কেবল বিবৃতি দিয়েছেন, প্রমাণস্বরূপ কোন আলোকচিত্র বা লোক রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেননি

২. চাপাই নবাবগঞ্জের (রাজশাহী) বেগম জাহানারার কাছ থেকে আমি নামগুলি সংগ্রহ করেছি। বেগম জাহানার বয়স ৪০। তাঁর সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে

করে হিন্দু-গৃহিণীরা লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেয়।[১] ক্ষেত্রদেবতার নৈবেদ্যোপচার হিসেবে 'চিতইপিঠা'র ব্যবহার আছে।[২] মুসলমানের বিবাহোৎসব ও ঈদপরবে পিঠা তৈরি করার রেওয়াজ আছে। অঞ্চল ভেদে এর বিভিন্ন নাম, যথা— চালপিঠা, তালপিঠা, গুড়পিঠা, দুধপিঠা, চিতইপিঠা, ধুকিপিঠা, পাতপিঠা, দৈলাপিঠা, বড়াপিঠা, পাঁচপিঠা ইত্যাদি। ময়মনসিংহ জেলায় কন্যার বিয়েতে যৌতুকের সাথে 'পাকুয়ানপিঠা' দেওয়া হয়।[৩]

পিঠার প্রধান উপাদান আতপ চালের আটা। আটার সাথে তালের রস মিশিয়ে তালপিঠা, গুড় মিশিয়ে গুড়পিঠা, নারিকেল মিশিয়ে পুলি-পিঠা হয়। আবার তেলে ভেজে তেলইপিঠা, আগুনে সেঁকে চিতই-পিঠা, বাষ্পে সিদ্ধ করে ভাপাপিঠা। সব পিঠায় নকশা তোলা হয় না। সাধারণতঃ পুলিপিঠা ও তেলইপিঠা নকশী করা হয়। চালের গুঁড়ার 'কাই'কে বেলনা দিয়ে বেলে প্রথমে পুরু রুটি তৈরি করে পরে তার উপর খেজুরকাঁটা, পাটকাঠি ও সুচ দিয়ে নকশা আঁকা হয়। আঁকার কাজ শেষ হলে বাঁশের ছিলকা বা মুছনা দিয়ে নকশার বাইরের অংশ ছেঁটে ফেলা হয়।[৪] বলা বাহুল্য, এখানে রঙ তুলির প্রশ্ন আসে না। সুচ, কাঁটা বা কাঠি দ্বারা রুটির গায়ে দাগ কেটে নকশা তোলা হয়।

ফুল, পাতা, মাছ, পাখি, গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জাম ও জ্যামিতিক রেখা পিঠার নকশায় দৃষ্ট হয়। পিঠার আকৃতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্যের

---

১. নয়াধানের চিড়ামুড়ি পুলিপিঠা করে,
মা লক্ষ্মীরে পূজে আরও পরতি ঘরে ঘরে।

লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, ১৩৭৩. পৃঃ ৬০

২. যোগেশচন্দ্র রায়—পূজাপার্বণ, পৃঃ ৫৩

৩. কইন্যার মা বসিয়া
পাক্‌কুয়ান বানায় বসিয়া
এইনা পাক্‌কুয়ান যাইব
নবীন দুলার দেশেরে

উদ্ধৃত: মোহাম্মদ সাইদুর—ময়মনসিংহের নকশী পিঠা, পূর্বদেশ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

৪. ঐ

দিক থেকে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যথা —কাজললতা, শঙ্খলতা, হিজল-পাতা, সজনেপাতা, চিরলপাতা, বেঁটফুল, উড়িফুল, কন্যামুখ, চম্পাবরণ, জামাই মুচড়া, সতীন মুচড়া, সরপুস, পদ্মদীঘি, সাগরদীঘি প্রভৃতি।[১]

বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহে মাটির তৈরি কৃত্রিম নকশী পিঠা রক্ষিত আছে।[২] এসব পিঠার গঠনে এক পিঠে রূপে ও রেখায় বাস্তব প্রতিকৃতিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ পাতাগুলি আকারে বিভিন্ন পাতার মত, মাছগুলি আকারে ভিন্ন ভিন্ন মাছের মত, পাখিগুলি আকারে এক একটি পাখির মত করে গড়া হয়েছে। কোন কোনটিতে বাস্তব আকৃতি ধরা পড়েছে, যেমন পানপাতা, পাটপাতা, চাঁদামাছ, ভ্রমর, চড়ুই প্রভৃতি। অন্যত্র বস্তুব ছায়াপাত ঘটেছে। পাখি, কীট, মাছ, পাতা ছাড়া পাতিল, সরতা, ছাতা, কাঁকই, মই প্রভৃতির ছবি আছে। গোল বৃত্তের সুচিত্রিত জ্যামিতিক নকশাগুলি বেশ মনোরম। পদ্মচাকা, কলাচাকা প্রভৃতি নকশার মধ্যে ছন্দজ্ঞানের পরিচয় আছে। কন্যামুখ, জামাইমুখ, জামাই মুচড়া, সতীন মুচড়া প্রভৃতি নামের পিঠা মানবাকৃতির কোন নকশা নয়, বিভিন্ন কারুময় জ্যামিতিক নকশারই ভাবাত্মক নাম।

পাকুয়ান বা তেলইপিঠা ছাড়া পুলিপিঠাতেও নকশা আঁকা হয়। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে এরূপ পিঠার আকার পানিফলেব ও স্বস্তিকার মত।[৩] চন্দ্রের আকৃতিবিশিষ্ট চন্দ্রপুলিপিঠা তৈরির কথা কাজলরেখার গীতিকায় পাওয়া যাব।[৪]

কেবল পিঠা নয়, আমসত্ত্ব ও খেজুরগুড়ের পাটালি চিত্রিত আকারে পাওয়া যায়। এগুলি খোদিত ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হয়। ছাঁচে

---

১. ঐ

২. কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র নমুনার প্রায় দেড়শো পিঠা এখানে আছে। বিভিন্ন প্রকার পাতাব একটি আলোকচিত্র এবং পাখি, মাছ ও ভ্রমবের একত্রে একটি আলোকচিত্র মোট দুটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হযেছে

৩. পূজাপার্বণ, পৃঃ ৫৩

৪, নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।
চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রেব আকিরত॥
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৩১

ঢেলে ক্ষীরের স্বস্তি ও পুতুল তৈরির রীতি গ্রামাঞ্চলে আছে।[১] ছাঁচে তৈরি মিছরির মঠে ময়ূর ও পরীর ছবি দেখা যায়।[২]

কাঁথার মত পিঠার নকশাও একান্তভাবে বাঙালী নারীমানসের ফসল। সে-সৃষ্টির আয়ু ক্ষণিক মাত্র—ভোজ্যদ্রব্য হিসেবে যা রসনাতৃপ্ত করে, তাতেই মনের রূপটুকুকে ফুটিয়ে তুলে তারা অকৃত্রিম সৌন্দর্যবোধ ও স্বভাবজ সুচারুবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে।

নকশী ছাঁচ

নকশী 'ছাঁচ' বা 'সাজ' লোকশিল্পকলার একটি স্থায়ী রূপ (form); মাটি, পাথর, অথবা কাঠ দিয়ে তা তৈরি। সেই ছাঁচে ফেলে অন্য বস্তুকে চিত্রিত অথবা রূপায়িত করা হয়। কাঠের নকশী ছাঁচে রঙ লাগিয়ে কাপড়, কাঁথা ইত্যাদি চিত্রিত করার রীতি দেশের সর্বত্র প্রচলিত। এগুলি তৈরি করে ছুতার অথবা কোন শিল্পীমনা গ্রামবাসী। মাটি-পাথর-কাঠের ছাঁচে ফেলে মিঠাই, ক্ষীর; আমসত্ব, গুড়ের পাটালি প্রভৃতি নির্মিত হয়। এসব ছাঁচের মুখ্য রূপকার গ্রামের ললনারা। হিন্দু নারী ছাঁচে ফেলে ক্ষীরের 'স্বস্তি' ও 'পুতুল' বানায়। পাবনা জেলায় প্রচলিত ক্ষীরের স্বস্তির ছাঁচ সম্পর্কে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস লিখেছেন, 'পাথরের টুকরার উপর নানাবিধ মনোহর ফুল লতাপাতা খোদিত করিয়া উহা ক্ষীরের স্বস্তি তৈয়ার করিবার ছাঁচ রূপে ব্যবহৃত হয়।'[৩] ফরিদপুর জেলায় আমসত্বের ছাঁচ সম্বন্ধে শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মাটি পুড়িয়ে কিংবা পাথর খুঁদে নানারূপ লতাপাতায় ঠাকুমারা এই সব ছাঁচ তৈরি করেন এবং তাইতে আমসত্ব দিয়ে থাকেন।'[৪] ছাঁচে ফেলে নানা আকারের নাড়ু প্রস্তুত হয়।

১. শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস—চিত্রশিল্পে পল্লীরমণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬৩

২. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৬৫
ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর সৌন্দর্যের প্রতীক। পরী মূলতঃ গ্রীক-সংস্কৃতির উপাদান; বাঙালী প্রত্যক্ষভাবে ইরান-সংস্কৃতি থেকে নিয়েছে।

৩. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬৩

৪. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪০, পৃঃ ১০৬

শ্রীকামিনীকুমার রায় লিখেছেন, 'গ্রামাঞ্চলে ক্ষীরের লাড়ু প্রায়ই মাছ, পশু, পাখি, ফলফুল, লতাপাতা ইত্যাদির চিত্র খোদিত নানা আকারের ছাঁচে প্রস্তুত করা হয়।··· সুনিপুণা মহিলাদের বিচিত্র কারুকার্যের ছাপ বুকে লইয়া নানা আকারের লাড়ু যখন আকার অনুযায়ী পাত্রে পাত্রে চড়িয়া ভারে ভারে বিবাহ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন যেন সকলের কাছে ক্ষীরশিল্পের এক প্রদর্শনীর দ্বার খুলিয়া যাইত।'[১] বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রাচীন আমসত্ত্বের ছাঁচ' পাদনামে তিনটি ছাঁচের আলোকচিত্র দিয়েছেন। একটিতে আছে পায়রার মূর্তি; অপর দু'টিতে গোলাকার নকশায় এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যস্থলে 'শতদল পদ্ম', তার চারপাশে পুষ্পিত লতার বেড়, বাইরের বৃত্তে মানুষ, ঘোড়া, হাতী, হরিণ, সিংহ, ময়ূর খোদিত আছে।[২] ছাঁচগুলি দক্ষ হাতের তৈরি, কারণ চিত্রগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফরিদপুর, যশোহর, প্রভৃতি জেলায় খেজুর গুড়ের পাটালি তৈরি করার বিচিত্র ছাঁচ আছে। চৌকা, ত্রিভুজ, বর্ফি, চাকা প্রভৃতির আকার বিশিষ্ট পাটালির ছাঁচে নানা প্রকার কারুকাজ থাকে।

মূল ছাঁচ আদর্শায়ন শিল্পকর্মের নিদর্শন। ছাঁচের চিত্রসৌন্দর্যই ছাঁচকৃত বস্তুর চিত্রসৌন্দর্য। খাদ্যবস্তুকে কারুখচিত করার পেছনে বাঙালীর রুচিবোধের সাথে সৌন্দর্যজ্ঞান ক্রিয়া করছে।

নকশী পুতুল

হাতের তৈরি মাটির পুতুল ও খেলনা নানা প্রাণী ও বস্তুর প্রতিকৃতিতে আদর্শায়ন চিত্রের নিদর্শন বহন করে। আবার এতে রঙ-রেখার বিভিন্ন অঙ্গাবয়ব রচনায় লিপিচিত্রেরও অভিব্যক্তি আছে। এখানে পুতুলটা মুখ্য, পুতুল চিত্রিত করা গৌণ ব্যাপার। তথাপি কোন কোন পুতুল ও খেলনার গঠন-প্রকৃতি এমন বিমূর্ত হয় যে, উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি চিত্রিত না করলে তার স্বরূপ ধরা পড়ে না। মাটির পুতুলের মানুষের মাথাটা গোলাকার পিণ্ডবিশেষ— চুল, নাক, কান, চোখ, মুখ, কপালের স্পষ্ট বিন্যাস থাকে না; কাপড়ের পুতুলেও তাই। তখন রঙ দিয়ে অথবা রঙিন সুতা দিয়ে অঙ্গগুলি

১. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫
২. বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪৪৩ (গ)

ফুটিয়ে তোলা হয়। পুতুলের সব প্রাণীর পাগুলি প্রায় এক রকম— লম্বা ও প্রসারিত, নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু। হাঁটুর ভাঁজ নেই, হাঁটুর উপর-নীচের আকারগত ভেদও তেমন থাকে না। এটি কুকুরের পা কি হরিণের পা, গরু কি ঘোড়ার পা তা নির্ণয় করা সহজ নয়। অর্থাৎ পুতুলের এ্যানাটমি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাদামাটি, কাপড়, সোলা প্রভৃতি স্থূল ও ভঙ্গুর উপকরণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পষ্টতা আনা যায় না; তখন লোকশিল্পী রঙ লাগিয়ে সে অভাব পূর্ণ করে। বিশেষজ্ঞের ভাষায়, 'It is colour that animates the figures.'[১] রঙ দিয়ে চোখ, কান, নাক, মুখ, কেশ, অলংকার, পোশাকাদির স্পষ্টতা আনা হয়। পুতুলের এরূপ অঙ্গচিত্র পূর্ণাঙ্গ চিত্রের মর্যাদা বহন করতে পারে না সত্য, তবে রঙিন অঙ্গবিন্যাসেই পুতুলের দেবভাব, বীর্যভাব, হিংস্রভাব অথবা নম্রভাব ফুটে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুতুলের দেহ অনাবশ্যকভাবে ও অসামঞ্জস্যভাবে ফোঁটা ও রেখা দিয়ে রঙিন করা হয়েছে। এখানে চিত্রিত করার চেয়ে শোভিত করার প্রবণতা অধিক। অজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর Folk toys of India গ্রন্থে চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত যে কটি লোক-খেলনার আলোক-চিত্র দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে 'হরিণ' 'কুকুর', 'হাতী ও বালক' পাদ-নামের ছবিকে রঙিন করার জন্য কেবল রৈখিক নকশা টানা হয়েছে।[২] এগুলিকে নকশী পুতুল বলা যায়। ফ্রেসকো চিত্রের মত কাঁচা অবস্থায় রঙ দিয়ে অথবা কাঠি দিয়ে দাগ কেটে পুতুল নকশী করা হয়। নকশা কখন কখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যক্ষতা আনে, কখন কখন অনাবশ্যক রেখাঙ্কনে পরিণত হয়। পাখির ডানায় যখন দাগ টানা হয়, তখন পালকের ব্যঞ্জনাটা ধরা পড়ে; কিন্তু একই রেখা যখন গলায় ও মাথায় দেখা যায়, তখন তা অর্থহীন খেয়ালী নকশা ছাড়া কিছুই নয়।

পলিমাটির দেশ বাংলায় পোড়ামাটির পুতুল বা খেলনার প্রচলন বহু প্রাচীন কালের; পাহাড়পুর-ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপে লোকায়ত আদর্শের পোড়ামাটির প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। লোকায়ত শিল্পাদর্শে এ্যানাটমির সমতা, সূক্ষ্মতা ও প্রত্যক্ষতার অভাব থাকে। স্থূল ভঙ্গিতে কেবল বস্তুর

১. Ajit Mookharjee—Folk toys of India, p. 14
২. Ibid, See plate No. 6, 8 and 30

আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়। এরূপ আদর্শের দিক থেকে প্রাচীন যুগের সহিত এযুগের পুতুলাদির বিশেষ পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে ব্যবহারের দিক থেকে। প্রাচীন টেরাকোটা ছিল দেবমূর্তি, প্রতীকমূর্তি অথবা কামনার প্রতিকৃতি, এযুগে পুতুলগুলি শিশুর খেলনা অথবা গৃহসজ্জার উপকরণ হয়েছে। তবে ব্রতাচার ও পীরাচারের পুতুলগুলিতে এখনো ধর্মীয় সংস্কার আছে।

গ্রামের মেলা-উৎসবাদিতে যেসব পুতুল ও খেলনা বিক্রয় হয়, সেগুলি পেশাদার কুমার, ছুতার ও মালাকার বানিয়ে থাকে। কুমার মাটির পুতুল, ছুতার কাঠের পুতুল ও মালাকার সোলার পুতুল বানায়। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে মানুষ ও জীবজন্তুর পুতুল সাধারণত: গ্রামের নরনারীই তৈরি করে থাকে। মুসলমান গ্রামসমাজে 'সত্যপীরের ঘোড়া', 'রসুলের দুলদুল', 'মহরমের তাজিয়া' প্রভৃতি বেশরা আচার কেন্দ্রিক পুতুলের প্রচলন দেখা যায়।[১]

আলপনা

অঙ্কনপদ্ধতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে আলপনাকে রেখাচিত্রের অন্তর্ভূত করা যায়। রঙ-রেখার লেপন দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। হিন্দু নারী-সমাজের ব্রতানুষ্ঠান আলপনার প্রধান উৎস। এ ছাড়া অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও বরণ উৎসবে আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। আলপনা মুখ্যত: মাঙ্গল্যচিত্র।

আলপনায় বর্ণবৈচিত্র্য কম থাকলেও চিত্রবৈচিত্র্য আছে। চালের গুঁড়ির সাদা 'পিটালি' আলপনার প্রধান রঙ। লাল রঙের জন্য সিন্দূর ব্যবহার করা হয়। ইঁটের গুঁড়ি, কাল ছাই প্রভৃতি দিয়েও আলপনা আঁকা হয়।[২] কোন কোন আলপনায় গোবর-গোলা জল ব্যবহার করা

---

১. অজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে একটি দুলদুল ঘোড়ার আলোকচিত্র দিয়েছেন। পুতুলটি ছেঁড়া কাপড় ও কাগজ দিয়ে তৈরি। লোকশিল্পের সাধারণ নটিকের মতই পা অভঙ্গ, সোজা ও প্রসারিত। লাল ও সাদা রঙের কাগজ জড়িয়ে হাঁটু ও খুরের উপরের ভাঁজ এবং মুখে লাগাম ও গায়ে জিনের স্বাতন্ত্র্য দেখানো হয়েছে গ্রন্থকারের মতে পুতুলটি বর্ধমান থেকে সংগৃহীত। পূর্বোক্ত, প্লেট নং ৩১ দ্রষ্টব্য।

২. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী— ব্রত ও আচার, পৃঃ ৩৫

হয়।[১] মুসলমানের বিয়েতে হলুদ বাটা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। ফুলের আলপনায় ফুল সাজিয়েই ইপ্সিত ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।[২] কাঠি, কলম বা হাতের আঙুল দিয়ে ঘরের খুঁটি, মেঝে, দুয়ার, দেওয়াল, বারান্দা, আঙিনা, পূজার বেদী, পিঁড়ি, কুলা, সরা, হাঁড়ি, কলস, ঝাঁপি, কাঠা ইত্যাদি স্থানে ও পাত্রে আলপনা আঁকা হয়। এরূপ সামান্য উপকরণ এবং সাধারণ আধারে চারপাশের পরিদৃশ্যমান নানা বস্তু আলপনায় চিত্রিত হয়। সূক্ষ্মরেখায় ও পরিমিত রঙের বিন্যাসের অভাবে বস্তুর নিখুঁত অবয়ব ফুটে উঠে না। পল্লীর অশিক্ষিত চিত্রশিল্পীরা তা করেও না, স্থূল ও স্পষ্ট গ্রাহ্য রেখার টানে আকারে-প্রকারে, আভাসে-ইঙ্গিতে ইপ্সিত বস্তুর দ্যোতনা দিতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলপনাকে শিল্পীমনের 'মানচিত্র' বলেছেন।[৩]

নকশী কাঁথা ও নকশী পিঠার মত আলপনার জগৎ একান্তভাবে বাঙালী নারী মানসের জগৎ। কাঁথা ও পিঠার ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে, কিন্তু আলপনার চিত্রণ উপলক্ষ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠাননির্ভর। প্রয়োজন অনুসারে কাঁথা, পাখা, পাটি অবসর মত যে কোন সময় তৈরি করা যায়, কিন্তু আলপনা অবসরমাত্র যেখানে-সেখানে ও যখন-তখন আঁকা হয় না; বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থলে বিশেষ আলপনা এঁকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়, যেমন ব্রতের আলপনায় কেবল ব্রতকালীন নির্দিষ্ট স্থানে কামনার ছবিগুলিকে চিত্রিত করা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে পিঁড়িতে বা কুলাতে শুভসূচক বস্তুর আলপনা দেওয়া হয়। অধুনা আলপনা আঁকা কুলা বা ডালা গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি এবং মাটির দেওয়ালের আলপনা কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলাচারে আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। উদ্দেশ্যভেদে চিত্রের রূপভেদ হয়। আসনপিঁড়িতে যখন পদ্মশঙ্খ আঁকা হয় তখন তা ব্রতের দেবতার, যখন ব্যঞ্জনের

---

১. প্রফুল্লকুমার দাস—চিত্রশিল্পে পল্লীরমণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬১
২. পুণ্যিপুকুর ব্রতে এরূপ আলপনা দেওয়া হয়। ঐ, পৃঃ ৭৬১
৩. বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬১

বাটি আঁকা হয় তখন তা অন্নপ্রাশনের নবজাতকের এবং এক বৃন্তে দুই ফুল বা ভ্রমর-পদ্ম আঁকা হয় তখন তা বিয়ের বর-বধূর।[১] বিভেদটা এভাবে চিত্রে সূচিত হয়।

আদর্শ ও নীতির দিক থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামধর্মের এত বিরাট পার্থক্য যে, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় ও সৃষ্টিকর্মে সহজে স্বাতন্ত্র্য এসে গেছে। মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবে ব্রতের আলপনার চিত্র বর্জন করেছে, সামাজিক ও লৌকিক উৎসবে আলপনার রীতি প্রচলিত থাকলেও তাতে হিন্দুর মত ধর্মীয় সংস্কার নেই, এতে ধর্মপ্রবাভমুক্ত সৌন্দর্যচেতনার রূপলীলা আছে। কুলায় আলপনা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রচলিত। হিন্দুনারী লক্ষ্মীর কুলায় লক্ষ্মীর পা ও ধানছড়া আঁকে।[২] মুসলমানরা তা আঁকে না, ফুলের গাছ, জ্যামিতিক রেখা আঁকে।[৩] হিন্দুরা আলপনার কুলায় পূজার নৈবেদ্য রাখে, মুসলমানরা অনুষ্ঠানের প্রসাধন দ্রব্য রাখে অথবা দেওয়ালে ও তোরণে টাঙিয়ে রাখে।

আলপনা আঁকার পেছনে ধর্মচিন্তা, মঙ্গলচিন্তা, সৌন্দর্যজ্ঞান যা'ই থাক না কেন, তা কোথাও লোক-হৃদয়ের আবেগ শূন্য নয়। সৃষ্টি প্রেরণার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সমীভূত হলে আলপনা ধর্মের অঙ্গ হয়েও যে বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্ররূপায়ণে নির্মল শিল্পমূর্তি গ্রহণ করতে পারে তার প্রমাণ আছে কাজলরেখার আলপনায়। কাজলরেখা চালের পিটালি দিয়ে অনেকগুলি মূর্তি এঁকেছে, যেমন ধানছড়া, গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ্মপত্রে লক্ষ্মী-নারায়ণ, হংসরথে জয়া-বিষহরী, তরাই ডাকুনী, বনদেবী রক্ষাকালী, গঙ্গা-গোদাবরী, হিমালয় পর্বত প্রভৃতি।[৪] এর সবগুলিই লক্ষ্মীপূজার আলপনার চিত্র নয়,[৫] কতকগুলি হিন্দুর লৌকিক ও

১. এক বৃন্তে দুই ফুল আলপনাটি সম্পূর্ণ প্রতীকব্যঞ্জক, বর-কনের একাত্মতার প্রতীক। পদ্ম ও ভ্রমর মিলনের সংকেত জ্ঞাপন করে। বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬১, ৬৯

২. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬২

৩. গ্রন্থে প্রদত্ত 'কুলাচিত্র' দ্রষ্টব্য।

৪. মৈমনসিংহ-গীতিকা, পৃঃ ৩৩২

৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্মীব্রতে আলপনার বিচিত্র চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, "সকাল থেকে মেয়েরা ঘরগুলি আলপনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানছড়া হল আলপনার প্রধান

পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি। এর পরে কাজলরেখা যা এঁকেছে তা নিজ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ছবি। পল্লী কবির ভাষায়—

সমুদ্রে সাগর আঁকে চান্দ আর সুরুযে।
ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে।।
শেজেতে শুইয়া আছে মরা সে কুমার।
... ...
সুইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্রমিত্র লইয়া।
নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া।।

'কাজলরেখা' কথাকাহিনীরই এটা চিত্ররূপ।[১] আলপনার ভিতর দিয়ে বাঙালী ললনা ধর্মকর্মের বাইরেও স্বীয় চিত্তবৃত্তির বিকাশে রূপচরিতার্থতার পথ দেখিয়েছে, এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলপনার চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন, "আলপনার শিল্প হচ্ছে সমতল ভিত্তিতে চিত্রণ— চালের গুঁড়ো জলে গুলে আঙুলে দিয়ে মোটা আর সংক্ষিপ্ত রেখায় আঁকা— সুতরাং বিষয় বস্তুকে আভাস দিয়ে, রূপক দিয়ে, প্রতীক দিয়ে বোঝাতে হয়; একেবারেই 'ডিটেল' দেওয়া চলে না। সমতল পৃষ্ঠপটে শুধু এই রেখার টানে রূপক রূপ পায় আশ্চর্য সব ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইনে।"[২] চিত্রের বস্তুধর্মিতা অথবা বিমূর্ততা কোনটাই লোকমানসের সচেতন শিল্পপ্রয়াস নয়। ব্রতের আলপনায় বস্তুর স্পষ্টগ্রাহিতা আবশ্যক, কেননা কামনার বস্তুকে কেউ ধূম্রাচ্ছন্ন দেখতে চায় না। তথাপি কোথাও কোথাও বিমূর্ত ছবি এসে যায়, তার কারণ

অঙ্গ।...আলপনায় নানা অলংকার এবং চৌকিতে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না লিখে কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিংবা পদ্মের উপরে পা—এমনি নানা রকমের চিত্র দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধান ছড়া, কলমীলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা থাকে।"
বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৯

১। সুচরাজার স্মরণার্থে উদ্দেশ্যমূলক চিত্র হলেও তা বাস্তবধর্মী জীবনালেখ্য। এখানে চিত্রের বর্ণনা পাই, চিত্রপট পাই না, অতএব এর চিত্রণকুশলতা ও রসসাধকতা নির্ণয় করা যায় না।

২. বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬৪-৬৫

শিল্পীর চেতনা যেমন বস্তুর পূর্ণাবয়ব ধাতস্থ করতে পারে না, তেমনি দ্বিধাহীন শিল্পরীতিতে তাকে রূপায়িত করতে পারে না। সেঁজুতি ব্রতে হাতে-পো-কাঁখে-পো আলপনাটি একটি এ্যাবস্ট্রাক্ট নকশা, বহু সন্তানবতী বিব্রতা সীমন্তিনীর প্রতিকৃতি।[১] অবনীবাবু তাঁর বাংলার ব্রত গ্রন্থে হাতে-পো-কাঁখে-পো-এর একটি স্কেচ দিয়েছেন।[২] চিত্রে কেবল হাতে ও কাঁখে নয়, সন্তানবতী সীমন্তিনী মাথায় ও পায়ে মোট ছ'টি আত্মজকে ধারণ করে আছে। মা ও সন্তানেরা একই ভঙ্গিতে অঙ্কিত— মোটা রেখার টানে বড় আকারে মা, ছেলেরা সব সমান ও একই রেখায় বিমূর্ত। লক্ষ্মীর ব্রতে লক্ষ্মীদেবীর পদচিহ্ন মানবীয় পদাকৃতি মাত্র, এতে এমন কোন স্বাতন্ত্র্য নেই যাতে মনে হতে পারে, এ লক্ষ্মীরই পা, অন্য কারও নয়। ডিটেল হোক বা এ্যাবস্ট্রাক্ট হোক লোকচিত্রশিল্পীর কৃতিত্ব রেখার বলিষ্ঠতা— বর্ণবিন্যাসে উদাসীন থেকেও কেবল রেখা ও বিন্দুকে সম্বল মাত্র করে কখন স্বরূপে কখন ব্যঞ্জনায় বস্তুকে ফুটিয়ে তোলে। সহজ সরল রেখায় মুহূর্তের এই অঙ্কনে বস্তুর স্থূল আবেদনই আসে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবেদন চিত্তের গভীরে দাগ কাটতে পারে না। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার জন্য উন্নত চিত্রের প্রভাব রসিকচিত্তে সুদূরপ্রসারী হয়।

আলপনার চিত্রবৈচিত্র্যের একটা 'ফর্দ' দিয়েছেন অবনী বাবু— যথা,

প্রথম—পদ্ম
দ্বিতীয়—লতা মণ্ডপ
তৃতীয়—গাছ, ফুল, পাতা
চতুর্থ—নদনদী ও পল্লীদৃশ্য
পঞ্চম—মাছ ও পশু-পক্ষী
ষষ্ঠ—চন্দ্রসূর্য ও গ্রহনক্ষত্র
সপ্তম— আভরণ ও আসবাব পত্র।[৩]

তাঁর ফর্দটি মূলতঃ ব্রতের আলপনাকে লক্ষ্য করে। ব্রতের আলপনা ও অন্য অনুষ্ঠানের আলপনার মধ্যে চিত্র নির্বাচনে বিভেদ আছে। সামাজিক অনুষ্ঠানের আলপনায় ফুল, লতা, পাতা এবং জ্যামিতিক নকশাই প্রধান।

১. রবীন্দ্র মজুমদার—বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৭
২. বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬৭
৩. ঐ, পৃঃ ৬৭

উদ্দেশ্য ও উপলক্ষের বিভিন্নতার জন্য এবং চিত্রের আধারেরও নানা ভেদ থাকার জন্য আলপনার নির্দিষ্ট মটিফ নির্ণয় করা যায় না। দু'একটা সাধারণ চিত্ররূপ প্রায় সব আলপনাতে দেখা যায়, যেমন— পুষ্পিতলতা, পেঁচানো ফুল ইত্যাদি। আলপনার ফর্দে অবনী বাবু যে লতামণ্ডলের কথা বলেছেন তা পেঁচানো ফুলের সহিত অভিন্ন। এক এক আলপনায় এক এক লতার চিত্রণ দেখা যায়— লক্ষ্মী পূজায় খুঁটির গোড়ায় অন্যান্য চিত্রের সাথে কলমীলতা ও দোপাটিলতা অঙ্কিত হয়।[১] বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠানে বার রকম লতার আলপনা দেওয়া হয়।[২] গাছ, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চন্দ্র, আভরণ, তৈজসপত্র ইত্যাদির চিত্র নানা আলপনায় দেখা যায়, কিন্তু এগুলি কোন মটিফ নয়। ব্রতের কামনা ভেদে আলপনার পরিবর্তন ঘটে। মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনার বিষয় চন্দ্র, সূর্যমণ্ডল, ভিটা, পুতুল, পৃথিবী, আকাশ, পুকুর, পাখি, ঘোড়া, দোলা, পালকী, সিংহাসন, শঙ্খ, সিন্দুর, কাপড়, আয়না, চিরুনি, পানের বাটা, ভৃঙ্গার, থালা, মানুষ, তাল, সুপারি, পান, বেগুন, খড়ম প্রভৃতি।[৩] সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় থাকে দোলা, বেগুনপাতা গুয়াগাছ, ফুলগাছ, মাকড়সা, শর, আসনপিঁড়ি, শঙ্খ, খাড়ু, হাতা, বেড়ী, বঁটি, খাট, থালা, চড়ই পাখি, গঙ্গা-যমুনা, নদী ইত্যাদি।[৪] এসব বিচিত্র চিত্র থেকে মটিফ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কালের দিক থেকে ব্রতের আলপনা খুব প্রাচীন হওয়ার কথা। ব্রতপূজা আদিবাসীর বস্তুপূজার অনুরূপ। কামনার অনুকূল সুফল

---

১. বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৯

২. ঐ, পৃঃ ৬৮-৭০

গ্রন্থকার লতাগুলির নাম করেননি। কেবল 'বর-যাত্রার পদ্ম' পাদনামে যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে পদ্মের চারপাশে মোচালতার বেষ্টনী আছে। তিনি সাধারণভাবে লতা-মণ্ডলের চিত্র হিসেবে কলালতা, খুন্তিলতা, চালতালতা, চাঁপালতা, শঙ্খলতা ইত্যাদির নাম করেছেন। ডঃ দীনেশ সেনের মতে মোচালতা, কলমীলতা, শিমলতা, শঙ্খলতা ও কলমীলতা পাঁচটি লতামণ্ডলের নাম পাওয়া যায়। বৃহৎ বঙ্গ; ৪১১ পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

৩. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৩৫

৪. বাংলার ব্রত, পৃঃ ৪১-৪২

প্রত্যাশায় নদনদী, গাছ, পাহাড়, মেঘ, চন্দ্রসূর্য, পশু, পাখি, দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করার মধ্যে প্রাচীন ধর্মমতের লক্ষণ আছে। লৌকিক ব্রতের দেবদেবী ও পুজোপকরণগুলির সহিত অনার্য উপাদানের মিল আছে, যেমন ধানের ছড়া, দূর্বা, সিন্দূর ইত্যাদি। এগুলি কৃষি সভ্যতার অবদান।

আধুনিক চিত্রকলায় 'মাধ্যম' দ্বারা শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে, যেমন জলরঙ, তেলরঙ, লিথোরঙের চিত্র। আলপনাতে পিটালি, গোবর, মাটি ইত্যাদি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ঐগুলি দিয়ে আলপনার শ্রেণী-ভাগ করা চলে না। চিত্রিত বস্তুর 'ফর্দ' মাফিক অর্থাৎ পদ্ম, লতা-মণ্ডল, গাছপালা, নদনদী ইত্যাদি রূপেও আলপনার বিভাগ করা যায় না। এতে আলপনার স্বকীয় রূপ ধরা পড়ে না। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আলপনার চিত্রবস্তু ও চিত্রধর্মকে অংশত নিরূপিত করলেও ব্রতের আলপনা, বিবাহের আলপনা, জলসার আলপনা ইত্যাদি ভাবে শ্রেণীবিন্যাস গ্রহণযোগ্য নয়। এক এক ব্রতের এক এক রকম আলপনা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিয়ের আলপনায় কিংবা লোকোৎসবের আলপনায় কোন এক প্রকার চিত্রবস্তুর নির্দ্দিষ্টতা নেই। আবার 'আধারে'র দিক থেকেও বিভাগ করলে আলপনার অন্তঃপ্রকৃতি পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয় না। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য কুলাচিত্র, পিঁড়িচিত্র, দেওয়ালচিত্র, সরাচিত্র ইত্যাদি নাম দিয়ে আলপনার শ্রেণীভাগ করা হল।

•

মেঝের আলপনা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের মেঝে, সিঁড়ি, খুঁটি, মাটির ঝাঁপ, দেওয়াল, বাড়ির উঠান, পূজাপার্বণের বেদী, ও লৌকিক উৎসবানুষ্ঠা-নের স্থলে আলপনা দেওয়া হয়। ব্রতের আলপনাগুলি পিটালি রঙ দিয়ে মাটিতেই আঁকা হয় বেশী। মাঘমণ্ডল ব্রত ও সেঁজুতি ব্রতের চিত্রের বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। পুণ্যিপুকুর, ভাদুলী ও বসুধারা ব্রতে বিচিত্র চিত্র মেঝেতে আঁকা হয়। ব্রতের স্থান লেপেপুছে তারপর আলপনায় চিত্রিত করা হয়। ধর্মভাব, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য-রুচির সমন্বয়ে সে-স্থানটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ব্রতের আলপনাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আলপনাকে প্রভাবিত করেছে। আল-পনার রীতি উভয় ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন, কেবল চিত্রবস্তুতে পার্থক্য এসেছে। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলচিন্তা, শুচিজ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ

উদ্রেক করে এমন বস্তুই আলপনায় আঁকা হয়। সৌন্দর্যের ও পবিত্রতার গুণে আলপনা নগরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। '২১শে ফেব্রুয়ারী'র মত বাঙালীর জাতীয় উৎসবে রাজপথেও আলপনা দেওয়া হয়। এতে প্রধানতঃ জ্যামিতিক ডিজাইন বেশী থাকে।

দেওয়ালচিত্র : মাটির দেওয়ালে আলপনা দেওয়া হয়; আবার সাধারণ ছবিও আঁকা হয়। হিন্দুর ঘরের দেওয়ালে 'স্বস্তিকা চিহ্ন' প্রায়শঃ দেখা যায়। স্বস্তিকা মঙ্গলের চিহ্ন। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে পদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্তি আঁকা হয়।[১] সিঁদুর দিয়ে দেওয়ালের গায়ে 'লক্ষ্মীর ধারা' আঁকার রীতি আছে।[২] বীরভূম জেলায় গ্রামের মেয়েরা দেবলীলা ধানশিষ, পাতা প্রভৃতি এঁকে দেওয়াল চিত্রিত করে।[৩] দেবদেবীর চিত্র আঁকা হয় আপদবালাই থেকে গৃহকে রক্ষা করার জন্য। সচরাচর কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা দেওয়ালে অঙ্কিত থাকে। পশুপাখি, ফুলফল আঁকা হয় সৌন্দর্যচর্চার অভিপ্রায়ে। স্বস্তিকার মত পদ্ম দেওয়ালচিত্রের সাধারণ মটিফ। দেওয়ালের আলপনা ও অন্যান্য ছবি কিছুকাল স্থায়ী হয়। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এগুলি চিত্রিত হলেও উৎসব শেষে মুছে ফেলা হয় না, সারা বছর দেওয়ালের গায়ে থেকে যায়। গুহা-বাসীরা গুহার গায়ে ছবি এঁকে চিত্ররসপিপাসা মিটাতো, গ্রামবাসীরা দেওয়ালে আলপনা ও ছবি এঁকে অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে।

কুলাচিত্র : ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ত্রিবিধ অনুষ্ঠানে কুলাতে আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতের কুলায় আলপনা দেওয়ার প্রথা হিন্দুনারীসমাজে খুব প্রাচীন। কামনার ছবিই ব্রতের আলপনায় প্রতিফলিত হয়; সুতরাং এখানে বস্তুনির্বাচনে ব্রতচারিনীর স্বাধীনতা নেই। তবে যে বস্তু আঁকে তা পরিচিত জগতের ছবি বলে তাতে বাস্তবের ছায়াপাত ঘটে। লক্ষ্মীপূজার কুলায় 'লক্ষ্মীর পা' ও 'ধানশিষ' অঙ্কিত হয়। সাধারণতঃ কুলার পিঠে দুপাশে দুটি ধানের শিষ,

---

১. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪০, পৃঃ ১০৪
'দেওয়ালে লক্ষ্মীর আলপনা' চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

২. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪১৮ (ক)।

৩. ঐ, ৪৪০

মাঝে দুসারিতে তিনটি করে ছ'টি লক্ষ্মীর পা থাকে।[১] ফরিদপুর জেলায় 'হ্যাচড়া পূজা'য় কুলায় আলপনা দেওয়া হয়।[২]

বিবাহানুষ্ঠানে কুলা বা ডালায় আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে আছে। আলপনাযুক্ত কুলায় ডালার তত্ত্ব সাজান হয়। ফুল-ফল, লতা-পাতা অথবা জ্যামিতিক নকশা চিত্রিত হয়। এখানে ব্রতের মত কামনার প্রতিফলন নেই, সৌন্দর্যসৃষ্টির স্বাধীন অবকাশ আছে। এজন্য ব্রতের কুলার চেয়ে ডালার কুলা অধিক সুদৃশ্য ও সৌন্দর্যজ্ঞাপক।

অধুনা গ্রাম, শহর সর্বত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুলা, চালুন, কাঠের পাত্র ইত্যাদিতে বিচিত্র শোভনীয় আলপনা দিয়ে তোরণ, দেওয়াল সুসজ্জিত করা হয়। নগরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১লা বৈশাখ 'রামনবমী' উৎসবে কুলাচিত্রে দোকানপাট সাজান হয়। আলপনাযুক্ত সুদৃশ্য কুলা হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কোন বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান হয়। এ উদ্দেশ্যে তোরণও সজ্জিত করা হয়। এতে কুলার আলপনা 'জাতীয় চিত্রে'র মর্যাদা পেতে চলেছে। বলা বাহুল্য, এ সব আলপনায় ধর্মের লেশমাত্র নেই, কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

পিঁড়িচিত্র : ব্রতে ব্রতিনীর আসন, অন্নপ্রাশনে নবশিশুর আসন এবং বিবাহে বর-বধূর আসন হিসেবে কাঠের যে পিঁড়ির ব্যবহার আছে, তাতে অনুষ্ঠানভেদে নানা আলপনা আঁকা হয়।

> আমকাঁঠালের পিঁড়িখানি তার সরু সরু করে
> লতাফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করে।
> তাহারই উপরে বাপভাই মিলে ঢোল বাজাইয়া
> বামুন ডাকিয়া কন্যারে দান করে ॥[৩]

স্পষ্টতঃ লতাফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করা এই পিঁড়িটি বিয়ের আসনপিঁড়ি। বর বা কনে যে পিঁড়িতে বসে স্নান করে তাতে হলুদ

---

১. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬২
২. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০, পৃঃ ৭৭৩
৩. উদ্ধৃত : জসীমউদ্দীন—সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৬০

ও আলতা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজে কন্যাসম্প্রদানের সময় যে পিঁড়িতে বরকনেকে একত্রে বসান হয় তাতে পিটালি-গোলা জল দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। পিঁড়ির আলপনার চিত্রবস্তুর বৈচিত্র্য আছে। শিল্পীর সৌন্দর্যজ্ঞান ও মানসাভিপ্রায় অনুযায়ী বস্তু নির্বাচিত ও অঙ্কিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরকনের আসনপিঁড়িতে 'একবৃন্তে দুই ফুল' আঁকা থাকে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'পদ্ম ও ভ্রমর' আঁকার কথাও বলেছেন।[১] প্রফুল্লকুমার দাস 'পদ্ম ও প্রজাপতি' আঁকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে, সজীব গাছ, লতামণ্ডল, জ্যামিতিক ডিজাইন, অক্ষর লিখন ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়।[২] অর্থাৎ পিঁড়িটিকে সুদৃশ্য করাই এর উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে আছে মিলনসূচক প্রতীক-দ্যোতনা।

হিন্দুসমাজে অন্নপ্রাশন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান। এই আচারের মাধ্যমে শিশুর মুখে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম অন্ন (ভাত অর্থে) তুলে দেওয়া হয়। শিশুকে একটা আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে বসান হয়। অবনীবাবু বলেছেন, এই পিঁড়িতে ব্যঞ্জনের বাটিসহ লতাপাতা আঁকা থাকে।[৩] ব্রতের আসনপিঁড়িতে সৌন্দর্যজ্ঞাপক চিত্র আসে পিঁড়িটিকে সুশোভিত কবার জন্য। ব্রতকর্মের কোন চিত্র এতে অঙ্কিত হয় না।

সরাচিত্র : মাটিব তৈরি সরাতে আলপনা দেওয়া হয় পূজাপার্বণে। 'লক্ষ্মীর সরা' লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। মৃন্ময় লক্ষ্মীর মূর্তির স্থলে গ্রামবাসীরা সরার মূর্তিকেই পূজা করে থাকে। সরায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি এঁকেও তা পূজা করা হয়।[৪] অনেক স্থলে সরায় দেবীমূর্তি এঁকে পূজামণ্ডপে চালচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেশাদার কুমারেরা এগুলি তৈরি করে গ্রামের মেলা-উৎসবে বিক্রি করে। কুমারেরা সরায়

---

১. বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬১, ৬৯

২. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬১

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১
বিবাহের সময় বর যে পিঁড়িতে বসে তাহার উপরে 'আলপনা' পাদনামের চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

৪. পূর্বোক্ত, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪০, পঃ ১০৬
রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি চিত্রিত একটি সরা সাভার থেকে আমি সংগ্রহ করি। সংগ্রহ কাজে সাহায্য করে আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান দীপক রায়। সে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী।

গাজীর ছবি, মহরমের ছবি আঁকে; মুসলমানরা তা ক্রয় করে গৃহে সযত্নে রক্ষা করে। টাঙ্গাইলে এ ধরনের সরা দেখা যায়। অধুনা নগরবাসী আলপনা দেওয়া সরা ও অন্য চিত্রশোভিত সরা দেওয়ালে ঝুলিয়ে ড্রয়িংরুম সজ্জিত করে। প্রাচীন সরাচিত্র এভাবে ধর্মের সীমা ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষ সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গে পরিণতি হয়েছে।

ঘটচিত্র

ঘট শব্দের সাধারণ অর্থ মাটির ছোট 'কলস'। কুমার কাঁচা মাটি দিয়ে হাতের কৌশলে বিভিন্ন গড়নের কলস তৈবি করে, পরে সেগুলি পুড়িয়ে নেওয়া হয়। কাঁচা অবস্থায় কলসের গায়ে ছিল্‌কা দিয়ে নানা নকশা তোলা হয়। কাঁসারী পিতলের কলস ও থালাবাসনে এরূপ নকশা আঁকে। খোচিত নকশা ছাড়াও রঙ-তুলি দিয়ে বিভিন্ন সৌখিন চিত্রে কলসীর গলা ও গা চিত্রিত করা হয়। 'পুষ্পিতলতা' ও রৈখিক কারুকাজ এক্ষেত্রে অধিক দেখা যায়। একটি মেয়েলীগীতে অন্য একটি চিত্রের উল্লেখ আছে:

কলসীর মইধ্যে লেখিয়া থুইছে
রাধে বড় কলঙ্কিনী।[১]

—কিশোরগঞ্জ

কলঙ্কিনী রাধার মূর্তি ধর্মভাবজ্ঞাপক নয়, জীবনরসাত্মক। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী কলসীর গায়ে কেউ ধর্মের ছবি আঁকে না। পূজার মণ্ডপ সাজাতে অথবা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ সাজাতে ফুল-ফল-পাতাসহ 'দ্বারঘট' ও 'মঙ্গলঘট' ব্যবহৃত হয়। এসব ঘটে পিটালি, তেল-সিন্দূর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়, মঙ্গলঘটে স্বস্তিকাদি আলপনা দেওয়ার কথা বলেছেন শ্রীকামিনীকুমার রায়।[২] ঘর সাজাবার ছোট ছোট সৌখিন কলসীতেও আলতারঙ দিয়ে লতাপাতা ও অন্যান্য নকশা তোলা হয়। এগুলি মেলাদিতে বিক্রি হয়।

---

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড (বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত), ১৩৭৩, পৃঃ ২৬৫
২. শ্রীকামিনীকুমার রায়—লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ৯৪

বিশেষ অর্থে ঘটের ব্যবহার আছে যা নামে ঘট হলেও আকারে-প্রকারে কলসী নয়, ভিন্ন প্রকৃতির পাত্র তা। এতে আছে ধর্মের প্রভাব। 'মনসার ঘট' এদেশে বহুল প্রচলিত একটি নাম। প্রতিমার পরিবর্তে মনসাদেবীর প্রতীক হিসেবে ঐ ঘটকেই পূজা করা হয়। ধর্মপূজার প্রতীক 'পাটে' কোন মূর্তি থাকে না। কিন্তু মনসার ঘট প্রতীকমাত্র নয়, এর অবয়বটাই মূর্তিমান। অর্থাৎ দেবঘটটি এমন ভাবে তৈরি যে, এর গলা, মাথা, পেট বরাবর প্রতীকমূর্তি অথবা প্রতিমামূর্তি ফুটে উঠে। শিল্পীর মণ্ডণকৌশলেই এরূপটি হয়। শ্রীসুধাংশু কুমার রায় তাঁর The Ritual Art of the Bratas of Bengal গ্রন্থে মনসাঘটের দুটি আলোক-চিত্র দিয়েছেন, এর একটিতে আছে মনসার প্রতীক ফণাযুক্ত সাপের মূর্তি (১২-বি প্লেট), অপরটিতে আছে দেবীরূপিণী মনসার প্রতিমামূর্তি (১২-এ প্লেট)। ঘটদ্বয় বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত।[১] বাঙলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে সাপের ফণাযুক্ত একটি মৃন্ময় ঘট আছে। ঘটের মূর্তিকে বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষতা দেওয়ার জন্য রঙের ব্যবহার আছে। চোখ, নাক, চুল, ফণা ইত্যাদি এভাবে রঞ্জিত হয়। এক বা একাধিক সর্প ফণাযুক্ত ঘটকে পূর্ববঙ্গে 'নাগঘট' বলে। বাঁশের চোঙাকৃতির নাগঘটকে 'কৈতরিঘট'ও বলা হয়। ময়মনসিংহ গীতিকায় মনসার ঘট বুঝাতে 'ভরক' শব্দের ব্যবহার আছে।[২] পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এটি 'বারা' নামে পরিচিত।[৩] পিতল বা লোহার ঘটও নির্মিত হয়। সর্পরূপী মনসাপূজা অর্থাৎ প্রাণিপূজা অনার্য ধর্মাচারের অঙ্গীভূত। মনসা ছাড়া 'ঘটলক্ষ্মী'র পূজাও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। ধানের ছড়া-ভরা ও ছবি-আঁকা ঘটের পূজাই ঘটলক্ষ্মীর পূজা। প্রাচীন ঘটলক্ষ্মী পূজানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক লক্ষ্মী মানবীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এসূত্রে মনসার ঘটের মত লক্ষ্মীর ঘটও প্রাচীন হতে পারে। লক্ষ্মীর প্রতীক 'ধানছড়া' কৃষিসংস্কৃতির উপাদান। দক্ষিণরায়ের

১. The Ritual Art of the Bratas of Bengal, Firma K. L. Mukhopadhaya, Calcutta, 1961, P. 60

২. ভরক ভাঙিল মোর দুষ্ট দুরাচার।—দস্যু কেনারামের পালা, মৈমনসিংহ-গীতিকা, পৃঃ ২২০

৩. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪

মুণ্ডমূর্তিসহ ঘট আছে, একে 'দক্ষিণরায়ের বারা' বলে।[১] ধর্মের ঘটে সূর্যের আলপনা দেওয়া হয়। কার্তিকের ঘটেও বিবিধ আলপনা থাকে; এর অপর নাম 'কার্তিকের ভাঁড়'।[২] বস্তুত: দেবঘটগুলি হিন্দুর লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ।

পটচিত্র

তুলির সাহায্যে পটের উপর রঙের আলিম্পনে বস্তুর রূপাবয়ব ফুটিয়ে তোলাই চিত্রবিদ্যার মূলকথা। লৌকিক ধারার একমাত্র পটচিত্রে তুলিচিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি অনুসৃত হয়।

আলপনা বাংলার অন্তঃপুরচারিণী নারীদের কামনা বাসনার প্রতিচ্ছবি, পটচিত্র পটুয়া পুরুষদের মানসসম্পদ। আলপনায় ধর্মবোধ, মাঙ্গল্যচিন্তা, সৌন্দর্যবোধ সক্রিয়, পটচিত্রে আদিতে ধর্মীয় চেতনা ক্রিয়া করলেও পরবর্তীকালে অর্থোপার্জনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় সৌন্দর্যের চিহ্ন হ্রাস পেয়ে এগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের সুলভ পণ্যে পরিণত হয়। অবনতির যুগে কালিঘাটের কোন কোন পটচিত্রে এরূপ রিরংসার নর্মলীলার পরিচয় আছে। এগুলি পটের পূর্বৈতিহ্যের বিকৃত পরিণতি। রুচিহীনতা পটচিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের দীর্ঘকালের নিজস্ব শিল্পকলা অধুনা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্মচেতনা থেকে পটচিত্রের উদ্ভাবন— ঐতিহাসিক সূত্রানুসন্ধানে বিশেষজ্ঞরা তার মর্মোদ্ধার করেছেন। রবীন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ-জীবনী ও জাতকের কাহিনী পটচিত্রে বিধৃত করা হত। আট শতকের রচনা বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে তার পরিচয় আছে।[৩] তিনি আরও বলেছেন, মধ্যযুগে বাংলার পটীদাররা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এর পুনঃ প্রচলন করেন। তাঁর মতে, পটের চিত্রবস্তুতে কৃষ্ণলীলা সেজন্য প্রাধান্য লাভ করে।[৪] এটা হল ষোল

---

১. ঐ পৃঃ ৯৪
২. ঐ পৃঃ ৯৪
৩. বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৩
৪. ঐ, পৃঃ ৯৩

শতকের কথা। গুরুসদয় দত্তের মতে, বাংলা পটচিত্র ও পটুয়া সঙ্গীত অধ্যাত্মভাবসঞ্জাত। সাত শতকের রচনা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যে যমপটের উল্লেখ আছে। বাংলার পটুয়ারা পালাশেষে যমপট দেখিয়ে থাকে। এরূপ রীতি সাদৃশ্যে তিনি মনে করেছেন, বাংলার পটশিল্পীরা বৌদ্ধযুগের চিত্রকরদের উত্তরসাধক।[১] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, পটুয়াদের পূর্বপুরুষ 'মস্করী' উপাধিধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা বুদ্ধের সময় হতে পটচিত্র এঁকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। ভিন্ন ভাষার লোকের কাছে ছবির সাহায্যে ধর্মমত প্রচার সহজ হত। বাংলাদেশে মস্করীদের নাম পটীদার। ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত পটুয়ারা মুসলমানদের আগমনের পর ইসলামধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করেনি।[২]

বাংলাদেশে পটচিত্র ও গানের ভেতর দিয়ে যে সব ধারা সংরক্ষিত তার অধিকাংশ পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। সাধারণতঃ কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, শিবপার্বতীলীলা প্রভৃতি চিত্র ও গানের উপজীব্য বিষয়।[৩] এ ছাড়া লৌকিক পাঁচালী ও পালাগান চিত্রিত হতে দেখা যায়। 'গাজীর পট' লৌকিক কাহিনীকে (গাজী গানের পালা) আশ্রয় করে চিত্রিত। কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধারাবাহিকভাবে এঁকে পট দেখানো বা পট নাচানো হত।[৪] পটের কাহিনী আগে, চিত্র পরে। এদিক থেকে পটের কাহিনীর উদ্ভব ও প্রচার কাল জানলে পটের সময় জানা যাবে। রাধা-কৃষ্ণ ও রাম-সীতার কাহিনী সংস্কৃত ভাগবত ও রামায়ণ থেকে এদেশে প্রচার লাভ করে। আর্য সংস্কৃতির সহিত বাঙালীর পরিচয় প্রাচীন কাল থেকে ঘটলেও আপামর জনসাধারণের কাছে এর সামগ্রিক প্রভাব মধ্যযুগে কৃত্তিবাস, মালাধর বসু প্রমুখ কবির বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাপকতর হয়েছিল। এঁরা পনর শতকের কবি।[৫] যে সময়

১. পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ১৵

২. বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪৪০—৪১

৩. পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ১৷৶—১৸০

৪. ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে পট দেখানো ব্যাপারটাকে পট নাচানো বলে। বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪৪১

৫. কৃত্তিবাস জালালউদ্দীন শাহের (১৪১৯-৩২ খ্রীঃ) এবং মালাধর বসু ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮০খ্রীঃ) আমলে আবির্ভূত হন। দ্রষ্টব্যঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ— বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় ভাগ।

থেকে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা পটচিত্রের প্রচলন হতে পারে। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাবের কাল ষোল শতক। বাংলায় যখন পীর-দরবেশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তখন গাজী পীরকে কেন্দ্র করে পীরের পাঁচালী প্রচলিত হয়। পটুয়ারা তাঁকে আশ্রয় করে 'গাজীর পট' অঙ্কন করেছে। ইসমাইল গাজীর আবির্ভাব কাল পনর শতক বলে অনুমিত।[১] সুতরাং পনর-ষোল শতকের দিকে বাঙালীর নিজস্ব ভাবনা কল্পনা অনুযায়ী পটচিত্র অঙ্কিত ও প্রচারিত হয়েছিল। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

পটুয়াদের জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান করলেও এমতের সমর্থন পাওয়া যায়। গুরুসদয় দত্ত পটচিত্রকারের কাছ থেকে একটি কিংবদন্তী সংগ্রহ করে বলেছেন, পটুয়ারা বিশ্বকর্মার বংশধর, মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি আঁকলে তুলির অবমাননায় মহাদেব অভিশাপ দেন— 'তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাকগে।' সব জাতিরা একত্রে মহাদেবের কাছে জীবিকা সম্বন্ধে সাশ্রুনেত্রে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'তোরা হিন্দুও হবি না মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীত করবি আর হিন্দুর কর্ম করবি অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।' দত্ত মহাশয় পটুয়াদের কাছ থেকে শোনা উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সেই থেকে আমরা মুসলমানের মত নামাজ করি আর হিন্দুর দেবদেবতার ছবি আঁকি ও সেই

---

১. কিংবদন্তীতে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ইসমাইল গাজী পীর ছিলেন। ইসমাইল গাজী সুলতান বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক এবং তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি একাধারে ধর্মীয় নেতা অন্যধারে অকুতোভয় যোদ্ধাও ছিলেন। ইসমাইল গাজী সুলতানের নির্দেশে উড়িষ্যার অধিপতি ও কামরূপরাজ কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন ও জয় লাভ করেন।
Jadunath Sarkar—History of Bengal, Vol. 11. pp. 133-34
তাঁর বীরত্ব ও পীরত্ব নিয়ে 'গাজী-বিজয়' শেখ ফয়জুল্লাহ রচনা করেন। কবির আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে ডঃ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন। মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ৮৯

২. বিভিন্ন পেশাদার মুসলমানদের বর্ণনার সাথে একটি চরণে পটুয়াদের কথা আছে। চরণটি এরূপ 'পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে।' কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃঃ ৮৬

গান করি।'[১] এখানে মহাদেবের অংশটুকু কাল্পনিক, কিন্তু বাকী অংশ যেমন পটুয়ারা মুসলমানের মত নামাজ পড়ে হিন্দুর দেবদেবীর ছবি আঁকে ও গান গায় ইত্যাদি বিষয় মোটেই অসত্য নয়। মহাদেব যখন অভিশাপ দিচ্ছেন তখন মুসলমানরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে।[২] মুসলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধরা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করে। ডঃ দীনেশ সেনের মতে, চৌদ্দ শতকের দিকে ধর্মান্তরীকরণের পালা শেষ হয়।[৩]

এসব প্রামাণিক নিদর্শন থেকে বলা যায়. পালযুগে বৌদ্ধ মস্করীরা যে পটচিত্র ও পটগীতির প্রচলন করেছিল তা ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করে মুসলিম বিজয়ের পরে এদেশে লৌকিক সংস্কৃতি ও পৌরাণিক সংস্কৃতি সর্বসাধারণের কাছে মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা লাভের সময় হতে। পালরাজাদের মত মুসলমান সুলতানরা স্থানীয় সংস্কৃতির (লৌকিক ও অভিজাত উভয়ই) পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন।

'পট্ট' শব্দ থেকে 'পট' এসেছে। পট বা কাপড়ের উপর ধারাবাহিক চিত্র এঁকে লাঠির সহিত জড়িয়ে রেখে তা'ই ঘুরিয়ে একে একে ছবিগুলি দেখিয়ে পটুয়ারা ছড়া ও গানের ভেতর দিয়ে কাহিনী বিবৃত করে। পরবর্তীকালে কাগজ আবিষ্কৃত হলে তাতে ছবি আঁকা চালু হয়। কিন্তু পূর্বের পট নামটি অপরিবর্তিত থেকে যায়।

রঙ তুলির সাহায্যে পটে ছবি আঁকা হয়। বিষয় নির্বাচনে চিত্রকরের স্বাধীনতা না থাকলেও বড় কাহিনীর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচনের অধিকার আছে। এরূপ বিষয় নির্বাচন ও বস্তু উপকরণের দিক দিয়ে পটচিত্র আলপনার চেয়ে আর্টের অধিক মূল্য বহন করে। অধিকাংশ আলপনার স্থায়িত্ব তৎকালীন, পটচিত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। উপকরণ ও চিত্রণের দিক থেকে এরূপ সুযোগ লাভ করেও পটচিত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের

---

১. পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ১৮/—৫/০

২. কিংবদন্তীর অভিশাপ দাতা মহাদেব না হয়ে যদি কোন দলপতি হন তবে আর অস্বাভাবিকতা থাকে না। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' চিত্রকর জাতির উৎপত্তির কাহিনীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিশাপ দেওয়ার কথা আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দ্বাদশ শতকের রচনা। ঐ, পৃঃ ১।০

৩. Dinesh Chandra Sen—Folk Literature of Bengal, pp. 84-87

অধিকারী নয়। পটের অঙ্কনপদ্ধতি স্থূল, তুলির টানে সরল রেখায় অথবা বৃত্ত-রেখায় রঙের ঘনত্ব প্রায় সব জায়গায় সমান— তরল অথবা গাঢ় রঙের বিন্যাসে ছবির অবয়বে বাস্তবতা আনার চেষ্টা করা হয় না। ফলে পটচিত্রে স্থূল রেখার কায়া আছে, সূক্ষ্ম রঙের মায়া নেই। কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও ব্যবসায়বৃত্তিব নির্দিষ্টতার জন্য পটচিত্র যে পরিমাণ উদ্দেশ্য সাধিত করেছে, সে পরিমাণে সৌন্দর্যকলার সামগ্রী হতে পারেনি। পটচিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচক লিখেছেন, "ছবির মূল খসড়া একজন কারিগর তুলোট কাগজে কিংবা কাঠের পাটায় আঁকেন, তার উপর পর পর তিন চার জন তিন চারটে মাটির খুরিতে গোলা ভিন্ন ভিন্ন রঙ দিয়ে যান। এই রঙ দেওয়াটা প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ। এইভাবে ঘন্টা খানেকের মধ্যে একশো দেড়শো পট আঁকা হয়।"[১] স্পষ্টতঃ এখানে কলা-সাধনার একক মানসক্রিয়ার সৃষ্টিশীল অবকাশ নেই, এ অনেকটা যান্ত্রিক উপায়ে ঢালাই সৃষ্টি। পুরুষে পুরুষে প্রচলিত বৈচিত্র্যহীন পটচিত্রে তাই গোষ্ঠীশিল্পের প্রাধান্য আছে, ব্যক্তিশিল্পের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বর্ণসম্পাতের চিহ্ন কম। পটুয়ারা কোন মডেল সামনে রেখে আঁকে না। ফলে তাদের ছবি ভঙ্গিসর্বস্ব ও গতানুগতিক হয়। এই লোক প্রচলিত ভঙ্গিসর্বস্বতা এবং গতানুগতিকতার জন্য পটচিত্র ব্যক্তির খসড়া হয়েও লোকচিত্রের গুণধর্ম লাভ করেছে।

বাংলায় দু'রকমের পটচিত্র প্রচলিত। গুরুসদয় দত্ত এগুলির নাম করেছেন একচিত্র বা 'চৌকাপট' এবং বহুচিত্র বা 'দীর্ঘপট'।[২] কালিঘাটের পটচিত্র প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র। মানুষ, গরু, বাঘ, পাখি প্রভৃতি এতে চিত্রিত হয়। কালিঘাটের পটের সমসাময়িক কালের নরনারীর চিত্র কোনটি ব্যঙ্গাত্মক, কোনটি ভাবাত্মক, কোনটি অশ্লীল ভঙ্গিময়। ডক্টর সেন 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে এরূপ কয়েকটি ছবির রেখাচিত্র দিয়েছেন। কয়েকটি ছবির পাদনাম— নিদ্রিতা, নর্তকী, স্বামী-স্ত্রী, নায়িকা, বৈষ্ণব-ব্যঙ্গচিত্র, বীণাবাদিকা, তবলা-বাদিকা, চুল-আঁচড়ানো, দুল-পরা, তাম্রকূট সেবিনী ইত্যাদি। চিত্রগুলির রেখা বিন্যাস সরল ও সবল, সর্বত্র একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি আছে। এগুলি পটুয়াদের অনায়াস সৃষ্টি হলেও অর্থহীন সৃষ্টি নয়।

১. বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৪-১৫
২. পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ॥৶-৸০

পাদনামের সহিত চিত্রগুলিতে অর্থজ্ঞাপক ভঙ্গি আছে। দীনেশ বাবুর মতে, কালিঘাটের চৌকাপটে ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব পড়েছে।[১] বস্তুতঃ এগুলি আঠার উনিশ শতকের ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাবে দেশীয় রীতির সংকর-বিন্যাস।

ধর্মপট অনেকগুলি চিত্রের সমন্বয়ে একটা কাহিনীর ধারাবাহিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। লাঠিতে জড়ান এ পটচিত্রেই প্রকৃতপক্ষে খাঁটি বাঙালীর চিত্ররীতির নিদর্শন আছে। এ ধরনের পট বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত। দত্ত মহাশয় বীরভূম, মুর্শিদাবাদের পটচিত্রের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দিয়েছেন আট-দশ হাত থেকে বিশ-পঁচিশ হাত। তাঁর মতে, লম্বা কাগজেব উপর এ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হয়।[২]

উপরের দু'টি ভাগ ছাড়া 'পঞ্চকল্যাণী পট' নামে মিশ্র বিষয়ক পটের কথা বলেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। এগুলি কোন বিশেষ দেবদেবীর লীলা নিয়ে অঙ্কিত নয়, বিভিন্ন দেবদেবীর এক এক লীলা এগুলিতে অঙ্কিত থাকে। এর রচয়িতা পেশাদার পটুয়ারা নয়; গ্রামের কুমাররা মাটির পাত্রে এগুলি এঁকে থাকে। পূর্ববঙ্গে এ শ্রেণীর পট প্রচলিত আছে।[৩] আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব টাঙ্গাইল অঞ্চলে মাটির বৃত্তাকার থালায় এ শ্রেণীব পট অঙ্কিত দেখেছেন বলে তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন।[৪] পূর্ব ময়মনসিংহে পটচিত্র দেখিয়ে ও পটগীতি গেয়ে পটুয়াদের জীবিকার্জনের কথা প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পটগীতির এরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

দেখ ভঙ্গি বাঁকা—
দেখ ভঙ্গি বাঁকা রাখাল সখা কদম্ব তলায়
বাজায়ে মোহন বাঁশী গোপীর মন ভুলায়।
দেখ কুটনা বুড়ী—

---

১. বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪৪৮

২. পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ৸০
চিত্র সংখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দশ-পনরর অধিক হয় না। দত্ত মহাশয় তাঁর গ্রন্থে যেসব পটগীতি সংকলিত করেছেন তাতে মোটামুটিভাবে উক্ত সংখ্যাই পাওয়া যায়।

৩. বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০

৪. লোক সাহিত্য, পৃঃ ৩৩৪

দেখ কুটনা বুড়ী জটলা করি কুমন্ত্রণা দিয়া
শ্যামের সঙ্গে গোপন পীরিত দিয়াছে ঘটাইয়া।
দেখ কাল ননদী—
দেখ কাল ননদী হারামজাদি কুলের কুলবালা
(বলে) দেখ গো দাদা তোর রাধা গিয়াছে জঙ্গলা।
শ্যামের সঙ্গে পীরিত করে গলায় দিছে মালা।[১]

এখানে একই কাহিনীর তিনটি স্বতন্ত্র চিত্রের বাণীরূপ পাওয়া যায়—কৃষ্ণ, কুটনী-বুড়ি ও ননদী। পটুয়ারা চিত্র দেখে দেখে ঐরূপ গান করে।

একমাত্র 'গাজীর পটে' কিছুটা মুসলমানী ভাব আছে। গাজীপীর বাঘের দেবতা। গাজীর পট পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'গাজীর জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে ছবি এঁকেছে পটুয়া তার গাজীর পটে। সে পট লাঠির আগায় মানচিত্রের মত ঝুলিয়ে পয়ারের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়ে ফিরেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মজলিসে। সরল গ্রামবাসী তা উপভোগ করেছে কখনো বেদনায় বিগলিত হয়ে, কখনো আনন্দ কলরোলে, আবার কখনো শিহরিত রোমাঞ্চিত হয়ে।'[২] এখানে গাজীর পট দেখানোর রীতি এবং গ্রামবাসীর মনে এর রসগত প্রভাবের কথা পাওয়া যায়। গাজীর অলৌকিক কাহিনী নিয়ে পট আঁকার উল্লেখ থাকলেও তিনি ছবিগুলির বর্ণনা দেননি। প্রফুল্ল বাবু পূর্ববঙ্গের গাজীর পট নাচানোর বর্ণনায় এক স্থানে একটি চিত্রের উল্লেখ করেছেন, 'গাজী সাহেব ব্যাঘ্রের উপর সমাসীন ও চারিদিকে উর্দ্ধপুচ্ছ ব্যাঘ্রাদির পলায়ন।'[৩] অন্যত্র তিনি গাজী কালুর পটসম্পর্কিত একটি গানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন,

দেওয়ান কোন গুণে তরাইয়া লও ভাই গাজীর নামে।
গাজী কালু দুই ভাই আড়াঙ্গি উড়াইল।
জঙ্গলার যত বাঘ দৌড়িয়া পলাইল।

১. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৫০
২. তোফায়েল আহমদ—আমাদের লোকশিল্পের রূপরেখা, মাহে-নও, চৈত্র, ১৩৭২, পৃঃ ৯৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০

একী বাঘ, নেকী বাঘ, চোখ পাকাইয়া চায়।
সুন্দব-বন্যা বাঘটায় বৈরাগী লইয়া যায়।
গোয়ালার মায় বুলে হায়রে হায়।
কাল গাইয়ের ধলা বাছুর বাঘে লইয়া যায়।
গোয়ালার মায় বুলে কোমর ভাঙ্গা বুড়ী।
বাঘ মাবিতে লইয়া যায় দোয়ার-বান্ধা লরী।[১]

উক্তিটির মধ্যে পটের চারটি স্বতন্ত্র কথাচিত্র পাওয়া যায়। এক: বাঘের উপর উপবিষ্ট গাজী কালু; দুই: পলায়নরত বাঘের দল; তিন: সুন্দর-বন্যা বাঘেব বৈরাগী ও বাছুর শিকার; চার: বাঘ মারতে বুড়ীর পশ্চাৎ ধাবন। কথাচিত্রেব বর্ণনা থেকে চিত্রবস্তুর পরিচয় পেলেও চিত্রসৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে 'গাজীর পট' পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন, তাতে পাগড়ি পরিহিত শ্মশ্রুধারী ব্যাঘ্রোপবিষ্ট গাজীর মানবমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ব্যাঘ্রটি উর্দ্ধপুচ্ছ। সম্মুখে একজন পরিচারিকা, পশ্চাতে একজন পরিচাবক। পটের মূল অংশেব সহিত ক্ষুদ্রাকার আরও অনেক চিত্র আছে— মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী, বাঘের কবলে গরু, মুগুরধারী দক্ষিণ রায় প্রভৃতি।[২] চিত্রগুলিকে বঙে-রেখায় স্পষ্ট ও ভাবে-ভঙ্গিতে জীবন্ত করে আঁকা হয়েছে। নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত প্রায় অনুরূপ একটি পটচিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৩]

আশরাফ 'সিদ্দিকী কারবালার যুদ্ধ শিবির' ও 'বিবি সোনাভান' প্রভৃতি পটের কথা বলেছেন। পুঁথিকাব্যের প্রভাবে বচিত বিবি সোনা-ভানের পটগীতির অংশ বিশেষ তিনি উল্লেখ করেছেন। যথা,

এই দেখেন সাহেব সকল বিবি সোনাভান।
ঘোড়ায় চাপিয়া বিবি জঙ্গ কইরতে যান।
যখন নাকি জঙ্গের ঘোড়ায় চাবুক পড়িল।
শূন্যে উড়াল দিয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিল॥[৪]

১. ঐ, পৃঃ ৫২
২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০০
৩. গ্রন্থের 'লৌকিক পীরবাদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য
৪. লোক সাহিত্য, পৃঃ ৩৩৫

পটগীতি থেকে পটচিত্রের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়—অর্থাৎ ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে সোনাভান যুদ্ধে চলেছে, তার হাতে চাবুক, তা দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করছে সে। ঘোড়ার ভঙ্গিও বেগবান। সবকিছু মিলিয়ে ছবিটি সজীব ও গতিশীল।

পটগীতি ও পটচিত্র শিল্পকলার অভিন্ন আত্মা— পটগীতিতে যা বাঙ্ময় পটচিত্রে তা'ই রূপময়। বহির্জগতের সহিত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে বাংলার গ্রামবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে এরই সাহায্যে চিত্ররসপিপাসা নিবৃত্ত করেছে।

মুখোশচিত্র

বাঙালীর লোকজীবনে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে মুখোশ পরে বা সঙ সেজে নৃত্য, অভিনয় করার রীতি আছে। মুখোশে ও সঙের সাজে লোকায়ত চিত্রেব আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় মুখোশনৃত্যে দেবদেবীর রূপাকৃতির মুখোশ পরা হয়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবে যে শিবনৃত্য ও কালীনৃত্য করে তাতে শিব ও কালীর প্রচলিত মূর্তির অনুকরণে মুখোশ তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নাচে। কাঠেব ফ্রেমে কাপড় জড়িয়ে মাটি দিয়ে লেপে তার উপর রঙের ছোপ দিয়ে শিবের মুখাবয়ব চিত্রিত করা হয়। কালীনাচের মুখোশে একটি কাঠের খোলে কালীদেবীর মূর্তির আকার দেওয়া হয়। তারপর রঙে রেখায় তাকে বাস্তবায়িত করা হয়। সমস্ত মুখমণ্ডল নীল রঙে রঞ্জিত, চোখে ও মণিতে সাদা ও কালরঙ, খোলের সহিত জড়ানো জিহ্বাকৃতির কাঠটি রক্ত-রঞ্জিত।[১] 'বুড়াবুড়ি' নাচের মুখোশ গঠনে ও চিত্রণে বুড়া ও বুড়ির স্বতন্ত্র ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। এটি দ্বৈত নাচ, একটি মুখোশে বৃদ্ধের অপরটিতে বৃদ্ধার মুখচ্ছবি থাকে।[২] এসব নৃত্যানুষ্ঠানে গ্রামের বেহারা, মালি, ছুতার ও কৈবর্তরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।[৩]

---

১. G. S. Dutt—Mask Dance of Mymensingh, Modern Review, August, 1939, pp. 219-20

২. Ibid, p. 222

৩. Ibid, p. 218

লৌকিক আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে সঙ সাজার রীতি আছে। বহুরূপীরা জীবজন্তুর সঙ পরে রঙ্গকৌতুক করে থাকে।[১] বিচিত্র পোশাক পরে ও অঙ্গ চিত্রিত করে সঙ সাজা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘোড়ার সঙ সেজে 'ঘোড়ানাচ' হয়।

পৃথিবীর নানা জাতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মুখোশ পরে। বিশেষজ্ঞগণ ছ'টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যথা,

এক : মুখোশের সাহায্যে বীর্যভাব, করুণভাব বা সম্মোহভাব ফুটিয়ে তোলা ;

দুই : নারীর ঋতুপ্রাপ্তি অথবা কৃষিসংক্রান্ত আচারে বীভৎস মুখোশ পরে প্রেতাত্মার প্রভাব দূর করা ;

তিন : শিকার, শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্যকারী আত্মার প্রতিকৃতির মুখোশ পরা ;

চার : টোটেম সমাজে নিজস্ব মুখোশ পরে গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ;

পাঁচ : ভীতি ও বীভৎসতার মুখোশ পরে ব্যাধি দূর করা ;

ছয় : আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে রঙ্গকৌতুকের মুখোশ পরা।[২]

স্পষ্টত: এসব উদ্দেশ্যে মুখোশ পরার মধ্যে আদিম মনোভাবের পরিচয় আছে। ভয়ঙ্কর মুখোশ পরে প্রেতাত্মার প্রভাব দূর অথবা সম আকৃতির মুখোশ পরে অভিন্নতা রক্ষা করার মধ্যে যথাক্রমে বিপরীত যাদুবিশ্বাস ও সম-প্রক্রিয়ার যাদুবিশ্বাসের ধর্ম আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূলের 'শামন' অধিবাসীদের ওঝা চিকিৎসার সময় মুখোশ পরিধান করে। 'সিরওয়ান' জাতির ছোট ছোট ছেলেরা বছরে প্রথম বজ্রধ্বনি শুনলে চামড়ার তৈরি বজ্রপাখির মুখোশ পরে দেবতাকে আহ্বান জানায়।[৩]

---

১. শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে বহুরূপী শ্রীনাথের কথা আছে। সে বারাসতের অধিবাসী। বহুরূপীর সং সেজে রঙ্গকৌতুক দেখিয়ে সে সারা বছরের অন্ন জোগাড় করে।

২. Maria Leach (ed)—Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, Vol. II, p. 685

৩. Ibid, pp. 684-85

দারুচিত্র

কাঠ বা দারুর উপর অঙ্কিত চিত্রকে 'দারুচিত্র' বলা হয়। এতে রঙ-তুলির ক্রিয়া নেই, হাতুড়ি-বাটালির সাহায্যে কাঠ কেটে কেটে ছবি তোলা হয়। গ্রামের ছুতার মিস্ত্রীরা এরূপ নকশা বা চিত্রের কাজ করে থাকে। লোকজীবনে নিত্য ব্যবহারের সামগ্রীতে ছবি অঙ্কিত হয়েছে, যেমন কপাট, চৌকাঠ, খিলান, কড়িকাঠ, পালংখাট, বাতির গাছা, হুকার নল, ছুরির বাঁট, পুতুল, বাক্স, সিন্দুক, কৌটা, বাদ্যযন্ত্রের খোল, কোরানের জেহেল, পাণ্ডুলিপির পাট, পাল্কীর ডোলা, নৌকা প্রভৃতি। এগুলির প্রত্যেকটির ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। কপাট, চৌকাঠ, কড়িকাঠ প্রভৃতি ঘর তৈরি করার উপকরণ। এ গুলিতে ফুল, লতাপাতা অঙ্কিত হতে দেখা যায়। চৌকাঠ ও কড়িকাঠ আকারে লম্বা হয় বলে স্বাভাবিকভাবে তরঙ্গিত পুষ্পিতলতা অঙ্কিত হয়। দরজা ও কপাটের পাল্লায় থাকে পদ্মাদি ফুল ও জ্যামিতিক ছক।

বাদ্যযন্ত্রের খোলে মানুষের মূর্তি, পশু-পাখির ছবি, লতাপাতার চিত্র দেখা যায়। ময়ূর, মাছ, হাতী, মকর ইত্যাদি ছবিগুলি পূর্ণায়ত মূর্তির (space art) নমুনা। নিছক সৌন্দর্য সাধনা হল এরূপ মূর্তি রচনার মৌলিক প্রেরণা।[১]

বাহন হিসেবে পাল্কীর ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র প্রচলিত। বিয়ের অনুষ্ঠানে পাল্কীর ব্যবহার আভিজাত্যের পরিচায়ক। পল্লীর কাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা পাল্কী বহন করে। পাল্কীর ডোলাটা বাইরের দিক থেকে চিত্রিত থাকে। এতে লোকচিত্রের সাধারণ ছবি ফুলপাতা, লতা-গাছ, পশুপাখি এবং দেবদেবীর অবয়ব অঙ্কিত হয়।

নদীমাতৃক দেশে নৌকা যানবাহনের অন্যতম উপায়। বহু প্রাচীন কাল থেকে বাঙালী নৌকার ব্যবহার করে আসছে। 'ডোঙ্গা' অস্ট্রিক ভাষার শব্দ।[২] প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি উৎস থেকে নৌকার বিবিধ নাম পাওয়া যায়। যেমন,

১. বাংলা একাডেমী শিল্প সংগ্রহে একটি দোতারার কাঠের খোলে মানুষের মুখাবয়ব আছে, অগ্রভাগে আছে হাতীর মুখমণ্ডল। একটি সারিন্দার খোলের মাথায় টিয়ার ছবি আছে।

২. ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ— বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৬৬

মধুকর, রাজবল্লভ, রাজহংস, শঙ্খচূর, উদয়তারা, রত্নপতি, ময়ূরপঙ্খী, কাজল রেখা, গুয়ারেখী, টিয়াঠুঁটি বিজুসিজু প্রভৃতি।[১] এছাড়া বজরা, পানসি, পতেলা, সাম্পান, বালাম, জেলিয়া, কোশ, ভাওয়ালী, পাবেন্দা, গোধু ইত্যাদি নামে নৌকার ব্যবহার প্রাচীন কালে ছিল। কোন কোনটি আজও আছে। নৌকার বিচিত্র নামই প্রমাণ করে নৌশিল্পে বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার গড়ন ময়ূরের আকৃতির মত। নৌকার সম্মুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগের গঠনে ময়ূরের রূপটা ফুটিয়ে তোলা হয়। এরূপ রাজহংসী নৌকায় রাজহাঁসের আকৃতি, টিয়াঠুঁটি নৌকায় টিয়ার ঠোঁটের আকৃতি দেওয়া হয়। গোধু নৌকার সম্মুখভাব মকরের মত এবং তলদেশ অর্ধচন্দ্রের মত।[২] কাঠ কেটে জোড়া দিয়ে নৌকা তৈরি করা হয়। অতএব নৌকা আদর্শায়ন চিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গচিত্র

অঙ্গচিত্র শিল্পকলার কোন নির্দিষ্ট বিভাগ নয়, দেহ চিত্রশোভিত করা হয় প্রসাধনচর্চার অঙ্গ হিসেবেই। নারীর কপালে টিপ, চোখে কাজল, হাত-পা-নখে আলতা বা মেহেদীর লেপন প্রসাধনক্রিয়ারই অঙ্গ। প্রসাধন তথা রূপচর্চাভিলাসে বয়স্ক পুরুষ 'খেজাব' দিয়ে শ্মশ্রু রঞ্জিত করে।[৩] কতক অঙ্গরঞ্জনে সম্প্রদায়ভেদে ধর্মীয় সংস্কার আছে। হিন্দু বিবাহিতা নারীর সিন্দুররঞ্জিত 'সীমন্তরেখা' সৌভাগ্যের চিহ্ন। ভাই এর কপালে 'ভাই-ফোঁটা' স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার চিহ্ন।[৪] অষ্টাঙ্গে 'তিলকরেখা' বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্রতার চিহ্ন।[৫] এসব অঙ্গ শোভায় বস্তুর কোন প্রতীক ফুটে

---

১. তোফায়েল আহমদ— আমাদের প্রাচীনশিল্প, পৃঃ ৮১

২. Dr. Dinesh Chandra Sen (ed.) Eastern Bengal Ballads of Mymensingh, Vol. 1, Part. I, p. xc (a).

৩. খেজাব শব্দ আরবী خزب থেকে আগত। বলা বাহুল্য, এটি মুসলমান অভিজাত সমাজে প্রচলিত।

৪. যম-দোয়ারে দিয়া কাঁটা
ভাই-দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।

হিন্দু সমাজে ভাই-ফোঁটার ব্রতে বোন ভাই-এর কপালে চন্দন ও আবির দিয়ে ভাই-ফোঁটা দেয়। ব্রত ও আচার, পৃঃ ৩৮

৫. চন্দন ও মাটি দিয়ে তিলক দেওয়া হয়।

উঠে না। কেবল প্রথাবদ্ধভাবে রেখার টান অথবা রঙের ছোপ আছে। রঙে রেখায় বস্তুর মানসাভিব্যক্তির মধ্যেই যথার্থ চিত্রকলার নিদর্শন আছে। তথাপি অনুষ্ঠান ও উপলক্ষ ভেদে আলতা, কাজল, কুমকুম, চন্দন, সুরমা, মেহেদী প্রভৃতি উপকরণে কোন কোন অঙ্গরঞ্জন অঙ্গচিত্রে পরিণত হয়। বিয়ের উৎসবে 'কনে-চন্দনে' চন্দনগুঁড়ার ফোঁটা দিয়ে কনের কপালে ও কপোলে যে পেঁচানো রেখার খিলান দেওয়া হয় তাতে চিত্রাভাস রয়েছে। লাল রঙের টিপটি হয় পূর্ণচন্দ্রের[১] মত অথবা তারার মত, কখনও লম্বা রেখাও অঙ্কিত হয়। কনে-চন্দনের চিত্রের প্রশংসা করে দীনেশ সেন লিখেছেন, ''কনের কপালে অগুরু চন্দন দিয়া অতি সূক্ষ্ম খড়কের দ্বারা কত চারুশিল্পের অবতারণা করিতেন— কনের মুখখানির ঊর্ধ্বে সেই শিল্পের বর্ণ ঝলমল করিয়া তাহার লাবণ্য অশেষ রূপে বাড়াইয়া দিত।''[২] হিন্দু-সমাজে বিয়ের দিন কনের কপালে তেল-সিন্দূরের 'গাছ-ফোঁটা' দেওয়া হয়। এর আকৃতি তিন শাখার গাছ বা ত্রিশূলের মত। মুসলমানেব ঘরে বিয়েতে মেহেদী দিয়ে বর-কনে করতল ও করপৃষ্ঠ চিত্রিত করে। চূণ-গোলা পানি দিয়ে কাঠির সাহায্যে প্রথমে ছবি আঁকা হয়। পরে বাঁটা মেহেদী লাগিয়ে দেয়। চুনের স্থানে মেহেদীর রঙ লাগে না। চুন ব্যবহার না করেও বাঁটা মেহেদীর গোলা রসে কাঠি দিয়ে চিত্র আঁকা হয়। করতলে পদ্ম, গোলাপ ফুল, আরবী লিখন অথবা জ্যামিতিক নকশা আঁকতে দেখা যায়; করপৃষ্ঠে মণিবন্ধ থেকে অঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত সরল রেখা অথবা লতাপাতা আঁকা হয়। নারীর বক্ষদেশও চিত্রশোভিত করা হয়।

রমণীর খোঁপা বাঁধার মধ্যে শিল্পকলার নিদর্শন আছে। কেশবিন্যাস, বেণীবন্ধন ও কবরীরচনায় বাহ্য বস্তুর আকৃতি ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্ত আছে 'গোপীচন্দ্রের গানে' নটীর সা স্জার বর্ণনায়। এখানে চার

---

১. 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' (সুকুর মামুদ রচিত) নটিনী সিন্দুরের যে টিপ পরেছে তাকে প্রভাত সূর্যের সহিত তুলনা করা হয়েছে:

কামসিন্দুরের ফোঁটা দিলেন কপালে।
উদিত দিনকর যেন বিহানের কালে॥

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ৪১১

২. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪২৩

প্রকার খোঁপার নাম পাওয়া যায়, যথা 'ট্যাংরা', 'চ্যাং আর ব্যাং', 'নাটি আর নটী' এবং 'গুনজরি ভোমরা'। পাঠান্তরে খোঁপার আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়— 'সরুআর ডাল,' 'হুনি', 'ঢালা'। সরু আর ডাল নামক খোঁপায় আছে 'ফুলের ঝাড়, স্বর্গের তারা ও গুনজরি ভোমরা।' হুনি খোঁপা দেখতে 'বাঙ্গাল গাইয়ার টুনির মত।' ঢালা খোঁপায় 'আলোআখোআর মেলা' চিত্রিত হয়েছে।[১] দীনেশ সেন অন্য অনেক রকম খোঁপার নাম করেছেন, যথা গুয়াঠুঁটি, মুটকী, ঝুটকী, বিউনী, টিয়াপাখি, সিঁথিকাটা, প্রজাপতি, চূড়খোঁপা ইত্যাদি।[২] খোঁপাগুলি মানুষ, পাখি, পতঙ্গ ও নানা বস্তুর প্রতিকৃতি। চুলের সাহায্যে এসব ছবি ফুটিয়ে তোলা অল্প কৃতিত্বের বিষয় নয়; এতে বেশ ধৈর্য, সংযম, সাধনার পরিচয় আছে। অনেক খোঁপার নাম দেশজ। বেণীর ফাঁস দিয়ে কাঁটা ও ফিতার সাহায্যে এঁটে খোঁপা বাঁধা হয়।

অঙ্গে উল্কির ছাপ যথার্থ চিত্রের ধর্ম বহন করে। অন্য অঙ্গচিত্র ক্ষণস্থায়ী হয়, কিন্তু উল্কি দেহে আমরণ থেকে যায়। পৃথিবীর প্রায় আদিম লোকসমাজে উল্কি পরার রেওয়াজ আছে। কোন কোন উচ্চ সমাজের লোকের মধ্যেও উল্কির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন কালে সাধারণতঃ ধর্ম, সৌন্দর্য, যৌন, চিকিৎসা, সংবাদ, আত্ম-রক্ষা প্রভৃতি কারণে উল্কি পরা হত। ছোটনাগপুরের ধানওয়ার জাতির মেয়েরা মনে করে, উল্কির চিহ্ন মৃত্যুর পরও আত্মার সঙ্গে থেকে যায়— ঈশ্বরকে উল্কির পবিত্র চিহ্ন দেখিয়ে তারা মুক্তি পাবে। ভারতীয় হিন্দুদের বিশ্বাস, তারা পরলোকে উল্কি-রূপ অলংকার বিক্রি করে স্বর্গে যেতে পারবে। আফ্রিকার ইকোই জাতির মেয়েরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর তারা উল্কির দাগের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের অভিন্নতা সম্পাদনের জন্য ইজিপ্টের লোকেরা বুকে ও বাহুতে দেবতার নাম অথবা প্রতীকের উল্কি দেয়।[৩]

---

১. গোপীচন্দ্রের গান. পৃঃ ২১৮-১৯
খোঁপাগুলির বর্ণনায় অতিরঞ্জন অনেক। তবে সর্বাংশে মিথ্যা নয়, কোন কোনটি খোঁপার রূপ বাস্তব হতে পারে, যেমন চ্যাং ব্যাং, ভ্রমর, টোনা, তারা ইত্যাদি।

২. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৯২

৩. James Hestings (ed.)-Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol. XII, pp. 208, 211

কতক জাতি উল্কির ঐন্দ্রজালিক গুণে বিশ্বাস করে, যা আপদ-বিপদ থেকে আত্মরক্ষা এবং রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার কাজে সাহায্য করে। বোর্নিও প্রদেশের কায়ান জাতির লোকেরা হাতের মণিবন্ধে 'লুকুত' নামে এক প্রকার উল্কি পরে, এতে অসুখ বিসুখ হয় না। আইনু মেয়েরা ঠোঁটে ও বাহুতে উল্কি পরে ব্যাধির প্রেতাত্মাকে দূরে রাখার জন্য।[১] কোন কোন আদিবাসীরা মনে করে, উল্কি তাদের গোষ্ঠীর পরিচয়বাহী চিহ্ন। আফ্রিকার মাওরি জাতির লোকেরা কানের নীচে তাদের নিজস্ব চিহ্ন আঁকে। এ দিয়ে তারা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে। প্রাচীন থ্রেসিয়ান রমণীরা উল্কি পরতো নিজেদের আভিজাত্য রক্ষার জন্য। নিউজিল্যাণ্ডের মেয়েরা গায়ে উল্কি পরে তাদের বিবাহিত জীবনের মর্যাদা জ্ঞাপন করে। সামোয়া দ্বীপের পুরুষেরা উল্কি না পরলে সভা সমিতিতে কথা বলার অধিকার পায় না।[২]

উল্কি পরার পেছনে সৌন্দর্য সাধনারও একটি দিক আছে। আদিম নরনারী পরস্পরকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উল্কির বিচিত্র রঙিন চিত্রে দেহ শোভিত করত বলে যৌনবিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্ক অভিমত পোষণ করেন। জার্মান নৃতত্ত্ববিদ উণ্ডের মতে, উল্কি শুরুতে প্রেতাত্মার কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য লোকে ধারণ করত, পরে দেহসজ্জার প্রসাধনে পরিণত হয়।[৩] নিউজিল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, ক্যারোলাইন দ্বীপ, ব্রিটিশ নিউগিনির অধিবাসীরা দেহের প্রসাধন স্বরূপ উল্কির অলংকার পরে থাকে। তাদের মধ্যে ক্যারোলাইন ও নিউগিনির লোকেরা সমস্ত দেহকেই চিত্রিত করে। নিউজিল্যাণ্ডের পুরুষেরা কপালে, চোখের নীচে, নাকে, চিবুকে তথা সমস্ত মুখমণ্ডলে উল্কির ছাপ পড়ে।[৪]

টোটেম গোষ্ঠির লোকেরা তাদের স্ব স্ব টোটেমের উল্কি পরে। সাধারণভাবে মানবমূর্তি, পশু, ফুল, তারা, জ্যামিতিক ছক তাদের উল্কির চিত্রবস্তু। ইউরোপের নাবিকেরা হাতে নোঙর ও জাহাজের উল্কি আঁকে।[৫]

---

১. Ibid, p. 212
২. Ibid. pp. 208, 211
৩. Ibid, p. 213
৪. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩০৮, পৃঃ ১২৭
৫. ঐ, পৃঃ ১২৭

বাংলাদেশে বৈরাগীরা উল্কি পরে। তাদের উল্কিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ছাড়া জ্যামিতিক নকশাও থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবদেবীর মূর্তি ও ফুল, লতাপাতা এঁকে থাকে।[১]

বাংলার বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা উল্কি দেয়। সাঁওতাল, ওরাঁও ও মুরিয়ারা গোত্রধর্ম, গোত্রমর্যাদা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যজ্ঞানে অনুষ্ঠান সহকারে তাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে উল্কি দেয়। উল্কি আঁকার কাজে তাদের পেশাদার ওঝা আছে। ওরাঁওরা সাপ, সূর্য, পাখি ও বৃত্ত আঁকে।[২]

দেহের পেশীবহুল অংশের চর্মে কাঁটা বা সুচ দ্বারা বিদ্ধ করে ও ক্ষতস্থানে রঙ লাগিয়ে উল্কি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে উল্কি আঁকার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "প্রাচীন কালে রমণীরা সূচাগ্র দ্বারা গাত্রচর্ম নানা আকারে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে কেশুতিয়া পাতার রস দিত। ক্ষত শুকাইলে উহা একপ্রকার নীলাভ হরিৎ বর্ণের রেখার মত দেখা যাইত।"[৩] আফ্রিকার ম্যাকোয়া অধিবাসীরা কয়লা দিয়ে উল্কির রঙ করে, এতে চর্মে নীলাভ রঙ ফুটে উঠে। জাপানের মেয়েরা এক প্রকার গাছের ছাল পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগায়। এতে নীল-কাল রঙ উৎপন্ন হয়। এস্কিমোরা ভষা দিয়ে কাল রঙের উল্কি দেয়।[৪]

---

১. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত— বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫৯৮
২. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ২৯১-৯২, ৩৪৬-৪৭
৩. ঐ, পৃঃ ৫৯৮
৪. Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol. VII, pp. 209-10.

তৃতীয় অধ্যায়

লোকনৃত্য

নৃত্য দৈহিক গতিভঙ্গিমা। তবে ব্যবহারিক জীবনের নিত্যকার গতিভঙ্গিমা মাত্র নয়, এতে ছন্দ আছে, সংযম আছে। বাস্তব জীবন ক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিকতার স্পর্শমুক্ত যদি না হত তবে নৃত্য শিল্পমর্যাদা লাভ করত না; আর তাতে অবসর বিনোদনের আনন্দলোক রচিত হত না। নৃত্যে দৈনন্দিন জীবনের খেয়ালসর্বস্বতা থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশেষ রূপাঙ্গিকতা আছে। ছন্দ সংযম আনে। নৃত্যে ছন্দ ও সংযম বেশ আয়াসসাধ্য; ক্লাসিক নৃত্যের অঙ্গভঙ্গির কৌশল সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। কৃত্রিম ভঙ্গিসর্বস্বতা লোক-অভ্যাসে কম। এজন্য লোকনৃত্যের অঙ্গকৌশল দুঃসাধ্যব্রত নয়।

ক্লাসিক নৃত্যের তুলনায় লোকনৃত্যে যে সংযম ও ছন্দের অভাব আছে তার বড় প্রমাণ হল, এতে মুদ্রার ব্যবহার নেই। মুদ্রাবিন্যাসের দ্বারা বিভিন্ন অঙ্গের কৌশলগত প্রকাশভঙ্গিতে ক্লাসিক বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের সৌন্দর্যমহিমা নিহিত। শাস্ত্রকারের মতে 'জবত্ব, স্থিরতা, রেখা, ভ্রামণী, দৃষ্টি, অশ্রান্তি, প্রীতি, মেধা, বাক্য ও গীত এই দশ প্রাণপ্রতীক তাল-মান-লয়াশ্রিত সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ' শাস্ত্রীয় নাচের বৈশিষ্ট্য।[১] লোকনৃত্যে এগুলি অনুপস্থিত নয়, কিন্তু অমার্জিতরূপে এবং অনিয়ন্ত্রিতরূপে লোক-জীবনের চিহ্ন নিয়ে বিরাজমান। অঙ্গভঙ্গির সূক্ষ্ম কলাকৌশলের চেয়ে দেহের স্থূল গতিবিধিতে লোকনৃত্য অধিক সীমাবদ্ধ। এজন্য ক্লাসিক নৃত্যের মত লৌকিক নৃত্যে অনমনীয় কোন পদ্ধতি গড়ে উঠে না। ক্লাসিক নৃত্য লোকে শিখে নাচে, লৌকিক নৃত্য নেচে শিখে।

শ্রেণীভেদে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি একটি অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ ও সীমিত বস্ত্রে সম্পন্ন হয়। নৃত্যবিশেষে নির্দিষ্ট সজ্জা ও ভূষণের অভাব বা পরিবর্তন

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত— জ্ঞানভারতী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫

হলে শাস্ত্রীয় নাচের অঙ্গহানি ঘটে ; পোশাকের যুগোপযোগী পরিবর্তন কিংবা অভাবে অসঙ্গতি লোকরুচির অপূর্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না।

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত ও সংযোগ নৃত্যানুষ্ঠানের ভূষণ স্বরূপ। যন্ত্রসঙ্গত নৃত্যছন্দকে গতি ও স্বচ্ছন্দতা দান করে। যন্ত্রের যাদুস্পর্শে নৃত্যস্পন্দন পার্থিবতার আসঙ্গ ছেড়ে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরসের মূর্তি ধারণ করে।

ক্লাসিক নৃত্যের ঐশ্বর্য অনুপাতে বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় ; কিন্তু আড়ম্বরহীন লোকনৃত্যে তালযন্ত্রের ব্যবহার অল্প। দেশজ ঢাক-ঢোল-কাঁসি একটি সাধারণ উপকরণ। বাংলার কোন কোন নাচে বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন একতারা যোগে বাউল নাচ, খোল-করতাল নিয়ে কীর্তননাচ, তুবড়ির সাহায্যে সর্পনাচ প্রভৃতি। কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কেবল হাততালি দিয়ে জারিনাচ, ডালানাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা লোকনৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা কণ্ঠসঙ্গীত যোগে সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ নাচ গানের সাথে সাথে পরিবেশিত হয়। বাউল, জারি, কীর্তন প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠানে গান ও নাচ অবিভাজ্য অঙ্গ। বাউলরা গান করতে করতে নাচে, বৈষ্ণবরা নাচতে নাচতে কীর্তন করে। মুসলমান শিয়ারা মর্সিয়া গাইতে গাইতে জারিনাচ নাচে। এতে একদিকে যন্ত্রসঙ্গীতের অভাব থাকলে তা দূর হয়, অন্যদিকে সমস্ত পরিবেশটা অধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠে। নৃত্য দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সঙ্গীতসহযোগে নৃত্য অধিক চিত্তাকর্ষক হয়।

নাচের সঙ্গে গান আধুনিক শহরের নৃত্যানুষ্ঠানে দেখা যায়। অপেরা বা গীতিনাট্যে নেপথ্য গানের সাথে নাচও চলে। কিন্তু লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। শহরের উচ্চকলায় গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি নাচের অঙ্গভঙ্গির দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে নাচ ও গানের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। লোকনৃত্য গানের অথবা লোকসঙ্গীত নাচের একান্ত তাৎপর্যবাহী হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সমালোচকের মতে, "নাচে গান থাকলেও গানের প্রত্যেক শব্দ ধরে অর্থ প্রকাশের কোন চেষ্টাই করে না নাচিয়েরা। গানের মূল ছন্দটাই এ নাচের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠে।"[১] পল্লীগানে যেমন ভাবের দৈন্য, নাচেও তেমনি

১. শান্তিদেব ঘোষ— ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৭

ভঙ্গির অভাব। কলাকৌশল দ্বারা গানের অর্থ প্রকাশের ভেতর দিয়ে নাচকে নিখুঁত করার চেয়ে আন্তর আবেগের টানে আনন্দলোক রচনা করাই লোকনৃত্যের প্রধান লক্ষ্য।

প্রায় সব দেশের লোকনৃত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দলবদ্ধতা। বিশেষজ্ঞের অভিমত : Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's crucial cycles.[১] প্রতিষ্ঠিত জীবনচক্রের গতিময় দলবদ্ধ প্রত্যনুসরণই পল্লীনৃত্য বা লোকনৃত্য। গ্রামীণ জীবন-ব্যবস্থায় দলগত ঐক্যচেতনার আদর্শ আছে। নাগরিক জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসুখসর্বস্ব। এর জীবনব্যবস্থাতেও অহংবোধের সন্তোষবিধান ও উৎকর্ষ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যীভূত হয়। সেজন্য নগরের নাচে ব্যষ্টির চেতনা প্রবল। গ্রামের দলবদ্ধ নাচে ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না, সমষ্টির মিলনে যে গতিছন্দের সৃষ্টি হয়, তাতেই সহজ আনন্দের প্রকাশ। গ্রামের নাচ দূর থেকে দেখে নয়, নাচে অংশগ্রহণ করে অধিক আনন্দ। শান্তিদেব ঘোষ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এর ছন্দের দোলায় এমন একটা মাদকতা থাকে যে নাচের সময় আর কিছুই খেয়াল থাকে না। সব ভুলে ছন্দের দোলায় মেতে ওঠাই হল দলবদ্ধ লোকনৃত্যের প্রধান গুণ।"[২] ব্যক্তিচৈতন্য চিহ্নিত ক্লাসিক নৃত্যে একটি সূক্ষ্ম রসবোধ প্রমূর্ত ; তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যরসে দর্শকচিত্ত আপ্লুত হয়। দলবদ্ধ সহজ প্রাণস্ফূর্তি ও স্বচ্ছন্দতা লোক-নৃত্যের মৌল আবেদন। তার আবেগশক্তি দর্শককে আসরে টেনে এনে নাচিয়ে আনন্দ জোগায়।

লোকনৃত্য অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলে এতে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ক্লাসিক নৃত্যশিল্পীর লক্ষ্য হল, দর্শকের কৌতুকবোধ জাগ্রত করে আনন্দ দান করা। ব্যক্তিত্ববিকাশ, দর্শকের মনোরঞ্জনসাধন এবং নৃত্যের ব্যাকরণ-বন্ধনের জন্য ক্লাসিক নৃত্যে কৃত্রিমতা এসে যায়, এতে জাতির প্রাণৈশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকশিল্পীর চেতনা নাচে, আত্মপ্রকাশে নয়। লোকনৃত্যে কোথাও কৃত্রিমতা নেই। জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন, "লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালাতে

১. Maria Leach (ed.) Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legends, Vol. 1, p. 276

২. ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৭

বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্যামল ভূমি, মাথার উপরে থাকে অসীম আকাশের নীলিমা।…শিল্পীরা হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না, শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গভঙ্গে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই। যে কোন জাতির সত্যিকার আত্মা খুঁজে পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে এবং লোকসঙ্গীতেই।"[১]

এ হল নৃত্যের বহিরঙ্গের রূপ-প্রকৃতির কথা। আভ্যন্তরীণ গুণধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে এর উৎস-তাৎপর্যের কথা বলতে হয়। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাচের উদ্ভব-রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন। স্যার আর্থার ইভানস বলেছেন, "আদিম যুগে মানুষের যখন ভাষা ছিল না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করত।"[২] ভাষাহারা মানুষের ভঙ্গির দ্বারা জীবনের ঘটনা, মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে নাচের আদি জন্মসূত্র নিহিত থাকতে পারে।

যৌনাকর্ষণ নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন। মানুষের যৌন-চেতনা মৌলিক জৈবপ্রবৃত্তি। নৃত্যে নরনারীর অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পরিণামে যৌনবোধের উদ্রেক ও মিলনাসক্তি তীব্র করতে পারে। বহু উপজাতির যুবক-যুবতী দাম্পত্যজীবনে আবদ্ধ হওয়ার আগে নৃত্যের মধ্য দিয়ে নির্বাচনপর্ব সমাধা করে।[৩] কোন কোন সম্প্রদায়ের দম্পতির যৌনমিলনের জন্য নৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন আছে। একসময় বাংলার তান্ত্রিক বামাচারীরা ভৈরবচক্রে মিলিত হয়ে মদ্যপান, ভৈরবনৃত্য ও যৌনসম্ভোগ করত।[৪] সুতরাং আদি স্তরে আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় নৃত্যচর্চা অসম্ভব ছিল না।

কেউ কেউ মনে করেন, উন্মেষপর্বে নাচ ছিল কাজের সমতুল।[৫] নাচ ও কাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। দলবদ্ধ নাচ যেমন আদিম জাতির

---

১. শ্রীপ্রসাদ রায়— ভারতীয় নৃত্যের নবজন্ম, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃঃ ১১৪
২. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়— ভাষার জন্মকথা, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃঃ ১০৮
৩. শান্তিদেব ঘোষ— গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য, পৃঃ ৪-৫
৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ— মোসলেমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১২
৫. দ্রষ্টব্যঃ বেতার জগৎ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৬

গোষ্ঠীচেতনা সংহত করেছে, তেমনি কর্মানুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যেখানে কাজের তাগিদ সেখানে অবসরবিনোদন, মনোরঞ্জন বা চিত্তোৎকর্ষের প্রশ্ন উঠে না। আদিম জাতির 'শিকারনাচ', 'যুদ্ধনাচ', 'শস্যনাচ' প্রভৃতি নাচের মূল লক্ষ্য ছিল সুফলপ্রাপ্তি। কাজ শুরু করার আগে এসব দলবদ্ধ নাচের মধ্য দিয়ে প্রেরণা লাভের পেছনে একটা বিশ্বাস সক্রিয় ছিল। এর নাম যাদুবিশ্বাস। অলৌকিক অপ্রাকৃত শক্তির অমোঘ প্রভাব ও কার্যফল সম্বন্ধে একটা অটুট মানসিক ধারণাকে যাদুবিশ্বাস বলা হয়। শিকারনাচে ও যুদ্ধনাচে অনুকরণ করে কামনা সফল করার চেষ্টা আছে। ফসলনাচে উর্বরতার কামনা প্রকাশ করা হয়। এসব নাচের গতিভঙ্গি কামনা অনুযায়ী রূপ লাভ করে। নাগাদের শস্যনাচে লাফ দেওয়ার রীতি আছে। তাদের বিশ্বাস, উঁচু লাফ দিলে ধানের গাছ বড় হবে, ফলন ভাল হবে।[১]

কাজ আরম্ভ করার আগে নাচের লক্ষ্য ছিল কর্ম সম্পাদনের, আবার কাজের শেষে অনুষ্ঠিত কোন কোন নাচের লক্ষ্য ছিল ধর্মাচার উদ্‌যাপনের। শিকারলব্ধ মৃত জন্তুর চারপাশে আদিবাসীরা যখন নৃত্য করত তখন তার পেছনে অবসরের আমোদস্ফূর্তির আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও প্রধান লক্ষ্য ছিল পশুদেবতার সন্তোষবিধান।[২] বৃষ্টির জন্য নৃত্যের প্রচলন লোকসমাজের মধ্যে এখনও দেখা যায়, মেঘদেবতা তাতে খুশী হয়ে পানি বর্ষণ করে। উত্তরবঙ্গে 'হুতুম দেয়া'র উদ্দেশ্যে কোচ কৃষক রমণীদের মধ্যে যে নৃত্যানুষ্ঠান হয়, তার লক্ষ্য হল বৃষ্টি কামনা করা।[৩] আদিম ধর্মসংস্কারই এরূপ নগ্ন নৃত্যের উৎসমূল।

বাংলা লোকনৃত্যের কোন কোনটিতে প্রাচীন সংস্কার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব এবং বাকী অংশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভাবন ও উদ্‌যাপনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বাংলার প্রচলিত লোকনৃত্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

এক. ধর্মীয়— জারিনাচ, ফকিরনাচ, চেলানাচ, কীর্তননাচ, গম্ভীরানাচ, বাউলনাচ প্রভৃতি।

---

১. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১২৬

২. Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legends, Vol, 1, P. 278

৩. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭২৮

দুই. সামাজিক—ঢালিনাচ, লাঠিনাচ, রায়বেঁশেনাচ ;

তিন. আনুষ্ঠানিক—ঘাটুনাচ, খেমটানাচ, সারিনাচ, বলিনাচ।

ক্লাসিক নৃত্যের মত অন্তর্নিহিত গুণধর্মের বিচারে শ্রেণীবিভাগ লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে অধিক সংগত নয়। ক্লাসিক নৃত্যের নামকরণের মধ্যে অর্থসামঞ্জস্য আছে, যেমন কথাকলিনৃত্য, বাঈজীনৃত্য। লোকনৃত্যের এক-শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সম্পর্ক খুব দূরবর্তী নয়। কোনটি ধর্মীয় নাচ, কোনটি সামাজিক নাচ, কোনটি বা উৎসবনৈমিত্তিক তা স্থির করা কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ নয়। বেশীর ভাগ নাচেই মিশ্রগুণের সমাবেশ হয়েছে। কোন কোন নাচ আধা সামাজিক, আধা ধর্মীয়। আবার কোন কোন নাচে আমোদ-প্রমোদের ভাগ অধিক। ঘাটু প্রকৃতপক্ষে অবসর বিনোদনের নাচ, কিন্তু এর বিষয়বস্তু হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর লীলাকাহিনী। মহররম উৎসবে লাঠিনাচে ধর্মীয় আবেদনের চেয়ে দৈহিক কসরতের আকর্ষণ অনেক বেশী। বাউল নাচে বলেই বাউলনাচ, ঘাটু নাচে বলেই ঘাটুনাচ ; এ ছাড়া নাম শুনে আর অন্য কোন অর্থ করা যায় না। আসরে নাচ দেখেই লোকনৃত্যের রসতাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়।

হিন্দুসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় নাচগুলি আচারমূলক (ritual)। ব্রতনাচ এ শ্রেণীতে পড়ে। ব্রতনাচে কামনা সফল করার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়। কোন কোন নাচ প্রতীকধর্মী (symbolical)। ছো-নাচ, বুড়াবুড়িনাচ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেবদেবীর মুখোশ পরে এসব নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে টোটেম বিশ্বাস থাকতে পারে।[১] সামাজিক নাচের ভেতর দিয়ে সমাজের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। ঢালিনাচ, রায়বেঁশেনাচ প্রভৃতিতে যুদ্ধের কলাকৌশল আছে। দলবদ্ধ যুদ্ধনাচে গ্রামবাসী সংহত প্রচেষ্টায় উদ্দীপনা লাভ করে। এক কালে যুদ্ধনাচের মধ্যে ক্ষমতা প্রকাশ এবং দক্ষতা প্রদর্শন করে 'যৌননির্বাচন' (sexual selection) কার্যও সম্পন্ন হত।[২]

১. মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে জীবজন্তু, পশু, উদ্ভিদের আত্মায় বিশ্বাস করে তাদের পূজা করা হয়। এ শ্রেণীর প্রাণীকে টোটেম বা 'কুলকেতু' বলে।

২. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, (SDFML) Vol. 1, P. 279

বাংলার প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। বিশেষতঃ বাংলার লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশের বিকাশ উভয় সম্প্রদায়ের জীবনরস ও সমাজমূলকে আশ্রয় করেই। বাংলা লোকনৃত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করতে গেলে মুসলিম সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলির উদ্ভাবন কাল ও উদযাপন উপলক্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ দুরূহ ব্যাপার নয়, কিন্তু হিন্দুসমাজের নাচগুলির প্রাচীনতা নিরূপণ করতে দীর্ঘ যুগসীমায় অনুসন্ধান চালাতে হয়।

হিন্দুধর্মে সঙ্গীত-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলাকে 'দেবদত্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] 'নটরাজ' বিষ্ণু, 'নটবর' কৃষ্ণ, 'নৃত্যপটিয়সী' উর্বশী বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্র। শিবের 'তাণ্ডবনৃত্যে' মর্ত্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে।[২] দেবসভায় বেহুলা সবাইকে নৃত্যে মুগ্ধ করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন।[৩] গোরক্ষনাথ নৃত্যকৌশলেই গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেন।[৪] মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য প্রদর্শন পুণ্য অর্জনের উপায় বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।[৫] দক্ষিণ ভারতে 'দেবদাসীনৃত্য' এরই নিদর্শন। এক সময় মন্দিরকে কেন্দ্র করেই নৃত্যচর্চা হত[৬] হিন্দুর লৌকিক ধর্মাচারণ ও জীবন-যাপনেও বিবিধ লোকনৃত্যের প্রচলন আছে; যথা গাজননাচ, কীর্তন নাচ, ঘৃতনাচ, ধূপনাচ, অবতারনাচ ইত্যাদি। এর সবগুলিই দ্বৈত অথবা দলবদ্ধনাচ। কোনটি পুরুষ-নাচ, কোনটি স্ত্রী-নাচ। এসব নাচের উপলক্ষ ধর্মানুষ্ঠান। সে ধর্মমত ব্যাখ্যা করলে নাচগুলির উদ্ভবকাল ও আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ধরা পড়ে। আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত বাংলার লৌকিক ধর্মের সংঘাত ও শেষে সমন্বয় রচিত হয়; তখনই হিন্দুর ব্রতগুলির উদ্ভব হয়। স্ত্রী-আচার হিসেবে ব্রত অন্তঃপুরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। নানা লৌকিক দেবতার ব্রতপূজা ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রতনৃত্য তখন থেকে

১. শ্রীমনিবর্দ্ধন—প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪০, পৃঃ ৮৫২
২, Projesh Banerji—The Folk Dance of India, Allahabad, 1959, P. 25
৩. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত—মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩০২-০৩
৪. শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—গোর্খ-বিজয়, পৃঃ ৬৪
৫. নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত—বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২২
৬, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭১৬

প্রচলিত হয়ে যায়। কীর্তন গানের সঙ্গে কীর্তননাচের আয়োজন চৈতন্য দেবের ধর্মমত প্রচারের পর ব্যাপকতা ও প্রথাবদ্ধতা লাভ করে।

ঐহিক সুখ ও মোহ আনে বলে ইসলামধর্মে নাচ-গানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিছক আনন্দোপভোগ নয়, ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা আদর্শ জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামধর্ম। এ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলে প্রচলিত নাচ-গানের প্রভাব কিছু কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। প্রতিবেশী হিন্দু সংস্কারের প্রভাববশতঃ হোক অথবা জীবনরস আস্বাদনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশতঃ হোক, বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজ দেশের প্রচলিত নাচগান ও আনন্দোৎসব কেবল উপভোগই করেনি, নতুন ভাবধারা ও সংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে আনন্দের রসভাণ্ডার বর্ধিত ও সমৃদ্ধ করেছে। পূর্ব-সংস্কারের জন্য বটে, আবার হিন্দুর সহিত একত্র বসবাসের জন্যও বটে, মুসলমানরা হিন্দুর রীতিনীতি ও আচার-আচরণ দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের কাছে আনন্দোপভোগের লৌকিক উপকরণগুলি সমানভাবে আদৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার মিশ্রণ এবং সংস্কার সাধনের ফলে স্বতন্ত্র রূপরসে মণ্ডিত হয়ে অভিনব আচার-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। জারিনাচ, ঘাটুনাচ, বাউলনাচ, লাঠিনাচ, খেমটানাচ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণজাত নাচগুলি প্রধানতঃ মুসলমান সমাজমানস দ্বারা লালিত, চর্চিত ও উপভোগ্য হয়ে আসছে। ঘাটুনাচের প্রধান প্রতিপোষক মুসলমানরাই, কিন্তু এর ভিত্তিমূল সম্পূর্ণ হিন্দু ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাউলনাচের ভাব ও ভঙ্গিতে হিন্দুয়ানী ও ইসলামী ঐতিহ্যের মিশ্রণ আছে। জারিনাচের মূল প্রেরণা ইসলামী ঐতিহ্য। কারবালার বিষাদময় কাহিনীকে অবলম্বন করে এদেশে মর্সিয়া সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠার সময়ে জারিনাচের প্রচলন হতে পারে। মুর্শিদী ও ফকিরী নাচের আদর্শ দরবেশদের 'সামানৃত্য' থেকে গৃহীত হতে পারে। আকবরের দরবারে সামানৃত্যের কদর ছিল।

জারিনাচ

বাংলার মুসলিম সমাজের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত নাচ হল জারিনাচ। মহররম উপলক্ষে জারিনাচ অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া

সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররমপর্ব পালনকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে। তাদের কাছে জারিনাচের ধর্মীয় আবেদন স্বীকৃত। ইসলামী শাস্ত্রে মহররমের সময় শোক প্রকাশ. রোজা পালন, সুন্নত নামাজ পাঠের নির্দেশ আছে। মিছিল বের করা, তাজিয়া তৈরি করা, দরগাহ বানান, মাতম করা, মর্সিয়া গাওয়া, জারি নাচা, লাঠি খেলা ইত্যাদি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এগুলি অধিকাংশ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবজাত। বিশেষতঃ তাজিয়া নির্মাণ ও দরগাহর আনুষ্ঠানিকতা হিন্দুর পূজাচারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে এর কোন নীতি-নির্দেশ নেই।

জারিনাচে সাধারণতঃ তরুণ ও কিশোররা অংশগ্রহণ করে। জারিগান ও জারিনাচ একই সময়ে একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধান ব্যক্তি গান করে, কিন্তু নাচে না। অঞ্চল বিশেষে তার বিভিন্ন নাম— রংপুরে 'হাদি', রাজশাহীতে 'ওস্তাদ', ময়মনসিংহে 'বয়াতি', কুমিল্লায় 'জোগালি' ইত্যাদি। দলের মধ্যে যারা গানে ও নাচে অংশগ্রহণ করে তাদের 'পাইল' (রংপুর) বা 'দোহার' (ময়মনসিংহ) বলা হয়। সমস্ত দলটিকে 'জারিয়ালদল' বলে।

জারিনাচের পোশাকে কিছু বিশিষ্টতা আছে, তবে বাধ্যবাধকতা নেই। জারিয়ালদের পরনে নিত্য ব্যবহার্য লুঙ্গি, গায়ে সার্ট বা গেঞ্জী, হাতে ও মাথায় লাল রুমাল জড়ান থাকে। কোন কোন অঞ্চলে তারা পায়ে নূপুর পরে। ময়মনসিংহের কোন কোন জারিয়ালদলের বয়াতি 'চটি' বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে, দোহাররা হাততালি দেয়। মুর্শিদাবাদে সরু বাঁশের একপ্রান্ত খিল খিল করে চিরে এক প্রকার লৌকিকবাদ্য তৈরি করা হয়, এর নাম 'ঝারনি'।[১] দুহাতের দুটি ঝারনি পরস্পর আঘাত করলে ঝনঝন সুর ধ্বনিত হয়। এটি তালবাদ্যেরও কাজ করে।

জারিনাচ বৃত্তাকার রেখায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল গায়েন প্রধানতঃ কারবালার করুণরসের গাথা গায়, দোহাররা দিশা বা গড়ান গেয়ে তাকে সাহায্য করে। রংপুরে দুতিন জন পাইল নাচে, অন্যান্য পাইল তাদের ঘিরে বিশেষ ভঙ্গিতে বসে হাততালি দিয়ে নাচের ছন্দ জোগায়। তারা বাম পায়ের হাঁটু মুড়ে তার উপর দেহের ভার এবং ডান পায়ের হাঁটু আধভাঙা অবস্থায় রেখে উপবেশন করে। হাদি বৃত্তের বাইরে থাকে।

---

১. নিজস্ব সংগ্রহ।

গানের ভাবার্থ ধরে ভঙ্গিপ্রকাশের চেষ্টা জারিনাচে নেই। গানের ছন্দে ও বাদ্যের তালে মাথা দুলিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে শোকার্তভাব ফুটিয়ে তোলা হয়।

মুর্শিদাবাদে ওস্তাদ ছাড়া সবাই নাচে। সে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মর্সিয়া গায়, দোহাররা তার গানের দিশা অংশটুকু গায় এবং ঝারনি বাজিয়ে নাচতে থাকে। কাঠিনাচের ঢঙে কখন নিজের দুটি ঝারনিতে আঘাত করে, কখন দু'পাশের ঝারনিতে আঘাত করে তাল দেয়। তারা নাচের সময় মৃদু পার্শ্ব পদক্ষেপে বৃত্তরেখায় ঘুরতে থাকে।

জারিয়ালদলের লোকসংখ্যার নির্দিষ্টতা নেই। সচরাচর পনের-বিশ জন দেখা যায়। মহররমের চাঁদ দেখার রাত থেকে জারিনাচ শুরু হয়। উৎসবের দশ দিন তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে। ময়মনসিংহের গৃহস্থরা জারিয়ালদের খই-চিড়া খাওয়ায়।[1] উত্তরবঙ্গে এ উপলক্ষে খিচুড়ি খাওয়ার রেওয়াজ আছে।[2] উৎসবের শেষ দিন স্থানীয় দরগাহ অথবা নকল কারবালায় বিভিন্ন দলের সমাবেশে নাচ-গানের উত্তেজনা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে।

বাউলনাচ

বাংলার পল্লীর পথে-ঘাটে বাউলগান ও বাউলনাচ দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে। বাউল নাচ ও গান একান্তভাবে বাউলদেরই কৃত্য, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে এতে অংশ গ্রহণ করে না।

বাউল নাচ-গানের কোন লৌকিক উপলক্ষ নেই। কোন কোন ভিক্ষোপজীবী বাউল পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও তার সংখ্যা অতি নগণ্য। বাউল গান ও নাচের মূল প্রেরণা ধর্মসাধনা। বিশেষতঃ গান তাদের

---

১. রওশন ইজদানী—মোমেনশাহী লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩১

২. একটি প্রচলিত ছড়া :

> হোসেন হাসেন কারবালা
> খিঁচুড়ি খ্যায়া দিন চালা।—মুর্শিদাবাদ

তারা বাড়ি বাড়ি নাচ-গান করার সময় গৃহস্থের কাছ থেকে যে চাল-ডাল পায়, তা দিয়ে খিঁচুড়ি রান্না করে খায়। নিজস্ব সংগ্রহ।

সাধনারই অঙ্গ। নাচ গানের অনুষঙ্গ, তবে অপরিহার্য অঙ্গ নয়। এজন্য বাউল মাত্রই গান গায়, কিন্তু সব বাউল নাচে না। কেবল মানসিক প্রস্তুতি ও আনন্দানুভূতির তীব্রতা অনুসারে গানের গূঢ়ার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য বাউল গান করতে করতে নাচে মেতে উঠে। সমালোচক লিখেছেন, "তারা যখন ভক্ত, দরদী বা মরমীদের সঙ্গ করে, তখন তাদের আলাপ আলোচনার ভাষা হোল গান; তখন গান গাইতে বা গান শুনতে তাদের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই তাদের নাচের মূল প্রেরণা।"[১]

বাউল ফকিরের সাধারণ পোশাকই বাউলনাচের পোশাক; গায়ে গেরুয়া রঙের লম্বা ঢিলা জোব্বা বা আলখাল্লা, কোমরে এক খণ্ড কাপড় জড়ান, মাথায় পাগড়ি, মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভরা।

সুরবাদ্য হিসেবে একতারার ব্যবহার সর্বত্র প্রচলিত। তালবাদ্য হিসেবে বাউল বাঁয়াও ব্যবহার করে। অনেক বাউল নূপুর পরে। বাঁয়া কাঁধ থেকে ঝোলান কোমরের সঙ্গে এটে বাঁধা। ডান হাতের একতারার সুরে বাম হাতের বাঁয়ার তালে এবং পায়ের নূপুরের ঝঙ্কারে বাউল মশগুল হয়ে গান গায় ও নাচে। কোন কোন বাউলনাচের আখড়ায় খঞ্জরী ব্যবহৃত হয়। খঞ্জরী ও নূপুর অতিরিক্ত তালবাদ্য; একতারা ও বাঁয়া নিয়েই 'নটবাউল' স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাউলনাচে এক মূর্তিতেই গীত-বাদ্য-নৃত্য ললিতকলার ত্রিধারার একত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।[২]

বাউল পুরুষের নাচ এবং প্রধানত: একক নাচ। আখড়ার মিলোনৎসবে দলবদ্ধ বাউলনাচ হয়ে থাকে। ক্লাসিক নাচের মুদ্রাভিনয় বাউলনাচে অনুপস্থিত। দেহ বা কোমরের কোন ছন্দভঙ্গি নেই; ডান হাতের একতারাটি কখন কানের কাছে চেপে ধরে, কখন প্রসারিত করে মৃদু টঙ্কারে বাজায়। তারা মিষ্টিক প্রেমের গান গায়, কিন্তু নৃত্যছন্দে সে ভাব ফুটিয়ে তোলার আবশ্যক মনে করে না। বাউলনাচের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে পদচালনায় এবং গতিবিধিতে। একটি সংযত বলিষ্ঠ গতিভঙ্গি নাচে ললিতমধুর আস্বাদ্যমানতা এনে দেয়। নাচের

১. গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য. পৃঃ ৫৩

২. রাজেশ্বর মিত্র—বাংলা লোকসঙ্গীত (মধ্যযুগ), মিত্রালয়, কলিকাতা, ১৯৫৫ পৃঃ ৮০ (ভূমিকা—অমিয়নাথ সান্যাল লিখিত)।

সময় বাউলের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "এদের নাচে সামনের দিকে বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই হোলো প্রধান বিশেষত্ব। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে না এসে ঘুরে গিয়ে আবার সেই মুখী সামনে চলা, এই হোলো এদের নাচের মূল চাল।"[১]

পল্লীর রাস্তা, মাঠ-ঘাট অথবা আখড়া যে কোন স্থানেই বাউলনাচ জমে উঠতে পারে। কুষ্টিয়া ও যশোহর এবং পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বাউলদের প্রধান কেন্দ্র। তবে এদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা প্রায় সব জেলাতেই বিচরণ করে থাকে। এখন পল্লীতে ভিক্ষোপজীবী হিসেবে এদের দেখা যায়।

ফকিরনাচ

দেশের সর্বত্র এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঢিলাঢালা পোশাক পরে এবং লম্বা বাবরি রাখে। এরা সাধারণভাবে মাদারের ফকির নামে পরিচিত। এদের কেউ কেউ ভিক্ষা করে। অনেকে সমাজের সব রকম কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পীর-ফকিরের শিষ্য-প্রশিষ্য হিসেবে এরা নিজেদের পরিচয় দেয় এবং মুর্শিদের নির্দেশমত জীবন অতিবাহিত করে। বাউলদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। বাউলরা ঘরছাড়া বিবাগী, আবার ঘরমুখী সংসারীও। বাউল গান গেয়ে 'পরমসাঁই'-এর অনুসন্ধান করে। ফকিররা পুরোপুরি সংসারী। তারা সমাজদেহে প্রায় একাত্ম হয়ে মিশে আছে। বাউলদের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ নেই। ফকিররা মূলতঃ মুসলমান। ফকিররা নৈমিত্তিক জিকির ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে নাচ-গানও করে থাকে। বাংলাদেশে ফকিরনাচের কাল ও উপলক্ষ পাওয়া যায় চৈত্র সংক্রান্তির 'মাইজভাণ্ডার' উৎসবে। ঐদিন রাত্রে ভক্তরা পীরের মাজারে জড় হয়। তারা মোমবাতি ও আগরবাতি দিয়ে মাজার আলোকিত ও সুরভিত করে। পীরের নামে একটি বাঁশ লাল কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। বাঁশের মাথায় থাকে চামর বা পরচুলা। তাদের মতে, বাঁশটি হল মাদার পীরের প্রতীক। এটি ঘাড়ে নিয়ে তারা নাচে ও গান গায়। তাদের পায়ে ঘুঙুর থাকে। নাচ-গানের এ অনুষ্ঠানটি 'মাদারের বাঁশ

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১-৫২

তোলা' নামে পরিচিত।[১] পীরের ভজনায় এটি যে গান ও নাচেরই অনুষ্ঠান, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফকিরালি গানে।

চল যাই ভাণ্ডারে
দেখিব মওলারে
পুরাব মনের বাসনা ॥ ধুয়া
ও ভাই
বসি বসি হয় না জিগির
লাফদি ফালদি কর জিগির
চায়নি খোদা রাজি হয়।[২]
—নোয়াখালি

ফকিরনাচ এই 'লাফদি ফালদি'র নাচ। অর্থাৎ লাফালাফি করে এ নাচ নাচা হয়। আসরে একটি অগ্নিকুণ্ডে মাংস পোড়ান হয় পীরের প্রসাদ হিসেবে। তারই চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে তারা নাচে। তাদের পা ফেলার ভঙ্গি ও মাথা নাড়ার ভঙ্গি হল নাচের প্রধান অংশ। তারা তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যায় আর মাথা দোলায়। বাবরির লম্বা চুলে মুখমণ্ডল ছেয়ে যায়। পা ও মাথার তুলনায় দেহের অন্য অংশের তেমন ক্রিয়া নেই। পেশোয়ারের পাঠানদের 'খটক' নাচের ভঙ্গিটা কতকটা এ রকমই। জারিনাচে শোকভাব, ডাকনাচে বীরভাব ফুটিয়ে তোলা হয়, বাউলনাচের মত ফকিরনাচে ভক্তিভাব প্রকাশ পায়।

পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলে এটি 'মাদারনাচ' নামেই অভিহিত। নকুল চন্দ্র দত্ত একটি প্রবন্ধে (শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭২) মাদার নাচ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি সরল বাঁশ লইয়া যে নাচ দেখানো হয়, তাহাই পল্লী বাংলায় মাদারনাচ নামে খ্যাত। ঢোল ও কাঁসি সহযোগে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইজন দুইটি সরল সম্পূর্ণ বাঁশ লইয়া পল্লীতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কখনও চিবুকের উপর, কখনও কপালের উপর, হাতের তালুর উপর, বুকের উপর, কখনও কখনও এক

১. প্রস্তুত গ্রন্থের লৌকিক পীরবাদ অধ্যায়ে 'মাদার পীর' অংশ দ্রষ্টব্য।
২. নোয়াখালি জেলার মীর আলীপুর গ্রাম নিবাসী আমার স্নেহভাজন ছাত্র কাজী রফিকউল্লাহর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি।

একটি আঙ্গুলের প্রান্তসীমার উপর লইয়া, কখনও শুইয়া, কখনও দাঁড়াইয়া ব্যালেন্স রাখিয়া এক একজন নৃত্য করে। বাঁশ দুইটির শেষ প্রান্তে রঙ্গিন বস্ত্রখণ্ড পতাকার মত জড়াইয়া দেওয়া হয়। শুধু মুসলমান পল্লীতে নহে, হিন্দু পল্লীতেও এই মাদারনাচ দেখান হইয়া থাকে।"[১] বগুড়া জেলায় এটি 'নিশানের নাচ' নামে অভিহিত।[২] নাচে মাদারপীরের নিশান বা প্রতীক বাঁশের গুরুত্ব থেকেই এরূপ নামকরণ।

চেলানাচ

মাদারের বাঁশের অনুরূপ গাজীর বাঁশের অনুষ্ঠান উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে পালিত হয়। এতে গাজীর দরগায় গাজীর চেলা গাজীর বাঁশ নিয়ে যে নাচ নাচে ও গান গায় তা ফকিরনাচের সহিত অভিন্ন। এখানেও গাজীপীরের প্রতীক চামরযুক্ত বাঁশ নিয়ে চেলা দরগার চারপাশ ঘিরে বিভোল হয়ে নাচে। জনৈক লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে চেলানাচের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, "যে লোকটি গাজীর বাঁশের চেলা হত তাঁব মাথায় থাকত প্রকাণ্ড পাগড়ি। তার সমস্ত গা থাকত উলঙ্গ আর পরনে থাকত চিকন একটি লেংটি। চেলা এইরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে নাড়া, ছোকরা ও ঢুলিসহ দরগার সম্মুখে আসে এবং একই সঙ্গে সকলে দরগায় সালাম করে। সালাম শেষে চেলা দরগার সম্মুখে গেড়ে দেয়া বাঁশ তিনটি থেকে চামরসহ মাঝের বাঁশটি উপরে নেয় তারপর বাঁশের গোড়াটি নিজের নাভির উপরে তুলে নিয়ে বাঁশটি হেলাতে দুলাতে থাকে এবং নাচতে নাচতে সাতবার দরগার চারপাশে ঘুরে আসে। সাতবার ঘুরে আসার পর চেলা দরগার সম্মুখ থেকে নাচতে নাচতে পিছনে যায় ও পিছন থেকে নাচতে নাচতে আবার সম্মুখে আসে। এইভাবে চেলা সর্বক্ষণ নাচতে থাকে। চেলার নাচে মাটি কাঁপে, বদ্ধ পুকুরের পানি টলমল করে, বৃক্ষের তাজা পাতা ছিঁড়ে পড়ে তবু তার নাচ থামে না।"[৩] উদ্ধৃতির শেষ বাক্যে অতিরঞ্জন আছে, তবে নাচের

১. দ্রষ্টব্য: বাংলার লোকসাহিত্য. ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯১
২. বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ: ১০২
৩. সামীমুল ইসলাম—উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃ: ১৩১

তীব্রতা বুঝাতে যে এ বর্ণনা, তা নিঃসন্দেহ। ফকিরনাচ ও চেলানাচের ঐতিহ্য যে একই তা উভয় নাচের বর্ণনার মিল থেকে বুঝা যায়।

ঘাটুনাচ

ঘাটু বাংলার আঞ্চলিক নাচ। বিল-হাওরে ভরা ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্ব এবং শ্রীহট্টের পশ্চিম অঞ্চলে ঘাটুগানের সঙ্গে ঘাটুনাচের আসর বসে। এ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় বা সামাজিক কোন উপলক্ষ নেই, লোকমনোরঞ্জন নিমিত্তই এর আয়োজন হয়। এজন্য বছরের যে কোন সময়, যে কোন স্থানে ঘাটুগান ও ঘাটুনাচের আসর জমে উঠতে পারে। তবে সাধারণতঃ বর্ষাকালে চারিদিক যখন পানিতে থই থই করে, গ্রাম্যচাষীর হাতে কাজ থাকে না— ঘাটু নাচের আসর তখনই জমজমাট হয়ে উঠে।[১]

এক বা একাধিক ঘাটু নিয়ে ঘাটুদল গঠন করা হয়। ঘাটুদলের প্রধানকে সরকার বা মূল গায়েন বলে, তার এবং সহকারী বায়েনদের প্রধান কাজ হল গান করা এবং বাজনা বাজিয়ে নাচের তাল জোগান। নাচের ভূমিকা ঘাটুর উপর ন্যস্ত। ঘাটু গানের তরুণ কিশোর, দশ থেকে বিশ পর্যন্ত তার বয়স। ঘাটুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল নারীবেশে রূপসজ্জা। 'অল্প বয়সের সুন্দর বালক নিজেকে রমণীর পোশাক-পরিচ্ছদে, অলংকার-প্রসাধনে সজ্জিত করে যখন আসরে নৃত্যের ঝঙ্কার তোলে তখন সে দর্শকদৃষ্টিতে একটি রূপবতী বালিকা রূপেই প্রতিভাত হয়। প্রাকৃত জনচিত্তের বিনোদনের এটি একটি প্রধান অঙ্গ।

১. ঘাট থেকে ঘাটু শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। ঘাট+উ=ঘাটু। ঘাটু গান ও নাচের আসর নৌকার পাটাতনে বসে। ঘাটুর দল ঘাটে ঘাটে গান করে ও নাচ দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে। উপরন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে যমুনার ঘাটের লীলা উল্লেখযোগ্য অংশ। ঘাটু গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। উভয় দিক থকে ঘাটু শব্দের চালু হতে পারে। তবে ঘাট ছাড়াও লোকালয়েও ঘাটু গানের আসর বসে। গুজরাটে একই শ্রেণীর নাচগানের চল আছে. এখানে বালিকাবেশী ছেলেদের 'গানটু' বলে। গানটু>গাঁটু>ঘাঁটু>ঘাটু এরূপ হওয়াও স্বাভাবিক।

দ্রষ্টব্য: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১-৫২
মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী—লোকসাহিত্যে গাঁডু গান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৮

ঘাটু নাচের দলগুলি অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের ; দর্শকও মুসলমান জনসাধারণ। পর পুরুষ দর্শনমাত্র যেখানে কঠোর পাপের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে সেখানে লোকমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রমণীর নাচে অংশ গ্রহণ করা প্রায় অবাস্তব ব্যাপার ছিল। সমাজের জনমনের চাহিদা পূরণের জন্য বালকের দ্বারাই তাই রমণীর বেশবাসের আয়োজন করা হত।

ঘাটুর পরিধানে সূতী অথবা সিল্কের দামী শাড়ি ঘাগরার মত করে পরা, মাথায় চুলের খোঁপা। এ উদ্দেশ্যে ঘাটু লম্বা চুল রাখে, অভাবে পরচুলা পরে। তাদের অঙ্গে নানা অলংকার, মুখেচোখে পেন্ট, পায়ে ঘুঙুর।

ঘাটু গানের সুর ও তালবাদ্য হিসেবে ঢোল, মন্দিরা, বাঁশী ও সারিন্দা প্রধান। কোন কোন আসরে হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হয়। আসরের এক পাশে মূল গায়েন বায়েনসহ আসন গ্রহণ করে। গান ও নাচের বিষয়বস্তু হিন্দুর পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলা। বাস্তব জীবনের প্রেমলীলার কাহিনীও আছে; কিন্তু তা নগণ্য। লোকনৃত্যের মধ্যে একমাত্র ঘাটুনাচে গানের ভাবার্থ ধরে নাচের ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলা হয়। ঘাটুনাচ আধুনিক অপেরার মত অভিনয়মুখ্য। অপেরার নেপথ্যের গানের ভাবকে সুবিন্যস্ত অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এ ধরনের গ্রামীণ সংস্করণ ঘাটুনাচ। গানের বিষয়, কণ্ঠের সুর, বাদ্যের তাল-সংকেত অনুযায়ী ঘাটু বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক কলাকৌশল দ্বারা নৃত্যাভিনয় করতে থাকে। গানের ভাব ও তালবাদ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নৃত্যভঙ্গিমাও পরিবর্তিত হয়। এরূপ একটি দীর্ঘপালাকে সারারাত ধরে ঘাটু নৃত্যমূর্তি দান করে।[১] এজন্য

১. রাধাকৃষ্ণের কেবল প্রেমের অংশ টুকুই ঘাটুগানের অংশীভূত। এর মোট চারটি ভাগ— রঙ্গিলা, মুরলী, জলভরা এবং বিচ্ছেদ। এগুলির মধ্যে মুরলী ও বিচ্ছেদ অংশের প্রাধান্য বেশী। প্রত্যেকটি অংশ ছোট ছোট একপদী গানে বিভক্ত, যেমন— ভজন. সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলভরা, ফুলতোলা. কুঞ্জসাজান, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদ, মধুমাস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি। গানগুলিকে ঘাটুর 'ছম' বলে। ছমগুলি মূল গায়েন গায়। ঘাটু ছমের ভাবানুযায়ী নাচে।
দ্রষ্টব্য: মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন—কাসিমপুরী-লোকসাহিত্যে ঘাঁটু গান, পূর্বোক্ত,পৃ: ৬৯-৬০
মোহম্মদ সাইদুর—ময়মনসিংহ জেলার ঘাটুগান ও নাচ, পূর্বদেশ, ৯ই চৈত্র, ১৩৭৪

ঘাটুগান ও ঘাটুনাচের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, ঘাটুনাচের এরূপ গুণধর্মে লৌকিক নাচের খাঁটি মেজাজটি বজায় থাকেনি, ভদ্র নাচের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে তা। ভাবভঙ্গিতে সচেতনতার লক্ষণ থাকায় তার উদ্ভবকাল অন্যান্য নাচের সহিত তুলনায় অনেক পরবর্তী হওয়াই স্বাভাবিক। ঘাটু গান ও নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী বলেছেন, ষোল শতকের শ্রীহট্টের জনৈক বৈষ্ণবাচার্য কৃষ্ণপ্রেমে মোহিত হয়ে বিবাগী হয় এবং রাধিকাভাবে প্রেমাভিনয় করতে থাকে। ক্রমে তার শিষ্যদল গড়ে উঠে; দলের মধ্যে বালকরা আসত। তাদের সখীবেশে সাজান হত, তারা নেচে প্রেমভাব প্রকাশ করত। এসব শিষ্যপ্রশিষ্য, ছেলেছোকরাদের প্রভাব থেকে ক্রমে ঘাটু নাচ-গান গড়ে উঠে।[১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোক-সাহিত্য, (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে এ মত সমর্থন করেছেন।[২] উদ্ভবকালে ঘাটুনাচের আধ্যাত্মিক দিকটি প্রধান ছিল। পরে যখন তা লোকসমাজে প্রবেশ করে এবং লোকচৈতন্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন আস্তে আস্তে তার আদর্শচ্যুতি ও রুচিবিকৃতি ঘটে। এর সঙ্গে যখন অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গ যুক্ত হয় তখন তার রস-রুচি ক্রমশঃ অতলে ডুবে যায়। এককালের গরীব মাতাপিতা ছেলেকে ঘাটুদলে ভর্তি করত মাসোহারার জন্য।[৩] অনেক সময় সুদর্শন বালকদের অপহরণ করে ঘাটুদলে ভর্তি করা হত। ঘাটুগানের প্রধান প্রতিপোষক মুসলমানরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে প্রথাগতভাবে গ্রহণ করেছে। এতে আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধ নেই। অধুনা সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিরসাত্মক এ গান ও নাচ লুপ্ত হতে বসেছে। আধ্যাত্মিকতা বর্জিত রাধাকৃষ্ণপ্রেম, মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিপোষণ, অপেরাধর্মী সচেতন শিল্পপ্রয়াস ইত্যাদি কারণে বলা যায়, ঘাটুগান ও ঘাটুনাচ অর্বাচীন কালের লৌকিক নাচ।

১. লোকসাহিত্যে গাঁড়ু গান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯
২. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩
৩. লোকসাহিত্যে গাঁড়ু গান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০

সারিনাচ

নৌকাবাইচের সময় সারিগানের সাথে সারিনাচ হয়। ঠিক প্রতিযোগিতার মুহূর্তে নাচ-গান হয় না, যখন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে যায় এবং প্রতিযোগিতা শেষে গৃহে ফিরে আসে সে সময় গান ও নাচ হয়।

সারিগানের বিষয় বিবিধ—রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী ও নিমাই সম্পর্কিত গান, লৌকিক নরনারীর প্রেমাত্মক গান, পরস্পর আক্রমণাত্মক গান ইত্যাদি। হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এবং বিজয়ার দিন অর্থাৎ আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে যে নৌকাবাইচের আয়োজন হয়, তাতে সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর গান হয়ে থাকে।[১] মুসলমান সমাজে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কোন লৌকিক উৎসবে অথবা কোন বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন নৌকাবাইচের আয়োজন হয়। এ সময় খালে-বিলে পানি থাকে। তারা সাধারণতঃ নরনারীর প্রেমমূলক গান এবং হাস্যকৌতুক ও আক্রমণাত্মক গান গেয়ে থাকে।[২]

নৌকার বেশীর ভাগ লোক বৈঠা টানে। গানের বয়াতি ও নাচের দু' একজন ব্যক্তি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে ও গান গায়। বৈঠার তালে তালে নাচ হয়, সঙ্গে ঢোল, কাঁসিও থাকে। গানের ভাবের সঙ্গে নাচের ভাবের তেমন সম্পর্ক থাকে না। তারা নাচের জন্য নাচে। নিছক আনন্দোল্লাস এর মুখ্য উদ্দেশ্য। নাচের ভাবভঙ্গিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চলন্ত ছিপের উপর এই নৃত্যের মধ্য দিয়া উচ্চ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না।"[৩] বস্তুত বহু সংখ্যার বৈঠার টানে নৌকা যখন দ্রুত ছুটে চলে তখন তার নাচে মঞ্চের নাচের সূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশের অবকাশ স্বাভাবিকভাবে থাকে না।

বাংলায় প্রায় সর্বত্র নৌকাবাইচের চল আছে। তবে বিল-হাওর ও নদীনালা বিধৌত অঞ্চলে এর আড়ম্বরের মাত্রা বাড়ে। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় খুব জাঁকজমকের সহিত নৌকাবাইচ হয়ে থাকে। পূর্ব ময়মনসিংহে একে 'আরং' উৎসব বলে।[৪]

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩
২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৬৪-৬৮
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ৫৯৫
৪. নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া।
   আরং জমিবে কত দেশ ভাসাইয়া॥
ময়মনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৬৫

ছোকরানাচ

ঘাটুনাচের মত ছোকরানাচের কোন ধর্মীয় বা সামাজিক গুরুত্ব নেই, সম্পূর্ণ লোকমনোরঞ্জন নিমিত্ত তা অনুশীলিত হয়। মাঠে-ঘাটে, খেত-খামারে সারাদিন কাজ করে রাত্রে ছোকরানাচের আসরে আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যে ডুবে থেকে কৃষক, মজুর কর্মক্লান্তি ও সংসারচিন্তা লাঘব করার চেষ্টা করে।

ছোকরানাচ বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। এর বিষয়বস্তু: অংশত: অশ্লীল বলে লোকালয়ের বাইরে মাঠে-ময়দানে তা হয়ে থাকে। সাধারণত: স্থানীয় লোকোৎসব বা মেলাতে ছোকরানাচের আয়োজন হয়। মাঝ বয়সের যুবা ও তরুণরা এতে বেশি ভিড় জমায়।

উত্তর বঙ্গের রংপুর ও রাজশাহী এবং পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এর জনপ্রিয়তা অধিক। স্থান বিশেষে এর ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক নাম— রংপুরে 'বেনাকুশাইন', রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদে 'আলকাপনাচ'। সুধীর কুমার করণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তের যে 'নাচনী নাচের' বিবরণ দিয়েছেন, তা এ ছোকরানাচের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।[১]

ছোকরানাচে ছোকরার সংখ্যা এক বা একাধিক। ছোকরারা সকলেই পুরুষ। আসরে গানের বিষয় অনুযায়ী তারা নারী-পুরুষের বেশ ধারণ করে। এতে কিছুটা যাত্রার ঢঙ আছে, তবে ছোকরানাচ যাত্রা নয়। যাত্রা পুরোপুরি অভিনয়মুখ্য। ছোকরানাচে গানই প্রধান। গানের কথায় আর নাচের ভঙ্গিতে চটুল রঙ্গরসিকতা দ্বারা দর্শককে আনন্দ-দান করা হয়। ছোকরার বেশবাস ঘাটুর মত। ছোকরার বয়স ঘাটু থেকে বেশী হতে পারে।

ছোকরা নাচ-গানের বিষয় মূলত: রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। গানের প্রধানকে 'গীদাল' (<গীতাল) ও সহকারীদের 'দোহার' বলে। নাচের আসরে একপাশে আসন নিয়ে গীদাল গান করে, দোহাররা বাজনা বাজায়। বেনা, জুড়ি, হারমনিয়ম, ঢোল, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। ছোকরার পায়ে 'ঘাড়ু' থাকে।

১. সুধীরকুমার করণ— সীমান্ত বাংলার লোকযান, পৃঃ ২৩৯-৪৫

'গীদালের গানের' সুর ও ভাব অনুযায়ী ছোকরার নাচের ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রিত হয়। ছোকরা নিজে গান গায় না ; আসরের গানকে দেহভঙ্গিতে অভিব্যক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে ! কেবল ক্ষেত্রবিশেষে পালাগানের কোন গভীর ভাবাত্মক অংশে অল্পকাল সে গান ও নাচের দ্বৈতভূমিকা নিয়ে থাকে। দর্শক ও শ্রোতার কাছে এ মুহূর্তটুকু বিশেষ উপভোগ্য হয়। পালাগানের ফাঁকে দর্শকমনকে কিছুক্ষণ অবসর দেওয়ার জন্য হাল্‌কারসের গানের সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গির নাচের আয়োজন করে। এ অংশটুকু বাঈজী নাচের মত দেহসর্বস্ব ভঙ্গির পরিচায়ক। এ সময় ছোকরারা সৌখিন দর্শকের কাছে গিয়ে বকশিস আদায় করে।

দুটি দলে প্রতিযোগিতা হলে ছোকরা নাচ ও গান সারারাত ধরে চলে। লোকজীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে তাদের মন, রুচি ও প্রবণতাকে রপ্ত করে নেয় নাচিয়ের দল। তারপর তাদের মানসোপযোগী রসপরিবেশনে ত্রুটি রাখে না যাতে করে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের বিরক্তি ধরে বা আগ্রহ কমে। ছোকরার দলগঠনে হিন্দু মুসলমানের বাছবিচার নেই। দর্শকও উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ। একই হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় তারা একত্রে সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

আলকাপগান লঘু রঙ্গরসিকতার গান। আলকাপের নাচ-গানের পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আলকাপ গানে একটি কিশোর কিংবা বালক মেয়ের মত সাজিয়া নৃত্য করে ও গান গাহিয়া থাকে। ...দলের একজন পুরুষ কিশোরী বেশী বালকটির সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নানা লঘু হাস্যপরিহাস ও কৌতুক করিয়া থাকে। দলের মধ্যে এই দুইজন ব্যতীত অবশিষ্ট আর প্রায় সকলেই দোহার। পুরুষ ও নারী-বেশী বালকটির দ্বৈত সঙ্গীত সংলাপের মধ্যে মধ্যে তাহারা ধুয়া ধরিয়া থাকে, কখনও কখনও ছড়া কাটে।"[১]

নারীবেশী বালকটি আঞ্চলিক ভাষায় 'ছোকরা' নামে পরিচিত। এ থেকেই ছোকরানাচের নামকরণ। ঈষৎ পার্থক্য থাকলেও, বলা যায়, ঘাটু নাচ ও ছোকরানাচ পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের পরিবেশ বৈগুণ্যে আঞ্চলিক সংস্করণ মাত্র, উভয়ের উৎসমূল ও উদ্ভবকাল একই হওয়া স্বাভাবিক।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪ (৩য় সং)।

খেমটানাচ

খেমটানাচ হচ্ছে বাঈজীনাচের গ্রামীণ সংস্করণ।[১] বাঈজীরা দক্ষ পেশাদার নর্তকী। তারা নাচ-গান করে গ্রামের জমিদারদের ভোগলালসা নিবৃত্ত করত। বাঈজীনাচের ভাব ভোগসর্বস্ব হলেও আঙ্গিক উচ্চকলার নিদর্শন বহন করে। খেমটানাচের ভাবভঙ্গি আদিরসাত্মক। ঘাটু বা ছোকরা নাচে বালককে নারীর বেশ পরান হয়, এখানে নারীই নর্তকীর বেশ ধারণ করে নাচে। নাচ-গান হল তাদের নেশা ও পেশা।

সঙ্গীতের এক প্রকার তালের নাম খেমটা।[২] খেমটা তালে গানের সাথে নাচও হয় বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। খেমটা গান ও নাচের বিষয় রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম। ঢোল, বাঁশী, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খেমটানাচের কোন নির্দিষ্ট উপলক্ষ নেই। যে কোন সামাজিক ও লৌকিক আনন্দ-অনুষ্ঠানে খেমটা নাচ-গানের আয়োজন হতে পারে। গ্রামের বিয়ের মজলিসে খেমটানাচ বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষায়, "তখন খেমটাওয়ালীদের আদর ছিল রীতিমত। বিশেষ করে মেয়েলী উৎসবে খেমটা নাচকে একটি প্রধান অঙ্গ বলে মনে করা হত।"[৩] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে হিন্দুর পূজোৎসবে খেমটা নাচের চল ছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাৎ করিয়া দিত।"[৪] হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ নাচের সমঝদার ও প্রতিপোষক ছিল। মুসলমান সমাজে মেয়ে মহলেও খেমটা নাচের স্থান ছিল। বগুড়া জেলার একটি আঞ্চলিক মেয়েলী গীতে আছে :

সরুয়া মানুজা দীঘল ক্যাণ,
মানুজা ক্যানে হ্যালে না।

১. গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য, পৃঃ ৩৮

২. খেমটা ছয় মতান্তরে চার মাত্রার তাল, যথা— ধাটে ধেঁ নাতে নে তাটে ধেঁ নাথে নে। অথবা ধাগেধি নাতিন নাগধি নাতিন। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত— বিশ্বকোষ, ৫ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০১

৩. হেমেন্দ্রকুমার রায়— বাংলা নাচ ও উদয়শঙ্কর, মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৫২, পৃঃ ২৮২

৪. উদ্ধৃতি গৃহীত : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৪ (ভূমিকা, ৮ম সং)।

ও খেমটাওয়ালী, তুই নাচোন
ক্যানে জানিস না।
জানি কিনা জানি নাচোন,
ব্যাজ ক্যানে তোল না।[১]

এখানে বাদ্যের তালে তালে কোমর দুলিয়ে নাচার পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত: খেমটানাচ তালবাদ্যের সহিত সঙ্গতি রেখে নাচতে হয় এবং গানের কথাকে অঙ্গভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে হয়। খেমটানাচের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

In this kind of dance (khemta) the most intricate footwork wove into the dance complicated and delightful patterns. The movement of the feet required great agility and long practice. The dancers also brought into play their eyes, as much as any other part of the body, and much movement of the lips which required skilful muscle control in order to convey an impression of effortless balance.[২]

অধুনা খেমটানাচ লুপ্তপ্রায়; কেবল স্থানে স্থানে হিজড়া শ্রেণীর লোকেরা দল গঠন করে এ ধারার ক্ষয়িষ্ণু বিকৃত রূপটি ধারণ ও বহন করে চলেছে। তারা নারী-পোশাকেই সজ্জিত হয়ে নাচে। কখন কখন তারা বিয়ের মজলিসে আহূত হয়; দেশের হাট-বাজারেও নাচ দেখিয়ে রুজিরোজগার করে।

লাঠিনাচ

মহরমপর্বে অনুষ্ঠেয় লাঠিনাচ এক প্রকার যুদ্ধনৃত্য। দেশব্যাপী এর প্রচলন আছে। জারীয়ালদলের মত লাঠিয়ালদল গঠন করা হয়। এতে দৈহিক বল ও কায়দা কানুনের প্রয়োজন হয় বলে বয়স্করা অংশ গ্রহণ করে; তরুণরা থাকে শিক্ষানবিশ হিসেবে। লাঠিনাচের তাল ও ছন্দ রক্ষা করা হয় ঢোল ও কাঁসির সাহায্যে। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ— পায়জামা অথবা মালকোচ মারা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি বা আটসাঁট শার্ট। সুবিধার জন্য

১. উদ্ধৃত: লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৬৫, পৃঃ ৩৯
২. The Folk Dance of India, p. 122

কোমরে ও মাথায় গামছা বাঁধতে পারে। কোন কোন অঞ্চলে পায়ে ঘুঙুর ও ঘেকুর পরার রীতি আছে।[১]

লাঠিনাচে লাঠি একমাত্র উপকরণ নয়, তলোয়ার, ছোরা, থালা প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ে নাচ দেখান হয়। লাঠিনাচ প্রকৃতপক্ষে আধা নাচ, আধা খেলা। লাঠি, তলোয়ার নিয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের ভঙ্গিতে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ দ্বারা এতে বীরত্ব প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ললিত ভঙ্গিমার সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্য আশা করা বৃথা। তথাপি নাচের অংশবিশেষ বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালের কুশলী পদক্ষেপে এবং অগ্রপশ্চাৎ হস্ত ঘূর্ণনে সৌন্দর্য ফুটে উঠে। সাধারণতঃ আসরের প্রথমাংশের যে পাঁয়তারা চলে—এক পায়ের হাঁটু ভেঙে উপরে তুলে এবং অপর পায়ে ঝাঁকানি দিয়ে সামনে এগিয়ে চলার ভঙ্গিমায় নৃত্যোচিত সৌন্দর্য আছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে লাঠির ঘূর্ণন ও ঘাত-প্রতিঘাতে দৈহিকশক্তি ও কৌশল প্রয়োগই মুখ্য হয়ে উঠে। কৃত্রিম দ্বৈতযুদ্ধ ছাড়া নানা ভঙ্গিতে লাঠি ঘুরিয়েও নাচ ও খেলা দেখাতে পারে লাঠিয়াল।

লাঠিনাচে ঢুলিরও একটা ভূমিকা আছে। সে কেবল দক্ষ বাজিয়ে নয়, রসিক নাচিয়েও। লাঠিয়ালের নাচের গতি-লয়-ছন্দ ঢোলকের তালের সংকেত অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। একটা পূর্ণ নাচের কখন কোন অংশ নাচতে হবে ঢুলি তাল দিয়ে তা বলে দেয়। অর্থাৎ নাচের আরম্ভ, পাঁয়তারা, দ্বন্দ্ব, বিরতি ইত্যাদি এক এক অংশ ঢুলির তালের ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে।

লাঠিনাচ পুরুষের একক অথবা দ্বৈতনাচ। নাচের সঙ্গে কোনরূপ গান হয় না। পায়ের গতিভঙ্গি এবং হাতের ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গের ক্রিয়া এতে তেমন নেই। হাতের লাঠি সামনে, পিছনে, দুপায়ের মাঝে মাথার উপরে দ্রুত ঘুরানোর মধ্যে যথেষ্ট বীরত্বের ভাব আছে। বিভিন্ন কৌশলে লাঠিনাচ হয়। প্রতিটি লাঠিনাচ ধীর লয়ে শুরু হয়, শেষ পর্যায়ে লয় দ্রুত হয় এবং এত দ্রুত হয় যে, তখন নাচের সৌন্দর্য থাকে না, শৌর্যবীর্য প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠে। নাচ শুরু করে একটি কৌশল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কৌশলে যাওয়া যায় না।

জারিয়ালদলের মতই মহরমের চাঁদের দশ দিন ধরে লাঠিয়ালদল বাড়ির উঠানে উঠানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দরগাহতলায় এবং শেষদিন কৃত্রিম

১. গ্রন্থে প্রদত্ত লাঠিনাচের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

কারবালায় নাচের আসর জমায়। গৃহস্থরা লাঠিয়ালদের পয়সা অথবা চাল-ডাল দিয়ে পুরস্কৃত করে।

ঢালিনাচ

ঢাল দিয়ে নাচ হয় বলে এর নাম ঢালিনাচ। এটি পুরুষের যুদ্ধনৃত্য। ঢাল এবং লাঠি এর প্রধান উপকরণ। বেতের ঘন বুনোটে তৈরি ঢাল, দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত; বাঁশের শক্ত অংশ নিয়ে লাঠি তৈরি। লাঠিনাচের কোন অংশ যুদ্ধের, কোন অংশ যুদ্ধের নয়—নিছক ব্যক্তিগত একক কৌশল হতে পারে। কিন্তু ঢালিনাচের সর্বাংশই দ্বৈতযুদ্ধের অভিনয়।

ঢালিনাচে কোন সঙ্গীত নেই, কিন্তু বাদ্য আছে। ঢোল এবং কাঁসি নাচের তাল জোগায়, নট তালে তালে পা ফেলে নাচের প্রেরণা লাভ করে। দৈহিক শক্তির কসরত এবং কলাকৌশলগত চেষ্টাতেই এ নাচের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। নাচের সূচনায় প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় আখড়ায় কিছুক্ষণ পাঁয়তারা কষে। আখড়ার দুপাশে অর্ধচাপের মত স্থান জুড়ে তারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণের সুযোগ করে নেওয়ার জন্য ঢোল-কাঁসির তালে তালে বিশেষ ভঙ্গিতে পদক্ষেপ করতে থাকে। তারা পরস্পরের দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে এবং হাবভাবে বীরত্ব প্রকাশ করে। এ পাঁয়তারাটুকুতেই প্রকৃত পক্ষে ঢালিনাচের বিশেষত্ব ফুটে উঠে। এরপর তারা এক সময় আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে লেগে যায়, আক্রমণের জন্য লাঠি, আত্মরক্ষার জন্য ঢাল। কখন দাঁড়িয়ে, কখন হাঁটু ভেঙে বসে যুদ্ধের সুযোগ খোঁজে ও আক্রমণ চালায়। ঘাত-প্রতিঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত নাচ থামে না।

লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানে ঢালিনাচ দেখান হয়। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে কিছু পুরস্কার বা পারিতোষিক দেওয়া হয় বটে কিন্তু এর চেয়ে দর্শকের বাহবা দক্ষ নাচিয়ের বড় পাওনা। এর জন্য নাচের সৌন্দর্যটুকু তারা নষ্ট হতে দেয়নি। যশোহর ও খুলনা জেলার ঢালিনাচের প্রচলন আছে।

রায়বেঁশেনাচ

রায়বেঁশেনাচ লাঠিনাচের অনুরূপ যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ নাচ। 'রায়বাঁশ' নামক এক প্রকার শক্ত বাঁশের তৈরি লাঠি নিয়ে এ নাচ হয় বলে

এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। রায়বেঁশে মূলতঃ হিন্দুদের নাচ: ডোম, বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এতে অংশ গ্রহণ করে। বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদে এর প্রচলন আছে।[১] বীরভূমের মুসলমানরা রায়বেঁশে নাচে অংশ গ্রহণ করে বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন।[২] আবদুল হালিম সাহেবের মতে বাংলাদেশের সীমান্তের জেলাগুলিতে এ নাচ দেখা যায়। তিনি রায়বেঁশেনাচের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন:

It is usually performed by menfolk standing in a ring indicating by various guesture of the arms and hands, the drawing of bows, the hurling of spears, the brandishing of swords or the movements of horsesmen, all keeping in times. Sometimes the dancers perform in pairs, one man supporting another on his shoulders, both dancers simultaneously performing the same movements of arm and hand. The Raibeshe is acrobatic dancing, remarkable for agility, valour and austere grace.[৩]

অন্যান্য যুদ্ধনাচের মত রায়বেঁশেনাচেও ঢোল ও কাঁসি বাজিয়ে তাল রক্ষা করা হয়।

ডাকনাচ

ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ডাকনাচের প্রচলন দেখা যায়। এটা পুরুষের যুদ্ধনৃত্য। এ নাচের ভেতর দিয়ে সঙ্গীদের যুদ্ধে আহ্বান করা হয়। ডাকগানের সঙ্গে ডাকনাচ চলে। ডাক প্রকৃতপক্ষে গান নয়, উচ্চৈঃস্বরে একটানা কণ্ঠধ্বনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্বনি ও লয়ের নির্দিষ্ট মাপে তা উঠা-নামা করে। এই গান বা কণ্ঠধ্বনির জন্য একটি পূর্ণ ও চরম শ্বাসের প্রয়োজন হয়।

১. The Folk Dance of India, p. 130
২. বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩
৩. A. Halim—Music and Dance of East Pakistan, East Pakistan a Profile (Ed. by S. S. Hussain), Orient Longman Limited, Dacca, 1962, P. 138

ডাকনাচ পুরোপুরি সামাজিক নাচ। গোষ্ঠী বা সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত যে সতর্কতা ও যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল, তার ছায়ানুপাতে ডাক নাচের উদ্ভব হতে পারে। বর্তমানে মুসলমানরা এ নাচের প্রতিপোষক। লাঠি ডাকনাচের একমাত্র উপকরণ। নাচের তিনটি অংশ— ডাক, নাচ ও খেলা। শেষ পর্বে লাঠি নিয়ে যুদ্ধের যে দৈহিক কলাকৌশল দেখান হয়, তা লাঠি খেলার অনুরূপ।

'সরকার' যখন প্রথম ডাক শুরু করে তখন অকস্মাৎ মনে হতে পারে, শত্রুরা বুঝি হানা দিয়েছে; টের পেয়ে আশেপাশের সহচরদের ডাক দিয়ে সে সচেতন ও সতর্ক করে দিচ্ছে। দলের প্রধান ব্যক্তি 'সরকার' নামে অভিহিত।

ডাকনাচের সরকারের পার্শ্বচর হিসেবে দু'তিন জন লাঠিয়াল থাকে। সরকারের ভূমিকাই সজীব ও প্রধান। পার্শ্বচরদের কাজ হল, ডাকের ফাঁকে ফাঁকে সমস্বরে এক প্রকার অর্থহীন ধ্বনি তুলে সাড়া দেওয়া এবং লাঠিখেলার অংশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা নেওয়া।

সরকারের পোশাকে জাঁকজমক আছে। যুদ্ধের উপযোগী দেশীয় আঁটসাঁট পোশাক, মাথায় লাল শালু অথবা রঙিন গামছা জড়ান, পায়ে নূপুর বাঁধা। এতে কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। লাঠি নিয়ে ডান হাত সামনে প্রসারিত করে, পার্শ্বভাগে ঈষৎ বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সরকার ডাক দিতে দিতে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে, আবার দোল খেয়ে পায়ের পাতায় ভর করে আধা বসে আস্তে আস্তে উঠতে থাকে। এভাবে সমস্ত আখড়াটা মাঝে মাঝে চক্রাকারে বা অর্ধচক্রাকারে ঘুরে ফিরে কিছুক্ষণ ধ্বনিমুখর করে রাখে; তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বীরোচিত ভাব। এরপর কৃত্রিম দ্বৈত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নাচ শেষ হয়।

বলীনাচ

চট্টগ্রাম জেলায় চৈত্রসংক্রান্তির পর থেকে বৈশাখ মাস ধরে মাঠে-ময়দানে কুস্তির লড়াই হয়, তাকে 'বলীখেলা' বলে। এটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। মুর্শিদাবাদেও প্রতি-যোগিতামূলক কুস্তির খেলা হয় চৈত্র মাসের দিকে। এ খেলার আয়োজন, ঘোষণা, প্রতিযোগিতার উপহার সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের জন্য আঞ্চলিক

পরিচালক সমিতি আছে; সরকারের কাছ থেকে সমিতি এ উপলক্ষে বাৎসরিক অনুদান পায়। খেলাটি ঐ অঞ্চলে 'লড়না' নামে পরিচিত।[১] লড়না ও বলীখেলা যে একই অনুষ্ঠান, তাতে সন্দেহ নেই। উভয়ের উৎসও একই হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার দিন লোকে মাঠে জমায়েত হয়, এ সম্পর্কে আগেই ঢোল-সহরত করা হয়। প্রতিযোগীরাও সমবেত হয়। আখড়ায় বিচিত্র তালে ঢোল ও কাঁসি বাজতে থাকে। দু'রকমের কুস্তি হয়—'বাঁধা কুস্তি' ও 'ছাড়া কুস্তি'। দুজন প্রতিযোগীকে নির্বাচন করে তাদের মধ্যে যে লড়াই হয়, তাকে 'বাঁধা কুস্তি' বলে। একজন আখড়ায় নেমে খোলা চ্যালেঞ্জ দেয়, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সে লড়বে; একে মুর্শিদাবাদে 'আখড়া ছুট্টি' বলে।[২] যতক্ষণ পর্যন্ত না পরাজিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে লড়েই চলেছে, বরাবর অপরাজিত থাকলে তবে সে শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের খ্যাতি অর্জন করে। এটাকেই 'ছাড়া কুস্তি' বলা হয়। যারা খ্যাতিমান, দীক্ষিত এবং কুশলী, সাধারণতঃ তারাই এরূপ চ্যালেঞ্জ দেয় ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আখড়ায় নামা মাত্রই লড়তে শুরু করে না; তারা কিছুক্ষণ বাদ্যের তালে তালে পাঁয়তারা করে। এই পাঁয়তারাটুকু হয় অর্ধচন্দ্রাকারে পরস্পরের মুখোমুখি বিপরীত গতিতে। এতে আছে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তালঠুকা, হুঙ্কার, হাতের কসরত এবং চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি। এর সবটুকুতেই আছে শৌর্যবীর্যের ভাব। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয় এবং এক সময় কুস্তিতে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন প্যাঁচে লড়াই হয়, একজন চিৎ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলে। যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করে ফেলে দেয়, তারই জয় হয়। কুস্তির আগে পর্যন্ত পাঁয়তারার অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে নাচের পর্ব: আর একেই চট্টগ্রামে 'বলীনাচ' বলা হয়। এ নাচে ঢুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তার তালের বিভিন্ন বোলে পালোয়ানের গতিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়। ঢুলির বোলই শেষ পর্যন্ত তাদের কুস্তির মুখে ঠেলে দেয়। লাঠিখেলার ঢুলির সাথে তার এক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে।

লড়না বা বলীখেলা ধর্ম-সমাজনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এতে যোগদান করে এবং দক্ষ ব্যক্তি পুরস্কৃত

১. নিজস্ব সংগ্রহ।
২. ঐ।

হয়। আখড়াটি যেন একটি মিলনক্ষেত্র, সকল শ্রেণীর মানুষ ভেদাভেদ ভুলে কুস্তি খেলার ও কুস্তি দেখার আনন্দোপভোগ করে। সম্ভবতঃ খেলাটির উৎপত্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক উপলক্ষ ছিল না। হিন্দুসমাজে পূর্ব হতেই মল্লযুদ্ধ ছিল। মুসলমানরাও কুস্তির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। কুস্তি ফারসী শব্দ। পূর্বে মল্ল ও কুস্তি দ্বৈতযুদ্ধের (duel) বিষয় ছিল; দলের জয়পরাজয় তাতেই নির্ধারিত হত। 'সেক শুভোদয়া'র মদন মল্লবীর ছিল। ধর্মমঙ্গলের লাউসেন মল্লযোদ্ধা ছিল।[১] খুব সম্ভব তখন পর্যন্ত এটি যুদ্ধের অঙ্গ ছিল। এটি খেলার অঙ্গে পরিণত হয়েছে ঐ সময়ের পরে। যুদ্ধের কাজে অস্ত্রশস্ত্র ও কৌশল পাল্টে গেলে পরে মল্লযুদ্ধের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা লোপ পায়। মুঘলরা ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, বল্লম-বর্শার সাথে বন্দুক-কামানের গোলা-বারুদেরও আমদানী করে। তাদের ভারত-বিজয়ের অন্যতম কারণ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার। মল্ল বা কুস্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খেলার আখড়ায় তখন থেকে স্থান লাভ করতে পারে। বাংলাদেশে বলীখেলা ও বলীনাচের উৎপত্তির সম্ভবতঃ এটাই ইতিহাস।

---

১. সেখ শুভোদয়ার লেখক হলায়ুধ মিশ্র লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। এই সূত্রে গ্রন্থখানি বার শতকের রচনা হতে পারে। ধর্মমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ময়ূরভট্ট সতের শতকের লোক ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশে মুঘল বিজয় চূড়ান্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

লোক বাদ্যযন্ত্র

সঙ্গীতের জগৎ মূলতঃ সৌন্দর্যের জগৎ। দৈনন্দিনতার স্পর্শমুক্ত, তুচ্ছতার উর্ধে সৌন্দর্যসাধনায় মানবমনের যে ধ্যান, সঙ্গীত তারই অমূর্ত আবহ রচনা করে চিত্ত শুদ্ধি ও সিদ্ধির পথ দেখায়। এজন্য সঙ্গীতসাধনা সংস্কৃতিচর্চার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়—"সৌন্দর্যসৃষ্টি করাই হচ্ছে মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এদের সবচেয়ে সুলভ, সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে সঙ্গীতের সুর। গান কানে কানে মধু বর্ষণ করে, প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনি তোলে, মনে মনে মোহ ছড়ায়, আত্মায় আত্মায় প্রেম জোগায়।"[১] অর্থাৎ মানবজীবনবোধে সঙ্গীতের প্রভাব যেমন ব্যাপক, তেমনি সঙ্গীতচর্চার ভেতর দিয়ে মানবজীবন পূর্ণতা ও সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গীতচর্চার দ্বারা মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতম বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হয়। সঙ্গীতহারা জাতি মূক প্রাণীর মত মূঢ়।

কণ্ঠসঙ্গীত বা গান, যন্ত্রসঙ্গীত বা তান শিল্পকলার অতি শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রসসৃষ্টি। সুরের ছন্দসুষমায় ইন্দ্রিয়সুখকর মায়ালোকে মনকে আকর্ষণ করাই গানের ও তানের উদ্দেশ্য। সুশৃঙ্খলিত শিল্পসৃষ্টি বলতে সঙ্গীত কৃত্রিম জীবনপ্রয়াস নয়, প্রাত্যহিক জীবনস্পন্দনে যে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ-দোলা অর্থাৎ দৈনন্দিনের কাজকর্মে, হাসিকান্নায়, চাল-চলনে যে অসংবৃত ছন্দবেগ, সঙ্গীতকলায় তাকেই সুষমিত করা হয়। জীবনধর্মী সকল শিল্পকলারই এটা সারকথা। যন্ত্রকে মানুষ আয়ত্তে এনে সুললিত ধ্বনি সৃষ্টি করে। অনায়ত্ত বাদ্যধ্বনি সোরগোল, সুরতান নয়। সুরসৃষ্টিই বাদ্যযন্ত্রের মূল লক্ষ্য। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত সঙ্গীতকলার দুটি পরস্পরিত

---

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত—মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ ক (ভূমিকা)।

অঙ্গ, তবে পরস্পর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যন্ত্র ছাড়া গান, বা কণ্ঠ ছাড়া তান সৃষ্টি একেবারে অসম্ভব নয়। কথাকে কণ্ঠ ও যন্ত্র দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। কেবল উভয়ের সংমিশ্রণে সুর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে, সুরের মাধুর্য বাড়ে।

বাদ্যযন্ত্র কেবল সুর সৃষ্টি করে না, তাল সৃষ্টিও করে। নৃত্যচ্ছন্দে বাদ্যের তালসঙ্গত অপরিহার্য। সঙ্গীতের মহিমা সুরমূর্চ্ছনায়, নৃত্যের ঐশ্বর্য সুললিত ছন্দে। বাদ্যধ্বনি সে ছন্দ জোগায়। বাদ্যের তালে তালে নৃত্য। বাদ্যের ধ্বনি ও তাল নৃত্যসৌন্দর্যকে কানে পৌঁছিয়ে দেয়। বাঁশীর সুর, বীণার ঝঙ্কার যেমন সঙ্গীতের মায়াজাল রচনা করে, নূপুরের নিক্কণ, ঘুঙুরের শিঞ্জন তেমনি নৃত্যের মন্ত্রপুরী রচনা করে। তালবাদ্য নৃত্যে কেবল ছন্দ আনে না, গতিও আনে। নৃত্য যাতে বেতাল হয়ে না যায়, গতিহারা না হয়, সেজন্য বাদ্যযন্ত্রের সুষমসঙ্গত প্রয়োজন।

সঙ্গীতে ও নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ব্যাপকতা ও প্রাধান্য থাকলেও, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাদ্যধ্বনির উপযোগিতা উপলব্ধি করেছে মানুষ। অবশ্য এর মৌলিক উদ্দেশ্য যে তান ও তাল সৃষ্টি তা সর্বত্রই অব্যাহত। কলানৈপুণ্যের দিক থেকে ভেদ বা তারতম্য আছে। ধর্মকর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। নৃত্য-সঙ্গীতে আছে শিল্পকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসাধনা, রূপরস সৃষ্টির প্রয়াস; কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে আছে ব্যবহারিক জীবনের স্থূল উদ্দেশ্যসাধন, প্রয়োজনসিদ্ধির গতানুগতিক বহিঃপ্রেরণা। সঙ্গীত-আসর বা নৃত্যমঞ্চের অন্তরঙ্গতায় বাসনাতৃপ্তির যে ধ্যানমগ্ন অবকাশ ও অবসর, শোভাযাত্রার জীবন-উল্লাস ও যুদ্ধক্ষেত্রের জীবনসন্ত্রাসে নিশ্চিন্ত মনোসংযোগের নিবিড়তার সে সুযোগ নেই। অতএব বাদ্যযন্ত্র এখানে কলাসাধনায় নয়, কর্মসম্পাদনায় নিয়োজিত।

কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বাদ্যধ্বনি আবশ্যক অঙ্গরূপে পরিগণিত। হিন্দুমন্দিরে আরতির সময় ঘন্টাধ্বনি করা হয়। বৌদ্ধমন্দির ও খ্রীস্টান গীর্জাতেও ঘন্টা দিয়ে পূজার লগ্ন ঘোষণা করা হয়। খোল-মন্দিরা-করতাল ছাড়া বৈষ্ণবদের কীর্তনের আসর বসে না। কীর্তন তাদের ধর্মসাধনার অঙ্গ। ঢাক-ঢোল-কাঁসর ছাড়া হিন্দুদের পূজামণ্ডপ জমে না। ঢাকে বাড়ি দিয়েই দুর্গাপূজার উদ্বোধন।

হিন্দুধর্মে দেবদেবীর পরিকল্পনার মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। হিন্দুরা সঙ্গীতকে 'দেবদত্ত' বলে মনে করে।[১] তাদের সামাজিক উৎসবেও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে। শঙ্খ, সানাই, ঢোল ও কাঁসর না বাজলে বিবাহানুষ্ঠান মঙ্গলজনক হয় না। বরবধূ বরণ করা হয় শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে। শঙ্খ বাজিয়ে নবজন্মের আবির্ভাব ঘোষণা করা হয়।

শবযাত্রা, শোভাযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রাতেও বাদ্যের প্রয়োজন। হিন্দুরা খোল-মাদল-জুড়ি বাজাতে বাজাতে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। তারা ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে। মুসলমানদের মহরমের মিছিলে ঢোল, কাড়া, কাঁসর বাজান হয়। প্রাচীন যুগে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, শিঙ্গা-দামামা সৈনিকের রক্তে যুদ্ধের নেশা ধরিয়ে দিত। সেনাপতির শিঙ্গায় থাকত যুদ্ধের গোপন সংকেত।[২]

প্রাচীকালে, এমনকি, এযুগেও ঢোল বাদ্যাদি বাজিয়ে সরকারী নির্দেশ বা বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। ব্যবসায়বৃত্তিতে লোকসমাজে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাপুড়ে, 'তুবড়ি' বাজায় ও সাপ খেলায়। তুবড়ির মোহনীয় সুরে সাপ শুধু খেলে না, নাচেও। বানর, ভালুক প্রভৃতি নাচিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকার্জন করে। তাদের বাদ্যের নাম 'ডুগডুগি'। ডুগডুগির বোলের সাথে সাথে বানর নাচতে থাকে, খেলতে থাকে। পায়ে 'ঘুঙুর' ও হাতে 'ঘন্টি' বাজিয়ে কোন কোন ফেরিওয়ালাকে ফেরি করতে দেখা যায়। শিশুমন আকর্ষণ করার জন্য বাজিকররা 'ঝুমুর'

---

১. শঙ্খধারী বিষ্ণু, ডম্বরুধারী শিব, ঘন্টাধারী ব্রহ্ম ও মুরলীধারী কৃষ্ণের মূর্তি কল্পিত হয়েছে। বীণাধারিণী সরস্বতীমতিও সুপ্রচলিত। বীণা হাতে রাখেন বলে তাঁর অপর নাম বীণাপাণি। পিনাকযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন বলে মহাদেবের অপর নাম পিনাকী। বাঁশী ছাড়া কৃষ্ণের অন্য বাদ্যযন্ত্র শঙ্খ, যার নাম পাঞ্চজন্য।
জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃঃ ক–গ।

২. সে কালের যুদ্ধের রীতির জন্য বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হত। বাদ্যের তালে তালে সৈনিকরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অস্ত্রের ঝঙ্কার, যোদ্ধার হুঙ্কার মুমূর্ষুর আর্তনাদ বাদ্যের উচ্চরোলে চাপা পড়ে যেত। অধুনা যুদ্ধরীতি পরিবর্তিত হওয়ায় বাদ্যের ব্যবহার লুপ্ত হয়েছে। বিশেষ প্যারেড, আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ, গার্ড অব অনার প্রভৃতি উপলক্ষে পূর্বের রীতি অনুযায়ী আজও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

বাজিয়ে বাইস্কোপ দেখায়। 'জুড়ি' নিয়ে বৈষ্ণববৈরাগী ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে। 'খঞ্জনী' বাজিয়েও ভিখারীদের যাচ্ঞা করতে দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে নানা আচার-সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত আছে। বিশেষ করে, উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে নানা বাছবিচার ও বিধিনিষেধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র শুধু পুজোপাসনার অঙ্গ হিসেবে নয়, একে দেবতাজ্ঞানেই পূজা করার রীতি আদিম উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। পলিনেশিয়রা 'ড্রাম'কে তাদের দেবতা Tane এর ঐশীশক্তির প্রতিভূ বলে অভিহিত করে ও পূজা করে। বাতুম উপজাতি ড্রামকে রাজশক্তির প্রতীক বলে মনে করে।[১] এখানে বাদ্যযন্ত্রের উপর স্বর্গীয় গুণ ও রাজকীয় শক্তি আরোপ করা হয়েছে। ডাচগিনির নিগ্রোরা ড্রামের আত্মা আছে বলে বিশ্বাস করে এবং অনুষ্ঠানাদিতে তার উদ্দেশ্যে মদ্য উপহার দেয়। অরকানোস জাতির লোকেরা মনে করে, ড্রামের রোগ-নিরাময় শক্তি আছে। তারা বাদ্যের ম্যাজিকগুণ সম্বন্ধেও বিশ্বাস পোষণ করে। মন্ত্রাদি দ্বারা ভূতপ্রেত তাড়ানর সময় ক্লিমন্তস্ সম্প্রদায়ের লোকেরা ড্রাম-কাঁসর ব্যবহার করে।[২] কতক বাদ্য শুভ, কতক অশুভ। মালয়বাসীরা মনে করে, ড্রামাদি বাজিয়ে দেবতার আত্মাকে আবাহন করা যায়। অতএব এখানে ড্রাম মঙ্গলজনক বাদ্য। পূজা ব্যতিরেকে মন্দিরে রক্ষিত ঢাক, বাঁশী ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বাজালে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। নিউগিনির মেয়েদের কোন বিশিষ্ট বাঁশী দেখতে দেওয়া হয় না। দেখলে অপমৃত্যু ঘটে বলে তাদের বিশ্বাস।[৩] বাংলাদেশে লোকসমাজেও কোন কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শুভাশুভের সহিত জড়িত। শঙ্খ ও সানাই মাঙ্গলিক বাদ্য। রাত্রের বেলায় বাঁশীর সুর অমঙ্গলজনক। গৃহপ্রাঙ্গণে রাত্রে বাঁশী বাজাতে দেওয়া হয় না। লোকবিশ্বাস, এতে সাপ-ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে।

সুতরাং কি শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়, কি ধর্ম ও সমাজজীবনে, কি ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুচারু

১. James Hastings (ed.)—Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), Vol. IX, p. 6
২. Ibid, p. 6
৩. Ibid, p. 6

বৃত্তি চর্চায় তা মানবচিত্তকে করে আবেশমুগ্ধ, ধর্মবোধে মাঙ্গলিকতায় হৃদয়বৃত্তিকে করে উর্ধ্বগামী, বীর্যে উন্মাদনা আনে, জীবনজীবিকায় সাহচর্য দান করে। এক কথায় বাদ্যযন্ত্র জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব নিরূপণের মূল্যবান উপকরণ।

সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে, ধ্বন্যাত্মক 'নাদ' থেকে বাদ্যের উৎপত্তি।[১] যা হতে সঙ্গীত উপযোগী বাদ্য ধ্বনিত হয়, তাই বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্রের গঠনপ্রণালী ও ব্যবহাররীতির প্রকারভেদ আছে। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে চার শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে।[২] যথা,

১. তত— তার যোগে যে বাদ্য বাজে : একতারা, দোতারা, বীণা, সেতারা, সারেঙ্গী ইত্যাদি।

২. শুষির---ফুঁ দিয়ে যে বাদ্য বাজে : বাঁশী, শঙ্খ,সানাই, শিঙ্গা ইত্যাদি।

৩. ঘন— ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজান হয় : কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, ঘন্টা ইত্যাদি।

৪. আনদ্ধ— চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজান হয় : ঢাক, ঢোল, খোল, মাদল, খঞ্জরী, ডুগডুগি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যথা,

১. String Instrument— সুতা বা তার যোগে ধ্বনিত বাদ্য : ভায়োলীন, গীটার, পিয়ানো ;

২. Wind Instrument—ফুঁ বা বাতাসের সাহায্যে যে যন্ত্র বাজান হয় : হারমনিয়াম, একর্ডিয়ান, ট্রাম্পেট, মাউথ অর্গান ;

৩. Instrument of Percussion— আঘাত দিয়ে যে বাদ্য বাজে : ড্রাম, বেল, গং ইত্যাদি।[৩]

পাশ্চাত্য মতে বাদ্যযন্ত্রের বিভাগটি বাদ্যরীতি ও ধ্বনিনিনাদের দিক থেকে করা হয়েছে। এরূপ বিচারে প্রাচ্যের 'ঘন' ও 'আনদ্ধ'

---

১. নারায়ণ চৌধুরী—সঙ্গীত পরিক্রমা, পৃঃ ২

২. বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৮৩

৩. ERE, p. 8

বিভাগ দুটি প্রতীচ্যের একই বাদ্যের (Percussion Instrument) শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। তবে অন্য দুটি বিভাগ উভয় অঞ্চলে অভিন্ন। পণ্ডিতগণ মনে করেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র সর্বাগ্রে আবিষ্কৃত হয়। ড্রাম বাদ্যাদি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। কাঠের ফাঁপা গুঁড়ি ড্রামের আদি উৎস। এর পরে তত্ত বা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হয়। ভারতীয় বীণা ও ইউরোপীয় হার্প প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। শুষির শ্রেণী বাদ্যের উদ্ভাবন সবশেষে হয়েছে।[১] শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রদত্ত উপকরণে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। শঙ্খ, শিঙ্গা থেকে যে সুরধ্বনি উঠে তা তেমন সুমিষ্ট নয়, লোক-জীবনাচারে এগুলির অধিক ব্যবহার দেখা যায়। বাঁশীর সুর সুমধুর। তা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য বাঁশী মানুষের পরিণত মনের আবিষ্কার বলে ধরা হয়।

বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে। অনার্যরা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহাব করত কিনা এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বাংলার উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে যে সব বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়, তার কোন কোনটি প্রাচীন কালের হতে পারে। বিশেষ করে, চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র মানুষের প্রাচীন কালের আবিষ্কার। বাংলাদেশে ঢাক-ঢোলকাদি যারা তৈরি করে, তারা হিন্দু সমাজের অতি নীচ সম্প্রদায়ের লোক। তারা তপশীলীভুক্ত চর্মকার সম্প্রদায়। এদের রক্তে অনার্যপ্রবাহ আছে। প্রাচীন কালে লৌকিক জীবনসাধনায় ও ধর্মসাধনায় উৎসবানুষ্ঠানের এরাই আয়োজন করত ও তাতে অংশ গ্রহণ করত। কৃষিসভ্যতার পত্তন করে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাঙালী জনপদ এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বাহক ও প্রতিপোষক ছিল। লোকায়ত জীবনধারার নানা মটিফ, শিল্পকৃতির প্রাপ্ত নিদর্শন এবং ভাষা সম্পদের বস্তুব্যঞ্জনা থেকে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা দুসাধ্য নয়। অষ্টম শতকের পাহাড়পুর-ময়নামতীর প্রস্তর ফলক ও পোড়ামাটির চিত্রের মধ্যে লোকায়ত ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। পোড়ামাটির চিত্রগুলি এদেশের লোকশিল্পীর অবদান। এতে নৃত্য-বাদ্যরত মনুষ্য মূর্তি পাওয়া গেছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশী,

১. Ibid, p. 7

মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি চিত্রে দেখা যায়।[১] রাজেশ্বর মিত্র ঢাক, ডম্ফ, ডমরু, প্রভৃতি 'চর্মবাদ্য' এবং বাঁশী, শিঙ্গা, তুবড়ি প্রভৃতি 'ফুৎকার বাদ্য'কে দ্রাবিড়ির গোষ্ঠীর অবদান বলে মনে করেন।[২] অনার্যোত্তর প্রাচীন বাংলায় (বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট) সঙ্গীতাদির নিদর্শন সংস্কৃত গ্রন্থ, প্রস্তর ফলক ও মন্দিব গাত্রে অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি। এছাড়া বাংলা ভাষায় বচিত দু' একখানি গ্রন্থেও রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্রেব নাম-পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধযুগে সঙ্গীত বিষয়ক অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে ভরত মুনির 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' (পাঁচ শতক), লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' (বার শতক), সন্ধ্যাকব নন্দীব 'রামচরিত' (এগার শতক), শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' (তের শতক) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্বভারতীয়। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে গীত-নৃত্য-বাদ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত নিদর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ। চর্যাপদ গীতের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, পদশীর্ষে বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখই তার প্রমাণ।[৩] চর্যাগীতেব মধ্যে নট-নৃত্য-বাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। চর্যার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদে মোট সাতটি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা বীণা, পটহ, মাদল, করণ্ড. কসালা, দুন্দুভি এবং ডমরু; এগুলির মধ্যে পটহ, মাদল, করণ্ড, কসালা ও দুন্দুভি বিবাহোৎসবে বাজান হত বলে বর্ণিত হয়েছে। বীণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এটি শুকনো লাউয়ের সহিত তাঁতের তার দিয়ে তৈরি; সারি বা ছড় দিয়ে তা বাজান হত।[৪]

১. নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ৫৪৪
২. রাজেশ্বর মিত্র—বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), পৃঃ ২-৪
৩. চর্যাব পঞ্চাশটি পদে সর্বমোট উনিশটি রাগের নাম পাওয়া যায়। রাগগুলি এরূপ: পটমঞ্জরী, গবড়া, গউড়া, অরু, গুঞ্জরী, কাহ্নগুঞ্জরী, দেবক্রী, রামক্রী, দেশাখ, ভৈরবী. কামোদ, ধানসী, মালসী, মালসী গবুড়া, মল্লারী, শবরী, গুর্জরী, বরাড়ী ও বঙ্গাল।
৪. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত—Budhist Mystic songs গ্রন্থে ১৭, ১৯ ও ৩১ নং পদ দ্রষ্টব্য।

শূন্যপুরাণের এক স্থানে 'বিয়াল্লিস বাজনা'র উল্লেখ আছে, সেখানে কেবল জয়ঢাক ছাড়া অন্য বাদ্যের নাম পাওয়া যায় না।[১] তবে গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি বাদ্যের নাম পাওয়া যায়, যথা—ঢাক, ঢোল, কাড়া, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডম্বুরু, দুন্দুভি, বরঙ্গ, ভোর, খিরকালি, শঙ্খ ঘন্টা, শিঙ্গা, জয়ঢাক, দামামা ও খমক। এগুলির অধিকাংশ ধর্মপূজার ব্যবহৃত বাদ্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।[২] শেষের বাদ্য দুটি প্রক্ষিপ্ত। দামামা ও খমক ফারসী শব্দ। মুসলমানদের আগমন, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের পরে এগুলির চল হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি উত্তম গীতিনাট্য। এর প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এতে রাগতালের আধিক্য থাকলেও বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ খুব কম। মুরল বা মোহন বাঁশীর কথা বেশি আছে। বংশীখণ্ডের একটি পদে বাঁশী ছাড়া অন্য দু'টি বাদ্যের নাম পাওয়া যায়—করতাল ও মৃদঙ্গ। বাদ্যদ্বয় কৃষ্ণের নাচের তালবাদ্যরূপে স্থাপিত হয়েছে।[৩]

মুসলিম বিজয়কে কেন্দ্র করে ত্রয়োদশ শতক থেকে মধ্যযুগের সূচনা হলেও এদেশীয় শিল্প-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের প্রভাব পড়েছে অনেক পরে। চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে দেশবাসী সংস্কৃত চর্চায় মনোযোগী হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১০ খ্রী:) সঙ্গীত রসিক ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক মাহুয়েন রাজধানী গৌড়ে প্রভাতী সঙ্গীতের

---

১. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত—শূন্যপুরাণ, পৃ: ৬৭

২. দৃষ্টান্ত :

বাজএ জএঢাক মেঘর সম ডাক
সুনিতে সুধনি বাজনা।
মদঙ্গ কাড়া বাজে কুলর মালা সাজে
আনন্দেত ধর্ম্মর পূজনা॥

ঐ, পৃ: ৭৮

৩. দৃষ্টান্ত : খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥
—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (বংশীখণ্ড)।

বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁব বর্ণনা মতে, 'একদল গায়ক ছিল যন্ত্রসঙ্গীতে সুনিপুণ। প্রত্যেক দিন ভোববেলা তারা সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িতে গিয়ে সানাই, ঢোলক বাজিয়ে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করত।"[১] সানাই এবং ঢোলক মুসলমানদের অবদান বলে ডঃ শহীদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন।[২] মাহুয়েনের দুবছর পরে ফেইসিন গৌড়ের রাজদরবারে ভোজসভায় নর্তকী ও গায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন। এরা পোশাকে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নাচত ও স্থানীয় লোকসঙ্গীত গাইত।[৩]

ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় কীর্তনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বৈষ্ণবদের সঙ্গীতসাধনা এরই ভেতর দিয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। কীর্তনের 'তালপদ্ধতি' উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরূপ, কিন্তু 'আখর-পদ্ধতি' লোক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বহন করে।[৪] কীর্তনের প্রধান বাদ্য খোল, করতাল ও মন্দিরা। শঙ্খ, ঘন্টা প্রভৃতি বাদ্যও ঐকতান সৃষ্টিতে কীর্তনে ব্যবহৃত হয়।[৫] এগুলি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র।

পনব শতকের শেষ ও ষোল শতকের গোড়াব দিক থেকে বাংলার হিন্দু লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন কবে কাহিনীকাব্য রচিত হতে থাকে। এগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্য সমাজে গীত আকারে পরিবেশিত হয়। কাব্যগুলিতে গীতবাদ্যের বহুল বর্ণনা আছে। রাজেশ্বর মিত্র 'বাংলার সঙ্গীত' (মধ্যযুগ) গ্রন্থে মধ্যযুগের কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবনী থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে মোট ৬৬টি বাদ্যযন্ত্রেব তালিকা নির্ণয় করেছেন। তাঁব হিসাব মতে যন্ত্রগুলির নাম নিম্নরূপ :

তত—সপ্তস্বরা, স্বরমণ্ডল, রুদ্রবীণা, কপিলাস, মধুস্রবা, যন্ত্র, রবাব, পিনাকী, বল্লকী, সেতার, দোতারা, খমক।

১. মমতাজুর রহমান তরফদার—চৈনিক পর্যটকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, পৃঃ ৩৯-৪০

২. Traditional Culture in East Pakistan, P. 109

৩. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, পৃঃ ৩৯

৪. রাজেশ্বর মিত্র—বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৩

৫. শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবতে আছে,

শঙ্খ ঘন্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল
সংকীর্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥

উদ্ধৃত: বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৯

আনদ্ধ— দুন্দুভি, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, বীরঢাক, বীরকালি, পটহ, লগড়, ঢাক, ডমরু, কাড়া, পাখোয়াজ, ডম্ফ, খঞ্জরী, মুরজ, ভেরি, আনক, দামামা, দড়মসা, ঢোল, মর্দল, জগঝম্প, মোড়া, ছাপড়, জোড়া, টমক।

শুষির— শঙ্খ, শিঙ্গা, সানাই, কাহাল, মহুরী, উপাঙ্গ, করনাল, বিষাণ, বেণু, তুরি, তুরঙ্গ।

ঘন—করতাল, মন্দিরা, ঘন্টা, বীরঘন্টা, কাংস্য, ঝাঁঝর, মুচঙ্গ।

অজ্ঞাত পরিচয়— মঙ্গল, বরগো, পঞ্চশব্দী, চন্দ্রতারা, চন্দ্রহাস, ধুসরী, বেণী, রামবেণী, দোখণ্ডি, ঠনক।[১]

এগুলির কোনটি লোকবাদ্য, কোনটি উচ্চবাদ্য তা কবিগণ উল্লেখ করেননি, তাঁরা কেবল উপলক্ষের কথা বলেছেন।[২] তাঁদের বর্ণনা অনুসারে প্রধানতঃ পুজা, লৌকিক ও সামাজিক নানা মঙ্গল অনুষ্ঠানে এবং যুদ্ধে বাদ্যগুলি ব্যবহৃত হত।

মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গীতকলায় মুসলমানদের অবদান অতুল। মুসলিমপূর্ব যুগে ভারতীয় চিন্তাধারায় সঙ্গীত তথা শিল্পকলা ছিল ধর্মনির্ভর। মরমীবাদী সুফীগণ সঙ্গীতকে সাধন-ভজনের অঙ্গ বলে মনে করলেও বৃহত্তর মুসলমান সমাজে সাধারণভাবে সঙ্গীত সুচারু সৌন্দর্যসাধনা ও আনন্দোপভোগের সামগ্রী হিসেবে আদৃত ছিল। আনন্দের আয়োজনে মুসলমানগণ গীতবাদ্যকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে একদিকে যেমন এর প্রচার ব্যাপক করেছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন ভাব-বিষয়-রূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে একে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। দিল্লীর স্বয়ং বাদশাহরা সঙ্গীতের অনুরাগী ও

১. ঐ, পৃঃ ৩৯
বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে রবাব, সেতার, খমক, দামামা, সানাই প্রভৃতি ফারসী শব্দ; সুতরাং এগুলি মুসলমানদেরই অবদান। মঙ্গলকাব্যগুলি এদেশে মুসলমান শাসনামলে রচিত হয়।

২. রাজেশ্বর মিত্র বাদ্যগুলির পরিচয় দান প্রসঙ্গে দু'একটিকে গ্রাম্য বা দেশী বলে চিহ্নিত করেছেন, যেমন খমক, দোতারা, পটহ প্রভৃতি। কিন্তু এছাড়াও ঢাক, ডমরু, খঞ্জরী, শঙ্খ, মন্দিরা, ঘন্টা প্রভৃতি বাদ্য বাংলার লোকসমাজে বরাবর ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
ঐ, পৃঃ ৫২, ৫৭

প্রতিপোষক ছিলেন।[১] ভারতের কোন কোন সুফী-সাধক সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। বাহাউদ্দিন জাকারিয়া প্রমুখ সুফী দরবেশ যুগপৎ সাধক ও গায়ক ছিলেন। চিশতিয়া তরিকার সুফীরা সঙ্গীত অনুশীলন করত।[২]

ষোল শতকে বাংলাদেশে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর ভারতের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়, এতে ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হয়। মুসলমানী গীতবাদ্যের সহিত বাঙালী নতুন করে পরিচয় লাভ করে। সে সময় থেকে বাংলাদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রচিত কয়েকখানি সঙ্গীত বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলিতে রাগ-তাল-বাদ্য সম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সতের শতকের কবি আলাওল, আঠার শতকের কবি আলী রজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।[৩] বলা বাহুল্য তাঁরা শিক্ষিত কবি। তাঁরা যেসব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি মঙ্গলকাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। কবিদের বর্ণনা অনুসারে বাদ্যগুলি সঙ্গীত ও নৃত্যের সুর ও তাল সঙ্গত হিসেবেই ব্যবহৃত হত।[৪] আহমদ শরীফ

১. আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ), বাবর (১৫২৬-৩২ খ্রীঃ), আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী), জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৬ খ্রীঃ) সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন।
মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ জ (ভূমিকা)।

২. ডঃ আবদুল হালিম—পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪, পৃঃ ৫

৩. মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ য (ভূমিকা)।

৪.
দগর নাগর ঢোল যত বাদ্যধ্বনি
রবাব দোতারা বংশী সানাই বেণুনি।
ভেউর কন্নাল যথ রস বাদ্য রঙ্গ
পিনাক ডম্বুর বেণু কর্তাল মৃদঙ্গ।
নহবত ঝাঝরি বাদ্য যথেক সংসারে,
বাজ্ঞ কৈল হনুমান হোস্তে করতারে। —আলী রজা

উদ্ধৃত: ঐ পঃ ৫-৬

খোল মৃদঙ্গ বাদ্য জয়দ মঙ্গল
পদ্মাঝারি করতালি দবাই পাগল।
ঢোল দগর জয় সানাই মধু বীণা
তারপরে আসাবরি হএ দাসী আনা।
খটক ডমুকা বাদ্য ভেউর কন্নাল
তারপরে আছোয়ারি হয়ে গরমাল। —নাসির মুহম্মদ

উদ্ধৃত: ঐ, পৃঃ ৯১.

সাহেবের মতে, রাগ-তাল-বাদ্যের বর্ণনায় মুসলমান কবিগণ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১]

এরপর ইংরেজদের আগমনে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রভাব তখন থেকে পড়তে থাকে। হারমনিয়াম এদেশে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পল্লীর অশিক্ষিত লোকেরা আজও নিজেদের গান-বাজনায় হারমনিয়াম ব্যবহার করে।

উপরের বাদ্যযন্ত্রেব ঐতিহাসিক পর্যালোচনাটি বাংলার লোকবাদ্যের ধারা অনুসরণের সহায়ক হবে।

বাংলা লোকবাদ্যের গঠনপ্রকৃতি ও বাদ্যপদ্ধতি বিচারে উচ্চাঙ্গের বাদ্যের মতই শ্রেণীবিভাগ করা যায় অর্থাৎ এগুলিও তত, আনদ্ধ, ঘন ও শুষির এ চারভাগে বিভক্ত। লোকবাদ্যের উপকরণ সাধারণ, গঠন-প্রণালীও জটিলতাহীন। লাউয়ের খোল, বেল-নারিকেলের মালা, বাঁশ, কাঠ, নল, পাতা, মাটি, লোহা, পিতল, সুতা, তার, শিং, শঙ্খ প্রভৃতি লোকবাদ্যের বস্তু-উপকরণ। বাদ্যে বাঁশ কাঠের ব্যবহার বেশি। লাউয়ের খোল ও নারিকেলের মালা দেশজ সহজলভ্য বস্তু। লোহা-পিতল ধাতব পাত্র, পাত বা তারের ব্যবহারও ন্যূন নয়। ঘন বাদ্য ধাতব পদার্থের তৈরি। তত বাদ্যে তারের প্রয়োজন হয়। আনদ্ধ বাদ্যে গরু-ছাগল-সাপের চামড়ার ছাউনি থাকে। বাঁশ-পাতা-নল প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে শুষির বাদ্য তৈরি হয়। কতক বাজনায় প্রাকৃতিক বস্তু প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, যেমন শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি। তাল গাছের শুকনো পাতা দিয়ে পাতবাঁশী তৈরি হয়। মাটির ছোট কলসি তালবাদ্য হিসেবে বাংলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। চারা অবস্থায় আমের আঁটি দিয়ে ভেঁপু বানান হয়। গ্রামের ছেলেমেয়ে তাই বাজিয়ে বাঁশির সখ মিটায় এবং যন্ত্রধ্বনির রসোপভোগ করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্যেও ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। মুখে শিষ, হাতে হাততালি, আঙুলে চুটকি, বগলে বগলধ্বনি ইত্যাদি দ্বারাও সুরের সাধ মিটান হয়। উলুধ্বনি ও জিকর ধ্বনি শারীর ক্রিয়ায় উৎসৃষ্ট। এগুলিকে শারীর ধ্বনি (Circum-locution) নাম দেওয়া যায়।

১. ঐ, পৃঃ দ-ধ (ভূমিকা)।

পল্লীগান ও নাচে বাদ্যের ব্যবহার অধিক। বাংলার লোকসমাজে নাচ অপেক্ষা গানের প্রাধান্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিধ গানের প্রচলন আছে। পল্লীগায়কেরা প্রায় গানেই বাদ্য ব্যবহার করে। কোন কোন একক গানে শিল্পী নিজেই বাদক ও গায়ক, যেমন বাউলগান (একতারাযোগে), ভাওয়াইয়া গান (দোতারাযোগে), সারিগান (সারিন্দাযোগে)। দলবদ্ধ গানে মূল গায়েন 'দোহার'দের সাহায্য গ্রহণ করে। দোহাররা ধুয়া গায় ও বাজনা বাজায়। জারিগান, সারিগান, কবিগান, পালাগান, গম্ভীরাগান, ডাকগান প্রভৃতি দলবদ্ধ গানের উদাহরণ। এসব গানের আসরে সাধারণতঃ ঢোল, করতাল. মন্দিরা, জুড়ি, বাঁশী, খমক প্রভৃতি বাদ্যের প্রয়োজন হয়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগ ও তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় বাদ্যের যে ভূমিকা, লোকসঙ্গীতে বাদ্যের ভূমিকা সেরূপ নিগূঢ় ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত নয়। এখানে গানের কথাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যন্ত্রকে তেমন সূক্ষ্ম কৌশলে বাঁধা হয় না। সমালোচকের ভাষায়, "সঙ্গীত যতক্ষণ লোক-সঙ্গীতের স্তরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোক গান করে মাত্র গানেরই আনন্দে, সুরের বা রাগের প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য নয়, সারিন্দা প্রভৃতি যন্ত্রও বাজায়, কিন্তু মাত্র গানের সঙ্গতের জন্য, সারিন্দা বা অন্য বাদ্যের সুরেব বা তালের মোহে নয়।"[১] লোকগানের সাথে লোকবাদ্যের সঙ্গত সুর-সৃষ্টিতে তেমন নিখুঁত না হলেও তাল ও ছন্দ সৃষ্টিতে গায়কের আবেগ অক্ষুণ্ণ রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কীর্তন ও কবিগানে তালবাদ্যের সঙ্গত বেশ সুষম হয়। সুরের ক্ষেত্রে বাঁশীর অনুষঙ্গ সূক্ষ্মতার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

পল্লীগানের মত পল্লীনাচেও নানা বাদ্যের প্রয়োজন হয়। দু'একটি নাচে নর্তক স্বয়ং বাদকের ভূমিকা পালন করে। বাউলরা নাচতে নাচতে গান গায় ও বাদ্য বাজায়। ঘুঙুর বা নূপুর পরে নাচার রীতি আছে পল্লীর ঘাটুনাচে ঘাটু ঘুঙুর পরে। এছাড়া অন্যক্ষেত্রে যন্ত্রীরা তালসঙ্গত ও সুরসৃষ্টি করে আসরে নটনটীকে সাহায্য করে। বাংলার ঢালিনাচ,

১. রাজেশ্বর মিত্রের বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ) গ্রন্থে অমিয়নাথ সান্যালকৃত 'পরিচিতি' অংশ, পৃঃ ।/০—।৵০।

রায়বেঁশেনাচ, লাঠিনাচ, ডাকনাচ প্রভৃতি দ্বৈত বা দলবদ্ধনাচে ঢোল, কাঁসি, জুড়ি হল সাধারণ বাদ্য। জারিনাচে বয়াতি চটি বা খরতাল তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

গান-নাচ প্রভৃতি চারুকলা ছাড়া ধর্মকর্ম, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, অর্থোপার্জন ইত্যাদি জীবনের দৈনন্দিনতার স্থূল ব্যাপারে লোকবাদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।[১] বর্তমানে কতক বাদ্যের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়েছে। ডমরু নৃত্যের বাদ্য ছিল। এখন সাপ, বানর বা ভালুকের নাচ ও খেলায় পেশাদার বেদে বা বাজিকররা ডমরু বাজিয়ে থাকে। ডফ বা খঞ্জরী নৃত্যবাদ্য ছিল।[২] বর্তমানে ভিখারী খঞ্জরী বাজিয়ে গান গেয়ে যাচ্ঞা করে। শিঙ্গা সাধারণতঃ যুদ্ধের বাদ্য। 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্যে রাখাল কর্তৃক শিঙ্গা বাজানর বর্ণনা আছে।[৩] 'গোপীচন্দ্রের গানে' শিঙ্গা বাজিয়ে ভিক্ষা করার কথা আছে।[৪] পূর্ববঙ্গের 'হিরালি' ওঝারা বৃষ্টি-বাদলের দিনে শিঙ্গা বাজিয়ে ও মন্ত্র পড়ে শিলাবৃষ্টি রোধ করে।[৫] এখন বাদ্যটি লুপ্তপ্রায়। নাচ-গানে ঢোলের ব্যবহার বরাবর চলে আসছে, সংবাদ ঘোষণায় 'ঢোল পিটান' হয়। স্থান ও উদ্দেশ্য ভেদে একই বাদ্য তাল ও ছন্দ সুষমায় গায়ক ও নর্তকের মন মাতায়, আবার স্থূল ধ্বনিনিনাদে ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করে। বাঁশীতে কেবল সূক্ষ্ম সুরই তোলা হয় না, কথাকেও

১. গ্রন্থের ১২১—২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. আকবরের রাজ-দরবারে খঞ্জরীর সমাদর ছিল ; আইন-ই-আকবরীতে এর উল্লেখ আছে। বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ১১৩

৩. প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥
উদ্ধৃত : দীনেশচন্দ্র সেন— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ১০০ (৮ম সং)।

৪. গোপীচন্দ্রের প্রতি গুরু হাড়িফার উক্তি,
তুরু তুরু বলিয়া শিঙ্গা বাজাও তুলিয়া।
ভিক্ষা দিবে তোকে বিস্তর করিয়া॥
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ১৪২

৫. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২

ধ্বনিতে ফুটিয়ে তোলা হয়।[১] তুবড়ির সুমিষ্ট ধ্বনিতেও গানের সুর তোলা হয়। বর্তমানে সাপুড়ের হাতে তুবড়ি সাপ খেলানোর কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। পূর্বে টিকারা বা দুন্দুভি যুদ্ধের বাজনা ছিল। এখন নৌকাবাইচের সময় মাঝি-মাল্লা ব্যবহার করে; ফরিদপুর জেলায় 'গয়না নৌকা'র মাঝিরা আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আহ্বান করার জন্য টিকারা বাজায়।[২]

বাদ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার নিম্নের লোকবাদ্যগুলির আলোচনা করা হল :

তত— একতারা, বেনা, দোতারা, সারিন্দা, খমক ;
আনদ্ধ— ঢাক, ঢোল, খোল, ডুগডুগি, খঞ্জরী, ডফ ;
ঘন— কাঁসি, জুড়ি, করতাল, খড়তাল, চটি ;
শুষির— বাঁশী, পাতবাঁশী, তুবড়ি, শঙ্খ, শিঙ্গা, ভেঁপু।

এগুলি লোকবাদ্য এ অর্থে যে, গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশজ সুলভ উপকরণে এগুলি তৈরি করে। বস্তুর স্থূলতা ও গঠনপ্রণালীর সরলতার জন্য বাদ্যগুলিতে সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র সুর সৃষ্টি করা যায় না : সাধারণ সুর-তালের উপযোগী সরল বাদ্যযন্ত্রই লোকবাদ্য। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বীণা বা গীটারের তার বাঁধা হয়, লোকবাদ্যের একতারা বা দোতারায় সেরূপ যত্ন ও কৌশল নেই। দেশের জনগণ জীবনের নানা ক্ষেত্রে বাদ্যগুলি ব্যবহার করে। বিশেষ করে, তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত এসব বাদ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

১. পালং সখির বাঁশীর শব্দে মহুয়া বিপদাভাস পেয়েছিল, নদের চাঁদকে সে বলেছিল,

আমারও পালং সই বাঁশী বাজাইল।
সামাল করিতে পরান ইসারায় কহিল ॥

—মহুয়া

মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৮ (২য় সং)।

২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৭২ (ফরিদপুর), ১৯৬৪ চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, যেমনা নদীতে দেশীয় খেয়া নৌকায় ড্রাম থাকত, দুটি নৌকা পরস্পরের নিকট হলে বাদ্যধ্বনি করত।

H. A. R. Gibb (ed.)—Ibn Batuta: Travels in Asia and Africa, p. 271

একতারা

রাখালের সৌন্দর্য যেমন বাঁশী, ঢুলীর সৌন্দর্য ঢোল, সাপুড়ের সৌন্দর্য তুবড়ি, তেমনি বাউলের সৌন্দর্য একতারা। একতারা বাজিয়ে বাউল তার মরমীর গান গেয়ে পল্লীর মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাটে ঘুরে বেড়ায় আর সাঁই-এর সন্ধান করে। কানের কাছে একতারাটি মৃদুল গুঞ্জন তোলে, বাউল তন্ময় হয়ে সুরের সাথে গান গায়, তার ঘরছাড়া বিবাগী হৃদয় সুরলোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বাউল ছাড়া বৈষ্ণব বৈরাগী এবং মুসলমান ফকিরের হাতেও একতারা দেখা যায়। বাউল, বৈরাগী, ফকির ধর্মে মরমীবাদী, পেশায় ভিক্ষোপজীবী।

নামেই প্রমাণ করে এক তারা একতার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। একটি তারের কম্পনেই সুরধ্বনি উঠে। একতারার বস্তু-উপকরণ সাধারণ, এর গঠনপ্রণালীও সহজ। লাউ, বেল, নারিকেলের 'বস' বা কাঠের খোল, বাঁশের ডাঁটি, তার বা সুতা এবং চামড়া। এক এক রূপের একতারায় এগুলি ব্যবহৃত হয়। উপকরণ ও আকৃতি ভেদে চার রকমের একতারা দেখা যায়। এগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা লাউ, একতারা, গোপীযন্ত্র ও থুনথুনে।

লাউ : লাউ-এর বস লাউ বা পিতলের তৈরি। গোলাকার শুকনা লাউ-এর অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে বস তৈরি হয়। দু' হাত মত লম্বা এক খণ্ড ফাঁপা সরু বাঁশ মাথায় গিঁট রেখে সমান চার ভাগে চিরে মুখোমুখি দু'ভাগ করে কেটে বাদ দিয়ে বাকি দু'টি বাতা বসের দুপাশে বেঁধে দেওয়া হয়। লাউ-এর তলা সামান্য ছিদ্র করে লোহার চাকতির সাথে তার বা সুতা এঁটে দেওয়া হয়। বসের উপরের অংশ খোলা থাকে। খোলা অংশ দিয়ে তার উপরে বাঁশের মাথায় 'কানে'র সহিত বাঁধা হয়। কান ঘুরিয়ে তার টান-ঢিল করতে হয়। ডান হাতে বাতার মাঝামাঝি অংশ ধরে তর্জনীর ডগায় টোকা দিয়ে একতারা বাজান হয়। বাজানর সময় বাতা দুটিতে চাপ দিয়ে প্রয়োজন মত সুরের খাদ কমান-বাড়ান যায়। লাউ-এর খোলের প্রাধান্য থেকে সিলেটে এটি 'লাউ' নামেই পরিচিত। এ জেলায় লাউ বাজিয়ে গান করে বলে বৈষ্ণব ভিখারীকে 'লাউয়া বৈরাগী' ও মুসলমান ফকিরকে

'লাউয়া পীর' বলা হয়।[১] লাউ-এর বসের তৈরি বলে রংপুর জেলায় একতারার নাম 'বসমতি'।[২]

একতারা : একতারার বস বেল বা নারিকেলের মালা দিয়ে তৈরি। মালার অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে খোলা দিকে চামড়ার ছাউনি দিতে হয়। তেলের ওড়ং-এর মত কাঠের একখানা লাঠি মালার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। লাঠির নীচে থেকে একটি তার চামড়ার মাঝ দিয়ে উপরে লাঠির মাথায় কানের সাথে বাঁধা থাকে।

গোপীযন্ত্র : গোপীযন্ত্র নামের একতারার কাঠামটি লাউ-এর বস বা কাঠের খোলের হতে পারে। লাউ-এর বসের মত এর আকার গোল নয়, লম্বা। নীচের দিকে চামড়ার ছাউনি থাকে। উপরের অংশ খোলাই থাকে। ছাউনির নীচে থেকে একটি তার খোলের ভেতর দিয়ে উপরে বাঁশের কানের সাথে বাঁধা হয়। বাঁশটি লাউ-এর অনুরূপ দু'ফালি করে কেটে বাতা করা হয়। যন্ত্রটি বাজানর সময় তর্জনীর ডগায় মেজরাব জড়ান থাকে। বাউলগান ছাড়া জাগরণীগানে বৈষ্ণব বৈরাগীরা গোপীযন্ত্র ব্যবহার করে।[৩]

থুনথুনে : চোঙাকৃতি খোলের একপাশে একটি সরু বাঁশ বাঁধা হয়। বাঁশটি ফাড়া হয় না। নীচের চামড়ার ছাউনি থেকে পিতলের তার খোলের ভেতর দিয়ে উপরে বেরিয়ে এসে বাঁশের কানের সাথে অাঁট করে বাঁধা থাকে। পল্লীর ভিক্ষুকরা এটি ব্যবহার করে।[৪]

বেনা

'বেনা' বীণার বিকৃত উচ্চারণ।[৫] কিন্তু বীণার সঙ্গে বেনার কোন সামঞ্জস্য নেই। বরং গঠনপ্রণালী ও বাদ্যরীতির দিক থেকে

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬৭ (সিলেট), ১৯৬৪
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ রংপুর), ১৯৬৪
৩. নারায়ণ চৌধুরী— সঙ্গীত পরিক্রমা, পৃঃ ১৮০
৪. ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃঃ ৬
৫. বীণা>ব্যাণা>বেনা। রংপুর জেলায় এরূপ উচ্চারণ করা হয়। রংপুরের মাহীগঞ্জের শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কাব্যতীর্থের কাছ থেকে এ নাম সংগৃহীত হয়েছে। নিজস্ব সংগ্রহ।

বেহালার সঙ্গে কিছু মিল আছে। তার ও ছড়ের ঘর্ষণে বেনার সুর উঠে। এর গঠনপ্রণালী অনেকটা একতারার মত। একটা গোলাকার নারিকেলের মালার একপার্শে আছে চামড়ার ছাউনি। মালাটি ছিদ্র করে একটা বাঁশের ডাঁটি লাগান হয়। ডাঁটির নীচ থেকে তার চামড়ার উপর দিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। এখানে ঘোড়ার লেজের চুল বা 'ফিকে' তারের কাজ করে। চামড়ার উপরে থাকে কাঠের ঘোড়া। বাঁশের 'কাবারী'র সহিত ঘোড়ার ফিকে বেঁধে ছড় তৈরি করা হয়। বেনা রংপুরে কেচছাগান, কুশানগান ও রামায়ণগানে বাজান হয়।[১]

দোতারা

একতারার মত দোতারা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তারের কম্পনে সুরধ্বনি উঠে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাঁশীর পর দোতারার স্থান। 'ডই'-এর মত দেখতে কাঠের মূল কাঠামর সহিত তার ও চামড়া জুড়ে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। তার ও চামড়া ছাড়া এর অন্যান্য অংশ কান, ঘোড়া, ফেসি ও কটি। কাঠের ফ্রেমের প্রশস্ত অংশ বা 'তলা' ছাগলের বা গুঁই সাপের চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। যন্ত্রের মাথায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাঠি যুক্ত থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় এগুলিকে কান, পাখরা বা কেড়কি বলে।[২] কান ঘুরিয়ে সুরের লয় ঠিক করতে হয়। তার বাঁধা থাকে তলার শেষ প্রান্তে ফেসি নামে একটা লোহা বা পিতলের চাকতির সাথে। চামড়ার ছাউনির উপরে মাঝামাঝি জাগায় অর্ধচাপের আকৃতিব এক টুকরা কাঠ বা হাড় থাকে। এর নাম ঘোড়া। ফেসি থেকে তারগুলি ঘোড়াব উপর দিয়ে কাঠামর মাঝ বরাবর গিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। দোতারার অপর একটি অংশ কটি। এটি গরু-মহিষের শিং, হাড় বা কাঠের একটা চ্যাপটা টুকরা। রংপুরে এর নাম 'চুটকি', অন্যত্র তা 'খুটনি' নামে পরিচিত। দেশীয় দোতারার মোটামুটি এটাই গঠনপ্রণালী। আনুমানিক দু' হাত লম্বা হালকা এ বাদ্যযন্ত্রটি বাম হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে ডান হাতে কটির ঘর্ষণ দিয়ে বাজান হয়।

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪
২. পাখরা ময়মনসিংহ জেলায় এবং কেড়কি রংপুর জেলায় প্রচলিত আছে। নিজস্ব সংগ্রহ।

নামানুসারে দোতারার তারের সংখ্যা দুটি হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে তার কোথাও চারটি, কোথাও ছ'টি। এগুলি স্টিল বা পিতলের তৈরি হতে পারে আবার রেশমের পাকান সুতাও হতে পারে। ধ্বনির দিক থেকে তারের চারটি ভাগ—জিল তার, সুর তার, বম তার ও গম তার। এসব তার থেকে 'ওদারা', 'মুদারা', ও 'তারা' সুর ধ্বনিত হয়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত নিয়মিত সংগ্রাহক দোতারার চারটি তারের নাম দিয়েছেন বম, টন, চিল ও সরুয়ালী। তাঁর মতে, বমে 'মোটা' সুর, টনে 'চিকন' সুর, চিলে 'ছোট' সুর এবং সরুয়ালীতে 'চড়া' সুর তোলা হয়।[১] সাধারণতঃ ভাওয়াইয়া গানের সাথে দোতারা বাজান হয়। এর সঙ্গে বাঁশী এবং জুড়িও থাকে। ভাওয়াইয়া ছাড়া জারি, মুর্শিদী ও কবিগানে দোতারা ব্যবহৃত হয়। ছোকরা গান ও নাচে খেমটা তালে দোতারার যে সুর উঠে তার পরিচয় পাওয়া যায় নীচেব কয়েকটি চরণে :

কোরডোং মোরডোং
কোরডোং কোরডোং
করে মোর দোতরা রে।
ও মোর শিমলা কাঠের দোতরা
ও মোর গুই সাপের দোতরা
পোন্‌নাম করি তোরে।
কোরডোং মোরডোং
কোরডোং কোরডোং
করে মোর দোতরা রে।

—রংপুর

উদ্ধৃতিতে দোতারা তৈরির উপাদান হিসেবে শিমলার কাঠ ও গুই সাপের চামড়ার নাম পাওয়া যায়।

দোতারার প্রাচীনতম উল্লেখ 'পদ্মাপুরাণে' পাওয়া যায়।[৩] আঠার শতকের কবি আলী রজার 'ধ্যানমালা' সঙ্গীতগ্রন্থে দোতারার উল্লেখ আছে। বসন্ত-রাগের সহিত তালসঙ্গত হিসেবে যে সব যন্ত্র বাজে দোতারা তাদের মধ্যে একটি।[৪]

---

১. লোক সাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪
২. উদ্ধৃত: উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য. পৃঃ ৫৮-৫৯
৩. বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩২
৪. মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ ৫

সারিন্দা

দোতারার মত সারিন্দার একটি কাঠের কাঠাম থাকে। তার, চামড়া, কান, ঘোড়া, ফেসি প্রভৃতি এর উপকরণ। কটির দ্বারা আঘাত করে যেমন দোতারা বাজান হয়, তেমনি ছড়ের দ্বারা ঘর্ষণ করে সারিন্দা বাজান হয়। বাজানর সময় মাঝে মাঝে 'রজন' দিয়ে ছড় মেজে নিতে হয়।

সারিন্দার মূল কাঠামর তলার দুপাশ বেশ চাপা। এর উপরে চামড়ার ছাউনি। নীচ থেকে ফেসির সাহায্যে তার এঁটে চামড়ার উপর ঘোড়ার পিঠ দিয়ে গিয়ে মাথার কানের সাথে বাঁধা থাকে।

সারিন্দার মোট তার তিনটি— বম, সুর ও জিল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সারিন্দার দুটি সুরের কথা বলেছেন। মাঝের তারে 'সা' এবং প্রান্তের দুটিতে 'পা' সুর ধ্বনিত হয়।[১] সাধারণতঃ বিচারগান, কেচ্ছাগান ও কবিগানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। মুর্শিদী-গানেও সারিন্দা ব্যবহার করা হয়।[২] ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় ছাদ পিটান ও খেত নিড়ান সারিগানে সারিন্দা বাজান হয়।

খমক (خمك)

খমক পুরোপুরি লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রের গঠন ও বাদ্যরীতির দিক থেকে এটি তত শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু বাদ্যধ্বনির দিক থেকে একে আনদ্ধ বাদ্যের শ্রেণীভুক্ত করতে হয়। খমক সুরসঙ্গতে আবার তালসঙ্গতেও গান ও নাচে ব্যবহৃত হয়। অমিয়নাথ সান্যাল একে একাধারে সুরের ও তালের বাদ্য বলেই উল্লেখ করেছেন।[৩] রাজেশ্বর মিত্র একে তত বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, যন্ত্রটি ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার জনপ্রিয় গ্রাম্যবাদ্য।[৪] জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলেছেন, ফকির ও বৈরাগীরা ভক্তিমূলক গানে এটি বাজায়। এর সাথে খঞ্জরীও বাজান হয়।[৫]

---

১. Traditional Culture in East Pakistan, P. 112
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৬০ (খুলনা), ১৯৬৬
৩. বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ) গ্রন্থের 'পরিচিতি' অংশ, পৃঃ ৫
৪. ঐ, পৃঃ ৩৯-৫২
৫. ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃঃ ৫

খমক তৈরি করতে প্রয়োজন হয় একটি শূন্যগর্ভ কাঠের পাতলা খোল, ছাগলের চামড়া, পাট বা রেশমের সুতা, বাঁশের চোঙা আর নারিকেলের মালা। দশ-বার ইঞ্চি লম্বা কাঠের খোল যন্ত্রের প্রধান অংশ। খোলটি শুকন লাউ-এর হতে পারে। খোলের এক প্রান্তে চামড়ার ছাউনি। অপর প্রান্তের চারদিকে চামড়ার ঈষৎ ঘের, মাঝ অংশ খোলা। তলার ছাউনির মধ্যভাগ ছিদ্র করে সুতা টিনের চাকতির সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়। সুতার প্রান্তভাগ খোলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে বাঁশের চোঙা বা মুঠির সাথে বাঁধা থাকে।

খমকের দ্বিতীয় অংশ 'আরশী'। এটি লাটিমের আকার বিশিষ্ট একটি নারিকেলের মালা। এরই আঞ্চলিক নাম আরশী।[১] কোথাও 'জাওয়া' নামেও এটি পরিচিত।[২] কাঠের টুকরা অথবা মহিষের শিং দিয়েও আরশী তৈরি করা হয়। দোতারার কটির যে কাজ খমকের আরশীর সেই কাজ। বাম বগলে খোলটি চেপে এবং বাম হাতে মুঠি ধরে সুতা টান করে ডান হাতে আরশীর টোকা দিলে খমকের গমকযুক্ত ধ্বনি উঠে। এর ধ্বনি তালভেদে 'কোড়া টুবটুব', 'গাব-গুবা-গুব' অথবা 'দা গুড় গুড় গুড় তাগধিনি'। এই ধ্বনি বৈশিষ্ট্য থেকে খমকের একটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায় 'গাব-গুবা-গুব', সংক্ষেপে 'গুবগুবি' নামেও এটি প্রচলিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে এর নাম 'আনন্দ লহরী'।[৩]

শূন্যপুরাণে 'দেবীর মনক্রি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ধর্মপূজার বাদ্য হিসেবে খমকের নাম পাওয়া যায়।[৪] মঙ্গলসাহিত্যে গানের ও নাচের বাদ্য হিসেবে খমকের বহু ব্যবহার আছে, যেমন বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি। কাব্যগুলি ষোল শতকের

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬৭ (সিলেট), ১৯৬৪

২. ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃ: ৫

৩. ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃ: ৮৪

৪. বাজএ রণশিঙ্গা খমক ভেরি লিঙ্গা।
দুন্দুভি জয়ঢাক দামামা।
পণ্ডিত বেদ ধ্বনি আনন্দে নারাজনী
কি দিব মনক্রির সীমা॥
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত—শূন্যপুরাণ, পৃ: ১৩১

রচনা। 'খমক' লোকজীবনে তখন থেকেই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল, এসব দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুমান করা যায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য প্রভৃতির সঙ্গীত বিষয়েও মুসলমানদের প্রভাব ঐ সময়ের মধ্যে গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

ঢাক

বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে ঢাক-ঢোলের ব্যবহার চলে আসছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর প্রস্তরগাত্রে ও ফলকে ঢাকাদি বাদ্যযন্ত্রের চিত্র পাওয়া গেছে।[১] এগুলি বাংলার আর্যপূর্ব সংস্কৃতির নিদর্শন। এদেশে যখন ডোমসৈন্যের প্রভাব ছিল, তখন ঢাকের ব্যবহার ছিল। তারা দেশের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করত।[২] ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে যেখানে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, সেখানে ঢাকের নাম পাওয়া যায়।[৩]

ঢাক বেশ বড় বাদ্যযন্ত্র। কাঠের খোলের দুই মুখে পুরু চামড়া দিয়ে ঢাক তৈরি হয়। খোল আনুমানিক দু হাত লম্বা, এর ব্যাসের পরিমাণ অনধিক এক হাত। সুতার সাহায্যে বাম কাঁধে তুলে বাম কোল বরাবর ঝুলিয়ে রেখে দু হাতে দু রকমের কাঠি দিয়ে ঢাকের একই দিকে আঘাত করে বাজাতে হয়। ডান হাতের কাঠিটি বাঁশের তৈরি— মোটা ও শক্ত, বাম হাতের কাঠিটি বেতের তৈরি—পাতলা ও চ্যাপ্টা।

সাধারণতঃ হিন্দুর পূজার মণ্ডপে ঢাক বাজে। সঙ্গে কাঁসি থাকে। কোন শোভাযাত্রা কিংবা উৎসবেও ঢাক বাজান হয়।

ঢোল (دهل)

প্রয়োজনের দিক থেকে বাঁশী অপেক্ষা ঢোলের ব্যবহার বেশি। সুরের সুমিষ্টতা বাঁশীর জনপ্রিয়তার কারণ। ঢোল তালবাদ্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়তৃপ্ত

---

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ৫৪৪

২. আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে ॥—ছড়া
উদ্ধৃত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫১

৩. T. N. Dasgupta—Aspects of Bengali Society, p. 79-81

সুরের মোহজাল তা সৃষ্টি করতে পারে না। ঢোল তাল ও ছন্দ সৃষ্টি করে। গানের আসরে ঢোল ও বাঁশী, নাচের মঞ্চে ঢোল ও ঘুঙুর, বিবাহোৎসবে ঢোল ও সানাই, শোভাযাত্রায় ও যুদ্ধযাত্রায় ঢাক ও ঢোল। হিন্দুর পূজামণ্ডপে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির সঙ্গে ঢোল বাজান হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে ঢোলকাদির ব্যবহার অবাধ ও বহুল। মুসলমানের বিবাহোৎসবে, মহরমের শোভাযাত্রায়, লাঠিখেলায়, কুস্তির আখড়ায় ঢোল-কাঁসি বাদ্যের প্রয়োজন হয়। গ্রামের হাট-বাজারে এখনও ঢোল পিটিয়ে সরকারী পরোয়ানা জারি করা হয়। 'ঢোল-শহরত' কথাটি এখান থেকে এসেছে।[১] মধ্যযুগের মঙ্গল সাহিত্যে যুদ্ধের বাদ্য হিসেবে ঢোলের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে, মুসলমানরা এদেশে ঢোলের আমদানী করেন। ফারসীর 'দহল' শব্দ বাংলা ঢোলে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩] বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক আমীর খুসরু সেতার, রবাব, তবলার মত ঢোলকেরও উদ্ভাবন করেছিলেন।[৪]

ঢাকের মত ঢোলও কাঠের খোলের তৈরি, উভয় প্রান্ত চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। কিন্তু আকারে ঢোল ছোট। এর উভয় দিকে কাঠির আঘাত দিয়ে বাজান হয়। ঢোল আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। তাল ও সুর অনুসারে ঢোলের বাদ্যধ্বনি কখনও 'ডুগ ডুগ' কখনও 'দিদং ডুং চুংগ্'।[৫] জারিগান, কবিগান, টপ্পাগান, আলকাপগান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে এবং লাঠিনাচ ও ছোকরানাচে ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়।

খোল

খোল ঢোলকাদির মত আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। এর খোল সাধারণতঃ মাটির তৈরি। মাটির খোল আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। এর পরিধি ঢোল থেকে

১. রাজশেখর বসু সংকলিত চলন্তিকা দ্রষ্টব্য।

২. আগি গোণ্ডা বাজে ঢোল
তের কাহন সাজে কোল।—কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল।

৩. Traditional Culture in East Pakistan, p. 109

৪. মধ্যযুগের রাগ-তালনামা. পৃঃ ৬ (ভূমিকা)।

৫. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড (বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত). ১৩৭০, পৃঃ

অনেক কম। খোলের 'ডাইনামুখ' ছোট এবং 'বাঁয়ামুখ' অপেক্ষাকৃত বড় হয়। উভয় মুখে চামড়ার ছাউনি। চামড়ার মাঝে গাবের তাপ্পি লাগান হয় ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ফিতার সাহায্যে দু প্রান্ত বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে পেট বরাবর রেখে খালি হাতে খোল বাজাতে হয়। খোল মাটিতে রেখেও বসে বাজান হয়। খোল কীর্তনগানের প্রাণ-স্বরূপ। খোলের সঙ্গে করতাল ও মন্দিরা বাজে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে খোল-করতালকে শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি বলা হয়েছে।[১] পল্লীর ছোকরা নাচে ও গানে খোলের ব্যবহার আছে।[২]

ডুগডুগি

ডুগডুগির কাঠের খোলের দুপাশে ছাগলের চামড়ার ছাউনি আছে। মাঝের সরু অংশে শক্ত সুতা বাঁধা। সুতার মাথায় সীসা বা লোহার ছোট গুলি জড়ান। যন্ত্রটি ধরে নাড়া দিলে সুতার গুলি উভয় পাশের চামড়ায় পর্যায়ক্রমে আঘাত খেয়ে 'ডুগডুগ' ধ্বনি তোলে। ধ্বনিবৈশিষ্ট্য থেকেই এর আঞ্চলিক নাম ডুগডুগি। এর প্রাচীন নাম ডমরু বা ডম্বরু। বিশেষজ্ঞের মতে, এটি অস্ট্রিক শব্দ; নীচ জাতীয় ডোমেরা তা ব্যবহার করত। এরা অনার্য বংশোদ্ভূত।[৩] 'ডুগডুগি ধ্বন্যাত্মক দেশজ শব্দ। এদিক থেকে ডমরুকে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বলা যায়। ডমরু শিবের বাদ্য। তিনি মূলে লৌকিক দেবতা। পাহাড়পুরের চিত্রে ডমরু বাদ্যরত মানুষের ছবি আছে। সেখানে কাঠির আঘাত দিয়ে তা বাজাতে দেখা যায়।[৪] কাঠি ছেড়ে সুতা বেঁধে বাজানর রীতি কখন প্রচলিত হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। ডুগডুগি তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেদে ও বাজিকর সাপ, বানর ও ভালুকের খেলায় ডুগডুগি বাজায়। হিন্দুর গাজনগানে ডুগডুগি বাজান হয়।[৫]

১. বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ১৩
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪
৩. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—বাইশ কবির মনসামঙ্গল. ১৯৬২, কলিকাতা, পৃঃ ৩০৬ (টীকা)।
৪. নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে প্রদত্ত ২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।
৫. আমরা দুজন ভাই শিবের গাজন গাই।
মা গিয়াছে গয়াকাশী ডুগডুগি বাজাই।।—যশোহর
শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত—যশোর-খুলনার ছড়া, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮৩

খঞ্জরী তালবাদ্য। হাতের আঙুলে বা তালুর আঘাতে খঞ্জরী বাজিয়ে গানের ও নাচের তালসঙ্গত করা হয়। ঘাটুগান ও ঘাটুনাচের আসরে ঢোলকের সাথে খঞ্জরী বাজান হয়।[১] জারিগান ও জারিনাচেও খঞ্জরীর ব্যবহার আছে।[২] খঞ্জরীর গঠনপ্রণালী খুব সহজ। নিম বা কাঁঠাল কাঠের পাঁচ-সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাকতি। এর এক দিকে চামড়ার ছাউনি, অন্যদিকে খোলা। চাকতির গায়ে সমান দূরত্বে মুখোমুখি চারটি চারকোণাবিশিষ্ট ছিদ্রে লোহার শিকের সাথে টিনের ছোট ছোট পাত জড়ান থাকে। বাজানব সময় এগুলি ঝুন ঝুন শব্দ করে। চামড়ার ঠপ ঠপ ও ধাতুর পাতের ঝুন ঝুন এক মিশ্র ধ্বনির সৃষ্টি করে। এটি 'খঞ্জরী' নামেও সুপরিচিত।

লৌকিক নৃত্যগীতের আসবে ঢুলিব মত খঞ্জরী বাদকের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। ঢোল আকারে বড়, খঞ্জরী ছোট। এজন্য খঞ্জরী নিয়ে বাদকের গতিবিধি সহজ হয়। বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "খঞ্জরী বাদনে বঙ্গদেশীয় এক একজন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদন কৌশল দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা নানা প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জরী হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায় এবং মস্তকে ধারণ করিয়া বিবিধ তালে যুগপৎ বাজাইতে পারে এবং কখন আঙ্গুলেব আঘাতে কখন পরস্পর খঞ্জরীর আঘাতে ভিন্ন প্রকার বোল বাজাইয়া থাকে।"[৩]

ডফ (دف)

খঞ্জরী ও ডফ অভিন্নপ্রায় বাদ্যযন্ত্র। ডফের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট খঞ্জরীর কাঠের ফ্রেম বাটির মত, ডফের ফ্রেম চালুনের মত। পাতলা কাঠের চাকতির একদিকে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডফ তৈরি হয়। চাকতির গায়ে মাঝে মাঝে পিতলের পাত বসান থাকে। বাজানর সময় পাতগুলি একটা সুমিষ্ট ধাতব অনুরণন তোলে। সাধারণত: গানের আসরে দোতারার

১. রওশন ইজদানী—মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য, পৃঃ ৫৩
২. A. Halim—Music and Dance of East Pakistan, East Pakistan a Profile p. 136
৩. বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ৬১

সাথে ডফ বাজান হয়। বেদেরা বাজিখেলায় ঢোলের সাথে ডফ বাজায়। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নৃত্যের আসরে 'ডম্ফ' বাজানর কথা বলেছেন।[১] আকবরের রাজসভায় ডফ ও খঞ্জরী প্রিয় বাদ্য ছিল।[২] মুসলমানরা এটি আরব থেকে আমদানী করেন। আরবে ডফের ব্যবহার আছে।[৩]

ফরিদপুরে বাদ্যযন্ত্রটি 'ডোমফা' এবং সিলেটে 'ডপকি' নামে পরিচিত।[৪] পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এটির নাম 'বিষম ঢাকী'।[৫]

কাঁসি

কাঁসি কাঁসার তৈরি ঘন বাদ্যযন্ত্র। এটি দেখতে চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট পানের বাটার মত। কাঁসিব গায়ে ছিদ্র করে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। বাম হাতে দড়ি ধরে ডান হাতে কাঠি দিয়ে তা বাজান হয়। হিন্দুদের পূজাব মণ্ডপে ঢোলকের সাথে কাঁসি বাজে। মুসলমানের লাঠিখেলাতে ঢোলকের সাথে কাঁসি বাজাতে দেখা যায়। কাঁসি প্রাচীন বাদ্য। পাহাড়পুরের প্রস্তরগাত্রে কাঁসির চিত্র আছে।[৬] বড় আকারের কাঁসি 'কাঁসর' নামে পরিচিত। এটি পিতলের তৈরি। এর ধ্বনি কাঁসির ধ্বনি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ব্যবহারের উপলক্ষও ভিন্ন। মন্দিরে পূজাকর্মে এবং গৃহস্থ ঘরে লৌকিক অনুষ্ঠানে কাঁসর বাজান হয়। লৌকিক গান ও নাচে কাঁসি বাজে, কাঁসব নয়।[৭]

জুড়ি

জুড়ি বা মন্দিবা ঘনবাদ্য। কাঁসার নির্মিত দু'টি বাটি দু'হাতে ধরে পরস্পরের কাণায় মৃদু টোকা দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। বাটি দু'টির

---

১. প্রমথপতি কাছে ত্রিদশ পতি নাচে
ডম্ফ ধিক ধিক ধিঙ্গা।
উদ্ধৃত: বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৩
২. বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), পৃঃ ১১৩
৩. ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৮৯
৪. ডঃ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত—পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ২য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।
৫. চিত্তরঞ্জন দেব—বাংলার পল্লীগীতি, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৫২৮
৬. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৫৪৪
৭. বাংলার পল্লীগীতি, পৃঃ ৫৩২

তলায় মোটা সুতা বাঁধা থাকে। বাটির গা স্পর্শ না করে শুধু সুতা ধরেই বাজাতে হয়, হাতের স্পর্শ লাগলে ধ্বনি অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নিরূপণে জুড়ি সাহায্য করে।[১] বৈষ্ণব বৈরাগীরা জুড়ি বাজিয়ে ও গান গেয়ে ভিক্ষা করে। জারিগানে ঢোলকের সাথে জুড়ি বাজান হয়। এছাড়া বিচারগানে ও মারফতীগানে মুসলমান ফকিররাও জুড়ি বাজায়।

করতাল

জুড়ির চেয়ে করতাল আকারে বড়। আকৃতি সামান্য ভিন্ন, কিন্তু বাজানর পদ্ধতি অভিন্ন। খোল এবং করতাল সহগ বাদ্যযন্ত্র। বিশেষতঃ বৈষ্ণবকীর্তনে খোল ও করতাল অত্যাবশ্যক। পল্লীর গাইনের গীতে মৃদঙ্গের সঙ্গে করতাল বাজান হয়।[২] করতাল পিতলের তৈরি।[৩]

চটি

চটি বা চটা লৌকিক তালবাদ্য। কাঠের দুফালি টুকরা একই হাতের আঙুলে ধরে পরস্পরের গায়ে আঘাত দিলে খট খট ধ্বনি উঠে। ফরিদপুরে ফকিরালী গান, জিকির, কিস্সা ইত্যাদিতে চটি ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলায় চটির আঞ্চলিক নাম 'খুনজুড়ি'।[৪] এটি 'প্রেমজুড়ি' নামেও পরিচিত। প্রেমজুড়ি দেখতে তাঁতির মাকুর আকৃতির মত। কাঠের দু'টি ফ্রেমের সহিত টিনের পাত লাগিয়ে তার ভেতর ছোট ছোট লোহার গুটি ভরা থাকে।[৫]

খড়তাল

প্রেমজুড়ি দুটি আলাদা কাঠের ফ্রেম, খড়তাল দুটি কাঠের জোড়া ধরা চাড়। অনেকটা ছুতর মিস্ত্রীর রেঁদার মত দেখতে।[৬] পল্লীগানের

১. ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃঃ ২৮
২. ঐ, পৃঃ ৪৩
৩. বংলার পল্লীগীতি, পৃঃ ৫৩০
৪. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪
৫. ঐ।
৬. ঐ, খাতা নং ৬৩৬৪/১৭০ (ঢাকা), ১৯৬৪

তালসঙ্গতে খড়তাল ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ভজনগানে এটি ব্যবহার করে।

পাইল্যা

'পাইল্যা' বা পাতিল মৃতভাণ্ড বিশেষ।[১] নিত্য ব্যবহার্য ছোট কলসীর মত এর গড়ন। বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আসরে তালবাদ্য হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। উপযোগিতার দিক থেকে এটিকে তবলা-বাঁয়ার লৌকিক সংস্করণ বলা যায়; পাইল্যার মুখ বাঁয়ার ও পেট তবলার কাজ করে। পাইল্যার মুখের বাতাসে হাতের কৌশলে আঘাত দিয়ে বাঁয়ার প্রায় অনুরূপ ধ্বনি তোলা হয়। দক্ষ বাদক ছাড়া এরূপ ধ্বনি তুলতে পারে না। সঙ্গীতশাস্ত্রের তত, শুষির, ঘন, আনদ্ধ কোন শ্রেণীতে এটি পড়ে না; নাদ বা ধ্বনির দিক থেকে ঘন ও শুষির যন্ত্রের সাথে মিশ্র সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোন এক শ্রেণীর যন্ত্রের সাথে তা অভিন্ন নয়। শারীর ক্রিয়াজাত চুটকি, হাততালি, বগলধ্বনির মত পাইল্যাকে 'বিবিধ' শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

বাঁশী

বাঁশী বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্য। সব সম্প্রদায়ের ছোট বড় সব শ্রেণীর লোক বাঁশী বাজিয়ে থাকে। বাঁশী বাজানর জন্য উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। অবসরমত অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকে আনন্দের টানেই বাঁশীতে ফুঁ দেয়, তার সুমিষ্ট সুরে সঙ্গীত-পিপাসা নিবৃত্ত করে। সাধারণতঃ রাখাল বালকেরা বাঁশীর খুব ভক্ত। তারা ধেনু চরায় আর বেণু বাজায়। নানা প্রকার লোকসঙ্গীতে পেশাদার-অপেশাদার গায়কেরা বাঁশী ব্যবহার করে। ভাওয়াইয়া গানে দোতারার সঙ্গে এবং সারিগানে সারিন্দার সঙ্গে বাঁশী বাজান হয়। যাত্রাগানে ঢোলকের সঙ্গে এবং বিষহরী গানে খোলের সঙ্গেও বাঁশী বাজে।

বাঁশীর উপকরণ অতি সাধারণ— তরলা বাঁশের সরু একটি 'পোড়' হলেই চলে। এতে ছিদ্র করে বিভিন্ন প্রকার বাঁশী তৈরি করা হয়।

১. পাতিল > পাইল + আ (ভাবার্থে) = পাইল্যা ; ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এরূপ উচ্চারণ আছে।

সাধারণভাবে বাঁশীর দৈর্ঘ্য হাত খানেক হয়ে থাকে। তবে এর চেয়ে ছোট অথবা বড়ও হতে পারে। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি সারিগানে 'আষ্ট আঙ্গুল' পরিমিত বাঁশীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] খুলনা জেলার পশ্চিম অঞ্চলে লাঠির মত দেখতে এক প্রকার লম্বা বাঁশীর কথা বলেছেন আবদুল করিম সাহেব। তাঁর মতে, এর ঠিক মাঝখানে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়।[২] সাঁওতালদের বাঁশীও বেশ লম্বা হয়ে থাকে।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে কয়েক প্রকার বাঁশী প্রচলিত আছে, যথা আড়বাঁশী, কদবাঁশী, টিপরাবাঁশী ও হরিণাবাঁশী। বাঁশের বাঁশী ছাড়া নলের বাঁশী, পাতার বাঁশী প্রভৃতির ব্যবহার লোকসঙ্গীতে দেখা যায়। ভাওয়াইয়া গানে দোতারার সঙ্গে লেবুপাতা বাজানর রেওয়াজ আছে। একটি পাতা দু'হাতে ধরে অংশবিশেষ মুখের মধ্যে পুরে বাজান হয়।

আড়বাঁশী: বাঁশের বাঁশীর মধ্যে আড়বাঁশী অধিক জনপ্রিয়; এটি দেশের সর্বত্র প্রচলিত। মাথায় গিঁট রেখে বাঁশ কাটতে হয় যাতে তা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত খোলা। খোলা দিকে একই রেখায় কাছা-কাছি ছয়টি গোল ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রগুলিতে উপরে-নীচে ডান ও বাম হাতের তিনটি করে ছয়টি আঙুল রাখা হয়। বাজানর সময় আঙুলে ছিদ্রগুলি চেপে বন্ধ করে অথবা ছেড়ে দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি তোলা হয়। মাথার ঈষৎ নীচে ঐ ছিদ্রের বরাবর রেখায় অপর একটি ছিদ্র করা হয়। আড়াআড়িভাবে ধরে এতেই ঠোঁট রেখে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়। আড়াআড়িভাবে ধরে বাজানর জন্য এর নাম আড়বাঁশী হয়েছে।[৩]

১. আষ্টআঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে দিয়া ছেঁদা
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।
মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৮

২. আবদুল করিম—পূর্ব পাকিস্তানের লোক-বাদ্যযন্ত্র, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ৬৯২-৯৩

৩. ময়মনসিংহ জেলায় এ নামটি পাওয়া যায়। মহুয়া পালাগানে আছে:
শিরে ছিল আড়বাঁশীটি তুল্যা নিল হাতে
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ায় আনিতে।
—মৈমনসিংহ গীতিকা

মোহনবাঁশী, মুরলী, বেণু প্রভৃতি এর অপর নাম। কৃষ্ণের বাঁশীর নাম ছিল মুরলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুরলী বা মোহন বাঁশীকে আড়বাঁশী নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

কদবাঁশী : আড়বাঁশীর মত কদবাঁশীতেও নীচের দিকে ছয়টি গোল ছিদ্র থাকে। মাথার কাছে কোন ছিদ্র থাকে না। গিঁট সমেত মাথা তেরচাভাবে কেটে ঈষৎ ছিদ্রে বাঁশের পাতলা খিল দেওয়া হয়। খিলের নীচে চার কোণাবিশিষ্ট একটি ছিদ্র থাকে। নীচে ছয়টি ছিদ্রের বিপরীত দিকে একটি অতিরিক্ত ছিদ্র করা হয়। প্রয়োজনমত বাতাস ছেড়ে বা রোধ করে এব সাহায্যে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তেরচা অংশটুকু মুখে পুবে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। কদবাঁশীর মুখের গঠন প্রণালী থেকে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়; মুখ কলমের মত দেখতে বলে এর অপব নাম 'কলমবাঁশী',[২] মুখের কাছে খিল থাকে বলে ফরিদপুরে এর নাম 'খিলাবাঁশী',[৩] মুখের মধ্যে পুরে বাজান হয় বলে উত্তর বঙ্গে এটি 'মুখবাঁশী' নামে পরিচিত।[৪] অন্যত্র এটি 'লয়াবাঁশী' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।[৫] অন্যান্য বাঁশীর সহিত তুলনায় এটি বাজান অপেক্ষাকৃত সহজ।

টিপরাবাঁশী : টিপরাবাঁশীর উভয় প্রান্তই খোলা। কদবাঁশীর মত মাথার ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে বাজাতে হয়। এর গায়ে আটটি ছিদ্র থাকে।[৬] উভয় প্রান্ত খোলা বলে কেবল ফুঁ দিলেই বাজে না, অভিজ্ঞ বাদক ছাড়া টিপরাবাঁশী বাজান কঠিন কাজ।

হরিণাবাঁশী : বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত জনৈক নিয়মিত সংগ্রাহক হরিণাবাঁশীর এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, "হরিণ্যাবাঁশী বাঁশের

১. নান্দের নান্দনকৃষ্ণ আড়বাঁশী বাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংরক্ষিত লোকবাদ্যযন্ত্র বিভাগে এ নামটি পাওয়া যায়।

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৭১ (ফরিদপুর), ১৯৬৪

৪. পূর্বোক্ত, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ৬৯২

৫. ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক, পৃঃ ২২
বাঁশীর নামটি কোন অঞ্চলের তা গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি।

৬. Traditional culture in East Pakistan, p. 113

কঞ্চি দ্বারা তৈয়ার করা হয়। বাঁশীটি প্রায় ৯" দীর্ঘ। বাঁশীটি নীচের গিরা পর্যন্ত দুইভাগে বিভক্ত থাকে। কোন ছিদ্র থাকে না। ইহাতে ফুৎকার দিলে হরিণের বাচ্চার ডাকের মত এক প্রকার আওয়াজ হয়।"[১] বস্তুতঃ হরিণ শিকারের কৌশল হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কুমিল্লা জেলায় এ বাঁশীটিব প্রচলন আছে।

পাতবাঁশী

তালপাতা বা নারিকেল পাতা দিয়ে এ বাঁশী তৈরি কবা হয়। এটি একান্তভাবে লৌকিক বাদ্য। পল্লীর বালক-বালিকাদের বাজনার উপযোগী করে এটি তৈরি করা হয়। এর দ্বারা সূক্ষ্ম ও মধুর সুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাংলা একাডেমীর জনৈক সংগ্রাহক পাতবাঁশীর এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, "একটা পাতা দুই ভাঁজ করিয়া কলম কাটার মত আগাটা একটু কাটিয়া পরে ঐ পাতাকে কেন্দ্র করিয়া পাতা পেচাইতে পেচাইতে বা জড়াইতে জড়াইতে আস্তে আস্তে বড় করিতে হয়। পরে ঐ ছোট মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিলেই বাজিয়া উঠে।"[২]

মুখাবাঁশী

একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় মুখাবাঁশী ব্যবহার আছে বলে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব জানিয়েছেন। তাঁর মতে, 'বিষহরি পালাগানে'র সঙ্গে এ বাঁশী ব্যবহৃত হয়।[৩] ছোট-বড আকারের কয়েকটি চোঙা পরস্পরে মুখে পুরে জোড়া দেওয়া হয়। সবচেয়ে চোট চোঙার মুখে মুখ রেখে ফুঁ দিয়ে তা বাজান হয়।

ভেঁপু

আমের আঁটির অঙ্কুর গজিয়েছে অথবা চারা সামান্য বড় হয়েছে এমন অবস্থায় আঁটিটি মাটি থেকে তুলে বাইরের শক্ত খোল ছড়িয়ে

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬৪ (কুমিল্লা), ১৯৬৪
২. ঐ, খাতা নং ৬৩৬৪/১৭২ (ফরিদপুর), ১৯৬৪
৩. বাংলার পল্লীগীতি, পৃঃ. ৫৩১

নেওয়া হয়। তারপর আঁটির একদিক তেরচাভাবে মাটি বা ইটের দেওয়ালে ঘষে কদবাঁশীর মত মুখ তৈরি করা হয়। তেরচা অংশ মুখে পুরে ফুঁ দিলে পুঁ...পুঁ...শব্দ হয়। বাংলার পল্লীর ছেলেমেয়েদের এটাই প্রিয় ভেঁপু বাদ্য। এতেই তাদের সুরপিপাসা নিবৃত্ত হয়। এ কেবল খেলার অঙ্গ হিসেবে সুরের আনন্দে বাজান হয়, এর সঙ্গে গান, নাচ বা অন্যবিধ সুর-তালের সঙ্গতের সম্পর্ক নেই। সুর খুবই স্থূল। বয়স্করা তা ব্যবহার করেন না। কেবল শিশুর মনোরঞ্জনে ভেঁপু কাজে লাগে।

তুবড়ি

তুবড়ি শুষির শ্রেণীর বাদ্য। সাধারণতঃ সাপের খেলায় তুবড়ি বাজান হয়। এর সুমিষ্ট সুরে সাপ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নাচে ও খেলা দেখায়। তুবড়ির আঞ্চলিক নাম 'বীণ'। কোথাও 'তিক্তিরী' ও 'পুঙ্গী' নামেও পরিচিত।[১] একটি ছোট লাউ-এর খোলের ভিতর এক জোড়া বাঁশী লাগিয়ে তুবড়ি তৈরি করা হয়। বাঁশীর ছিদ্রে আঙুল দিয়ে বাতাস চেপে সুর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাতাস লাউ-এর খোলের ভেতর দিয়ে যায়। সাধারণ বাঁশী থেকে তুবড়ির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, শ্বাস নেওয়ার সময় ধ্বনি থেমে যায় না, জিহ্বা দিয়ে মুখ বন্ধ করে সুরের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা হয়। খোলের মধ্যে যে বায়ু সঞ্চিত থাকে, তা-ই কিছুক্ষণ বাঁশীকে ধ্বনিত করতে পারে। ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে তুবড়ির জনপ্রিয়তা বেশি। বাংলায় বেদে সাপুড়ে ছাড়া অন্যরা সচরাচর এটি ব্যবহার করে না।

শিঙ্গা

শিঙ্গা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। মহিষের শিং দিয়ে তৈরি। ঈষৎ বাঁকান শিং-এর সরু প্রান্তে জোরে ফুৎকার দিয়ে শিঙ্গা বাজান হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নায়ক শিঙ্গাধ্বনি করে স্বীয় দলের সৈনিকদের সঙ্কেত জ্ঞাপন করেন।

---

১. ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৯২
তিক্ত লাউ-এর খোল থেকে তিক্তিরী নামটি গৃহীত হয়েছে বলে গ্রন্থকার জানিয়েছেন।

শিঙ্গা অধুনা অপ্রচলিত। এর স্থলে বিউগল বাজান হয়। বড় আকারের শিঙ্গাকে 'রামশিঙ্গা' বলে।[১]

সামুদ্রিক শামুকের খোলস দিয়ে শঙ্খ তৈরি হয়। সব শঙ্খ বাদ্যোপযোগী হয় না, বিশিষ্ট আকারের শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খের ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুদেব মধ্যে শঙ্খধ্বনি মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়। প্রায় সকল শুভ অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজিয়ে অভিনন্দন জানান হয। মন্দিরে সন্ধ্যারতিতে শঙ্খ ও ঘন্টা বাজান হয।

১. বাংলার পল্লীগীতি, পৃঃ ৫৩১

পঞ্চম অধ্যায়

লোকাচার

১

শিশু-জন্ম

জীবমাত্রেরই পরম কামনা সন্তানলাভ। সন্তানলাভের জন্য প্রাণী চিরকাল সংগ্রাম করে আসছে। সন্তানধারণ ও লালন-পালন জৈব প্রবৃত্তির মত অপরিহার্য মনোবাসনা নয়, তবে প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। নবজন্মের ভেতর দিয়ে সৃষ্টিধারা অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্নরূপে চলে আসছে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ এ ব্যাপারে নানা স্বার্থের সহিত জড়িত। কেবল আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি নয়, ধনরক্ষা ও মানবৃদ্ধির জন্যও সে সন্তান কামনা করে। সন্তানহীন নরনারী লোকচক্ষে হেয়—'আঁটকুড়ে' পুরুষ ও 'বাঁঝা'নারী সমাজে অপাঙক্তেয়। এদের মুখ দেখা 'যাত্রানাস্তি'র লক্ষণ বলে লোকসংস্কার আছে। যৌনলিপ্সা দাম্পত্য জীবনের চরম কথা নয়; তবে দাম্পত্য জীবনের চরম সার্থকতা সন্তানকে কেন্দ্র করেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে এবং মনোবাসনার বৈচিত্র্যে নরনারীর মিলন বিঘ্ন হত যদি না আত্মজ এসে মায়ায় বেঁধে দিত।

কেবল ঐহিক প্রয়োজনে নয়, পারত্রিক চিন্তাতেও সন্তানের জন্য মানুষ ব্যাকুল। হিন্দুর বিশ্বাস, সন্তানের হাতের মুখাগ্নিতে পিতামাতা 'পুৎ' নামক নরক থেকে মুক্তি পায়। মুসলমানের বিশ্বাস, ছেলেমেয়ের দোয়া-দরূদ, দান-খয়রাতে পিতামাতার আত্মার মঙ্গল হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার তাগিদটাই প্রবল। ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিজীবন উভয় ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। আরণ্য জীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্যপশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের জনবল প্রয়োজন

ছিল। বনে বনে শিকারে, খাদ্যসংগ্রহে, শত্রুর সাথে সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করত। গোষ্ঠিজীবনেও সম্পদ বৃদ্ধি ও শত্রুনাশের জন্য সন্তান-সন্ততির সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের শ্রম, শক্তি ও সাধনার দ্বারাই জাতির সকল প্রকার নিরাপত্তা রক্ষা পায়।

অতএব মানুষের সন্তান চাই। সন্তান পাওয়ার জন্য আরাধ্যের কাছে কত মানসিক, উৎসর্গ, সাধ্যসাধনা; আবার পাওয়ার পর তার নিরাপত্তা ও লালন-পালনের জন্য কত বাছবিচার, আচার-সংস্কার! নারীর বন্ধ্যাত্ব অথবা গর্ভত্ব, শিশুর জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে জীববিজ্ঞান যা'ই বলুক না কেন, যে জনজীবনে বিজ্ঞানের আলোকশিখা প্রবেশ করেনি এবং এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত যার পরিচয় ঘটেনি—নানা বিশ্বাসের হাত ধরে সে জীবন বাসনার অনুকূলে অথবা আশঙ্কার প্রতিকূলে কেবল লৌকিক প্রথার অন্ধ-অনুসরণ করে আসছে। এর সবগুলি আদিম চেতনার নিষ্ফল ক্রিয়ামাত্র নয়, কোন কোনটির দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার বাস্তব কর্মফল আছে। বাস্তব উপযোগিতা ও অন্ধসংস্কার অবিমিশ্রভাবে কোন আচারে নেই। 'সাধ-ভক্ষণে' গর্ভবতী ও গর্ভশিশুর জৈবক্রিয়ার দরুন বিশেষ বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ অংশতঃ বিজ্ঞানসম্মত হলেও অজ্ঞ নারীমনের সেদিকে খেয়াল কম, বরং এর অভাবে অনাগত সন্তানের চরিত্রে সংযম শিথিলতার দোষ ঘটে, এরূপ অমূলক আশঙ্কায় সে আচারনিষ্ঠ হয়ে উঠে। তবু সাধভক্ষণে মনোবিজ্ঞানের ও যাদুবিশ্বাসের পাশাপাশি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তান কামনায় 'সাইটোর' অনুষ্ঠান, নবজাতকের নিরাপত্তার 'আঁতুর-বন্ধন', শিশুর চলৎশক্তির আশায় 'গড়গড়া' আচারের কোন বস্তুগত মূল্য নেই, মনোগত স্বস্তি ছাড়া।

শিশু-জন্মের আচারগুলি নারীরাই পালন করে থাকে। নারীমন অধিক রক্ষণশীল। বহির্বাস্তবের সহিত সংগ্রাম করে পুরুষের মন বস্তুগুণে যে পরিমাণে প্রত্যয়শীল, অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে সংগ্রাম বিমুখ নারীর মন বস্তুমূল্যে সে পরিমাণে আস্থাশীল নয়। তার কল্পনাশ্রয়ী মন বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা ভরাট করে নেয়। এজন্য অশিক্ষিত নারীমন থেকে নানা আচার-বিচারের জন্ম হয়। নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাঙালী আদিবাসীর উত্তরাধিকারী। 'এ্যানিমিজম', 'টোটেম', 'ট্যাবু', 'ম্যাজিক' প্রভৃতি ধর্মগত বিশ্বাস আদিম চেতনার লক্ষণ। বাংলায় বসবাসকারী

বর্তমান উপজাতিদের আচার-অনুষ্ঠানে আদিম চৈতন্য প্রায় অবিকৃতভাবে চলে আসছে। পূর্ব সংস্কারের বীজ বাঙালী নারীমানসে সঞ্চিত থেকে গেছে। নারীমানসিকতায় সংস্কারানুগত্য বেশী, সংস্কারসাধনপ্রবণতা কম।

বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত শিশু-জন্মের (Childbirth) অধিকাংশ আচার ও বিশ্বাস ম্যাজিক ও ট্যাবু লক্ষণাক্রান্ত। লোকাচারে ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিকশক্তির প্রভাব বেশী, লোক-বিশ্বাসে ট্যাবু বা বিধিনিষেধের প্রাধান্য। যাদুবিশ্বাসের মূলে আছে কর্মসাধনার দ্বারা অলৌকিক শক্তির আয়ত্তীকরণ, ট্যাবুর মূলে আছে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক বিধান। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সন্তান লাভের কামনায় বন্ধ্যা মেয়েরা গাছের শাখায় ঢিল বেঁধে দেয়। গাছের ঢিল হলো ফলের নকল, এইভাবে ফল ফলাবার নকল তুলেই মেয়েরা ফলপ্রসূ হবার কামনাকে সফল করবার কল্পনা করে।"[১] এটি একটি যাদুবিশ্বাসগত লোকাচার। গাছকে ফলবতী দেখে নিজেকে গর্ভবতীরূপে কল্পনার মধ্যে সমপ্রক্রিয়ার যাদুবিশ্বাস আছে।

আঁতুড়বন্ধন অনুষ্ঠানে ঘরের দরজায় মরা গরুর মাথার হাড়, ছেঁড়া জুতা ও ঝাঁটা রেখে ডাকিনী-যোগিনীর কুনজর ও জিন-ভূতের কুপ্রভাব থেকে নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে রক্ষা করার কল্পনার মধ্যেও যাদুবিশ্বাস রয়েছে। হাড়, জুতা. ঝাঁটা এসব অলৌকিক আত্মার অস্পৃশ্য বস্তু। এগুলি অমঙ্গলের প্রতিষেধকরূপে ক্রিয়া করছে। এখানে বিপরীত যাদুবিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে।

গর্ভবতী সম্বন্ধে নানা লোকবিশ্বাস আছে। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি লোকবিশ্বাসের[২] সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ক. গর্ভবতী নারীর রাত্রে একা ঘরের বাইরে যেতে নেই, গেলে সঙ্গে আগুন নিতে হয়। এরূপ করলে 'উপরিদুষ' হয় না।

---

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— লোকায়ত দর্শন, পৃ: ৩৪৮

২. লোকসাহিত্য (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫

পৃথিবীর প্রায় সব জাতির নারীর মধ্যে গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে সংস্কার আছে। মেক্সি-কোর মেয়েরা গর্ভবতী থাকাকালীন সামুদ্রিক শামুকের খোল ধারণ করে, এতে গর্ভপাত সহজ হয় বলে বিশ্বাস। ভারতের সিয়া মেয়েরা এ সময় মেসিনে সেলাই করে না, করলে শিশুর নাভির নাড়ি জড়িয়ে যায়।

SDFML, Vol. 1, p. 217

খ. গর্ভবতীকে পাতিল, মুচি, ঢাকুন ইত্যাদিতে খেতে নেই, খেলে সন্তানের পেট বড় হয়।

গ. চন্দ্রগ্রহণের সময় গর্ভবতীর কোন জিনিস কাটাকুটা অনুচিত, কাটলে সন্তানের ঠোঁট কাটা হয়।

ঘ. গর্ভবতীর ঝাঁটা বাঁধতে নেই, বাঁধলে সন্তানের নাড়ি জড়িয়ে যায় এবং প্রসবকালে কষ্ট হয়।

এসব লোক সংস্কারের পেছনে যাদুবিশ্বাসই সক্রিয়। লৌকিক কর্মের, অলৌকিক ফলশ্রুতি সম্বন্ধে অমূলক ধারণা হচ্ছে লোকসংস্কার। লৌকিক ক্রিয়ার সহিত অলৌকিক ফলশ্রুতির কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। কেবল কর্মের প্রতিভাসে মন আশঙ্কাগ্রস্ত হয়। আদিম মানুষ সকল বস্তুতে আত্মার আরোপ করে জড়শক্তির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ, সতর্ক থাকত। ধর্মবিশ্বাসের এটা এ্যানিমিজম স্তর। সর্ববস্তুতে আত্মার কল্পনা ও বস্তুর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস থেকেই এসব কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। অলৌকিকতার কর্মফলে বিশ্বাসই যাদুবিশ্বাস।

শিশু ও প্রসূতিকেন্দ্রিক আচারগুলির উদ্ভবের মূলীভূত কারণ যাদু ও ট্যাবু; সন্তানের নিরাপত্তার আশঙ্কায় এবং মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় এগুলি প্রতিপালিত হয়। কতকগুলি ভয় প্রাকৃতিক—ব্যাধি, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, কীট-দংশন ইত্যাদি, কতক অপ্রাকৃত ভয়-ছুঁৎ-ছায়া, কুনজর, ভূতপ্রেতের উৎপাত। আর এক রকম ভয় আছে তাকে জৈব সম্পর্কিত বলা যায়। নৃতত্ত্ববিদ এর নাম দিয়েছেন, Blood tabu contamination।[১] পিতা-মাতার দোষগুণ রক্তসম্পর্কে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শারীরবিদ্যা মতেও তা সত্য। প্রাচীন মানুষেরা পিতামাতার কতক খারাপ প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করত এবং তদনুপাতে সাবধানতা অবলম্বন করত। মায়ের সঙ্গে যে ট্যাবু, তা প্রধানতঃ আচরণ ও খাদ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করে। গর্ভবতী 'মৃগেল মাছ' খেলে সন্তানের 'মৃগীরোগ' হয়;[২] এটা খাদ্য সম্পর্কিত ট্যাবু। পিতার কাছ থেকেও সন্তানের উপর চারিত্রিক দোষ

১. Ibid, p. 217

২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫

বর্তে। কোন কোন জাতির মধ্যে সংস্কার আছে, স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালীন স্বামীর পক্ষে কোন গাছ, ঘরের ছাদ বা উঁচু টিলায় উঠা নিষেধ।[১]

হিন্দুশাস্ত্রে শিশুর জন্মসংক্রান্ত নানা 'সংস্কার' আছে। ব্যক্তিজীবনের শুদ্ধি অর্থে শাস্ত্রে সংস্কার বিধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অধিকাংশ শিশু-জন্মকে কেন্দ্র করেই পালিত হয়। যেমন,

গর্ভাধান—সন্তান লাভের আকাঙক্ষায়,
পুংসবন—গর্ভপ্রাপ্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পালনীয়,
সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভোৎপত্তির ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে করণীয়,
শোষ্যন্তীকর্ম—প্রসব-বেদনাকালে নির্বিঘ্ন গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে,
জাতকর্ম—প্রসবের পর ও নাড়ি ছেদের আগে করণীয়,
নামকরণ—জন্মের দশ বা একশ রাত্রির পর করণীয়,
নিষ্ক্রমণ—তৃতীয় মাসে প্রসূতির আঁতুড় ঘর হতে বাইরে আসা,
অন্নপ্রাশন—শিশুজন্মের পর পুত্র ও কন্যাভেদে ষষ্ঠ-অষ্টম মাসে বা পঞ্চম-সপ্তম মাসে করণীয়।[২]

এর অধিকাংশ বাঙালী হিন্দু সমাজে লোকাচারের সহিত মিল আছে। বলা যায়, লোকাচারকে সংস্কার করে শাস্ত্রাচারে পরিণত করা হয়।

মুসলমান সমাজেও নানা আচার ও কুসংস্কার আছে। বিশেষতঃ অশিক্ষিত গ্রামজীবনে এ সবের প্রভাব খুব বেশী। অনেক হিন্দু আচারই বিকৃত অথবা রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত আছে। সন্তানলাভের আশায় পীরের দরগায় প্রার্থনা করা ও শিরনী দেওয়া পুরোপুরি হিন্দুদের দেবতার কাছে পূজা ও মানসিক করার অনুরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। বন্ধ্যাত্ব দুরীকরণে সাইটোর আচার বাংলার কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান সমাজেও প্রচলিত আছে। আঁতুড়ঘর থেকে নিষ্ক্রমণকে মুসলমান পরিবারে 'শুদ্ধ হওয়া' বলে। উপলক্ষ হিসেবে অন্নপ্রাশন ও আঁকিকা অভিন্ন অনুষ্ঠান। নামকরণ প্রথা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। এছাড়া ধর্ম ও সমাজভেদে স্বতন্ত্র আচারও আছে। 'ব্যাভার' আচারটি সাধারণতঃ মুসলমান পরিবারে

---

১. ERE, Vol., 10, P. 243
২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃঃ ৭৬-৭৮

রেওয়াজ আছে। এর অন্তর্নিহিত গুণধর্মে আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার থাকলেও সাধারণভাবে লৌকিকতা হিসেবেও গণ্য হতে থাকে।

বাংলার পল্লী সমাজে প্রচলিত শিশু-জন্মের আচারগুলির কালগত বিচারে তিনটি স্তর নির্ণয় করা যায়:

এক. গর্ভপূর্ব—সাইটোর, বরকবের চিড়া খাওয়া।

দুই. গর্ভকালীন—বিল্লাতলে নারান, ব্যাভার, সাধভক্ষণ প্রভৃতি।

তিন. গর্ভোত্তর—ছাট, হাইটকালা, একচোরাব বেড়ি, আঁতুড়বন্ধন, নামকরণ, গড়গড়া ইত্যাদি।

সাইটোর

বন্ধ্যা নারীব সন্তান কামনায় সাইটোর অনুষ্ঠান পালন করা হয। এটি রংপুর জেলাব আঞ্চলিক নাম; গ্রামেব মেযেরা এ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক গীত গায়। অনুষ্ঠানেব পরিচিতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "সাইটোবের গীতগুলি গীত হইবাব পূর্বে একটি সোনাব ঝাড় তৈযাবী করে এবং তাহাতে আলোচাউল, মালভোগ কলা, চিনি, গুড়, দুধ, মুড়ি, খই ইত্যাদি দেয়। দেওয়ার পব সেই সোনার ঝাড়টি একজনে নাড়া দেয় এবং একজন স্ত্রীলোক তাঁহার আঁচল পাতিয়া সোনার ঝাড়টিব নীচে বসিযা থাকে। সোনার ঝাড়টি ঝুঁকাইতে ঝুঁকাইতে যখন সেই ঝাড় হইতে কোন খাবাব দ্রব্য খসিয়া পড়ে তখন সেই দ্রব্যটি আঁচলে মোড়াইয়া লইয়া যায় এবং ইপ্সিত স্ত্রীলোকটিকে খাওয়াইয়া দেয়।"[১]

আচারটির মর্মগত বিশ্বাস হল, কোন কিছু ভক্ষণ করে বন্ধ্যাত্ব দূর করা তথা অন্তঃসত্বা হওয়া। এভাবে সন্তান লাভেব কথা নানা লোকগাথায় পাওয়া যায়। ফলমূল, লতাপাতা খেয়ে অন্তঃসত্বা হওয়ার কাহিনী প্রায় সবদেশের লোকগাথার একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ। লোক বিজ্ঞানীর মতে একে 'অলৌকিক জন্মমটিফ' (unnatural birth motif) বলা হয়।[২]

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৩৯ (রংপুর), ১৯৬৪

২. আমেরিকান লোক-বিজ্ঞানী স্টিথ থম্পসন তাঁর The motif Index of Foklliterature গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অলৌকিভাবে সন্তানের জন্মলাভের মটিফগুলি তিনি T510-T543 সংখ্যায় শ্রেণী ভাগ করেছেন।

জনাব আশরাফ সিদ্দিকী এমতের সমর্থনে লিখেছেন, "রূপকথার এই মটিফ গুলি আদিম মানুষেরই বিশ্বাস বা ধ্যান-ধারণার ক্রমধারা মাত্র। সন্তানের জন্মগ্রহণ যে একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং এর সঙ্গে যে পিতামাতার কোনরূপ জৈব সম্বন্ধই নেই তা বহু আদিম জাতিরই বিশ্বাস ছিল। আমাদের দেশের অরণ্যচারী বহু নাগা, কুকী এবং গাড়োদের মধ্যে এখন পর্যন্তও এসব বিশ্বাস প্রচলিত আছে।"[১] সন্তান লাভের কামনায় বাঙালী রমণীর সাইটোর অনুষ্ঠান এরূপ আদিম চেতনাপ্রসূত।

'ষষ্ঠী' থেকে সাইটোর শব্দের উৎপত্তি।[২] হিন্দু লোকধর্মে ষষ্ঠী সন্তান প্রজননের এবং রক্ষণাবেক্ষণের দেবী।[৩] সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেবীর বর চেয়ে সাইটোর আচার পালন করা হয়। কাল ও স্থান ভেদে এর আচারগত পার্থক্য আছে কিন্তু সংস্কার ভেদ নেই। রংপুর জেলা হতে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে 'সাইটমোন' দেবীর কাছে সন্তানের বর প্রার্থনা করা হয়েছে:

ওপারে থাকিয়া সাইটমোন ডাকে ঘন রায়
আইসেক আইসেক খেউনি পার করি দে মোকে।
পার করিয়া দেরে খেউনি, পার করিয়া দে
যারে বর চাধু তারে বর দেইম।

ট্যাকাপয়সার বর দিলে সাইটমোন চোরায় নিয়া যাইবে।
দুই বা পুতের বর দিলে সাইটমোন বুগোত নাগি থাইকপে।[৪]

অন্য একটি গীতে আছে গাজী, মাদার প্রভৃতি লৌকিক পীর সন্তানের বর দিতে পারেননি। বর দিয়েছেন 'সাইটোরী মা'। সাইটোরী মায়ের

১. লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৩০
২. ষষ্ঠী>ষটঠী>ষাটী>ষাইট+অর (সম্বন্ধে)=সাইটর, সাইটোর।
৩. মানবশিশুরক্ষক বৌদ্ধদেবীর নাম জঙ্গুলা ও হারীতী দেবী।
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪৬
৪. পূর্বোক্ত, খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৭ (রংপুর), ১৯৬৬

ডিঙ্গা ঘাটে এলে জয়ধন তার কাছে বর প্রার্থনা করে। দেবী এই বলে বর দিলেন :

আয়ধন ছাড়িয়া দে মোর ডিঙ্গার গলই রে,
আয়ধন বিচেও আচোল লে ধনপুতের বর রে।[১]

জনাব সামীয়ুল ইসলাম আচারটির উপাদানগত ও পদ্ধতিগত কিছু ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভাঁটফুল ও আলোয়া খই (গুড় বিহীন খই) ডালার দুটি অত্যাবশ্যক উপাদান। তিনি লিখেছেন, "অনুষ্ঠানের পূর্বে সন্তানবতী মেয়েরা একখানি জায়গা উত্তমরূপে লেপেপুঁছে সদ্য প্রস্ফুটিত ভাইটেব ফুল ডালসহ উক্ত স্থানে গেড়ে দেয় এবং মাঝখানে ডালাটি ঝুলিয়ে রাখে। এরপর ডালাটি আলোয়া খই দিয়ে ভর্তি করে নাচুনী ও গীদালিরা গীত গায় ও মাঝে মাঝে ঝাঁকুনী মারে। ঝাঁকুনীতে ডালার আলোয়া খই মাটিতে ঝর ঝর করে পড়ে আর ছেলেপুলেরা কুড়িয়ে খায়।…অনুষ্ঠান শেষে ডালাটি খুলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বাসগৃহে রাখে ও ডালায় অবশিষ্ট যে দু'একটি খই থাকে তা তাকে ভক্ষণ করতে দেয়। এ ছাড়া ডালাটি সাত দিন অথবা একুশ দিন পানি দিয়ে ধুয়ে উক্ত পানি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকটিকে খাওয়ায়।"[২] অন্য শিশুদের উপস্থিতি ও সংসর্গ লাভের পেছনে নিজ গর্ভজাত বহু সন্তান লাভের কামনা প্রচ্ছন্ন আছে, যাদুতন্ত্রের এটি সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের বিষয়।

বরকরের চিড়া খাওয়া

বন্ধ্যানারী সন্তান কামনায় বরকরের চিড়া খাওয়ার আচার পালন করে। কোথাও বরকরের[৩] উদ্দেশ্যে শিরনী দেওয়া হয়। ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে এ আচারটি প্রচলিত আছে। হিন্দু নারীরা এতোদ্দেশ্যে 'বর কুমারের ব্রত' পালন করে। সাধারণতঃ সন্তান কামনা করে বরকরের

১. ঐ, খাতা নং ৬৩৬৪/১৩৯ (রংপুর), ১৯৬৪
২. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৬৫
৩. বরকর : কাল্পনিক পীর ; বরকরের চিড়া খাওয়া আচারের যে লোককথা প্রচলিত আছে তাতে বরকত খোদার নির্দেশে মর্তে মুসাফিরের বেশে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রদত্ত ফল খেয়ে রাণী সন্তানবতী হন। শ্রীকামিনীকুমার রায়—ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে সিন্নি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃঃ ২০৯

চিড়া খাওয়ার মানত করতে হয়। শ্রীকামিনীকুমার রায় একটি প্রবন্ধে আচারটির নিয়ম সম্পর্কে এরূপ বিবরণ দিয়েছেন: "উঠানে একটু জায়গা লেপিয়া, কলার একটি আগপাতে মানতকারিনী যে পরিমাণ চিড়া খাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণ চিড়া, কলা ও দুধ একত্র দিয়া বরকরের উদ্দেশে সেলাম করেন এবং কথা বলেন। পরে আবার সেলাম করিয়া উঠানে বসিয়াই সমস্ত চিড়া খাইয়া ফেলিতে হয়। কেহ কেহ এক এক মুষ্টি চিড়া ও দূর্বা উচ্ছিষ্ট পাতাসহ জলে বিসর্জন দেয়। সেদিন আর কিছু খাইতে নাই। বার মাসে এইরূপ বার দিন বরকরের চিড়া খাইতে হয় "[১]

ব্যাভার

ব্যাভার[২] নারীর প্রথম গর্ভকালীন লোকাচার। রাজশাহীর এটি আঞ্চলিক নাম।[৩] লৌকিকতার সহিত যুক্ত হয়ে আচারটি বর্তমানে সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাভার না দেওয়া আর্থিক অক্ষমতা ও পারিবারিক অমর্যাদার ব্যাপার। প্রথমবার গর্ভকালে পাঁচ-ছয় মাসের সময় কন্যার অভিভাবককে মাছের ব্যাভার বা তত্ত্ব পাঠাতে হয়। সাধারণতঃ আঁশযুক্ত বড় মাছ ব্যাভারের উপযোগী। কন্যার শ্বশুরগৃহে এ মাছ পাড়াপড়শীর মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়। নানা ব্যঞ্জন রান্না করে গর্ভবতীকে খাওয়ানো হয়। ব্যাভার দিয়ে মেয়েকে পিতৃগৃহে আনা হয়।

উক্ত প্রথাটি বৈচিত্র্যহীন কিন্তু গূঢ় তাৎপর্যবহ। মাছের সঙ্গে প্রজননের কোন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু যাদুবিশ্বাস সংক্রান্ত লোক-সংস্কার আছে। মাছের ডিম থেকে অসংখ্য পোনা জন্মে। মাছ প্রভৃত উৎপাদনের

১. ঐ, পৃঃ ২০৯
২. ব্যাভার<ব্যবহার; অর্থ লৌকিকতার জন্য প্রদত্ত বস্তু।
৩. কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে 'বেবার' শব্দটি উপহার বা যৌতুক অর্থে পাওয়া যায়:

বাপের বাড়ীর বেবার পাইলাম
সোনার পালঙ্ক নায়ে,
ভাইয়ের বাড়ী বেব্যর পাইলাম
সোনার তোষক নায়ে।

লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬

প্রতীক। বহু সন্তানের কামনায় মাছকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালে একটির প্রতীকে বা সংসর্গে অপরটির কামনা করা হয়। এখানে সংসর্গজনিত ইপ্সিত ফলের কামনা আছে।

গর্ভবতী নারীর উপর মাছের প্রভাব সম্বন্ধে নানা লোকবিশ্বাস আছে। এর কতক ট্যাবু, কতক টোটেম। গর্ভবতী নারীর কতকগুলি মাছ খেতে নেই, যেমন টাকি, গজাব, চিকর প্রভৃতি। এগুলি খেলে পেটের সন্তান টাকির মত বেঁটে, গজারের মত দাগযুক্ত অথবা চিকরের মত পাতলা-দুবলা হবে।[১] প্রাচীন বিশ্বাসমতে, মাছ ছিল উর্বরতাশক্তির প্রতীক। সন্তান ধারণ ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী ও ভূমির ভূমিকা অভিন্ন। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকারেব মধ্যে মৎস্যের ব্যবহার উর্বরতাশক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য হত।[২] যাত্রার পক্ষে মাছ শুভ বলে সাধারণ লোকবিশ্বাস আছে।[৩]

সাধভক্ষণ

বাংলার প্রায় সর্বত্র নারী সমাজে সাধভক্ষণের রীতি আছে। সাত মাসের গর্ভবতী নারীকে সাধ খাওয়ানো হয়। মাতৃগর্ভে সন্তানের আগমন হলে জৈবিক প্রভাবেই নারীর দেহে ও মনে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গর্ভস্থ সন্তান মায়ের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনরস শোষণ করে নেয়। দীর্ঘ দশ মাস এ প্রতিক্রিয়ায় কাটে। সুতরাং উক্ত সময়েব মধ্যে মায়ের দেহ-গত ও মনোগত পরিবর্তন একান্ত স্বাভাবিক। শারীরবিদ্যা অনুসারে গর্ভের সাত মাস কাল শিশুর পূর্ণতার তৃতীয় ও শেষ স্তর।

যে অনুষ্ঠানে সন্তানবতীর সাধ বা ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হয়, তাই সাধভক্ষণ। ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও আত্মতৃপ্তি ভ্রূণস্থ শিশুর জৈবিক ও মানসিক গঠনে ক্রিয়া করে। এর অভাব ও অপূর্ণতার প্রতিক্রিয়া বিপরীত হয়। এদিক থেকে সাধভক্ষণ আচারের একটা বাস্তব উপযোগিতা

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫
২. লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৪৩৩
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২

আছে। কিন্তু লোকবিশ্বাস— গর্ভবতীর সাধ পূর্ণ না হলে সন্তান লোভী ও অসংযমী হয়।

সাধভক্ষণের রীতি সম্বন্ধে আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, "গর্ভধারিনীকে নতুন তাঁতের শাড়ী পড়ানো হয়। একটি বিরাট থালায় নানা প্রকার ক্ষীর, পিঠা ইত্যাদি সাজিয়ে পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গর্ভধারিনীর চারপাশে বসানো হয়। খাওয়ার পর ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে গর্ভধারিনীকে জড়িয়ে ধরে।"[১] স্পষ্টত: আচারটি সমপ্রক্রিয়ার যাদুবিশ্বাস থেকে আগত। ছেলেমেয়ের দ্বারা এভাবে গর্ভবতীকে জড়িয়ে ধরার তাৎপর্য হল, অনেক সন্তান মায়ের কোল ভরে রাখবে। নবাগত শিশুর স্পর্শ দ্বারা অনাগত শিশুর আহ্বান—সমপর্যায়ের ঐন্দ্রজালিক (sympathetic magic) বিশ্বাসের এটাই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া।

হিন্দু সমাজে সাত অথবা নয় মাসে সাধ দেওয়া হয়।[২] সাত মাসের সাধকে 'কাঁচা সাধ' ও নয় মাসের সাধকে 'পাকা সাধ' বলে। সাধারণতঃ কাঁচা সাধে সকল প্রকার 'ভৃষ্টদ্রব্য' ও পাকা সাধে 'ভোজ্যদ্রব্য' পরিবেশন করা হয়। এয়োরা শুভদিন দেখে গর্ভবতীকে এ সাধ খাওয়ায়।[৩]

দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে সাধের খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা দেখা যায়। নারীর সাধ ও রুচি সম্বন্ধে লোকসাহিত্যের নানা বিভাগে উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি ছড়ায় আছে—

লাউলের বউলো সাধন্তি!
কি কি খাইতে সাধ?
ঘরের ছুঁইচে নলভোগ ছিম, তাই খাইতে সাধ।
ঘরের ছুঁইচে কাজলা ছিম, তাই খাইতে সাধ।
বরইর অম্বল কড়কড়া ভাত।
লেম্বুপাতা পান্তাভাত।[৪]

১. লোক-সাহিত্য, পৃঃ ৩৪৭-৪৮
২. একটি পল্লীগীতে পাঁচ মাসে সাধভক্ষণের উল্লেখ আছে। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নয় মাসে সাধ দেওয়ার কথা আছে: 'নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।'
৩. বিশ্বকোষ, এক-বিংশভাগ, পৃঃ ৪২৬
৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৬

এখানে 'ছিম,' 'বরই', 'লেবুপাতা', 'কড়াভাত' ও 'পান্তাভাত'— এ কয়টি দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। শিম ভেষজ তরকারী, বরই বা কুল টকফল, লেবুর পাতা সুগন্ধময়। শক্তভাত অথবা পান্তাভাতের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। এসবই গর্ভবতীর প্রিয়। মৈমনসিংহ-গীতিকার 'দস্যু কেনারাম পালা'য় যশোধারার গর্ভকালীন সাধের দ্রব্য হিসেবে 'চুকা' (অম্ল শস্যী-বিশেষ) ও 'ছিকরে'র (শিকড়) নাম পাওয়া যায়।[১] একটি মেয়েলীগীতে সাধভক্ষণের চারটি দ্রব্যের নাম করা হয়েছে, যথা তেতুল (তিন মাসের গর্ভকালে), পান্তাভাত (চার মাসেব কালে) মোবগ ও খাসির গোস্ত (ছয় ও সাত মাসের সময়), দই (নয় মাসের সময়)।[২] 'চম্পাবতী কন্যার পালাগানে' অজপাসুন্দরীর সাত মাসে সাধ খাওয়ার উল্লেখ আছে। তাকে নানা প্রকার মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু মিষ্টান্নের চেয়ে চুলার পোড়া মাটি আর অম্বলে তার অধিক স্বাদ।[৩]

বিন্নাতলে বারান

ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভবতী আচারটি পালন করে থাকে। ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহস্থ পরিবারে এটি দেখা যায় বলে শ্রীকামিনী কুমার রায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাত মাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোক খৈ, চিড়া, গুঁড়া, কাঁই (পোড়াফল), ঠিকরী (পোড়ামাটি)—এসব দিয়ে অথবা মোরগাদি পাক করে ভাত-ব্যঞ্জন দিয়ে বিন্নাতলে কলার আগপাতে করে ভোগ দেয়। শনি মঙ্গল বার একাজের জন্য প্রশস্ত।[৪]

'বিন্না' কাশ জাতীয় ঘাস। বিন্নাতলে ভোগ দেওয়ার অর্থ বিন্না-গাছ পূজা করা। বনদুর্গার উদ্দেশ্যে 'শেওড়া গাছ' পুজার রীতি হিন্দু সমাজে আছে। শুভ কাজে হিন্দু ললনারা দেবীর উদ্দেশ্যে ভাত-ব্যঞ্জন বা খৈ-চিড়াদির ভোগ দিয়ে থাকে।[৫] একে 'বনদুর্গার বারান' বলা

১. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—মৈমনসিংহ-গীতিকা, পৃঃ ১৯৪ (৩য় সং)।
২. আলমগীর জলীল সম্পাদিত—উত্তরবঙ্গের মেয়েলীগীত, পৃঃ ১৪০-০১
৩. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৪, পৃঃ ৬১
৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১১
৫. ঐ, পৃঃ ২১১

হয়। বনদুর্গা কাকরূপে এসে ঐ ভোগ গ্রহণ করেন।[১] অশিক্ষিতা মুসলমান পল্লীনারীরা হিন্দুদের অনুকরণে বিন্নাতলে বারান আচারটি পালন করে। শেওড়া গাছের স্থলে মুসলমানরা বিন্নাগাছ গ্রহণ করেছে।

ছটি

ছটি সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে আঁতুড় ঘরে পালন করা হয়। এটি হিন্দুদের 'যেটেরা পূজা'র (<ষষ্ঠী পূজার) প্রভাবজাত বলে জনৈক প্রবন্ধ লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান সমাজে ছটি আচারের প্রচলন আছে।[২] যেটেরা পূজায় হিন্দু ললনারা সন্তানকে নতুন বস্ত্রে আবৃত করে দেবীর উদ্দেশ্যে থালায় সাজিয়ে ভোগ রেখে দেয়। এর সঙ্গে দোয়াত, কলমও রাখা হয়। রাত্রে ষষ্ঠী দেবী এসে ছেলের ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান। রংপুর জেলার এটা 'সাইটোর জাগান' অনুষ্ঠান। একটা ডালাতে কলা, গুয়া, পান, খই, মুড়ি, সিন্দূর ইত্যাদি সাজিযে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ও গীত গায়।[৩]

মুসলমান নারীরা ঐদিন প্রসূতিকে ছয় রকম শাক ও মাছের ব্যঞ্জনসহ ভাত খেতে দেয়। প্রসূতি খাওয়ার পর থালায় এঁটো রেখে দেয়। মুর্শিদাবাদে একে 'ষেটরার ভাত' বলে। ষেটরার ভাত মুছে খেলে ছেলে হা-ভাতে হয় ও তার চোখে কাজল থাকে না বলে লোক-বিশ্বাস। শিশু বড় হয়ে খাই খাই করলে পরিহাসছলে তাকে 'ষেটরার ভুখা' বলা হয়।[৪] ভারতে মুসলমানের ঘরে সন্তান জন্মের ছয় দিনের দিন 'Chhatti' নামে আচার পালনের কথা সতের শতকের ইতালির পর্যটক মনুচি উল্লেখ করেছেন।[৫] সাঁওতালরা এ উদ্দেশ্যে 'ছেটিয়ের' নামে আচার পালন করে।[৬]

১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭
২. আবদুল মুনীম চৌধুরী—মুসলিম জীবনে বিজাতীয় প্রভাব, আল-ইসলাহ, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭২
৩. পূর্বোক্ত, খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৭ (রংপুর), ১৯৬৬
৪. নিজস্ব সংগ্রহ।
৫. Historia do Mogor, Vol. 11 , p. 50
৬. দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল—সাঁওতাল সংস্কার, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২, পৃঃ ৩৮০

পাঁচ দিনের মাথায় অনুরূপ আচার পালনের কথা বলেছেন সামীয়ুল ইসলাম। তাঁর মতে, ঐ দিন নাপিত ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নবজাত শিশুর মাথা কামান হয়। শিশুর কানে খড় ও হাতে কলম রাখা হয়; লৌকিক বিশ্বাস, ঐরূপ করলে সে ভাল শুনতে পায় ও বেশী লেখাপড়া করতে পারে। কামান চুল পানিতে পুঁতে রাখে।[১] এটিকে তিনি 'পাষ্টির অনুষ্ঠান' এরূপ নামকরণ করেছেন।[২] খুব সম্ভব, শব্দটি পঞ্চ ও ষষ্ঠী শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। পঞ্চ দিবসে ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠান লৌকিক চেতনায় 'পাষ্টি' শব্দে সমন্বিত হতে পারে।

হাইটকালা

সন্তান জন্মের সাত দিনের দিন আচারটি পালন করা হয়। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত 'সোনাই কন্যার পালাগানে' আচারটির নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

একদিন দুইদিন গড়ি সাতদিন হইল
নাপিত ডাকি আনি কানাই কুমাই লইল।
... ...
কানাই কুমাই যাদুরে কন্ কাজ করিল।
মৌলভী সাহেব আনি হাইটকালা করাইল।[৩]

সাধারণভাবে আচারটিকে 'শুদ্ধ হওয়া' বলে। শিশু জন্মের সপ্তম দিনে প্রসূতিকে সূতিকাগৃহ থেকে প্রথম বাইরে আনা হয়। ঐদিন ঘর-দুয়ার লেপা-পোঁছা হয়। নাপিতানী এসে শিশুর প্রথম বারের মত মাথার চুল ও হাত-পায়ের নখ কেটে দেয়। প্রসূতি স্নান করে শুদ্ধ হয় ও বাড়ীর লোকজনের সহিত মেলামেশার অধিকার পায়। এর আগে প্রসূতির স্পর্শ দোষাবহ। গর্ভবতী রমণী এখানে স্বয়ং ট্যাবু সদৃশা। ময়মনসিংহে এটি 'হাইট্যারা' নামে পরিচিত। শুচি স্নানের পর প্রসূতি নবজাতককে কোলে নিয়ে প্রথম বেরিয়ে এসে তার মাথার কাপড় মেলে ধরে শিল-পাটা ধোয়া পানি আমপাতা দিয়ে সেই কাপড়ের উপরে ছিটান

১. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৭৭-৭৮
২. পাষ্টির এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর।
৩. পূর্বোক্ত, খাতা নং ৬১৬২/৩৫ (চট্টগ্রাম), ১৯৬২

হয়। তারপর প্রসূতি উঠানে পাতান একটা চাটাইয়ের উপর দাঁড়ালে তার মাথায় ফুললতাপাতায় সাজান একটি মাথাল ধরে তাতে পিঠাদি মিষ্টান্ন দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আশেপাশের ছেলেমেয়েরা সেগুলি কুড়িয়ে খায়।[১] হাইট্যারা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েলীগীত গাওয়া হয়।[২] আঁতুড় ঘর থেকে প্রসূতিকে তুলে আনা হয় বলে কোথাও এটি 'উঠানি' আচার নামে পরিচিত।[৩] হিন্দু সমাজে এর শাস্ত্রীয় নাম 'উত্থান-পর্ব'।[৪]

একচোরার বেড়ি

'একচোরা' শিশুরক্ষক লৌকিক দেবতা। একচোরার অনুগ্রহে সন্তানের উপর 'টাকরা-টাকরী'র কুদৃষ্টি দূর হয়। টাকরা-টাকরী শিশুখাদক অপদেবতা। সে সূতিকাগৃহ থেকে সন্তানকে শুষে খায়। প্রথম জাতক নষ্ট হলে বিপত্তির কারণ, এতে প্রসূতির 'মল্লির দোষ' (মৃতবৎস) ঘটে। মৃতবৎসার পরবর্তী কোন সন্তান বাঁচে না। তখন 'একচোরা ব্রত' পালন করে এ দোষ দূর করা হয়। মুসলমান মেয়েরা হিন্দুদের মত ব্রত পালন করে না, কিন্তু ব্রতের কতক ক্রিয়া যথা সন্তানের নাক-কান ফোঁড়া, পায়ে ও হাতে সুতা বা লোহার বালা পরান ইত্যাদি অনুসরণ করে। শুদ্ধ হওয়ার দিন মুসলমান পরিবারে প্রসূতি উঠানে সন্তানকে কোলে নিয়ে পিটুলি ও পোড়াতুষ দিয়ে অঙ্কিত বৃত্তের মাঝে বসে একচোরার উদ্দেশ্যে সেলাম করে ও সন্তানের পায়ে সুতা বা লোহার বেড়ি পরায়। এটাই একচোরার বেড়ি নামে পরিচিত। প্রসূতি গৃহে থাকাকালীন টাকরা-টাকরীর দোষ দূর করার জন্য ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখে; নিমের ডাল, জুতা, ছেঁড়া জাল ও লোহা রাখার নিয়ম আছে। এগুলি অপদেবতারা অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না।[৫]

১. লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড. ১৩৭৬, পৃঃ ১২-১৩ (ভূমিকা)।
২. ঐ. পৃঃ ৮১-৮৮
৩. বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে সাত দিনে 'মনসা'র উঠানি করার বর্ণনা আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৮
৪. ঐ, পৃঃ ২৯২ (টীকা)। উত্থানিকা > উঠ্ঠানিআ > উঠানি।
৫. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৫

আঁতুড় ঘরবন্ধন

শিশুজন্মের পরমুহূর্ত থেকে তার নিরাপত্তার জন্য প্রিয়জনের ভয়, শঙ্কা ও উদ্বেগের অন্ত থাকে না। ক্ষীণ জীবনীশক্তিতে নবজাত শিশু নিতান্ত অসহায়। রোদ-বাতাস, রোগ-ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষার ভার প্রিয়জনের। এছাড়া ছ্যুৎ-ছায়া, ভূত-প্রেত, জিন-দেও ইত্যাদি অলৌকিক আত্মার কুপ্রভাবের ভয় আছে। শিশুব স্বাস্থ্য যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য প্রিয়জন জন্মাবধি সতর্কতা অবলম্বন করেন। আঁতুড় ঘরে থাকাকালীন শিশু ও প্রসূতি অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। এ সময় ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় খুব বেশী। এর প্রতিকারের জন্য আঁতুড়ঘর বন্ধন করা হয়। এর কুসংস্কার ও আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে কবি জসীমউদ্দীন ব্যক্তিগত শৈশবস্মৃতি থেকে লিখেছেন, "মা আঁতুড় ঘরে যাইয়া মাত্র ছয়দিন কাটাইতেন।...আঁতুড় ঘর খানির দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত। ঘরের সামনে একটা মরা গরুর মাথার হাড়, একজোড়া ছেঁড়া জুতা ও পিছা রাখা হইত, যে কোন অপদেবতা আসিয়া শিশুর ক্ষতি না করে, কোন আঁটকুড়ো মায়ের বদ্‌দৃষ্টি যাতে শিশুর উপর না পড়িতে পারে। যদি বা পড়ে তাহাতে শিশুর কোন ক্ষতি হইবে না। কাবণ তারপরই ঘরের সামনে লটকানো সেই হাড়, ছেঁড়া জুতা আর পিছার উপর চাইলেই তাহার কুদৃষ্টি নষ্ট হইয়া যাইবে।"[১]

জনৈক প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে প্রায় অভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, আঁতুড় ঘরের দরোজায় একটা মরা গরুর মাথার হাড়, একটা মাছ ধরার কোচ, এক মুঠা কাশের খড়, একটা পানের পড় ও দোয়াত-কলম কাগজ রাখা হয়। নারীমনে বিশ্বাস—গরুর মাথার হাড় থাকলে জিন-ভুত আসে না, এরা নবজাতকের ক্ষতি করে। কোচ দেওয়া হয়— ছেলে বড় হয়ে মাছ ধরবে। কাশের খড় ও পানের পড় দেওয়া হয়— পানের ব্যবসায়ে ছেলে উন্নতি করবে। দোয়াত-কলম-কাগজ ছেলের লেখাপড়া শেখার সঙ্কেত বহন করে।[২] আচারটির পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে। হাড়, জুতা, ঝাঁটা দিয়ে কুদৃষ্টি বা প্রেতাত্মার

---

১. জসীমউদ্দীন—জীবন কথা, পৃঃ ৬২

২. আবুর রাহিম কেশরী—আমাদের দেশের কতিপয় কুসংস্কার, পূর্বদেশ, ২৯শে অক্টবর, ১৯৬৭

প্রভাব দূর করার মধ্যে বিপরীত ইন্দ্রজালের ক্রিয়া আছে। কোচ, কাশ, পান, কলমাদি সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের লক্ষণ বহন করে। শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন, গোমুণ্ড হল ষষ্ঠীর প্রতীক।[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গোমুণ্ডকে ষষ্ঠীর বাহন বলা হয়েছে। মুকুন্দরাম ও রূপরাম এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।[২] হিন্দু সমাজের দিক থেকে এ সংস্কার সংগত। মুসলমান সমাজে তা জিন-ভূতের সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কার অপর সম্প্রদায় কর্তৃক স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে।

নামকরণ

শিশুর নামকরণের সময় অলৌকিকতা, সামাজিকতা, আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সব দেশে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। তবে আচারাদি সর্বত্র এক নয়। শরীয়ত মতে মুসলমান সমাজে 'আকিকা' দিয়ে নামকরণ করতে হয়। শিশুর পিতা এক মাস অথবা তিন মাসের মাথায় ছাগল, ভেড়া (ছেলের জন্য এক জোড়া, মেয়ের জন্য একটি) জবাই করে আকিকা দিয়ে থাকেন। এর গোস্ত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণতঃ শিশুর পিতামাতা তা গ্রহণ করেন না।

হিন্দু শাস্ত্রমতে শিশুর নামকরণ 'সংস্কারে'র অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য পালনীয় আচারই শাস্ত্রীয় সংস্কার। ছেলের জন্য বিজোড় মাসে এবং মেয়ের জন্য জোড় মাসে অন্নপ্রাশন হয়।[৩] এ অনুষ্ঠানে শিশুর নাম রেখে মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়া হয়।

শাস্ত্রধর্মের পাশে পাশে লোকধর্মেরও চল আছে। জ্যোতিষী গণনা দ্বারা শিশুর নামকরণ বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত। চট্টগ্রাম হতে সংগৃহীত 'হীরালাল ও পদ্মমণি কন্যার পালাগানে' কলাবতীর পুত্রের নাম গণক ডেকে স্থির করা হয়।[৪] ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত

---

১. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৪৫৩
২. ডঃ অমলেন্দু মিত্র—রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৫
৩. বিশ্বকোষ, দশমভাগ, পৃঃ ৯
৪. লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭১, পৃঃ ২৯

ছড়ায় শিশুর নামকরণের রীতি ছড়ার ভাষায় এরূপ :

লাউলের ঘরে পোলা অইছে কি কি নাম থুইমু ?
আমগা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু ॥
কলা গা হাতে দিয়া কলাই নাম থুইমু ।
বেল গা হাতে দিয়া বেলাই নাম থুইমু ।[১]

শিশুর জন্মের ছয় দিনের দিন হিন্দু পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন নাম পছন্দ করে নামের সাথে পৃথক পৃথক প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়। যে নামে প্রদীপটি উজ্জ্বল হয়ে জলে তাই শিশুর জন্য গ্রহণ করা হয়। এতে শিশুর খ্যাতি ও সম্মান প্রদীপ শিখার মত উজ্জ্বল হবে বলে লোকবিশ্বাস। চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজে প্রায় অনুরূপ প্রথা আছে। মাটির প্রদীপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আমপাতা পুড়িয়ে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করে নাম গ্রহণ করা হয়। এখানে সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের লক্ষণ আছে।

শিশুর নাম নির্বাচন ব্যাপারেও বহু কুসংস্কার আছে। মৃতবৎসার সন্তান বাঁচে না বলে অনেক সময় হীনার্থক ও ঘৃণার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়—যেমন পচা, তিতা, দুখু, ঝাটন, গুইয়া প্রভৃতি। এরূপ নাম করণের লোকমনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "যেসব মায়ের ছেলে আঁতুড়ে মারা যায়, তাদের ছেলেদের নাকি বিশ্রী নাম রাখলে যমে ছোঁয় না।...এই রকম মায়ের ছেলে হ'লে কখন কখন কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আসলে বেচা নয়, কেবল যমকে ফাঁকি দেবার জন্যে বেচা। এই সকল ছেলের নাম হয় এক কড়ি, তিন কড়ি, পাঁচ কড়ি, সাত কড়ি ইত্যাদি।"[২] ময়মনসিংহের গারো উপজাতিদের মধ্যেও এরূপ অন্ধ বিশ্বাস দেখা যায়। সন্তানদের দীর্ঘ আয়ুর কামনায় গারো মেয়েরা পুরোহিতের কাছে কৃত্রিমভাবে সন্তান বিক্রয় করে ও নানারূপ পূজাচার পালন করে।[৩] এখানে বিপরীত যাদুবিশ্বাসের লৌকিক চেতনা আছে।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭

২. আশরাফ সিদ্দিকী প্রণীত লোকসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকা (ডঃ শহীদুল্লাহ রচিত), পৃঃ ২৯

৩. আবদুস সাত্তার—আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১৯৬-৯৭

গড়গড়া

শিশুর যখন হাঁটি হাঁটি বয়স, আধা দাঁড়িয়ে আধা হামাগুড়ি দিয়ে চলে তখন গড়গড়া আচারটি পালন করা হয়। কোন এক নির্দিষ্ট দিনে 'গুড়পিঠা' তৈরি করে গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েদের ডাকা হয়। উঠানের মাঝে পরিষ্কার ভাবে লেপাপোঁছা করে শিশুকে দাঁড় করান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মা বা অভিভাবিকা পাত্র ভর্তি পিঠা শিশুর মাথায় ঢেলে দেয়। ছেলেমেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করে পিঠাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে খায়। লোকবিশ্বাস, এরূপ করলে শিশু তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখবে। এটি সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের ফল।

গুড় ও আতপ চালের আটার তৈরি গোলাকার পিঠার আঞ্চলিক নাম 'গড়গড়া'। রংপুরে এটি 'গড়গড়া পিঠা' নামে পরিচিত।[১] ময়মনসিংহ জেলা হতে সংগৃহীত 'লোকবিশ্বাসে' প্রায় অনুরূপ আচার পাওয়া যায়। "যদি কোন শিশু যথাবয়সে হাঁটিতে না পারে তবে সেই শিশুকে 'গড়গড়্যা' দিলে শীঘ্র হাঁটিতে পারে।...ছোট ছোট পিঠা তৈয়ার করিয়া সেই পিঠা ঘরের চাল হইতে নীচ দিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়।"[২] এখানে আচারের একটু ভেদ আছে—শিশুর মাথায় না ঢেলে চাল থেকে গড়িয়ে দেওয়া হয়। আচারধর্মের দিক থেকে আগের রীতিটি প্রত্যক্ষ ও তাৎপর্যধর্মী।

---

১. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত—আঞ্চলিক ভাষার অভিধান দ্রষ্টব্য।
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ)' ১৯৬৩

২

বিবাহ

বিবাহ মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। শাস্ত্রকারগণ বিবাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংস্কৃত ন্যায়বিদ রঘুনন্দনের মতে 'ভার্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ।'[১] বর কর্তৃক কন্যার ভার্যাত্ব গ্রহণের নাম বিবাহ। সংস্কৃত স্মৃতিকার গোপালের মতে, 'পিত্রাদি কর্তৃক কন্যোৎসর্গানন্তরং বরস্বীকারো বিবাহঃ।'[২] পিতা কর্তৃক কন্যাসম্প্রদান এবং কন্যা কর্তৃক বরবরণের নাম বিবাহ।

উপরের সংজ্ঞা দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। প্রথমটি পুরুষ কর্তৃক 'কন্যা গ্রহণ', দ্বিতীয়টি নারী কর্তৃক 'বরবরণ'। এই উভয় মতকে একত্র করে বলা যায়, স্বেচ্ছানুসারে স্বামী-স্ত্রী রূপে নর-নারীর মিলন-বন্ধনই বিবাহ। বস্তুতঃ বিবাহ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে দুটি নর-নারী একত্র বসবাসের নৈতিক ও সামাজিক সমর্থন লাভ করে। বিবাহের সংজ্ঞা-নিরূপণে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মিলন (union) কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, Marriage may be defined···as a physical, legal and moral union between man and woman in complete community of life for the establishment of a family.[৩] পরিবার প্রতিষ্ঠাকল্পে দু'জন নর-নারীর নৈতিক, দৈহিক ও বৈধ মিলন বিবাহের মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

দৈহিক মিলন তথা যৌনসম্ভোগ বৈবাহিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হলেও জৈবপ্রয়োজনীয়তা বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য নয়। এতে নরনারীর

১. স্মৃতিতত্ত্ব, পৃঃ ১০৬
২. উদ্ধৃত: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৪৯
৩. Encyclopeadia Britannica, Vol. 14, p. 950

জীবন নিরাপত্তার ও বংশরক্ষার অন্তরালশায়ী বাসনাও নিহিত আছে। এজন্য সন্তানকামনা বিবাহের চরমতম লক্ষ্য। সংস্কৃত পণ্ডিত বলেছেন, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'[১] বিবাহের মাধ্যমে ভার্যাত্ব গ্রহণ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা এই অর্থেই সংগত ও সত্য।

বিবাহের এসব গুরুত্ব আছে বলে ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায় ভেদে বিশিষ্ট মত ও পথ গড়ে উঠেছে। কোন মানবগোষ্ঠী একে সামাজিক মূল্য দিয়েছে, কোন গোষ্ঠী ধর্মীয় অঙ্গ বলে মনে করেছে। হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ একটি 'সংস্কার'।[২] সংস্কার ধর্মের মতই অবশ্য পালনীয় বিধান। এ জন্যে উচ্চ হিন্দু সমাজে বিবাহ জীবনাস্তিক এবং অবিচ্ছেদ্য (sacramant)। ইসলামীশাস্ত্র মতে সুস্থ, সবল ও সক্ষম নর-নারীর পক্ষে বিবাহকে 'ফরজ' করা হয়েছে। ফরজ ধর্মাচরণের মত অবশ্য পালনীয় বিধান। তবে বিবাহের শর্ত হিন্দুদের মত অবিচ্ছেদ্য নয়, মুসলমান সমাজে তা চুক্তিবিশেষ (contract)—নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিক্রমে সামাজিক চুক্তি। রোমানদের বিবাহ-আইনে নারীকে পুরুষের ক্ষমতাধীনে অর্পণ করা হয়—Placing the woman in the power of her husband.[৩] এই শর্তে স্ত্রী পণ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এতে স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয় না।

মানবজীবনের পূর্ণতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহের প্রাগুক্ত মূল্যবোধ থেকে মানুষ এর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। শাস্ত্রীয় বিধিমতে বিবাহ অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। ইসলামী রীতিতে কবুল, সাক্ষী, খোতবা, কাবিননামা[৪] ইত্যাদি এবং হিন্দুরীতিতে

১. উদ্ধৃতঃ শচীন্দ্রনাথ মজুমদার—বিবাহ সাধনা, পৃঃ ১৪

২. হিন্দুশাস্ত্রে অবশ্য পালনীয় দশটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, যথা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন. চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃঃ ৭৬

৩. Ibid, P. 951

৪. কবুল. সাক্ষী এবং কাবিন বা মোহরকে 'ফরজ' এবং খোতবাকে 'সুন্নাহ' বলা হয়েছে। Report of the commission eradication of social evils, Govt. of Pakistan, Karachi, 1965, P. 11

মন্ত্রপাঠ, সম্প্রদান, মালাবদল ইত্যাদি সম্পন্ন হলে বর-কনে দাম্পত্য জীবনযাপনের অধিকার পায়। লৌকিক জীবনে বিবাহের এগুলি অবশ্য পালনীয় বিধি হলেও এর সহিত অনেক লোকাচার জড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিনের চর্চায় মানুষ এ সম্বন্ধে নানাভাবে নানা আচার পদ্ধতি গড়ে তুলেছে, যার অধিকাংশ সংস্কারাগত, শাস্ত্রাগত নয়। এসব লোকাচার পালন না করলে বিবাহ অশুদ্ধ হওয়ার কারণ নেই, তথাপি আনুষ্ঠানিক পরিপূর্ণতাবোধে লোকে তা পালন করে থাকে। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলেছেন, লোকাচার শাস্ত্রাচার থেকে বলবান, অতএব তা অপরিত্যাজ্য। 'বলবান লৌকিকঃ শাস্ত্রাৎ, লোকাচার ন ত্যজেৎ।'[১]

বাংলার গ্রাম সমাজে বিবাহানুষ্ঠানে যে সব লোকাচার দেখা যায়, সেগুলির উৎসমূল দুটি : সংস্কারবোধ ও আমোদপ্রিয়তা। বিবাহ একটি শুভ অনুষ্ঠান। পাছে কোন বিপদ ঘটে, কোন অকল্যাণ হয় বা অপদেবতার কোপ পড়ে, এমনটি কেউ চায় না ; সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে সুখী দাম্পত্যজীবনের সূচনা হোক, তাই কাম্য। প্রধানতঃ এরূপ শুভ কামনা এবং বিপদমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে গ্রামজীবনের লোকাচারগুলি গড়ে উঠেছে। 'সোহাগ মাগা', 'পানিভরণ', 'বরণডালা', 'বরস্নান', 'ফুরুল ভরণ', 'মেহদী তোলা', 'গায়ে-হলুদ', 'খই ছিটানো', 'শয্যা তুলনি', 'উম্মালী বাড়া', 'বউ বরণ' প্রভৃতি বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ স্ত্রী-আচার। এগুলির উদ্ভব-উৎস অনুসন্ধান করতে হলে জীবন যখন দৈবনির্ভর, জড়শক্তির অধীন ছিল, প্রথাবদ্ধ ও আচারসর্বস্ব জীবনের সেই প্রাচীন স্তরে ফিরে যেতে হবে। বস্তুতঃ বাঙালীর অনেক লোকাচারের সহিত আদিবাসীর ও উপজাতির প্রথার মিল আছে। অর্থাৎ আদিম জীবনচর্যাই সংস্কাররূপে সমাজজীবনে চলে এসেছে। লক্ষণীয়, বিবাহের অধিকাংশ অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচারভুক্ত, পুরুষেরা দু' একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ; যেমন 'জ্যোতিষ গণনা', 'কুষ্টি-বিচার', 'নাড়োয়া সাজান' ইত্যাদি।

নরনারীর মিলনোৎসব আমোদ-স্ফূর্তির একটি উপলক্ষও বটে। ধর্ম শাস্ত্রে এর কোনটারই সমর্থন পাওয়া যায় না, কেবল লৌকিক ও

১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। উদ্ধৃত : শ্রীবিপ্রদাস শর্মা— শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৮৭

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দুদণ্ড আনন্দ উপভোগ করে থাকে। গান ও নাচের আসর, লাঠিখেলা, পাশা খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে আচার প্রবণ মন নয়, আমোদপ্রিয় মনের উল্লাস আছে।

গ্রামসমাজে বিবাহ সাধারণতঃ কুমার-কুমারীর স্বাধীন নির্বাচন মত হয় না। নির্বাচন পর্ব সম্পূর্ণ ভাবে অভিভাবকের জ্ঞান, রুচি, অভিজ্ঞতা ও অভিমতের দ্বারা স্থির হয়। হিন্দুর 'ছাতনাতলা'র 'শুভদৃষ্টি'র অনুষ্ঠানে এবং মুসলমানের 'বাসর ঘরে' বরবধূ প্রথম পরস্পরকে দেখার সুযোগ পায়। শুভদৃষ্টির অনুকরণে অধুনা 'শাহ-নজর' অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বিবাহের দিন অন্দর মহলে পাত্রপাত্রীর দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে থাকে আয়নার মাধ্যমে। মুসলমানের পর্দানশীলা ও হিন্দুর অসূর্যম্পশ্যা নারীই উত্তম বধূ।

আত্মীয় ও পরিচিত পাত্রপাত্রীর নির্বাচন ও মিলনপর্ব সম্পন্ন হয় মধ্যস্থতার দ্বারা। সম্পর্ক স্থাপনে যিনি মধ্যস্থতা করেন, তাঁকে বলা হয় 'ঘটক' (mediator)। ঘটকের কথামত ছেলের পক্ষের লোক প্রথমবার মেয়ে দেখতে গেলে সাথে পান ও চিনি নিয়ে যায়। এ থেকে এর একটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায় 'পানচিনির দাওয়াত'।[১] এটা ঠিক আচার নয়, একে লৌকিকতা হিসেবে গণ্য করা যায়। অঞ্চল বিশেষে 'পাকা-দেখা' অনুষ্ঠানকেও 'পানচিনি' বলে। গ্রাম ছেড়ে শব্দটি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিত লোকেরা তা প্রয়োগ করেন। কুমিল্লাতে পান ও ফুল নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। এর থেকে অনুষ্ঠানটিকে 'পানফুল' বলে।[২]

আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রকৃত সূচনা হয়, মুসলমানের 'কাবিন-নামা'য় আর হিন্দুর 'পাকা-দেখা'য়। এ পর্বে হিন্দুর প্রথম লোকাচার 'নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ'। এতে অভিভাবককে পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ ও মাতামহ পক্ষের তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করতে হয়।[৩]

১. ইব্রাহিম খাঁ—বাতায়ন, পৃঃ ১৬৫
২. নিজস্ব সংগ্রহ।
৩. পূর্বোক্ত, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃঃ ৭৪

কাবিননামা ভাষান্তরে চুক্তিপত্র। এটি 'বায়নামা'ও নামে পরিচিত।[১] এতে বিবাহের চুক্তি পাকাপোক্ত ও শর্তাবলী স্থির করা হয়। এজন্য এটি 'মাঙ্গনি' (betrothal) নামেও পরিচিত।[২] চুক্তি ও শর্ত লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় না, উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে মৌখিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। পাত্রীর অভিভাবকের গৃহে এই অনুষ্ঠানে বিবাহের দিন-ক্ষণ, মোহরনামা, দান যৌতুক ইত্যাদি স্থির হয়। 'বাগদান' স্বরূপ পাত্রীকে অলঙ্কার অথবা অর্থ দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। একে রংপুরে 'নিশান দেওয়া' বলে।[৩] কাবিননামাব পর কনের নাম হয় 'দুলহান' বা 'আরশ' আর বরের নাম হয় 'দামান' বা 'নওশা'।[৪]

হিন্দু সমাজে বর ও কনে মনোনীত হলে শুভদিন ও শুভক্ষণ দেখে প্রথমে বর ও পরে কনেকে ধান, দূর্বা ও চন্দন দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদের সময় মহিলারা মাঙ্গল্যসূচক শংখধ্বনি করে থাকে। যৌতুকাদি দিয়ে 'বাগদান' করা হয়। কনের নাম হয় 'বাগদত্তা'।[৫] কোন কোন স্থানে গুয়া-পান দিয়ে পাকা দেখাব কথা প্রকাশ করা হয়। একে 'দরগুয়া' অনুষ্ঠান বলে।[৬]

পাকা-দেখার পর থেকে আরম্ভ করে বিবাহের শেষপর্ব 'বরস্তা' বা বা 'মেলানি' (অষ্টমঙ্গলা) পর্যন্ত বর ও কনের পক্ষের গৃহে অনুষ্ঠিত লোকাচারের যেন অন্ত নেই। কথায় কথায় নিয়ম, পদে পদে আচার। প্রতিকর্মে বাছবিচার ও লৌকিকতা।[৭] এ সব আচারের মধ্য দিয়ে যে

১. মুর্শিদাবাদে এ নাম শোনা যায়। নিজস্ব সংগ্রহ।
২. Report of the commission for eradicasion of social evils, p. 16
৩. ছদরুদ্দীন—রংপুরের গ্রামীণ সংস্কৃতি : বিয়ে বাড়ী, মাহে-নও, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫, পৃঃ ২৫
৪. শাহ আনিসুর রহমান—বগুড়া জেলায় বিয়ের লোকাচার ও মেয়েলীগীত, পল্লব (জয়পুর হাট কলেজ বার্ষিকী), ১৯৬৪-৬৫, পৃঃ ১
৫. শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৩৩
৬. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ৪৫৯
৭. ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রামের হিন্দু সমাজের বিবাহে বর ও কনেকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩১টি আচারের উল্লেখ করেছেন অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, যেমন পত্র লেখা, আশীর্বাদ, জগুপত্র, হলুদ কোটা, নাওয়ানো,

জীবনচর্যা, মানসপ্রবৃত্ত, লোকসংস্কার. আমোদপ্রমোদের চিত্র ফুটে উঠে তাতে লোক-সংস্কৃতির বহু উপকরণ ও নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। বিবাহের প্রতিটি কর্ম সংস্কার ও সংস্কৃতি চিহ্নিত।

লোকসমাজে বিবাহকর্মে সচরাচর প্রচলিত লোকাচারগুলির নিম্নরূপ একটা তালিকা নির্ণয় করা যায়। সময়ের দিক থেকে এর তিনটি স্তর: বিবাহ-পূর্ব, বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর। অবশ্য আচারের দিক থেকে কোন স্বতন্ত্র পার্থক্য লক্ষীভূত হয় না।

বিবাহ-পূর্ব : পানচিনি, গায়ে-হলুদ, মেহেদী তোলা, পানখিলি, খুবড়া কোটা, পানিভরণ, সোহাগ মাগা, খাতৃতা ভাঙান, বরস্নান, ফুরুল ভরণ, দুধের ধার শোধা, সরিষা উদরান, বরণডালা, আমসবতী, বরবিদায়, মাড়োয়া সাজান।

বিবাহকালীন : বরবরণ, কনে সিংরান, শা-নজর, হাংগোড় ধরা।

বিবাহ-উত্তর : বধূবরণ, পাশাখেলা, বাসর জাগা, বাসি গোসল, মেলানি।

আচাব-অনুষ্ঠানগুলির কোন কোনটি কেবল বরের গৃহে পালিত হয়, কোন কোনটি কনের গৃহে পালিত হয়। কতক আচার উভয় গৃহে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। গায়ে-হলুদ, খুব্‌ড়া কোটা, পানিভরণ, বরণডালা, শা-নজর, ফুতিয়া তোলা, পাশাখেলা, বাসি গোসল প্রভৃতি বর-কনেকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। বর বিদায়, বরবরণ কেবল বরকে লক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত হয়। সোহাগ মাগা, কনে সিংবান, বধূবরণ প্রভৃতি কেবল কনের প্রতি প্রযোজ্য।

বিয়েব আচারে কোন কোনটিতে ম্যাজিক, ট্যাবু ইত্যাদি আদিম সংস্কারের স্পর্শ আছে। বধূবরণ, বাসি গোসল প্রভৃতি স্ত্রী-আচারে সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে শুভাশুভ ও বিধিনিষেধের বাছবিচার মানা হয়। এগুলি ট্যাবু লক্ষণাক্রান্ত।

খুবড়ল পূজা, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সোহাগভবা, ছত্রধরা, কোরকম, পাত্রসাজান, কনুইধোওয়ানো, চন্নন, মাদল পূজা (কনের বাড়ীতে), দৃষ্টি প্রদীপ, পাত্রী সাজান, আধার ঘর দেখানো, শুভ দৃষ্টি, মালাবদল, কুশবন্ধন, গৌরবচন, জো-খেলা, সেজভুলনী, বাসি বিয়ে, কালরাত্রিযাপন, কাকস্নান, ফুলশয্যা, বৌ-বরণ, বৌ-পরিচয় ও বৌভাত।
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—ফরিদপুরের একটি পুরাতন গ্রাম, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০, পৃঃ ৭৭৪-৭৬

সাধারণতঃ বিজোড় সংখ্যা শুভ বলে গণ্য করা হয়। মুসলমানের 'দেল-মোহর' হয় বিজোড় অঙ্কসংখ্যায়। বিবাহপাঠের সময় বর-কনেকে তিনবার করে কবুল করতে হয়। হিন্দু সমাজে 'সাতপাক' বিয়ের একটি অত্যা-বশ্যক অনুষ্ঠান। 'বৌভাত' অনুষ্ঠানে 'পঞ্চব্যঞ্জন' পরিবেশিত হয়। বিবাহের দিন, লগ্ন ইত্যাদি ব্যাপারেও পঞ্জিকার নিয়ম মেনে চলতে হয়। সপ্তাহের সব বারে বিয়ে হয় না। হিন্দু সমাজে বিয়ের আগে লগ্ন অতিক্রান্ত হলে কনে 'ভ্রষ্টলগ্না' হয়, এটা নারীজীবনের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ।

অনেক মাঙ্গলিক কাজ এয়ো বা সধবাদের দ্বারা করান হয়। খুবড়া কোটা, পানিভরণ, সোহাগ মাগা প্রভৃতি স্ত্রী-আচারগুলি পালনের অধিকার এয়ো রমণীদের। বর ও বধূ বরণের সময়ে বিধবা নারীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিধবা অমঙ্গলের প্রতীক। বরযাত্রাকালে মালি, তেলি প্রভৃতির মুখ দর্শন অমঙ্গলজনক বলে লোকবিশ্বাস।

রং ও রব সম্পর্কেও বাচবিছার আছে। হলুদ ও লাল রং বিবাহের মঙ্গলচিহ্ন। হলুদ, সিন্দুর, কুঙ্কুম, মেহেদী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার সর্বত্র বিয়ের নানা আচারে ব্যবহৃত হয়। গায়ে হলুদ, হাতে মেহেদী, কপালে কুঙ্কুম, সিঁথিতে সিন্দূর দেওয়া হয়। সবুজ চুড়ি ও সাদা শাঁখা সৌভাগ্যের চিহ্ন। লাল শাড়ি ও লাল ফিতা বরণ ডালার সামগ্রী। বিয়েতে কালো রং অমঙ্গলের চিহ্ন। কালো বস্ত্র শোকের চিহ্ন। শংখধ্বনি, হুলুধ্বনি, স্বস্তিপাঠ, বাদ্যধ্বনি, গীতাদি বিবাহে শুভসূচক। অন্য অনুষ্ঠানে হাঁচি অমঙ্গলজনক হলেও হিন্দুর বিবাহে শুভসূচক বলে বিধান আছে।[১] রং ও ধ্বনি সম্পর্কে উক্ত বিধিনিষেধগুলি প্রাচীন ট্যাবুর প্রভাবজাত।

পানচিনি

বিয়ের সূচনা হয় 'পানচিনি' অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে। ঘটকের মধ্যস্থতায় বরের পক্ষ থেকে প্রথম যখন কনেকে দেখতে যাওয়া হয় তখন সঙ্গে পান-সুপারি ও চিনি-বাতাসা নিয়ে যাওয়া হয়। এ থেকে এর নাম হয়েছে পানচিনি। কোন অঞ্চলে 'পাকা-দেখা' অনুষ্ঠানকেও

১. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃঃ ৬৯

পানচিনি বলে। এখন শহরেও শব্দটি চলে এসেছে। কনের অভিভাবকের গৃহে অনুষ্ঠিত হয় বলে এবং এর মাধ্যমে বর-কনে নির্বাচনের পালা সমাপ্ত হয় বলে কোন কোন অঞ্চলে এটি 'কন্যা-জোড়' নামেও পরিচিত। হিন্দু সমাজে সাধারণভাবে 'আশীর্বাদ' এবং মুসলমান সমাজে 'বায়নামা শব্দের ব্যবহার আছে। এ ছাড়া 'মঙ্গলাচরণ', 'লগ্নপত্র', 'পাটিপত্র' ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে।[১] মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে এবং সম্মতিতে বিয়ের দিন-ক্ষণ, দান-যৌতুক, দেনমোহর ইত্যাদি বিষয় ঠিক হয়। ঐদিনই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বর পক্ষের লোক কনের মুখ দেখে তাকে অর্থ দেন অথবা আংটি-আদি অলংকার পরিয়ে দেন। পানচিনির চিনি-বাতাসা ও পান-সুপারি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

গায়ে-হলুদ

বাংলার কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় সমাজে গ্রাম ও শহরের ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পরিবারে বিবাহোৎসবে গাত্র-হলুদ একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। পানচিনির ভেতর দিয়ে প্রস্তাব পাকাপাকি হলে বিবাহের সাত অথবা তিন দিন আগে থেকে হলুদ মাখান অনুষ্ঠান শুরু হয়। হলুদ বাটা হয় কয়েকটি দ্রব্যের মিশ্রণে: বগুড়া জেলার একটি মেয়েলী-গীতে কাঁচা হলুদ, দূর্বা ও সোন্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] কিশোরগঞ্জে হলুদ, গীলা ও সরিষার নাম পাওয়া যায়।[৩] ঢাকা থেকে সংগৃহীত বিয়ের গীতে দূর্বা ও ছন দিয়ে হলুদ বাটার উল্লেখ আছে।[৪] হিন্দু সমাজে কনেকে হলুদের সাথে মুগ, যব, মাষকলাই, মসুর চূর্ণও মিশ্রিত করে মাখান হয়।[৫]

বর-কনের স্ব স্ব গৃহে আচারটি অনুষ্ঠিত হয়। পিঁড়ি বা পাটিতে বসিয়ে এয়ো আত্মীয়ারা হলুদ মাখায়। প্রথমে পাঁচ জন এয়ো মুখে মাখিয়ে

১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯
২. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৩, পৃঃ ৯-১০
৩. ঐ, পৃঃ ২৬৮-৬৯
৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭
৫. শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৬১

দেয়, পরে গায়ে মাখান হয়। উত্তরবঙ্গে নিয়ম আছে, কিছু চাল-পয়সা পানসুপারি রেখে পাটি পাততে হয়।[১] গাত্র-হলুদে কনেকে লাল পাড়ের নতুন সাদা শাড়ি পরাতে হয়। একে 'হলুদ-মাখা শাড়ি' বলে। এটি 'ভিজানী কাপড়' নামেও পরিচিত।[২] এ শাড়ি আসে বরের বাড়ি হতে ডালার সাথে। হলুদ বাটার সময় ও মাখার সময় চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে নারীরা গীত গায়। অনেক সময় বাদ্যযোগে নাচও হয়। গীতগুলি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রচিত।[৩]

বগুড়া জেলার মেয়েলী গীতে বলা হয়েছে, 'বালাবালির ছিরি'র জন্য হলুদ মাখান হয়।[৪] হলুদ একাধারে প্রসাধন ও পবিত্রতার সামগ্রী। প্রাচীন ভারতে লেপনাদি প্রসাধন চর্চায় রমণীরা বচ, কুড়, হরিদ্রা, চম্পক-মুথা একত্রে বেটে গায়ে মেখে দেহের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা রক্ষা করত।[৫] হিন্দু আয়ুর্বেদশাস্ত্র চরকসংহিতায় আছে, হরিদ্রা মাখলে দেহের দৌর্গন্ধ্য, গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা, কণ্ডু, অরুচি, স্বেদ ও বীভৎসতা বিদূরিত হয় ও চর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।[৬]

১. খোদেজা খাতুন—পূর্ব পাকিস্তানের বিয়ের গান, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ পৃঃ ৪৪৫

২. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৮

৩. বরের হলুদ মাখা প্রসঙ্গে একটি গীত:

ওগো রঙ্গিলা দামাল
কে তোমারে এই অলদী পরাইয়াছে।
আমার দেশের বইনেয়া
বড়ই সন্ধিগো জানে।
গীলা অলদী বাটিয়া
ঢোল-বাজনা বাজাইয়া
এই অলদী পইড়ায়াছে। —কিশোরগঞ্জ

উদ্ধৃত: লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪

৪. ঐ, পৃঃ ৯-১০

৫. শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—প্রাচীন ভারতের প্রসাধন দ্রব্যাদি, মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৪২, পৃঃ ৪৭৯

৬. শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৫০

বস্তুতঃ গাত্র-হলুদ অনুষ্ঠানটি অন্ধ সংস্কার নয়, এতে মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, শুচি ও শুদ্ধতাবোধের পরিচয় আছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সৌন্দর্যচর্চা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। বাংলার অনার্য জীবনাচরণে হরিদ্রার ব্যবহার ছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ধান, দূর্বা, হরিদ্রা, পান, সুপারি ইত্যাদির ব্যবহাব কৃষিসংস্কৃতির অবদান।

স্থানভেদে অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন নাম আছে। বগুড়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলায় এর নাম 'হলদি কোটা'।[১] রংপুরে একে 'কুড় দেওয়া' বলা হয়।[২] ময়মনসিংহে এটি 'তেলই' নামে পরিচিত। তেলই দেওয়ার পর কনেকে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েদের ছাড়া পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়।[৩]

মেহেদী তোলা

বিবাহ উপলক্ষে মেহেদী মাখার রেওয়াজ বাংলার কেবল মুসলমান সমাজেই আছে। এটি মুসলমানরা আরব-ইরান থেকে আমদানী করতে পারে।[৪] মেহেদী অঙ্গ-রঞ্জক প্রসাধনী। সাধারণভাবে কাঁচাপাতা বেটে মেহেদী মাখা হয়। একটি মেয়েলী গীতে মেহেদী পাতার সহিত খয়ের, পোড়ামাটি ও কচুর ডাঁটা একত্রে চূর্ণ করে লেপন করার কথা আছে।[৫] নারীরা মেহেদীর অধিক ভক্ত। তারা নখ, করতল ও চরণ ছাড়াও স্তন ও

---

১. খোদেজা খাতুন—বগুড়া জেলাব পল্লী অঞ্চলের মেয়েলী সঙ্গীত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৪

২.
কুড়তো কুড়রে
বাচার কাচা হলদীর কুড়।
সেনা কুড় পায়া রে
বাচা তীর খামে খামিল।

উদ্ধৃত: উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৭

৩. District Census Report—Mymensing, Parts 1-V, 1961, p 22.

৪. আরবী 'মুহননা' থেকে মেহেন্‌দী বা মেহেদী শব্দের উৎপত্তি। Dr. Shaikh Ghulam Maqsud Hilali—Perso-Arabic Elements in Bengali, Dacca, 1967, p 240

৫. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৫

বক্ষদেশ মেহেদীতে রঞ্জিত ও চিত্রিত করে। এতে রমণীর একাধারে প্রসাধনবিলাস ও অন্যধারে সৌন্দর্যচর্চার পরিচয় আছে। মেহেদী মাখার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, উপলক্ষও নেই। কেবল বিয়েতে ঘটা করে মাখা হয়। বিয়েতে বর-কনে উভয়কে মেহেদী মাখান হয়। তবে বর অপেক্ষা কনের রূপসজ্জার আয়োজন বেশী। বরপক্ষ থেকে যে ডালা আসে, তাতে অন্যান্য দ্রব্যের সাথে মেহেদীও থাকে। এ মেহেদী কনেকে মাখান হয়। মেহেদী বাটা ও মাখার আনুষ্ঠানিকতা গাত্র-হলুদের আনুষ্ঠানিকতার মতই অর্থাৎ গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে উদযাপিত হয়।[১]

মেহেদী মাখা গতানুগতিক কিন্তু মেহেদী তোলা সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক। আচারটির মধ্যে হিন্দুদের বৃক্ষপূজার সংস্কার আছে। বিয়ের পূর্বদিন গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা চিত্রিত কুলা[২] বা ডালা নিয়ে দল বেঁধে বিয়ে বাড়ী থেকে যেখানে মেহেদীর গাছ আছে সেখানে যায়; কুলায় থাকে পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি ও বাতাসা জাতীয় কিছু মিষ্টদ্রব্য। মেহেদী তোলার আগে মেয়েরা গাছের চারপাশে বারকয়েক ঘুরে এসে কুলার দ্রব্যগুলি মেহেদী গাছকে উৎসর্গ করে। তারপর মেহেদী তোলে। এসব কাজের সাথে সাথে মেয়েরা গীত গায় ও নৃত্য করে। গীতগুলি অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে রচিত।

১. বরকে মেহেদী মাখানর উদ্দেশ্য গীত:

ওগো বঙ্গিলা দামান
কে তোমারে এই মেন্দী পইড়াইছে
আমার দেশের ভাওতোরা
বড়ই সন্ধি গো জানে।
আকন মেন্দী গো বাটিয়া
ঢোল বাজনা বাজাইয়া
এই মেন্দী পইড়াইছে। —কিশোরগঞ্জ

লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪

২. একটি গীতে পাঁচটি কুলা নিয়ে মেহেদী তোলার কথা আছে। যথা,

পাঞ্চ কোলা লইয়া আমরা
মেন্দী তোলতাম যাইগো।।
নাইচের তালে তালে দামান্দ সাজাই
আমরা বালিরে সাজাই গো।। —ময়মনসিংহ

লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯

পানখিলি

আপামর বাঙালীর কি ব্যবহারিক জীবনে কি সাংস্কৃতিক জীবনে পানাদির ব্যবহার সুপরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই পান-তামাক বাঙালীর সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে। এদেশেব কৃষিসভ্যতার ধারক অস্ট্রিকগোষ্ঠীর লোকেরা বিলাস-ব্যসন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে পান-সুপারি ব্যবহার করত। কালে কালে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন উপলক্ষে এর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা প্রসার লাভ করে। বাঙালীর জীবনে নানা স্তরে পানের ব্যবহার আছে— আহার-বিহারে পান, আমন্ত্রণ-আপ্যায়নে পান, আচার-অনুষ্ঠানে পান, পূজা-পার্বনে পান, উপহারে পান, কুসংস্কারে পান, তন্ত্রমন্ত্রে পান।[১] এক কথায় জীবনাচরণে ও ধর্মাচারে পান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করে আছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে পানখিলি সম্পূর্ণ স্ত্রী-আচারের অন্তর্ভুক্ত। অমিতাকুমারী বসু শ্রীহট্টের পল্লী অঞ্চলের বিয়েতে পানখিলির বর্ণনায় লিখেছেন, "পানখিলির দিন সধবারা এক জায়গায় জড়ো হয়। উঠানে কিম্বা ঘরে সুন্দর করে আলপনা দিয়ে তাতে দুখানা পেতলের থালায় সিঁদুর, পান-সুপারি, বাতাসা ইত্যাদি রাখে। হাসি তামাসা করতে করতে তারা সুপারি কাটে। কনের বিশিষ্ট একজন আত্মীয় বোঁটাসুদ্ধ পান একত্র করে সোনা আর রূপার হালকা কাঠি দিয়ে খিলি বানিয়ে থালায রাখে।...সেই থালায় এক বাটি তেল, বাতাসা, চিনি, সিঁদুর— এইসব সাজিয়ে সধবারা গৃহদেবতার কাছে কিম্বা মন্দিরে দেবীর সামনে নিয়ে পূজো দেয়।... তারপর সমস্ত সধবারা মাথায় তেল ছুঁইয়ে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর হাতে পান-সুপারি বাতাসা দিলে পানখিলি অনুষ্ঠান শেষ হয়।"[২] তাঁর মতে অধিবাসের আগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শ্রীকামিনীকুমার রায় একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে প্রায় অভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে আশীর্বাদ-এর কয়েকদিন পরে বরের বাড়ীতে ও কন্যার বাড়ীতে সমাজের সধবারা

১. শ্রীকামিনীকুমার রায়—সভ্যতায় পান-তামাক, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৬ পৃঃ ৫৬-৫৯

২. শ্রীমতি অমিতাকুমারী বসু—বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ, ১৪৫-৪৬

একত্র হইয়া 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ হাস্যপরিহাসের ও গীত জোকারের মধ্য দিয়ে কতকগুলি গোটা পানে খিলি দেন এবং গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে মিষ্টান্ন ও পানাদি লাভ করে বিদায় হন।"[১]

আশুতোষ ভট্টাচার্য আচারটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "লগ্নপত্রের পর কোন একটি শুভ দিন দেখিয়া সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন। ইহাতে কেহ আসিয়া আলপনা দেন কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধুপ-দীপ জ্বালেন। তারপর সকলে মিলিয়া একত্র বসিয়া একটি গোটাপান হাতে লইয়া তাহাতে খিলি বা একটি করিয়া সরু কাঠি পরাইয়া দেন, প্রথমে বরের বাড়ীতে এবং পরে কন্যার বাড়ীতে এই আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"[২]

মুসলমান সমাজে বিয়েতে 'ঝাড়পান' দেওয়ার রীতি আছে। চট্টগ্রামে 'তেলোয়াই' নামে যে অনুষ্ঠানটি প্রচলিত আছে, তাতে ঝাড়পান দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে কামিনীকুমার লিখেছেন, "বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে কনের পিতা বরের বাড়ীতে এক দফা উপহার পাঠাইয়া থাকেন। ইহাকেই 'তেলোয়াই' দেওয়া বলে।...সাধারণতঃ একটি পত্রযুক্ত নাতিবৃহৎ আম্রডালের প্রতি পত্রে এক একটি পানের খিলি বা একাধিক পানের খিলি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাহা একটি মজুর কাঁধে করিয়া বরের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। বরের বাড়ীর সকলেই ঐ ঝাড় হইতে পান লইয়া খায় এবং তাহার পান পাড়ায় বিলাইয়া দেওয়া হয়।"[৩] ইব্রাহিম খাঁ সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে বিয়ে উপলক্ষে নকসাদার 'ঝাড়পান' পরিবেশনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঝাড়খিলির কোনটির আকৃতি 'চড়ুই'-এর মত, কোনটির আকৃতি 'সিঙ্গাড়া'র মত।[৪]

---

১. পূর্বোক্ত, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃঃ ৫৮
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ, ৩৭৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯
৪. বাতায়ন, পৃঃ ১৬৬

থুবড়া কোটা

গায়ে-হলুদের মত ক্ষীর ভোজন বা থুবড়া[1] খাওয়ান অনুষ্ঠান বিয়ের পাঁচ-সাত দিনে আগে থেকে শুরু হয়। হিন্দু সমাজে এ উপলক্ষে 'আইবুড়ো ভাত' আচার পালিত হয়। পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান এটি।[2] বর-কনের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও নিকট প্রতিবেশীরা পালাক্রমে পলান্ন বা মিষ্টান্ন রান্না করে বর-কনেকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। মুসলমান সমাজে ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য বিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসে। প্রতি সন্ধ্যারাত্রে গ্রামের লোকজন ডেকে এনে বর বা কনেকে তা খাওয়ান হয়। মাদুর বা পাটিতে তাকে বসিয়ে একজন এয়ো তার মাথায় নিজের আঁচল দিয়ে দাঁড়ায়। গুরুজনরা একে একে তার মুখে তিন গ্রাস মিষ্টান্ন তুলে দেন। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী জেলায় একেই থুবড়া খাওয়ান বলে।[3] মেয়েলীগীতি, হাসিঠাট্টা ও হৈ-হুল্লোড়ের ভেতর দিয়ে থুবড়া ভোজন সম্পন্ন হয়।

বিয়ের একদিন আগে আচারটি ঘটা করে পালিত হয়। ঐদিন বিয়ের বাড়ীতেই থুবড়া রান্না করে খাওয়ান হয়। বিয়েবাড়ীতে আচারটি শুরু হয় 'থুবড়া কোটা' থেকে। মেহেদী মাখার চেয়ে মেহেদী তোলা যেমন বেশী আচারধর্মী, থুবড়া খাওয়ানব চেয়ে থুবড়া কোটাও তেমনি অধিক সংস্কারধর্মী। আব এজন্য আচারটি উক্ত নামে আখ্যাত হওয়ার দাবি রাখে।

থুবড়া কোটার মূল বিষয় হল, ঢেঁকিতে ধান ভেনে আতপ চাল তৈরি করা। এ চাল দিয়ে থুবড়ার ক্ষীর রান্না হয়। সকাল বেলায় গাঁয়ের মেয়েদের ডেকে আনা হয়। বর বা কনের অভিভাবিকা একটি

১. অব্যূঢ় > আইবুড় (অবিবাহিত), এব সহিত স্থবিরের ভাব জড়িত হয়ে থুবড়/থুবড়া শব্দেব উৎপত্তি। অধিক বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হয়নি এমন ছেলে-মেয়েকে গ্রামে থুবড়া-থুবড়ী বলে। হিন্দু সমাজে 'আইবুড়ো ভাত' এবং মুসলমান সমাজে 'থুবড়োর ক্ষীর' একই বস্তু। এখন খাদ্য বুঝাতেই শব্দটির চল হয়ে গেছে।

দ্রষ্টব্য : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম ভাগ।

২. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান দ্রষ্টব্য।

৩. নিজস্ব সংগ্রহ।

বড় ধামায় ধান এবং একটি সাজান চালুন দেন। চালুনে নিম্নলিখিত উপচার থাকে :

পান	—৭টা	দূর্বা	—৭ গাছা
সুপারি	—৭টা	হলুদ	—৭টা
ধান	—৭টা	তামার পয়সা	—৭টা
মাটির প্রদীপ	—১টা		

একটা মাটির নতুন ঝাঁঝর দিয়ে চালুন ঢেকে দেওয়া হয়। ঢেঁকিঘরে গিয়ে প্রথমে ঢেঁকির মুগলে ও গড়ে পর্যায়ক্রমে সাতবার চালুন ছোঁয়াতে হয়।[১] সাত এয়ো ঢেঁকিতে পাড় দেয়। আর সব মেয়েরা চারপাশে দাঁড়িয়ে গীত গায়। ধান ভানা হয়ে গেলে তুষে এবং চালুনের দ্রব্যে পানি ঢেলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, পানি দিয়ে এভাবে ধুয়ে দিলে শান্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং ভাবী দম্পতির আপদবিপদ দূর হয়। সন্ধ্যায় উক্ত আতপচাল দিয়ে ক্ষীর রান্না করা হয়। ঐদিন মা বা বাবা প্রথমে একটা রূপার টাকা ক্ষীরের থালাতে রেখে ছেলে বা মেয়ের মুখে তিনবার তুলে দিয়ে থুবড়া খাওয়ানর সূচনা করেন। তারপর অন্যান্যরা খাওয়ায়। এ সময় মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গীত গায়।[২]

কুমিল্লা জেলায় এ আচারটি সামান্য পার্থক্য নিয়ে 'উমালী বাড়া' নামে পরিচিত।[৩] বিয়ের আগের দিন পাত্র-পাত্রীর নিজ নিজ বাড়ীতে

১. হিন্দু সমাজে এটি 'ঢেঁকি বরণ' উৎসব। বিয়ের মঙ্গলদ্রব্য কোটার সময় তেল, সিন্দুর, ধান, দূর্বা, পান ও সুপারির উপচার দিয়ে প্রথমে ঢেঁকিকে বরণ করতে হয়। বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০

২. রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি আনুষ্ঠানিক গীতাংশ এরূপ :

ক্ষীর খারে আরস ক্ষীর খা
তোর বাবা দিবে ভরি ভরি দান।

মোহসীন আহম্মদ—রাজশাহীর পল্লীগীতি, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৬, পৃঃ ৭৯৯

৩. উমালী—জাঁকজমকের সহিত, বাড়া—কোন দ্রব্য (ঢেঁকিতে কোটা বা ছুরিতে কাটা)। উমালী বাড়ার অর্থ হল জাঁকজমকের সাথে ঢেঁকিতে কোটা।
উমালী—উমা < উম + আলি। পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (স্বরবর্ণ অংশ) দ্রষ্টব্য।

পাঁচ কাঠা সরু ধান তরুণী এয়োরা ঢেঁকিতে কোটে। ধান কোটার সময় মেয়েরা গীত গায়।[১] এ চালের রান্না ক্ষীর বর-কনেকে খাওয়ান হয়। ধান ভানার সময় মা উপস্থিত সকলের মাথায় সরিষার তেল দেন এবং নিজের আঁচলে ধান-দূর্বা-হলুদ বাঁধেন। বিয়ের পর এগুলি পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। এ দিয়ে অকল্যাণ তাড়ান হয় বলে লোক-বিশ্বাস আছে।

পানি ভরণ

পানি ভরণ আচারটিকে বরস্নানের উদ্যোগপর্ব বলা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পানি আনা হয়। অন্যান্য স্ত্রী-আচারের মত পানিভরণও গীতাদি সহকারে সম্পন্ন হয়।[২]

পানি ভরণ অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রসঙ্গে খোদেজা খাতুন লিখেছেন, "মাটির কলসী নিয়ে মেয়েরা নদী বা পুকুরে পানি ভরতে যায়। নদী বা পুকুর কাছে না থাকলে বড় কোন পাত্রে কুয়ার পানি তুলে নেওয়া হয়। এবং কলসীটি ভরে আম পাতার একটি প্রশাখাসমেত ভরা কলসীটি ঘরের এক কোণে রেখে দেওয়া হয়।"[৩]

হিন্দু সমাজে 'চুরপানি ভরা'র প্রথা আছে। বিবাহের দিন ভোর বেলায় বরের মা অন্য এয়োদের সঙ্গে নিয়ে পানি সংগ্রহ করে আনেন। মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালাদ্বয়ে চুরপানি ব্যবহারের উল্লেখ আছে।[৪] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন চুরপানি (<চোরপানি) সম্বন্ধে

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৫৩ (কুমিল্লা), ১৯৬৩

২. এসো বাই আমরা জল ভরিতে যাই
ভরণ-ভরা হইলে আমরা বাড়ীতে লয়্যা যাই।
—রাজশাহী

উদ্ধৃত: আশরাফ সিদ্দিকী— লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৫

৩. পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৪৬

৪. চুরপানি দিল মায় টুপায় ভরিয়া।
—মলুয়া

চুরপানি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে।
গীত জুকার যত হইল বিধিমতে॥
—চন্দ্রাবতী

উদ্ধৃত: মৈমনসিংহ গীতিকা, ৬৮, ১১০ (৩য় সং)।

লিখেছেন, "মৃন্ময় ঘটে জল ও পাঁচটি ফল এবং অঙ্গুরী লুকাইয়া রাখা হয়, বিবাহের পর বর সেই ঘট হইতে অঙ্গুরী ও ফলাদি বাহির করেন।"[১] শ্রীহট্ট জেলায় এ প্রথার উল্লেখ করেছেন অমিতা-কুমারী বসু। তিনি লিখেছেন, "বিয়ের ভোরে কাকপক্ষী ডাকবার আগে সধবা মেয়েরা কলসিতে করে গাত ঘাটের জল তুলে আনে। একে বলে চোরপানি। সেই জলে কনেকে স্নান করানো হয়।"[২] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে চোরপানি নামে জল তোলার একটি স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ভোর হইতে এয়োরা কন্যার মাতা ও পিতাকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ কোনও পুষ্করিণী বা নদীতে জল তুলিতে যান।"[৩] পাকিস্তানে পটোয়ার লোক সমাজেও অনুরূপ স্ত্রী-আচার আছে আঞ্চলিক ভাষায় তা 'ঘড়োলি' নামে পরিচিত। একটি রঙ্গিন বিচিত্র ঘড়া বরের বোন বা ভাবী মাথায় করে পানি আনতে যায়। সঙ্গে থাকে সখীর দল। এই অনুষ্ঠানে নাচ, গীত এবং বাদ্য হয়।[৪]

সোহাগ মাগা

হিন্দু সমাজে সোহাগ মাগার রীতি আছে।[৫] বিয়ের দিন সকালে মা তা পালন করেন। ডঃ দীনেশ সেনের মতে সোহাগ মাগার তাৎপর্য হল মেয়ের মঙ্গলের জন্য আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে আশীর্বাদ চাওয়া।[৬] 'মলুয়া' গীতিকায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

১. ঐ, পৃঃ ৬৮
২. বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৪৮
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০
৪. ঘড়োলি উপলক্ষে পটোয়ার গীত :

বাহ্ বাহ্ ঘড়োলি ভরু আইয়াঁ ভর পাইয়াঁ
ভর চা সিরেতে ধর আইয়াঁ।

উদ্ধৃত : আতোয়ার রহমান—পটোয়ার উপত্যকার বিয়ের গান, পাকিস্তানের লোকগীতি, পৃঃ ১১৬

৫. সৌভাগ্য শব্দ থেকে 'সোহাগ' শব্দ এসেছে। কন্যার ভাগ্য ভাল হোক— মায়ের এরূপ আন্তরবাসনা থেকে এই অনুষ্ঠানটির উদ্ভব হয়েছে।
৬. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৭ (পা.টী.)।

শ্বশুর বাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে।
তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে ॥[১]

ঐ গীতিকায় বলা হয়েছে লক্ষ্মীর কুলা মাথায় নিয়ে আঁচল দিয়ে ঘিরে মা সোহাগ মাগতে বের হন। কুলায় থাকে হলুদ, তেল, সিন্দূর আর মাটি। মাটি চিমটি দিয়ে দুয়ার থেকে তুলতে হয়। মার সঙ্গে পাড়ার নারীরা যায়। তারা গীত গায় ও জয়াদি জুকার দেয়।[২]

শ্রীহট্ট জেলায় প্রথাটি 'সোহাগ সহা' নামে পরিচিত। অমিতাকুমারী বসু এর পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, "চিত্রিত নতুন কুলোয় লাল পেড়ে নতুন শাড়ির মধ্যে চাল, চিনি, বাতাসা, কাঁচা হলুদ, পান, সুপারি, ঘি আর এক বাটি দই ঢেকে রাখা হয়। কনের মা সেই সাজানো কুলো মাথায় নিয়ে সদলবলে সাত বাড়িতে যাবে। এক এক বাড়ির দুয়োরে গিয়ে যখন সে নিঃশব্দে দাঁড়াবে, সেই বাড়ির গিন্নি কুলো থেকে আঙুলে করে একটু দই নিয়ে ছোট আলপনা দিয়ে তার উপর বসবার জন্য পিঁড়ি পেতে দেবে।... সেই গিন্নি কুলোর বাটিতে একটু ঘি ঢালবে, বাতাসা আর চিনি দেবে আর থালার চাল দুভাগ করে একভাগ কুলোতে দিয়ে কাপড় ঢাকা দেবে। বিয়ের পর কনে যখন দ্বিরাগমনে আসে তখন সে সাত বাড়ির এই চাল অন্যচালের সঙ্গে মিশিয়ে ভাত রেঁধে সমবয়সী কুমারী ও বৌদের খাওয়ায়।"[৩]

শ্রীকামিনীকুমার রায় একে 'জলসহা' (<জলসাধা) আচার বলেছেন। তাঁর মতে, কয়েকজন এয়ো পাড়াপ্রতিবেশীর গৃহ থেকে জল মাগন করে আনে। ঐ জলে বর বা কনেকে স্নান করান হয়।[৪] মুসলমান সমাজে সোহাগ মাগার প্রচলন নেই। তবে বিবাহে বর-কনের সৌভাগ্যের কামনা করে 'সোহাগ পুরিয়া' দেওয়ার প্রথা আছে। বরের বাড়ী থেকে কনের বাড়ীতে যে ডালা আসে তাতে সোহাগ পুরিয়া থাকে। এতে সোন্দা, মেথি, গিলা, সুঁট, সরিষা, সিন্দূর, জয়ফল, চন্দনচূড়, আপসান,

---

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৭
২. ঐ, পৃঃ ৬৮
৩. বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৪৮-৪৯
৪. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬-০৭

কাচুর, হাররে ইত্যাদি সুগন্ধী প্রসাধনী দ্রব্য এবং ক্ষুদ্রাকার আয়না, চিরুনী ও কাঁকই থাকে।

খাতত্তা ভাঙান

খাততা ভাঙান স্ত্রী-আচার, বগুড়া জেলায় এর প্রচলন আছে। আচারটির ভেতর দিয়ে পিতামাতার অভিভাবকত্বে বর বা কনের ভরণ-পোষণের সমাপ্তি ঘটান হয়। এর পালনরীতি সম্বন্ধে খোদেজা খাতুন লিখেছেন, "গায়ে-হলুদের পরে কনেকে (বরের বাড়ীতে বরকে) উঠানের একপাশে একখানা মস্তবড় পিঁড়িতে এনে বসানো হয়; বসিয়ে বোন বা ভাবী বা এদের সমশ্রেণী কেউ ডান হাতে একটি পানির ঝারি বা বদনা নেয়। তারপর বাম হাতের বুড়ো ও কড়ে আঙ্গুলে উনানের একটুখানি ছাই চেপে ধরে কনের পিঁড়ির চারপাশে ঘুরে কনের সামনে এসে হাজির হয়। চারপাশে ঘুরে আসার সময় নত হযে বদনার নল দিয়ে ঐ ছাইচাপা আঙ্গুলে পানি ঢালতে ঢালতে ঘুরে আসে। সামনে এসে হাজির হলে কনেকে বলতে হয় 'কিসের জন্য এসেছে।' তখন বোন বা ভাবী উত্তর দেয়—'বার বছরের খাততা ভাঙ্গাতে।' এইরূপ তিনবার বলার পর কনেকে গোসল করিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।"[১] স্পষ্টতঃ আচারটি গোসলের অব্যবহিত পূর্বের অনুষ্ঠান। বিবাহের দ্বারা পিতা-মাতার অভিভাবকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। হিন্দু বিবাহে 'কন্যা সম্প্রদান' একটি অবশ্য পালনীয় আচার। এর দ্বারা পিতৃগোত্র হতে কন্যাকে পতির গোত্রে গোত্রান্তরিত করা হয়।[২] এটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রীতি। যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চল ছিল তখন বরকে কন্যার গোত্রে যেতে হত। বর ও কনের উদ্দেশ্যে পালিত আচারটি এদিক থেকে খুব প্রাচীন হতে পারে।

আচারটি গীতযোগে সম্পন্ন হয়। গীতের ভাষা ও সুর করুণাত্মক। বার বছর ধরে যাকে আদরযত্নে লালন-পালন করেছে, তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে। এতে রঙ্গ-তামাসার স্থান থাকতে পারে না।

১. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৫
২. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৬৬

বরস্নান

বরস্নান গাত্র-হলুদের পরের অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন শেষবারের মত হলুদ মাখিয়ে স্নান করাতে হয়। অনুষ্ঠানটি বরস্নান নামে অভিহিত হলেও একই উপলক্ষে কন্যার গৃহে কন্যারও স্নানের আয়োজন করা হয়। বরযাত্রার আগে যেমন বরস্নান, তেমনি কন্যা সাজানর আগে কন্যাস্নান আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। অঞ্চল বিশেষে একে 'গীলা গোসল'ও বলা হয়।[১] শাহ আনিসুর রহমান বর ও কনের স্নানের আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিয়ের একদিন পূর্বে বর বা কনেকে ধান, দূর্বা, কাঁচা হলদী ও আদা দিয়ে গোছল করান হয়। এই গোছল উপলক্ষে সকাল বেলায় কনের গা থেকে সমস্ত গহনাপত্র খুলে ফেলা হয়, তারপর তাকে একটা ঘরের মধ্যে পাটির উপর বসিয়ে রাখা হয়। বরকে অবশ্য এমন করা হয় না। তাকে কেবল গোছলের পূর্বে একটা ঘরের মধ্যে কনের মত পাটির উপর বসান হয়। দুপুর বেলা কনে বা বরের ভাবী, নানী অথবা দাদী একটা বাঁশের নতুন চালুনে ধান, দূর্বা, হলদী, সরিষার তেল, আদা ও মাটির প্রদীপ সাজিয়ে কনে বা বরের সামনে নিয়ে যায়, তার মুখের সামনে সামান্য উঁচু করে ধরেন। পরে তার হাত ধরে উঠানের একধারে যেখানে গোছলের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা বড় কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে পূর্বোক্ত দ্রব্য দিয়ে গোছল করান হয়।...বিয়ের দিনে একই রকমভাবে গোছল করান হয়।"[২]

এখানে স্নানের স্থান, কাল, পাত্র, প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চালুন সাজান', 'বর-কনে বের করা' ও 'গোছল করা' এ তিনটি পর্বে অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করা যায়। প্রতিটি পর্বই গীত সহকারে সম্পন্ন হয়। গীতগুলি পুরোপুরি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত।[৩] পটোয়ার লোকসমাজে দুধপানি

---

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৩

২. পূর্বোক্ত, পল্লব : জয়পুরহাট কলেজ বার্ষিকী, ১৯৬৪-৬৪, পৃঃ ২-৩

৩. চালুন সাজানর গীত :

চালুন বল তোমার জনম কোন ঘরে
আমার জনম পাটুনীর দোকানে।
আমি গেলে বাছার বিয়া হবেরে।

দিয়ালী বল তোমার জনম কোন ঘরে
আমার জনম কুমারের দোকানে।
আমি গেলে বাছার বিয়া হবেরে।

—বগুড়া

দিয়ে বরগ্নান করান হয়।[১]

ফুরুল ভরণ:

ফুরুল ভরণ আচারের পরপর তিনটি পর্ব : ফুরুল ভরণ, ফুরুল সাজন ও ফুরুল ডোবা। পর্বগুলির অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র আছে এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান আছে। একটি মাটির ঘটকে বলা হয় ফুরুল। বগুড়া জেলায় ফুরুল, রংপুরে ফোরল, ময়মনসিংহে পুরল ইত্যাদি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়।

নদী, পুকুর অথবা জলাশয় থেকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামের এয়োরা ফুরুল ভরে আনে। তিনজন এয়ো এক নিঃশ্বাসে পাতিল ডুবিয়ে পানি ভরে। এ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক গীত গাওয়া হয়।[২] এরপর ফুরুল সাজান হয়। ফুরুল সজ্জার বর্ণনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখেছেন, "সেই পানিতে (ফুরুলের পানিতে) কিছু সরিষার তেল, কিছু হলুদ, একটি সদ্য

ঐরূপ আদা ও হলদীর কথা আছে। বর বা কনেকে ঘর থেকে বের করার সময় গীত :

ঘর হইতে বাহির হইতে বাছা ওরে
আমার ঐ দেখ ঘামিল বাছার মুখখানি।
এক নোটা চালিতে বৈধন ওরে

ঘর হইতে বাহির হইতে বাছা ওরে
আমার ঐ দেখ ঘামিল বাছার মুখখানি।
—ঐ

গোসল উপলক্ষে গীত:

পানির নোটা দামানের মাথায় টলমল করে
মরি হায়রে হায়রে।
পানি পরিয়া দামানের ভিজিল পাগড়ী জোড়া।

ভিজুক ভিজুক সুতার পাগড়ী
হামরা পেন্দাম বান্দা পাগড়ী।
মরি হায়রে হায়রে।
—রংপুর

পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৩; রায়হান উদ্দিন সরকার—বিয়ের গীত, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬৫, পৃঃ ২৪৫; লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮০

১. পূর্বোক্ত, পাকিস্তানের লোকগীতি, পৃঃ ১১৭

২. কোন ঘাটে ভরিমো ঘটরে ?
ডাকেয়া আনো খোয়াজক
কোন ঘাটে ভরিনো ঘটরে ?

উদ্ধৃত: উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৩

প্রস্ফুটিত লাল শাপলা, কয়েকটি দেবদারু পাতা ও আট-দশটি উলুখড়ের একটি তাড়া দিয়ে পাতিলটি সজ্জিত করে। কনের শয়নের ঘরের দরজার নিকটে সামান্য গর্ত করে ফোরলের পাত্রটি তথায় স্থাপন করে।"[১] বলা বাহুল্য, এটি নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। পরের দিন কনের স্নানের সময় ঐ পানি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে উলুখড়ের গোছা কনের মাথার উপর ধরে পানি ঢেলে তাকে ভিজান হয় এবং ফোরলের তেল-হলুদের পানি নিয়ে কনের গায়ে-মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয়। শাপলা ফুল কনের বুকে ও পেটে ছোঁয়ায়। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এসব আচার অর্থজ্ঞাপক— শাপলা ফুল নারীর গর্ভফুলের, উলুখড় বহু সন্তানের এবং দেবদারু পাতা ও তেল-হলুদ স্বচ্ছল সংসার জীবনের প্রতীক।[২] বস্তুত: এসবের পেছনে সংক্রামক ইন্দ্রজালের প্রভাব আছে। সাদৃশ্যবোধক বস্তুর স্পর্শ দ্বারা আসল ফল লাভের বাসনা সংক্রামক ইন্দ্রজালের বিষয়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব ফুরুল ডোবা। ফোরলের ফুল, পাতা, খড়, তেল-হলুদ-মাখা পানি যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া যায় না। অনুষ্ঠান সহকারে মেয়েরা পুকুর অথবা অন্য জলাশয়ে ফেলে দেয়। একেই ফোরল ডোবা বলে। ফোরল ডুবানর পূর্বে যে আচার পালিত হয়, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আচারটির পদ্ধতি ও ফলাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে শাহ আনিসুর রহমান লিখেছেন, "পুরুল ভরা লোকাচারের মধ্যে বর ও কনের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন কেমন হবে তাই দেখা হয়। বিয়ের দিন বর ও কনের গোছল করার সময় এই লোকাচারের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে উঠানের একধারে মাটি খুঁড়ে ছোট পুকুরের মত করা হয়। এই ছোট পুকুরে বর ও কনের নামে দুটো জলন্ত মাটির প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দুটো প্রদীপ যদি পাশাপাশি অবস্থায় ভাসমান থাকে তবে মনে করা হয় যে এই দম্পতি সুখে থাকবে। যদি প্রদীপ দুটো কোন ক্রমে একত্র না হয় তবে ধরে নেওয়া হয় যে এই দম্পতির জীবন সুখের হবে না। তারপর যে প্রদীপ আগে নিভে যাবে সে প্রদীপটি যার নামে সে অন্যজনের আগে মৃত্যুবরণ করবে বলে সকলে বিশ্বাস করবে।"[৩]

১. ঐ, পৃ: ২০২
২. ঐ, পৃ: ২০৪
৩. পূর্বোক্ত, পল্লব, জয়পুরহাট কলেজ বার্ষিকী, ১৯৬৪-৬৫, পৃ: ৪

খোদেজা খাতুন আচারটি সম্পর্কে প্রায় অভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ফুরুল ভরণের সময় নদীতে, পুকুরে বা বড় পাত্রে রাখা কুয়োর পানিতে কলার মোচায় করে দুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়— একটি বরের অপরটি কনের। প্রদীপ দুটি ভেসে ভেসে একত্রে মিলিত হলে শুভ সূচক। প্রদীপ জ্বলবার দীর্ঘত্বের উপর বর কনের দাম্পত্যজীবনের আয়ুষ্কালের দীর্ঘত্ব সূচিত হয়। এয়ো পুরস্ত্রীরা উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে কোন প্রদীপটি আগে নেবে বরের না কনের, এ ব্যাপারগুলো একান্তই প্রতীকধর্মী।"[১]

এঁদের মতে আচারটি বগুড়া জেলায় দেখা যায়। অন্যত্রও এর চল আছে। কিশোরগঞ্জে প্রচলিত 'পুরলভরা' নামটি পাওয়া যায়। আঞ্চলিক কিছু প্রভাব ছাড়া আচারটির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এক। রংপুরে এটি 'ফোরোল ডোবা' নামে পরিচিত।[২] ফোরোল ডোবা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "এই উৎসবে গ্রাম্য ললনাগণ পানিতে ভাসিতে পারে এইরূপ জাতীয় একটি পাত্রে ডিয়াইর (প্রদীপ) সাজাইয়া ও অগ্নি সহযোগে প্রজ্বলিত করিয়া ঐগুলি পানিতে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য আশেপাশের পুকুরে বা বিলের ধারে উপস্থিত হইত। অতঃপর প্রজ্বলিত ডিয়াইরগুলি পানিতে ভাসাইয়া দিবার পূর্বে তাহারা বহু শাস্ত্র করিত ও দীঘিটির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গীত গাহিত।"[৩]

আচারটি গীতযোগে সম্পন্ন হয়। গীতে আছে নারীর মনস্কামনার অভিব্যক্তি। রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতে দীপশিখার উজ্জ্বলতার মত কন্যার দীর্ঘ ও উজ্জ্বল জীবন কামনা করা হয়েছে।

পুষ্করিণী মাও মুই ভাসাও ঘিয়ের বাতিরে।
ও মোর গুঞ্জরী ভোমরা।
এই না বাতি তোমার জীবনের সাথীরে,

. ...

১. পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃ: ৪৪৬
২. 'ফোরোল' রংপুরের আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ মাটির ছোট কলসী বা পাতিল। দ্রষ্টব্য : আইনুজ্জামান—ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বিয়ের গীত, দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই পৌষ, ১৩৭৪
৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপুর), ১৯৬৬

এই না বাতি জলুক তোমার জীবন ভরিরে।[১]

আচার সম্পর্কিত অন্য একটি গীত :

ফোরল ডুব্বার গেনু মাও মুই
কুমার পাড়া দিয়া।
বারাও রহ কুমারের মায়া
হাতে ডিয়াইর নিয়া।
তোরে ডিয়াইর আবানে রহ কুমান্নি
বাচার বিয়া ঠেকা।[২]

এরূপ ডালার জন্য ডোমনি, তেলের জন্য তেলেনী এবং গামছার জন্য তাঁতিনীকে বলা হয়। আর এসব হচ্ছে ফোরল ডোবার উপচার।

হিন্দু সমাজেও এরূপ আচার আছে। অমিতাকুমারী বসু লিখেছেন, "একটা পাথরের পাত্রে দুধে আলতা গুলে রাখা হয়। তারপর বর-কনের গোলাব টোপর থেকে দুটো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে দুধে আলতায় ছেড়ে দেয়। ফুল দুটো ভাসতে ভাসতে যদি এক জাগায় এসে থেমে যায় তা হলে বুঝতে হবে বর-কনের মধ্যে ভালবাসা হবে। যদি আলাদা হয়ে দু-জায়গায় থেমে যায় তাহলে বুঝতে হবে দুজনের মধ্যে মিল হবে না।"[৩]

লেখিকা একে মুর্শিদাবাদের স্ত্রী-আচার বলেছেন। তাঁর মতে, আচারটি বিয়ের দিন কনের বাড়িতে বাসরঘরে পালিত হয়। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ফরিদপুরে 'সোহাগ ভরা হাড়ি' নামক আচারে একই পদ্ধতিতে বর-কনের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়।[৪] 'গোপীচন্দ্রের গানে' গোপীচন্দ্রের বিয়েতে 'পাতিল ডুবিয়ে' শুভাশুভ নির্ণয়ের কথা আছে।[৫] পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'সোনামুনি ভাগানো' নামটি প্রচলিত আছে। কামিনীকুমার রায়ের মতে,

১. আতোয়ার রহমান—মেয়েলী গানে সমাজচিত্র, লেখকসংঘ পত্রিকা, পৌষ-মাঘ, ১৩৬৮, পৃ: ৫১৬
২. উদ্ধৃতি : উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃ: ২০৬
৩. বিচিত্র বিবাহ, প: ১৬৩-৬৪
৪. অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—জাতীয় জীবনে ঠাকুরমার দান, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪০, পৃ: ১০৭-০৮
৫. গোপীচন্দ্রের গান, পৃ: ৩৩০

গামলার জলে দুটি 'মোনামুনি' ছেড়ে দেওয়া হয়; উভয়ের মিল হলে শুভ, মিল না হলে অশুভ মনে করা হয়।[১]

সামাজিক বিবাহের ভিতর দিয়েই নর-নারী শান্তির নীড় বাঁধে, এবং সন্তানের জন্ম দিয়ে সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখে। সুতরাং বিবাহিত জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ পূর্বাহ্নে যাচাই করে নিতে চায় তারা। বাংলার আদিবাসীর মধ্যে একই উদ্দেশ্যে আচার পালনের রীতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে পদ্ধতিটা কিছু ভিন্ন, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা অভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরংদের বিবাহে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ আয়ু পরীক্ষা করা হয় দুটো মুরগী জবেহ করে তাদের 'জিহ্বা'র দৈর্ঘ্য অনুসারে।[২] নাগা, কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতির মধ্যে বিবাহাদিতে ডিম ভেঙে এরূপ পরীক্ষা করা হয়।[৩]

দুধের ধার শোধা

দুধের ধার শোধা কনে সম্পর্কিত স্ত্রী-আচার। গোসলের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। অনুষ্ঠান সম্পর্কে অধ্যাপক শাহ আনিসুর রহমান লিখেছেন, "মায়ের দুধের ধার শোধা গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ।...এই উপলক্ষে গোসল করার পর কনে পিঁড়ির উপর অধোমুখে বসে থাকে। মা ধীরে ধীরে তার সামনে এসে বসে নিজের মাথার একগোছা চুল ডান হাত দিয়ে ধরে মেয়ের চুলের সঙ্গে ঠেকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে সেই চুলের উপর সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল ঢেলে দেয়।"[৪] অধ্যাপিকা খোদেজা খাতুন এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "মার দুধের ধারে মেয়ে বড় হয়।... তাই একটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে মা নিজের মেয়েকে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। মা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে একখানা চাদরের আড়াল দিয়ে দুধ-ভাতের গ্রাস তিনবার মেয়ের মুখের কাছে নিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে নিজের মুখে তুলে দেয়।"[৫]

---

১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫
২. আরণ্য জনপদ, পৃঃ ১২৬
৩. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—হিন্দুর সংস্কৃতির স্বরূপ, পৃঃ ২০
৪. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৩-৪
৫. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৬

ফল ও লক্ষ্যের দিক থেকে খাতৃতা ভাঙান এবং দুধের ধার শোধা পরস্পরের সম্পূরক। কেবল অভিভাবকত্বের অবসান নয়, ঋণমুক্ত করেও কনের বিদায়ের পথ নির্বিঘ্ন করা হয়।

সরিষা উদ্‌রান

সরিষা উদ্‌রান স্নানের পরবর্তী এবং দুধের ধার শোধার অনুষঙ্গ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র এবং জটিলতাহীন। একখানা চাদর ও কিছু সরিষা বা খই এর উপচার। গোসলের পর বর বা কনেকে একটা পাটিতে বসান হয়। চার জন মেয়ে তার মাথার উপর চাদরখানা মেলে ধরে। অন্যান্য মেয়েরা চাদরের উপর সরিষা বা খই ছিটায়। বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় এর প্রচলন আছে।[১]

উদ্‌রান শব্দের অর্থে আলমগীর জলীল সাহেব লিখেছেন, 'হাতে লইয়া একবার উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে আবার হাতের তালুতে নিক্ষেপণ' করা।[২] এখানে ছিটান অর্থও গ্রহণ করা যায়। যেখানে সরিষার স্থলে খই ছিটান হয় সেখানে আচারটি 'খই ছিটানো' নামেই প্রচলিত।[৩] হিন্দু সমাজে বিবাহ বাসরে 'লাজহোম' বলে একটি আচার আছে, তাতে কন্যাসম্প্রদানের পর কনেকে অগ্নিকুণ্ডে লাজ বা খই নিক্ষেপ করতে হয়।[৪] অনুষ্ঠানটি কৌতুকপ্রদ। এ সময় সমবেত কণ্ঠে গীত গাওয়া হয়।[৫] আচারটির তাৎপর্য সম্পর্কে মন্তব্য করে শাহ আনিসুর

---

১. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৪

২. হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলীল সম্পাদিত—উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত, পৃঃ ৬৭

৩. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৪

৪. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৮৫

৫. আনো আনো সরিষারে
বলদে ভরিয়া।
ঐনা সরিষা উদরামোরে
আলমে বসিয়া
ঐনা সরিষা উদরামোরে
বহুলে বসিয়া
—রাজশাহী

উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৪৭

রহমান বলেছেন, সরিষা বা খই ছিটানর অর্থ হল বর-কনের নূতন জীবনে বিপদ-আপদ নেমে এলেও তাদের যেন বিচলিত করতে না পারে।[১] অর্থাৎ বিপদ যদি আসেও খই-সরিষার লঘুভারের মত তারা অবহেলাভরে তা উপেক্ষা করতে পারে। আহিনুজ্জামান একটি প্রবন্ধে বলেছেন, যতগুলি সরিষা আছে তত বছর কনের পরমায়ু হবে এই কামনাতে তারা এরূপ আচার পালন করে।[২] লোকমনস্তত্ত্ব বিচারে এসব ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বরণ ডালা

বরণ ডালা পুরোপুরি আচার নয়, তবে আচারের বীজ এতে আছে। কেবল বিবাহ উপলক্ষে ডালা দেওয়ার রীতি আছে বলে এতে আনুষ্ঠানিক বিশিষ্টতা এসেছে। ডালা বেত বা বাঁশের তৈরি ঝুড়ি জাতীয় পাত্র। ডালায় করে বিয়ের তত্ত্ব আসে। এখন উপঢৌকন অর্থে ডালা শব্দের চল হয়ে গেছে। বর ও কনে উভয় পক্ষকে পরস্পরের জন্য ডালা দিতে হয়। বর কনের বাড়ীতে যে ডালা পাঠায় তাতে সাধারণতঃ চার প্রকার দ্রব্য থাকে: প্রসাধনী, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও আহার্য। আর্থিক অবস্থা ভেদে গহনাপত্রের মূল্যমানের তারতম্য ঘটে, কিন্তু কতকগুলি আচারদ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তন চলে না। ডালাতে আচারদ্রব্য হিসেবে পান (দুকুড়ি), গোটা সুপারি, কাঁচা হলুদ, বাটা মেহেদী ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্য হিসেবে মিষ্টান্ন, দই ও মাছ থাকে। ডালা দিয়ে বিবাহের আসন্ন মিলন-পর্বকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়। এই অর্থে বরণ ডালা নামটি যথার্থ। মিলন বা জোড়া অর্থে এর একটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায় 'জুড়নী' বা 'জোরণ'।[৩]

হিন্দু সমাজে ডালার তত্ত্ব আসে অধিবাসের দিন। ময়মনসিংহে একে 'তৈলকাপড়' বলে। একটি মেয়েলীগীতে তৈলকাপড়ের দ্রব্যের মধ্যে শংখ, মাছ ও দই-এর নাম পাওয়া যায়। এগুলি পাত্রপক্ষ পাঠায়

১. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃ: ৪
২. পূর্বোক্ত, দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই পৌষ, ১৩৭৪
৩. গোপীচন্দ্রের গান, পৃ: ৪৭৪

কন্যাপক্ষের বাড়ীতে।[১] গন্ধতৈল ও নতুন কাপড় এর অত্যাবশ্যক উপচার। চট্টগ্রামে 'তেলোয়াই' এবং কামরূপে 'তেলের ভার' নাম প্রচলিত আছে।[২]

আমসরতী

আমসরতী[৩] চট্টগ্রামে প্রচলিত আচার। মা ছেলের উদ্দেশ্যে এটি পালন করেন। এর রীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'দুলাকে সাজানো একটি পিঁড়িতে বসানো হয়। সামনে সাজানো কুলোর উপর বদ্‌না, তার মুখে আমের পত্রসহ ছোট ঠাইল। কুলো শুদ্ধ সব কিছু নিয়ে দুলার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এইটি আমসরতী। এরকম করার অর্থ তাকে সংসার ক্ষেত্রে সোপর্দ করা।''[৪] স্পষ্টতঃ আচারটি বর বিদায়ের পূর্বে বরের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে পালন করা হয়। আচারটি সম্পর্কে রচিত একটি মেয়েলীগীত এরূপ :

নীচনে তে বসুমতী
মাঁঅর হাতর আমসরতী
ভইনের হাতে ধূপ,
আঁচ্ছা গরি আকি লইও,
ভালা গরি আঁকি লইও,
মার দুর্লভ পুত।[৫]

— চট্টগ্রাম

বর বিদায়

ঘরের ছেলে বাইরে পা বাড়ালে বাঙালী মা বিহ্বল বোধ করেন। পথে নানা দুর্গমন, দৈবদুর্বিপাক, ডাকিনীযোগিনীর কুনজর ওঁত পেতে আছে। তাতে সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে। এজন্য মা ছেলেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেন ও নানা উপদেশ দেন।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ· ৩৭৮-৭৯
২. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭
৩. আম্রসত্রী>আম্রসতরী> আমসরতী (বর্ণ বিপর্যয়) ; সত্র শব্দের অর্থ যজ্ঞ, আচ্ছাদন। সত্রী—বিণ। দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় ভাগ।
৪. ওহিদুল আলম সম্পাদিত—চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫১
৫. ঐ, পৃঃ ৫১

যাত্রার পূর্বে বরবেশে ছেলে মায়ের কদমবুচি করে বিদায় চায়। মা ছেলের মুখে তিন গ্রাস মিষ্টান্ন তুলে দেন। এ সময় মেয়েলীগীত হয়। আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে গীতগুলি বেশ মূল্যবান। কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত একটি পল্লীগীতে মা ছেলেকে পথের শুভাশুভ সম্পর্কে সতর্কবাণী করছেন। শুভযাত্রা সম্পর্কিত লোকপ্রচলিত বিশ্বাস এখানে উল্লিখিত হয়েছে। পথে 'মালী' এবং 'তেলী' দেখা কুযাত্রার লক্ষণ, কিন্তু 'ফুলের ডালি' এবং 'দৈয়ের ভাঁড়' দেখা শুভসূচক।[১] পথে কেবল মানুষের ভয় নয়, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবেরও ভয়। এজন্য মা ছেলের এক পকেটে একটা রসুন বেঁধে দেন। এটা অশরীরী আত্মার প্রকোপ থেকে ছেলেকে বাঁচায়। এছাড়া সন্তানের আপদমুক্তির জন্য তিনি 'বন্দনা' করেন। রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি বন্দনাগীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

আদি বন্দলাম, অনাদি বন্দলাম
বন্দলাম চাইরো দিকরে
পীর বন্দলাম, পেগাম্বর বন্দলাম
মায়ের দুর্লভ পুতরে।[২]

হিন্দু সমাজে বর মাকে প্রণাম করে বিদায় চাইলে মা ছেলের হাতের কড়ে আঙুলটা একটু কামড়ে নিজের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ধূলো নিয়ে তিনবার ছেলের কপালে ছুঁইয়ে দেন, যাতে অপদেবতার কুদৃষ্টি না পড়ে।[৩]

মাড়োয়া সাজান

বিয়ের দিন বরকে অভ্যর্থনা করে বসানর জন্য মাড়োয়া বা চাঁদোয়া সাজান হয়।[৪] বরযাত্রী-সহ বর কনের বাড়ীতে উপস্থিত হলে তাকে বরণ করে নিয়ে বিশিষ্ট আসনে বসাতে হয়। এদিন বরের সমাদর রাজতুল্য। এজন্য বরের অপর নাম 'নওশা' (নতুন শাহ)।

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৭
২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৫
৩. বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৬১
৪. 'মাড়োয়া' মণ্ডপ শব্দজাত।

একটি মেয়েলীগীতে চার কোণায় চারটি কলাগাছ পুঁতে চারগাছ লাল সুতায় ঘিরে মাড়োয়া সাজানর বর্ণনা আছে।[১] দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যে আমের পাতাসহ ঘড়া প্রতিষ্ঠিত করে মাড়োয়া সাজানর কথা আছে।[২] হিন্দুদের 'মণ্ডপ' সাজান হয়। তারা সাতটা কলাগাছ পুঁতে ও মাটির ঘড়ায় আমপাতা, কাঁচা নারিকেল রেখে মণ্ডপ তৈরি করে। একে 'ছাতনাতলা' বলে। এখানে বিবাহ পাঠ সম্পন্ন হয়।

কনের বাড়ির অন্দর মহলে আর এক ধরণের মাড়োয়া তৈরি করা হয় বিয়ের কয়েকদিন পূর্বেই। মাড়োয়া সাজানর পদ্ধতি এক তবে, উপযোগিতা ভিন্ন। এখানে নতুন উনুন বানান হয় কনের ভাত রাধার জন্য। এ সম্পর্কে সামীয়ুল ইসলাম লিখেছেন, "মাড়োয়া অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচী হল—একটি স্থানে চারটি কলা গাছ পুতে ঐ কলাগাছ চারটির চারপাশে কাপড় দ্বারা আবৃত করে পর্দা করে; তারপর সমবেত স্ত্রীলোকেরা হাতে 'পাশুন' (খুন্তি) নিয়ে বাড়ির নিকটবর্তী স্থান থেকে কিছু মাটি কেটে নেয় এবং আবৃত কলাগাছ চারটির ভিতর গিয়ে বসে। তারপর তারা মাটি ছেনে 'টিডা' প্রস্তুত করে। তিনটি টিড়া দিয়ে একটি উনুন প্রস্তুত করে। উনুনের বিশেষত্ব হচ্ছে বিয়ের তিন দিন যাবৎ পাত্রী ও এয়োরা এই উনুনে রেঁধে বেড়ে খায়। তারা অন্য কারও রাঁধা ভাত খায় না, এমনকি পুরানো উনুনেও ভাত রাধে না, তাই বিয়ের ব্যাপারে এই উনুন ছিল অত্যাবশ্যক।...মাড়োয়া অনুষ্ঠানে গ্রাম্য ললনাগণ টিড়া প্রস্তুত করার সময় ও ভাত রাঁধার সময় গীত গাইত। উহা মাড়োয়ার গীত নামে প্রসিদ্ধ।"[৩] গীতগুলি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ও হাস্য-পরিহাসপূর্ণ। একটি গীতে মাটি কাটা, মাটি সানা ও টিড়া বানানর

১. চাইরি গাছি রাম কেলাগো চাইরি গাছি লাল হুঁতায় গো
দুয়ারে গাঁড়িলাইন, মাকুয়া বেড়াইল।
—কিশোরগঞ্জ

উদ্ধৃত : লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০

২. মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুগঠ।
সাপিলা রসালপত্র সুবর্ণের ঘট॥

উদ্ধৃত : আহমদ শরীফ সম্পাদিত—লায়লী-মজনু, পৃঃ ৬৮

৩. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৯৯

বর্ণনা আছে।

আইজ বাচার মাড়োয়ারে
নানী হামার পাশুন উবায়।
আইজ বাচার মাড়োয়ারে
মামী হামার পানি উবায়।
আইজ বাচার মাড়োয়ারে
দাদী হামার চিড়া বানায়।[১]

মাড়োয়াব সমালোচনা করে হাস্যরসাত্মক একটি গীত :

মাড়োয়া ক্যানে হালে
মাড়োয়া ক্যানে ঢোলে
সরিয়া সুরিয়া বইসো বরু
সউড়ি পড়ে দানে।
সউড়ি ক্যানে দানে ?
ভাত আঁদার জন্নে।[২]

বর বরণ

বরকে বরণ করা হয় দুবার। প্রথমবার বরের গৃহে গোসলের পর, দ্বিতীয়বার কনের বাড়ীতে যাত্রীসহ বর এসে পৌঁছলে পর। বরের নিজ গৃহে সাধারণত: ভাবী সম্পর্কের আত্মীয়ারা বর বরণ করেন। খুলনা জেলায় এর প্রচলন আছে। একটি নতুন কুলায় ধান, দূর্বা, তেল, হলুদ, মাটির প্রদীপ, কলগা ও হাঁড়ি রাখা হয়। একে বরণ কুলা বলে।[৩] গোসলের পর বরকে পিঁড়িব উপর বসিয়ে বরণকুলা তার মুখের সামনে ডান দিক থেকে বাম দিকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরান হয়। এ অনেকটা হিন্দুর প্রতিমার সামনে পুরোহিত কর্তৃক ধূপধুনায় আরতি করার মত। অনেক সময় খালি হাতে ধান-দূর্বা-পানাদি নিয়ে হাতের কম্পন ও মুদ্রার ভঙ্গিতে উক্ত প্রকারে ঘুরান হয়। ভঙ্গিটি সহজসাধ্য নয় বলে অভিজ্ঞা

১. ঐ, পৃ: ১৯৯
২. ঐ, পৃ: ২০০
৩. মুহম্মদ আবু তালিব—বিবাহগীত, দিলরুবা, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫৭, পৃ: ১৮৩

গ্রাম-বধূকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। ফরিদপুর জেলা থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে এরূপ অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ভাগ্যমতির বরণকুলা
আবে ছোটে তারা,
বরণী বরতে নারে জানে।
হাউলকা মাজা ঢুলাইয়া
গিরামী পাগোল করে নারে।[১]

দলবলসহ বর কনের বাপের বাড়ী উপস্থিত হলে বিবাহবাসরে বসানর আগে তাঁকে বরণ করা হয়। সাধারণতঃ দাদী সম্পর্কের বর্ষীয়সী মহিলা এ ভূমিকা পালন করেন। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত নিম্নের মেয়েলীগীতে বর বরণের সমস্ত পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে।

ও ময়নার দাদী লো
সোনার বাটায় আনিয়া
দামান রে তুই
ভালো করিয়া বর।
আইসো দামান বইসো খাটে
খাও বাটার পান।
সুন্দরমতি ময়না হারে
তোমায় করলাম দান।[২]

হিন্দু সমাজে 'বরাভ্যর্থনা'র প্রথা আছে। কনের বাড়ীতে দর্ভনির্মিত আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল ও মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, শর্করা ও জলের মিশ্রণ) দ্বারা বর অভ্যর্থনা করা হয়।[৩]

কনে সিংরান

বিয়ের দিন বর সাথে করে যে ডালা নিয়ে আসে তার সামগ্রী দিয়ে অন্তঃপুরে কনে সিংরান হয়।[৪] এটি পুরোপুরি স্ত্রী-আচার। এতে সাধারণভাবে কতকগুলি বিধিনিষেধ পালন করা হয়। এসময় কনের পরনে বাপের দেওয়া কোন কাপড়চোপড় থাকে না।

কনে সিংরান অনুষ্ঠানে কনের কেশবিন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিয়ের দিন বর যে প্রসাধনী দ্রব্য আনে তা দিয়ে কনের চুল বেণী করে

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯
২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪০
৩. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৮৩
৪. শৃঙ্গার শব্দ থেকে 'সিংরান' শব্দ উৎপন্ন হতে পারে।

বাঁধা হয়, খোঁপা করা হয় না। হিন্দু আচারের প্রভাবে কোথাও কোথাও চন্দন-গুঁড়া দিয়ে কনের কপাল ও কপোল চিত্রিত করা হয়। একে 'কনে-চন্দন' বলে। এরপর পোশাক ও অলঙ্কারে সাজিয়ে বিয়ে পড়ান হয়। কনে সিংরানর সময় গীত গাওয়া হয়। গীতগুলি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রচিত। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত একটি গীতে কনের কেশচর্চা ও সাজসজ্জায় রূপচর্চার কথা আছে।[১] পাবনা জেলায় আচারটিকে 'এয়োদানি করা' বলে। পাড়ার এয়োরা আনুষ্ঠানিকভাবে কনেকে সাজায়। একটি গীতে তেল, সিঁদুর ও মাজন দিয়ে কনে সাজানর বর্ণনা আছে। এর জন্য এয়োরা কনের মার কাছ থেকে পান-সুপারী বকশিস পায়।[২]

শা-নজর

হিন্দু সমাজে 'শুভদৃষ্টি' ও মুসলমান সমাজে 'শা-নজর' অভিন্ন অনুষ্ঠান। শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠানে বরকনেকে ছাতনাতলায় মুখোমুখি বসিয়ে একখানা চাদর দিয়ে আড়াল করে প্রথমবারের মত তাদের পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হয়। শাস্ত্রে এটা 'মুখচন্দ্রিকা' নামেও আখ্যাত হয়েছে। পরস্পরের মাল্যবদল এই অনুষ্ঠানের অবিভাজ্য অঙ্গ।[৩]

মুসলমান পরিবারে শা-নজর সম্পন্ন হয় গৃহের ভিতর কনের বাসরঘরে। কেবলমাত্র বর ছাড়া অন্য পুরুষ সেখানে উপস্থিত থাকে না। মেয়েরা এ আচারটি পালন করে। শা-নজর অনুষ্ঠানে বর-কনেকে পাশাপাশি বসান হয়। প্রথমে সরবত (গ্লাসের অর্ধেক বর, অর্ধেক কনে) ও পরে মিষ্টি খাওয়ান হয়। ভাবী সম্পর্কের আত্মীয়া এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।[৪] কোন কোন অঞ্চলে কনে নিজেই বরের মুখে ভাত ও মিষ্টদ্রব্য তুলে দেয়। ঢাকা জেলায় একে 'ক্ষীরবুজনী' বলে।[৫] লোক সংস্কার, এতে অল্পাহারে

১. পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃ: ৪৪৯-৫০
২. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১১-১২
৩. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃ: ৭৪
৪. বরকনের প্রথম সাক্ষাতে একাসনে উপবেশন ও একত্রে ভোজন পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচলিত আছে। জাপানে বৌদ্ধসমাজে লেবুর অর্ধাংশ বরকে ও অর্ধাংশ কনেকে খেতে দেওয়া হয়। শুভবিবাহ, পৃ: ৪৪৯
৫. ক্ষীর বুজনী <ক্ষীর ভোজনী।

স্বামী সন্তুষ্ট থাকবে। বর ও কনের মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে একখানা আয়না দিয়ে পরস্পরেব প্রতিবিম্ব দেখান হয়। হিন্দুর দম্পতির মালা বদলের অনুরূপ এ সময় অঙ্গুরী বিনিময় হয়। আয়নার সাহায্যে মুখ দেখান হয় বলে 'আয়নামুখ' নামেও অনুষ্ঠানটি পরিচিত।

শা-নজরের দ্বিতীয়পর্বে আছে বরনির্যাতনের পালা। বরকে নানা পরীক্ষা ও ঠাট্টাবিদ্রূপের ঝামেলা পোহাতে হয়। শাহ আনিসুর রহমান এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "পশ্চিম বগুড়ার কোন কোন স্থানে একটা বড় কাঠের পিঁড়ির উপর কনের পাশে বসতে গেলে পিঁড়ির নীচে সুপারী রেখে বরকে আছাড় খাওয়ানোর রীতি দেখা যায়।"[১]

বরনির্যাতনের প্রথা প্রাচীন হতে পারে। উপজাতি ও আদিবাসীর মধ্যে কেবল ঠাট্টাবিদ্রূপ নয়, বরকে শারীরিক পীড়াও দেওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বালোচ উপজাতিদের মধ্যে নিয়ম আছে, বর যখন কনেকে নিয়ে উটে করে বাড়ী ফিবে তখন পেছন থেকে তাদের উপর পাথর, লাঠি এমন কি তীর ছোড়া হয়। বর বিয়ের বাড়ী পৌঁছার পর কনের আত্মীয়-স্বজন যত খুশী নির্মম ব্যবহার করে, বরকে সহ্য করতে হয়। নির্বিবাদে কনেকে বরের হাতে তুলে দিলে স্ত্রীলাভের মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ হবে বলে তাদের বিশ্বাস।[২]

হাংগোড় ধরা

বিয়ের দিন কন্যা বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে এটি পালন করা হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করে বর-কনেকে আটকিয়ে রাখার নাম 'হাংগোড় ধরা'। উদ্দেশ্য বরের কাছ থেকে কিছু বকশিস আদায় করা। এ উপলক্ষে মেয়েলীগীত আছে। বলা বাহুল্য, গীতে বিদ্রূপের ভাষায় অধিক বকশিসের জন্য বরকে প্ররোচিত করা হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত একটি গীত এরূপ :

কনে পক্ষ : হামাক পাচটা ট্যাকা দ্যাও গো
ভাটিয়া দেশের বাংলানী।

---

১. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৮
২. মাহবুব উল আলম—বালোচ উপজাতির বিয়ে, মাহে-নও, পৌষ, ১৩৭০ পৃঃ ৩৪

বর পক্ষ : তোমাক একটা ট্যাকা দেগোঁ রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাংলানী।
তোমরা হাংগড় কোণা ঘুচান রে
ভাটিয়া দ্যাশের বাংলানী।[১]

বধূবরণ

কনের বাড়ীতে যেমন বরবরণ, বরের বাড়ীতে তেমনি বধূবরণ। বিয়ে করে বর স্বগৃহে ফিরে এলে প্রথমে বর-বধূকে বরণ করে নিতে হয়। বধূবরণের রীতি হিন্দু সমাজে বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত। মুসলমান সমাজে এর প্রভাব পড়েছে। বিশেষতঃ বরণকুলার উপচারগুলি যথা ধান, দূর্বা, কলা, মিষ্টি প্রভৃতিতে হিন্দুয়ানির ছাপ আছে।

বধূবরণের প্রথা ও পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে শাহ আনিসুর রহমান লিখেছেন, "বরের বাড়ী পাল্কী এসে পেঁাছয়।...বর-কনে যে ঘরে বাস করবে সে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটা লাল বা সাদা কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার উপর সুপারী, পান ও ছোট মাটির সরা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর বরের একজন বয়স্কা আত্মীয়া বর ও কনের মুখে সামান্য চিনি দিয়ে নামিয়ে আনেন। তারপর বর কনেকে নিয়ে ঐ বিছানো কাপড়ের উপর দিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার সময় বরকে নীচু হয়ে পান, সুপারী ও মাটির সরা তুলে নিতে হয়। এর অর্থ হোল বর যেন কন্যাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে সমস্ত বিপদ-আপদ অতিক্রম করতে পারে।...মা তারপর দুই হাতের ফাঁক দিয়ে বর ও কনেকে ঘরের মধ্যে ঢুকান এবং নিজের দুই উরুর উপর দুজনকে নিয়ে দুই গ্লাস দুধ পান করান। মা ঘরের কোণায় রক্ষিত একটা ডোল দেখিয়ে ছেলের বৌকে জিজ্ঞেস করেন, বলত মা ডোলের মধ্যে কি? কনে ডোল দেখে এসে বলে, ধান। মা বলে উঠেন, তোমার ঘরে হোক ধানের বান।"[২] তিনি একে বগুড়া জেলার আচার বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে বধূবরণের

১. উত্তর বাংলার লোকসহিত্য, পৃঃ ২৬৮
২. পূর্বোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৯

রীতি বর্ণিত হয়েছে। বরের মা দুয়ারে আঁচল পেতে দেন, তার উপর দিয়ে ছেলে ও বধূকে হেঁটে যেতে হয়। বরের বোন পিড়ি ও পানি রাখেন পা ধোয়ার জন্য। বরের ভাবী চিনির থালি এনে দেবর-জায়ার মুখে তুলে দেন।[১] কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত গীতে মা, চাচী, মামী, ভগ্নী ও ভাবী কর্তৃক বধূবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মা দুধের সরবত দিয়ে ছেলে ও বউকে বরণ করেন। চাচী দুধের ফিরনী, মামী পানের ঝাড়ি, ভগ্নী ধান দূর্বা এবং ভাবী অজুর পানি দিয়ে বরণ সম্পন্ন করেন।[২] ধান-দূর্বা-পানাদি যোগে হিন্দুরীতি এবং সরবত-ফিরনী-অজুর পানি যোগে মুসলমান রীতির মিশ্রণ আচারটিতে লক্ষ্য করা যায়। টাঙ্গাইলের মেয়েলীগীতে 'ঘিয়ের বাতি' ও 'চাকের চালুন' দিয়ে বধূবরণ করার দৃষ্টান্ত পাই।[৩] নতুন বউকে ঘরে তোলা হয়, এরূপ অর্থে ময়মনসিংহে এটি 'বউঘরা' নামে পরিচিত।[৪]

পাশা খেলা

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পাশা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহ উপলক্ষে বরবধূর পাশাখেলার আয়োজন এসব রচনায় নির্দেশিত হয়েছে। পাশাখেলা অনুষ্ঠানে প্রকৃতপক্ষে পাশাখেলা হয় না, পাশাখেলার ছদ্মনামে 'কড়ি খেলা' বা 'আংটি খেলা' হয়। শ্রীহট্ট জেলায় হিন্দুর বিয়েতে প্রচলিত এরূপ কড়ি খেলার বর্ণনায় অমিতাকুমারী বসু লিখেছেন, "বাসরঘরের মেঝেতে শীতল পাটির উপর বর কনেকে পাশা খেলতে হয়। চিত্রবিচিত্র মাটির হাঁড়িতে একুশটি কড়ি ঢাকা থাকে। মেয়েরা কেউ বরের পক্ষ নেয়, কেউ কনের পক্ষ। বর কনের হাতে একমুঠো কড়ি দিলে সেই কড়ি পাটির উপর ছড়িয়ে দেবে। গুণে দেখা হবে কটা কাড়ি উল্টেছে। তারপর বরের পালা। যার বেশী কড়ি উল্টোবে তারই জিত হবে। কড়ির হাড়ির সরা কনে আস্তে আস্তে তুলে ফেললে বর হাত

---

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭

২. লোকসাহিত্য. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩২ ৩৩

৩. শোনো শোনো মাজান গো কইয়া বুঝাই তোমারে।
এই ঘিযের বাতি চাকের চালুন দিয়া বইবা নেওগো ঘরে।।
উদ্ধৃত : বাতায়ন, পৃঃ ২৬১

৪. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১

দিয়ে ঢাকবে। শব্দ হলে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হবে।"[১] আশরাফ সিদ্দিকী ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে আংটি খেলার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিয়ের পর কনে যখন পতিগৃহে আসে তখন উঠোনের এক জায়গায় ছোট গর্ত করে তাতে পানি ভরে কনে ও বরকে কাদাপানির মধ্যে থেকে আংটি খুঁজে বের করতে হয়।[২] এ উপলক্ষে উপস্থিত নারীমহলে কাদা ছোড়াছুড়ি হয়। এতে লোকাচারের চেয়ে লঘু হাস্যপরিহাসের অংশ বেশী। মলুয়া গীতিকায় বর্ণিত পাশাখেলায় মনোরঞ্জনের দিকটাই প্রকটিত হয়েছে।[৩]

বাসর জাগা

বিয়ের পরদিন রাত্রে বরের বাড়ীতে বাসর জাগা হয়। ভাবী সম্পর্কের এয়ো স্ত্রীরা রাতে বাসর জেগে বরবধূকে পাহারা দেয়। প্রদীপ-ধূনাদি দিয়ে বাসর আলোকিত ও সুবাসিত এবং ফুলপাতা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। বাসরঘরে বরবধূ প্রবেশ করলে কিছু মুদ্রা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বধূকে সেগুলি কুড়িয়ে জোগাড় করতে হয়। লোকবিশ্বাস, এতে বধূর সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জন্মে। অর্থাৎ সে ভবিষ্যতে স্বামীর অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদ বৃদ্ধি করবে। বস্তুত: এরূপ লোকচেতনা যাদুবিশ্বাসজাত। একটি আচারের নকল তুলে অনুরূপ ফল কামনা করার মধ্যে সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাস আছে। বাসর জাগার পরবর্তী অনুষ্ঠান নাচ-গান ও রঙ্গকৌতুকের ভিতর দিয়ে সম্পন্ন হয়। যারা বাসর জাগরণে অংশ গ্রহণ করে তারা বরের কাছ থেকে বকশিস পায়।[৪]

বাসী গোসল

বাসী গোসল বধূ-সংক্রান্ত আচার। আচারটি বরের বাড়ীতে বাসর জাগার পরের দিন সম্পন্ন হয়। বাসী গোসলের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে

১. বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৫৫
২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪১
৩. পাশা খেলায় চান্দ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া।
পাশায় হারিল বিনোদ চিত্তের লাগিয়া॥
উদ্ধৃতঃ মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৮
৪. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৪৭

খোদেজা খাতুন লিখেছেন, "অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে বর ও কনেকে এক সঙ্গেই বড় একখানি পিঁড়িতে পাশাপাশি বসিয়ে গোসল করানো হতো। এখন শুধু কনেকে ঘর থেকে পান চোখে দিয়ে উঠানে বের করে এনে পিঁড়িতে বসানো হয়। তারপর গোসল হয়ে গেলে আবার পান চোখে দিয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। গোসলের পিঁড়ির সামনে একটা মাটির নতুন সরা রাখা হয়। ঘরে চলে যাবার সময় কনেকে ঐ সরাটি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতে হয়। সবাটি ভেঙ্গে যে কয় টুকরো হবে ছেলে-মেয়েও ততজন হবে বলে মনে করা হয়। এয়োরা মিলে তখন ঐ টুকরোগুলো হাতে নিয়ে উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে যায় এবং নবজাত সন্তানের ক্রন্দনের অভিনয় করে গীত গায়।"[১]

আশরাফ সিদ্দিকীর মতে রাজশাহী জেলায় এয়োগণ কাপড় দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করে কনেকে লক্ষ্য করে পরিহাসছলে এরূপ গীত গায়।[২]

বাসী গোসলের পদ্ধতি ও ফলশ্রুতিতে সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের ধর্ম আছে। মন্ত্র উচ্চারণ ও আচার পালনের সাহায্যে অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হলে সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের অর্থ আরোপিত হয়। সন্তানের প্রতীক পুতুল নিয়ে তাকে লালন-পালনের অভিনয় করা হয়।

বাসী গোসল 'অনুষ্ঠানটি বাসী বিয়ে' নামেও স্থানবিশেষে পরিচিত।[৩]

বৌভাত

সব সমাজের বিয়েতে বরের বাড়ীতে বৌভাতের প্রচলন আছে। খাওয়া-দাওয়ার উৎসব এটি। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী খাওয়ার আয়োজন

---

১. পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৫৩-৫৪

২. ছাওয়াল কান্দেরে
চাচীর কোলে যাইতে ছাওয়াল কান্দেরে।
দাদীর কোলে যাইতে ছাওয়াল
ছলবল ছলবল করে রে
খলবল খলবল করে রে।
উদ্ধৃত : লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৭

৩. পূর্বোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৫৩

হয়। সাধারণতঃ বিয়ের পরের দিন অথবা তিন দিনের দিন বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। কন্যাপক্ষের লোকদের পূর্বেই দাওয়াত দেওয়া থাকে। তাঁরা ও বরপক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একত্রে খানাপিনা সম্পন্ন করেন। হিন্দু সমাজে ঐদিন নববধূকে প্রথম রান্নাঘরে নেওয়া হয় এবং তার হাতের স্পর্শযুক্ত রান্না খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুক্ত করা হয়।[১]

বরন্তা[২]

সাধারণতঃ বিয়ের পব তিন দিনের দিন কনেপক্ষের লোক বরের বাড়ীতে আসে, কনে-জামাইকে নেওয়ার জন্য। এঁদের বিশেষভাবে সম্মান করতে হয় ও ঘটা করে খাওয়াতে হয়। মুর্শিদাবাদে এটাই 'বরন্তা' নামে পরিচিত। গৃহকর্তা খরচ বাঁচানর জন্য বরন্তা ও বৌভাত একসঙ্গে করতে পারেন, আবার পারিবারিক ঐতিহ্য ও দম্ভ প্রকাশের জন্য আলাদা ভাবেও করতে পারেন। বরন্তা নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান। হিন্দুসমাজে একে 'দ্বিরাগমন' বলে।[৩] এটি কনেব প্রথম 'নাইয়র'।

মেলানি

সম্ভবতঃ এটিই বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান। হিন্দু সমাজে 'অষ্টমঙ্গলা' অনুষ্ঠান পালিত হয় বিয়ের অষ্টম দিনে কনের বাড়িতে। ঐদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বরকনেব 'গাঁটছড়া' 'মঙ্গলসূত্র' ইত্যাদি খোলা হয়। চতুর্থ দিন অথবা দশম দিনেও এটি পালিত হতে পারে ; তখন এটি 'চতুর্থমঙ্গলা' বা 'দশমমঙ্গলা' নামে অভিহিত হয়।[৪] ঢাকা জেলায় মুসলমান সমাজে একই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'আড়াই-উন্না' নামটি পাওয়া যায়।[৫] দ্বিরাগমনেব

১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১
২. প্রবাদ আছে, 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। অতি বরন্তী না পায় বর॥' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বরন্তী' (বর+অন্ত+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ দিয়েছেন, 'বিয়েপাগলী' 'বরাকাঙ্ক্ষিনী'। বরন্তা (বর+অন্ত+আ স্ত্রীলিঙ্গে) ও বরন্তী সমার্থবাচক শব্দ হতে পারে।
৩. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮
৪. ঐ, পৃঃ ২০১
৫. আড়াই-উন্না ; উন্না সম্ভবতঃ 'মঙ্গলা' শব্দজাত। 'উল্লাস' (?) শব্দোদ্ভূত ও হতে পারে।

পর আড়াই দিনের মাথায় বর কনেকে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসে। ঐদিন বরকে কনের বাড়িতে মাছ, দই ও মিষ্টদ্রব্য দিতে হয়। মাছ না দেওয়া পর্যন্ত অভিভাবক মেয়ে-জামাইকে মাংস দিয়ে পলান্ন খাওয়াবেন। মাছ ও দই-এর যে আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব আছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।[১]

অনুষ্ঠান শেষে বর-কনেকে বিদায় দিতে হয়। একে 'মেলানি' বলে। বিদায় শব্দটি অশুভসূচক, এজন্য বিদায় অর্থে 'সুভাষিত' (euphemism) মেলানি বলা হয়। বর-কনের বিদায় যাত্রা শুভ হোক, তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, মেলানির তাই আন্তর কামনা।

১. প্রস্তুত গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩

ব্যাধি ও মৃত্যু

মৃত্যু জীবের অবধার্য পরিণতি। অথচ মৃত্যু কেউ কামনা করে না। মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে। মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে। তথাপি মৃত্যু আসে। মৃত্যুর নানা কারণ— জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য, দৈবদুর্বিপাক, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। জরা-বার্ধক্য প্রাণীর কালানুগত স্বাভাবিক পরিণতি। ব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রকোপে মৃত্যু হলো অকালোচিত। গ্রামজীবনে ব্যাধির ভয় পদে পদে। রোগ প্রতিরোধ ও উপশমের ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক, উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্য সম্পর্কে লোকের ধারণাও স্পষ্ট নয়। অতএব সেখানে ব্যাধি ও মৃত্যুর অবাধ দৌরাত্ম্য। সেখানে জীবন সর্বদা সংশয়ে সন্ত্রস্ত। যে সমাজজীবনে সাধারণ গাছ-গাছড়া, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় সেখানে ব্যাধি মৃত্যুর সামিল।

বাংলার গ্রামজীবনে রোগ-চিকিৎসায় গাছগাছড়া, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। জীবানু ব্যাধির কারণ —এই জ্ঞান লোকের ছিল না, ফলে এক এক ব্যাধির পেছনে এক এক অপদেবতার আস্থা কল্পনা করেছে যা রোগ ছড়ায় ও মৃত্যু ঘটায়। অশিক্ষিত মানুষ এসব অপদেবতার উদ্দেশ্যে মানসিক করেছে, শিরনী দিয়েছে, পূজা-অর্চনা করেছে। এরূপ মনোভাব থেকে বসন্তের শীতলা-দেবী, কলেরার ওলাবিবি, জ্বরের জ্বরাজরি, খোসপাঁচড়ার ঘেঁটু, সাপের বিষহরী ইত্যাদির উদ্ভব কল্পনা এবং পূজাচারের জন্ম হয়েছে। মৃত্যুর পর মৃতাত্মার কল্যাণের জন্য আচার সংস্কারাদিও পালন করা হয়।

মৃত, মৃতের সৎকার, মৃত আত্মার তুষ্টি সাধন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আচার আছে। মুসলমান ও খ্রীস্টানরা মৃতদেহ কবরস্থিত করে, হিন্দুরা দাহ করে। হিন্দুশাস্ত্র মতে মানবাত্মা

অমর, তা পুনর্জন্ম লাভ করে পূর্ব কর্মফল ভোগ করে। ইসলাম ধর্মে জন্মান্তরবাদ নেই, তবে কেয়ামতের দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং তারা লৌকিক কর্মফল অনুযায়ী দোজখের শাস্তি অথবা বেহেশতের শাস্তি ভোগ করবে। খ্রীস্টান ধর্মেও পুনরুত্থানের কথা আছে। বিচারের শেষদিন পাপপুণ্য অনুসারে স্বর্গ-নরকের শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করবে। মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য হিন্দুদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গোষ্ঠী-ভেদে দশ বা ত্রিশ দিন পর শ্রাদ্ধ করার রীতি আছে। মৃত্যুর পর সাত দিনের দিন বৌদ্ধরা 'আদ্যশ্রাদ্ধ' পালন করে। এতে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান হয়।[১] মুসলমানেরা মৃতের নামে দোয়া-দরুদ পড়ে ও দান-খয়রাত করে যাতে মৃতাত্মা গোরের ও দোজখের আজাব থেকে মুক্তি পায়। তারা মৃত্যুর তিন দিনের দিন 'কুলখাওয়ানি' এবং চল্লিশ দিনের দিন 'চেহলাম' করে। উভয় অনুষ্ঠানে মৃতের মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ পড়া হয়। এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সম্প্রদায়ভেদে মৃত সম্পর্কে মোটামুটি এটাই বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ধারণা এবং ধর্মসিদ্ধ প্রথাপদ্ধতি। কিন্তু লোকসমাজ এখানেই থেমে যায় না। তার বিশ্বাসের পথ যেমন বিচিত্র, আচার পালনের রীতি তেমনি বিবিধ। উপজাতিরা বা আদিবাসীরা ব্যাধি-মৃত্যু সম্পর্কে আরও অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে। অধিকাংশ উপজাতির লোকেরা মনে করে, মৃত্যুতে ইহলোকের সব ক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। মৃতের আত্মাবস্তুর প্রভাব থেকে যায়। এজন্য তারা মৃতব্যক্তি সম্পর্কে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে। আত্মাবস্তু ভালমন্দ দুই করতে পারে। পূর্ব পুরুষের আত্মাবস্তুর পূজা দেওয়ার রীতি আছে ময়মনসিংহের গারোদের মধ্যে। তারা মৃত ব্যক্তির কবরে পাথর চাপা দেয়, আত্মাবস্তু তাতে ভর করে। এ পাথর দিয়ে তারা কামনার অনুকূলে কাজ সমাধা করে। মৃতাত্মার পূজা দিয়ে তার শক্তির অধিকারী হয় তারা।[২] উপরন্তু মৃতের আত্মাবস্তুকে উর্বরতাশক্তির কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে মৃতের হাড়ের

১. Report of the commission for eradication of evils, Govt. of Pakistan, Karachi, 1965, P. 9

২. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১৮৬

ছাই জমিতে ছড়িয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এতে মৃতাত্মা জমিতে প্রবেশ করে ভূমির উর্বরতাশক্তি বাড়ায় ও ফলোৎপাদনে সাহায্য করে।[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের টিপরারা পাহাড়ের গায়ে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঘর নির্মাণ করে এবং তার ব্যবহার্য দ্রব্যসহ দাহকৃত ছাই সে ঘরে রেখে দেয়। এ ঘরকে তারা পবিত্রস্থানে বাৎসরিক পূজা দেয়।[২] আসামের খাসীয়া উপজাতি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয়, মৃতের আত্মা তা গ্রহণ করে। খাসীয়া রমণী মৃত স্বামীর হাড়ের মালা গলায় পরে বৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষা করে।[৩]

উপজাতির নানা সংস্কারের ধারা পুরুষানুক্রমে বাংলার লোকসমাজে প্রবাহিত। জনসাধারণ ব্যাধি ও মৃত্যু সংক্রান্ত বিবিধ বেশরা সংস্কার দীর্ঘকাল থেকে পালন করে আসছে। এসব সংস্কারের পেছনে প্রচ্ছন্ন রূপে অথবা পরিবর্তিত রূপে আদিম চৈতন্যেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করতে হয়। ব্যাধি, মহামারী, দৈব দুর্ঘটনা, অপদেবতার দুষ্প্রভাব প্রভৃতি কারণে জীবন বিপন্ন হতে পারে। দুঃখ-শোক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অজ্ঞ জনসাধারণ নিতান্ত লৌকিক উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অন্ধবিশ্বাসই তাদের বিধিব্যবস্থা, আচার-আচরণের প্রধান উৎস।

হাইয়া নেওয়া

সন্তান জন্ম নিয়ে মরে যায়। মা তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। এজন্য লোকাচার বা লোকচিকিৎসা আছে। সন্তানের হায়াত কামনা করে এ আচার পালিত হয় বলে এর নাম 'হাইয়া নেওয়া' আচার।[৪] কোন জীবিত শিশুর মাথার চুল, হাত ও পায়ের নখ, হাতের কব্জি ও পায়ের হাঁটু এবং অন্যান্য জোড় স্থানের ময়লা সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়ে মৃতবৎসা রমণী মাদুলী ধারণ করলে তার পরবর্তী গর্ভ নষ্ট হয় না,

১. ঐ, পৃঃ ১৯০
২. ঐ, পৃঃ ১৪২
৩. ঐ, পৃঃ ১৯৪ (পাদটীকা)।
৪. হাইয়া আরবী হায়াত শব্দজাত; অর্থ—আয়ু বা জীবন।

সন্তান বেঁচে যায়। এদিকে যে শিশুর হাইয়া নেওয়া হয়েছে সে ক্রমশঃ শুকিয়ে গিয়ে অথবা রোগে ভুগে মারা যায়। অবশ্য শিশুর পিতামাতা সময়মত জানতে পারলে এর প্রতিরোধক আচার পালন করে বিপদ এড়াতে পারে। তারা নিজ সন্তানের চুলনখাদি একটি পাতিলেবুর মাঝখানে চোকা করে কেটে তাতে পুরে ভাল ভাবে বন্ধ করে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। মৃতবৎসা রমণী কর্তৃক মাদুলী ধারণ করার আগেই একাজ করতে পাবলে তবে বিপদ দূর হয়, পরে হলে কোন সুফল পাওয়া যায় না। আচারটি বরিশাল জেলায় লোক সমাজে প্রচলিত আছে।[১]

স্পষ্টত: আচারটি যাদুবিশ্বাসপ্রসূত। একটি শিশুর হায়াত দিয়ে অন্য শিশুর হায়াত কামনা করা হয়। যাদুবিদ্যায় একে 'সংক্রামক ইন্দ্রজাল' (contagious magic) বলা হয়। চুল, নখ, ময়লা প্রভৃতি অঙ্গাংশ অথবা অঙ্গ সংশ্লিষ্ট ব্যবহার্য বস্তু দ্বারা গুণমন্ত্র করা 'ডাইনী বিদ্যা'র (witchcraft) বহুল প্রচলিত প্রাচীন রীতি। শিশুর অঙ্গাংশ দ্বারা তার হায়াত গর্ভধারিণীর মাধ্যমে অন্য শিশুর দেহে সংক্রামিত করা সম্ভব, এরূপ লোকবিশ্বাস থেকে আচারটির উদ্ভব হয়েছে।

জলকাওরীর বাও

'জলকাওরী' পানির জীববিশেষ।[২] এটি অপদেবতা, নরদেহের প্রতি তার লোভ। মানুষ ডুবে লাপাত্তা হয়ে গেলে বলা হয়, জলকাওরী তাকে টেনে নিয়েছে। শিশু বা কিশোর বালকেরা পুকুর বা নদীর ঘাটে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার জ্বর হয় ও দেহ ফুলে যায়। এতে লোকের ধারণা হয়, রোগীর উপর জলকাওরীর আসর হয়েছে! এ ক্ষেত্রে রোগীকে যেখানে আছাড় খেয়েছে সেখানে নিয়ে গিয়ে চাল মিশ্রিত পানিতে গোসল করান হয়। পাড়ের কোন উচু ঢিপিতে তিনটি কাঠি পুঁতে একটি ছোট পাতিলে শিরনী

---

১. বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার আশা গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ নরুল ইসলামের নিকট থেকে সংগৃহীত।

২. কুমারী থেকে 'কাওরী' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। জলকুমারী>জলকাওরী। 'বাও' বাত বা বাতাস শব্দজাত।

রান্না করে কলার ভেলায় উক্ত দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়। কলার খোলের আঁশ রোগীর হাতে পায়ে বেঁধে দিতে হয়। লোকবিশ্বাস, এতে রোগীর ফোলা অংশ সেরে যায়। এটিও বরিশাল জেলায় প্রচলিত লোকাচার।[১]

বেরা ভাসান

বাড়িতে কোন মারাত্মক অসুখ হলে অথবা ঘোর বিপদ দেখা দিলে রোগ-শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বেরা ভাসান আচার পালিত হয়। মহরমের সময় যে আনুষ্ঠানিক বেরা উৎসব হয়, তার অনুকরণে এটি উদ্ভূত হলেও রীতিপদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য আছে। এটি প্রয়োজন অনুসারে বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। কলা গাছের খোল বা বাকলের ভেলায় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে শিরনী ভোগ দেওয়াই এর আচার সম্বন্ধীয় প্রধান ক্রিয়া। খোয়াজ খিজির প্রধানত: পানির পীর। তবে 'আব-হায়াতে'র (fountain of life) 'অথবা 'সবুজের উৎসপ্রাণ' (genius of vegetation) হিসেবেও তিনি পরিগণিত হন।[২] আবহায়াত বা জীবনের উৎস হিসেবে তিনি অসুখ-বিসুখের সময় লোকের কাছ থেকে পূজা পেতে পারেন। ময়মনসিংহে লোকসমাজে এ উদ্দেশ্যে বেরা ভাসানর রেওয়াজ আছে।[৩] পীরের নামে আগে থেকেই মানত করা হয়। তারপর বিপদ কেটে গেলে কোন এক সময় কুমারী মেয়েরা দলবেঁধে মাগন করতে যায়। তারা সকাল বেলা গোসল করে ভিজা কাপড়ে একখানা কুলায় ধান-দূর্বা ও পানিভর্তি লোটা নিয়ে মাগন করে। মাগনের সময় তারা আনুষ্ঠানিক গীত গায়।[৪] সাধারণত: চল্লিশ বাড়ি থেকে মাগন এনে তারা শিরনী

---

১. সংগ্রাহক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম: পূর্বে উল্লিখিত।

২. প্রস্তুত গ্রন্থের লৌকিক পীরবাদ শীর্ষক অধ্যায়ের 'খোয়াজ খিজির' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৬, পৃ: ১৫ (ভূমিক)।

৪. এক সখী দুইও গো সখী
সখী পাঞ্চজনে রে
ডাইলি-চাইলি মাঘত যায গো
বাবা খোয়াজ খিজিরের
নামে রে॥

ডাইলি দিবাইন চাইলি গো দিবাইন
আর বাঁ দিবাইন কি রে
খোয়াজ খিজিরের শিন্নী দিবাইন
দেরীর আছে কি রে।
—ময়মনসিংহ

উদ্ধৃত: ঐ, পৃ: ১১২

পাক করে। প্রথমে শিরনীর কিছু অংশ খিজির পীরের উদ্দেশ্যে ভেলায় করে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বাকী অংশ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে খায়। ভেলা লাল, নীল কাপড় দিয়ে সাজান হয়; তাতে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান থাকে।[১] শিরনীর সাথে একটি তামার পয়সাও দিতে হয়।[২]

গাজীগানের পালা দেওয়া

ময়মনসিংহে বেরা ভাসান এবং ফরিদপুরে গাজী গানের পালা দেওয়ার উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে আচারপদ্ধতি ভিন্ন। পরিবারের কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল রোগে ভুগলে অথবা প্রবাসী পরিজনের বিপদ উপস্থিত হলে সে আপাদবালাই দূর করার জন্য গাজীর নামে পালা দেওয়া হয়। এখানে গাজীকে রোগ-উপশমকারী পীর হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩] আগে থেকেই মানত করা হয়, পরে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তা পূরণ করা হয়। আচারের দিন গৃহস্থ ব্যক্তি পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ দিয়ে ডেকে আনে। পেশাদার বয়াতি আসে গান করতে। আসরের মাঝখানে একটি মাটির সরাতে সোয়া সের চাল, পান, সুপারি ও নতুন কাপড় বাঁশের ঝুঁড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ঝুড়ির পাশে থাকে 'গাজীর আসা'।[৪] বয়াতি নানা অঙ্গভঙ্গি করে গান করে, শ্রোতারা তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। এতে প্রচলিত

---

১. লাল নীল কাপড়ে গো
আরে কিনা বেরুয়া বেড়াইলাইন।   পাঞ্চ পিদিম জ্বালাইয়া গো
আরে কিনা বেরুয়া ভাসাইলাইন।

—ময়মনসিংহ

উদ্ধৃত: ঐ, পৃঃ ১১০

২. ঐ, পৃঃ ১৬ (ভূমিকা)।

৩. প্রস্তুত গ্রন্থের লৌকিক পীরবাদ অধ্যায়ের 'গাজীপীর' অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—হারামণি, ২য় খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২) গ্রন্থের ভূমিকাংশে 'গাজী গানের আসর' পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন। তাতে আশার সঙ্গে চামর বাঁধা আছে। পাশে একটি 'মঙ্গলঘট' এবং একটি টুলে অন্য উপচার আছে।

'গাজীর পালাগান' গাওয়া হয়। গানের শেষে সকলের মধ্যে মানতের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।[১]

ভুলা পোড়ানি

গ্রাম থেকে আপদ-বালাই দূর করার অনুষ্ঠান ভুলা পোড়ানি। খড়-কুটা দিয়ে মানুষের মূর্তি বানিয়ে তাই পোড়ান হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় এ রীতির প্রচলন আছে। আচারটির পদ্ধতি সম্বন্ধে কামিনীকুমার রায় লিখেছেন, "কার্তিক সংক্রান্তির সন্ধ্যায় খড়কুটা দিয়ে মানুষের মত একটা মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার মাথায় ধূপ, সরিষা, শুকনা পাটপাতা ও কয়েকটা মশা-মাছি রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একজন সেই জলন্ত মূর্তিটিকে লইয়া চতুর্দিকে দৌড়ায়, আর চীৎকার করিয়া বলে—

ভালা আইয়ে বুরা যায়
মশা-মাছির মুখ পোড়া যায়।
দো! দো!! দো!!!

ঐ সময় আরও কয়েকজন কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটে এবং 'দো দো' বলিতে থাকে। ঐরূপে পথে প্রান্তরে আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ ছুটিয়া দগ্ধপ্রায় মূর্তি মাঠে দাঁড় করিয়া রাখা হয়।"[২] মুর্শিদাবাদে আলেয়াকে 'ভুলা' বলে। রাত্রিবেলায় মানুষকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়, এজন্য আলেয়ার এ নাম। ময়মনসিংহে কাকতাড়ুয়াকে 'ভুলা' বলে। খড়কুটার তৈরি ছেঁড়া জামা-জুতা পরা, চূণকালি মাখা মূর্তিটি পশুপাখিকে ধোকা দেয় ও ক্ষেত-ফসল রক্ষা করে। এ মর্মে এটির ভুলা নাম। কাকতাড়ুয়া পোড়ান হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত ভুলা পোড়ান হয়। মূর্তির সাথে সাথে রোগ-ব্যাধি পুড়ে ধ্বংস হয়, এরূপই লৌকিক বিশ্বাস। অনুকরণধর্মী ইন্দ্রজাল (imitative magic) থেকে এরূপ আচারের উৎপত্তি।

---

১. আচারটির বিবরণ বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত নিয়মিত সংগ্রাহক নূরুল হক মোল্লার নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি।

২. লৌকিক শব্দকোষ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮

ত্যাপথের ছ্যাঁকা[1]

অচেনা অসুখে দীর্ঘকাল ভুগছে এমন ব্যক্তির রোগ-উপশমের আশায় ত্যাপথের ছ্যাঁকা আচারটি পালন করা হয়। তিন রাস্তার মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে তাতে শুকনো মরিচ, নালিতাপাতা, লেবুপাতা একত্রে পোড়াতে হয়। দ্রব্যগুলি দিয়ে আগেই রোগীর গা ছুঁয়ে নেওয়া হয়। রাস্তার ছাই কোন পদচারী মাড়ালে বা ডিঙিয়ে গেলে তার দেহে ঐ রোগ চলে যায়। পূর্বের রোগী ক্রমে আরোগ্য লাভ করে। স্যার জর্জ ফ্রেজারের বর্ণনা অনুযায়ী এটি 'সংক্রামক ইন্দ্রজালে'র দৃষ্টান্ত।[2] অঙ্গসংশ্লিষ্ট বা দেহস্পৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে ব্যাধি দেহান্তরে সঞ্চালিত করা এরূপ যাদুবিশ্বাসের লক্ষণ।

দুরারোগ্য ব্যাধির লোকচিকিৎসা হিসেবে কখন কখন অচেনা অদৃশ্য অপদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হয়। পাঁচ ছটাক আতপ চাল, পাঁচ মুরগীর পাঁচটি ডিম, পাঁচটি সবরি কলা ও বিজোড় সংখ্যক তামার পয়সা একত্রে একটি কলাপাতার অগ্রভাগে নিয়ে নির্জন মাঠে ভূত-প্রেতের সংস্কারজড়িত কোন গাছের নীচে রেখে দেওয়া হয়। অপদেবতা তা ভক্ষণ করে তুষ্ট হয়ে রোগীর দেহ ছেড়ে দেয়। এখানে পাঁচ সংখ্যার ট্যাবু লক্ষণীয়। ত্যাপথের ছ্যাঁকা ও ভোগ দেওয়া আচার বাংলার লোকসমাজে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত।[3]

বাড়ি বন্ধন

মড়কের সময় কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য এবং গৃহের অন্য কেউ যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্যও বাড়ি বন্ধন করা হয়। এ ব্যাপারে পেশাদার পীর-ফকির ডাকা হয়। তারা দোয়াদরূদ ও তন্ত্রমন্ত্র জানে। বন্ধন কাজে লাগে তিনটা বোতল ও

১. ত্যাপথ <ত্রিপথ ; ছ্যাঁকা<সেঁকা<সেকা।

২. A. C. Haddon—Magic and Fatishism, Constable & Co. Ltd., London, 1910, P. 3

৩. উল্লিখিত বিবরণ বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুরের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি। তাঁর মৌখিক ভাষ্য মতে, ময়মনসিংহে এরূপ লোকাচার দেখা যায়। তাঁর আবাস ভূমি কিশোরগঞ্জ।

একটা মরা গরুর খুলি। মাথার খুলি রোগীর ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে এক একটা বোতল বাড়ির এক এক স্থানে পোঁতা হয়। প্রথম একটা বোতল রোগীর ঘরের মেঝেতে পোঁতা হয়, পরের বোতল আঙ্গিনায় এবং শেষেরটা বাড়ির দেউড়িতে পোঁতা হয়। লোকের ধারণা, এরূপ মন্ত্রপূত বোতল দিয়ে ব্যাধি বাইরে বিদায় করা হয়। বোতল চিহ্নিত সীমানার মধ্যে তা আর প্রবেশ করতে পারে না। স্পষ্টত: এখানে ব্যাধি বা মহামারীর আত্মা কল্পনা করা হয়েছে। গরুর মাথার খুলি ট্যাবু। প্রেতাত্মা তা স্পর্শ করে না। লোকসমাজে বাড়ি বন্ধনের অনুরূপ গ্রাম বন্ধনেরও রেওয়াজ আছে।

চোরা রুটি

চোরা রুটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক লোকপ্রথা। মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিপালিত হয়। মৃত্যুর তিন দিনের দিন রুটি তৈরি করে মৃতাত্মার নামে ভোগ দেয় এবং গরীব ভিক্ষুকদের ডেকে খাওয়ান হয়। এটি কুল খাওয়ানির অনুকরণে পরিকল্পিত লোকাচার। ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে চল্লিশ দিনের দিন অনুরূপ একটি আচার পালিত হয়, নাম 'চল্লিশা'। ঐদিন রুটি ও হালুয়া তৈরি করে প্রথমে কলাগাছের খোলে মৃতাত্মার নামে ভোগ হিসেবে কিছু অংশ পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। লৌকিক ধারণা, চল্লিশ দিন পরে মৃতাত্মা ঘরে আসে, ভোগ পেলে ফিরে চলে যায়। বাকী হালুয়া-রুটি সন্ধ্যার সময় গ্রামের চল্লিশ বাড়িতে বিতরণ করা হয়। ঐদিন ঘরদোর ও কাপড়চোপড়ে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয়।[১] আচারটি চেহলামের প্রভাবজাত।

খঞ্জন বাহন

মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে পালিত খঞ্জন বাহন আচারটি চট্টগ্রামে দেখা যায়। বাড়িতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তিন দিন অথবা পাঁচ দিনের পর রাত্রে ভিজা চালের গুঁড়া ডালায় করে রেখে দেওয়া হয়। সকালে যদি দেখা যায়, ডালায় কোন কিছুর ছাপ পড়েছে, তবে ধারণা করা হয়, মৃতাত্মা সে স্থান দিয়ে চলে গেছে।

---

১. সংগ্রাহক মোহম্মদ সাইদুর: পূর্বে উল্লিখিত।

৪

চাষাবাদ ও ফসল

বাঙালীর লোকজীবন কৃষিনির্ভর। অনার্যযুগ হতেই কৃষিকাজ জীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে চলে আসছে। অধুনা শহর এবং শহরপ্রান্তে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বৃহত্তর গ্রামজীবনে আবহমান কালের মত চাষাবাদের প্রাধান্য আজও অক্ষুণ্ণ। ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প ও আঞ্চলিক ব্যবসায় দ্বারা কিছু সংখ্যক পল্লীবাসী জীবিকার্জন করলেও তা কৃষির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বৃত্তি নয়। ব্যবসায়ের মূল পণ্য কৃষিজাত দ্রব্য। তাঁতির তুলা, জেলের সুতা, তেলির তিল-সরিষা আসে কৃষকের ঘর থেকে। কামার, কুমার, ছুতারের জিনিষপত্র কৃষক নেয়, বিনিময়ে সে তাদের ক্ষুধার অন্ন জোগায়। মাঝিমাল্লারা খেয়াপার করে কৃষকের কাছ থেকে পাঁচফসলির পারানি পায়। এক কথায় বাঙালীর সমস্ত আর্থ-নীতিক জীবনব্যবস্থা কৃষিকাজ ও কৃষিজাত ফসলেয় সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

বাংলার উর্বর মাটিতে প্রায় সব ফসলই ফলে। বাঙালীর কৃষিপদ্ধতি গতানুগতিক। একখানা লাঙল ও একজোড়া বলদ কৃষকের প্রধান সম্বল। কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি, মই, জোয়াল প্রভৃতি চাষাবাদের যন্ত্রপাতি। আকাশের পানি আর বন্যার পলি কৃষিকাজের একমাত্র সহায়। পরিমিত বন্যা এবং বৃষ্টি চাষের অনুকূল। কৃষক ঋতুতে ঋতুতে বীজ বোনে, পাকা ফসল ঘরে তোলে। অন্নের আর পণ্যের ফসল পেয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে।

প্রকৃতিনির্ভর এরূপ কৃষিব্যবস্থা সকল সময় ভরসাযোগ্য নয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকালবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি কৃষিকাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। বাঙালী এসবের প্রতিকার চেয়েছে; তবে হাতিয়ার দিয়ে নয়, প্রকৃতির ও দৈবের কাছে প্রার্থনা করে। আধুনিক যুগে প্রতিকূল

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কিছু হাতিয়ার তার আয়ত্ত হয়েছে—অনাবৃষ্টিতে সেচ, অনুর্বরতায় সার, বন্যায় বাঁধ, কীটনাশে ঔষধ ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বকালে শ্রম ও সাধ্য সীমিত ছিল বলে দৈবনির্ভরতাই একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। দৈবশক্তি বা অপশক্তির কার্যকারণ সম্পর্কে তার ধারণা নেই। অতএব সেখানে সেচ, সার, বাঁধ, ঔষধ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা সংগ্রামের প্রয়াস নেই, আছে পূজা-পার্বণ, আচার-বিচার দ্বারা দেবতার সন্তোষ-বিধানের ও অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা। কেবল কৃষি এবং ফসল সংক্রান্ত বিষয়ে নয়, বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত আদিম চেতনাবিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীমাত্র জীবনের বিভিন্ন স্তরেই নানা আচার, সংস্কার, বিশ্বাস ও প্রথার অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। মানসিক সান্ত্বনা ছাড়া এসব আচার পালনের বস্তুগত মূল্য তেমন নেই।

বাংলাদেশের লোকপ্রচলিত ফসল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির কালানুক্রমিক শ্রেণীভাগ এরূপে করা যায়।

এক : বৃষ্টি আবাহন—বেঙ বিয়া, পুতুল বিয়া, বদনা বিয়া, মেঘারানী, হুদুম দেয়া, বসুধারা ব্রত প্রভৃতি।

দুই : বৃষ্টি বারণ—বাটি পোঁতা।

তিন : জমি চাষ—হলপ্রবাহ।

চার : বীজ বপন— তুষ ছিটান, কুলানি।

পাঁচ : ফসল রক্ষা— আলোডালো, ক্ষেত বন্ধন, ভগ্গা দেওয়া, গাস্বী উৎসব, হিরালি আচার ইত্যাদি।

ছয় : ফসল তোলা— বাতা ডুগল, আওনি বাওনি।

সাত : বিবিধ— মাগন, নবান্ন ইত্যাদি।

যখন সেচ ব্যবস্থা ছিল না তখন চাষাবাদের জন্য আকাশের বৃষ্টি ছিল একমাত্র সহায়। বৃষ্টি না হলে জমির চাষ হয় না, বীজ বপন করা যায় না। ফসল না হলে জীব বাঁচে না। বৃষ্টির অভাবেই মরুভূমি প্রাণিবাসের অযোগ্য। অতএব কৃষিকাজে বৃষ্টি অত্যাবশ্যক। বৃষ্টির এরূপ গুরুত্ববোধ থেকে পৃথিবীর সব কৃষিপ্রধান দেশে বৃষ্টি কেন্দ্রিক লোকাচার গড়ে উঠেছে। হিন্দু ও গ্রীক পুরাশাস্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে বৃষ্টি-দেবতা কল্পনা

করা হয়েছে। ভারতীয় দেবতা রুদ্র বা ইন্দ্র ও গ্রীক দেবতা জিউস এ উদ্দেশ্যে মর্তবাসীর পূজা পেয়ে থাকেন। আকাশের মেঘ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। অতএব তার স্তুতি প্রার্থনা করা অথবা তাকে মন্ত্রে বশীভূত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বৃষ্টি আহ্বায়ক অথবা বৃষ্টিনিবারক মন্ত্র সরাসরি যাদুবিশ্বাসপ্রসূত। মন্ত্র ও স্তুতি যখন লৌকিক ক্রিয়ায় আচার-অনুষ্ঠানে রূপায়িত হয় তখন মানস কামনার নকল তুলতে দেখা যায়। আকাশে পানির ছিটা দিয়ে, মাটিতে পানি ঢেলে অথবা বস্তু বা ব্যক্তির দেহ বারিসিক্ত করে এরূপ নকল তোলার চেষ্টা নানা দেশের 'বৃষ্টি-আবাহন' আচারে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন টিউটনেরা নগ্ন বালিকার গায়ে পানি ঢেলে বৃষ্টি আবাহন করত। গ্রীকরা ওক গাছের ডাল পানিতে ডুবিয়ে মেঘদেবতার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। ভারতের বৌদ্ধরা মন্দির প্রাঙ্গণে গর্তে পানি ঢেলে মাটির শোষণের প্রতীকে বৃষ্টি কামনা করত।[১] কোথাও স্বয়ং দেবমূর্তিকে পানিতে ডুবান হয়।[২] মন্ত্রশাস্ত্র বা যাদুবিদ্যায় এসব আচার সদৃশ ইন্দ্রজাল সম্ভূত বলে লোকবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করে থাকেন।[৩]

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এক বৃষ্টি আবাহনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নানা লোকরচনা ও লোকাচারের উদ্ভব হয়েছে। বাংলার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অনুসন্ধান করলে মোটামুটিভাবে গান, ছড়া, ব্রত, মন্ত্র, বারমাসী ও প্রবচনে বৃষ্টির কামনা ব্যক্ত হয়েছে, দেখা যায়। বাঙালী বৃষ্টির দেবতারূপে কল্পনা করেছে স্বয়ং 'মেঘারানী'কে। বৃষ্টির প্রত্যাশায় মেঘারানীকে সম্বোধন করে নানা ছড়া পাওয়া যায়। এগুলিতে পুরোপুরি লৌকিক আত্মাটি স্পন্দিত। সম্প্রদায় নির্বিশেষে এগুলির প্রচলন আছে।

ছড়ার মত ব্রতও অন্তর্লীন মনোবাসনা থেকে জন্ম নিয়েছে। 'বসুধারা ব্রত' বৃষ্টি কামনায় রচিত। শুধু ব্রতকথা নয়, ব্রত-আলপনা ও ব্রতাচারে একই মনোভাব ব্যক্ত। শস্যকামনায় 'শসপাতার ব্রত' পালন করা হয়। এর আলপনা, আলেখ্য, এমন কি নৃত্যেও ফসলের কামনা ব্যঞ্জিত।[৪]

---

১. SDFML, vol. 2, p. 921

২. মুর্শিদাবাদে হিন্দুসমাজে বৃষ্টির দেবতা রুদ্রের মূর্তিকে পানিতে ডুবানর রীতি আছে। Folklore, IX, 1898, pp. 277-280

৩. গ্রন্থের 'লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ১৫০

ব্রত এবং ব্রত সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান একান্তভাবে হিন্দুরমণীর মানস সম্পদ।

খনার বচন প্রধানতঃ কৃষিকাজের বিবিধ রীতি পদ্ধতি, নিয়ম নির্দেশ ও আবহাওয়ার বিষয় নিয়ে রচিত। এগুলি মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে, বছরে বছরে বাস্তব পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মানসফসল। হাল, বলদ, চাষ, ভূমি, বীজ, ফলন, বৃষ্টি, বন্যা, মাস, ঋতু প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্যোতিষীব্যাখ্যা বচনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধে খনার বচনের নির্দেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বচনগুলি বৃষ্টিকে আবাহন বা প্রতিরোধ করে না, বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে।[১] এক কথায়, এগুলিকে পল্লীবাংলার 'কৃষি-দর্শন' বলা যেতে পারে।

কামনা সফল করার আশায় মন্ত্র কেবল অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, অধিকার প্রয়োগের দাবীও করে। বৃষ্টি আবাহন মন্ত্রে সরাসরি বৃষ্টিকে আবেদন করা হয়, বিফলতায় দোহাই দেওয়া হয়।[২] প্রত্যক্ষ যাদুবিশ্বাস এ মন্ত্রের উৎসস্থল।

স্থানবিশেষে মানিক পীরের জারি গেয়ে কৃষকরা বর্ষাকে অহ্বান করে।[৩] শরীয়তপন্থীর মুসলমান কৃষকেরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মাঠে

১. চৈত্রেতে খর খর। জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
বৈশাখে ঝড় পাথর।। তবে জানবে বর্ষা বটে।।

অথবা

শনির সাত মঙ্গলের তিন ভাদুরে মেঘ বিপরীত বায়।
আর সব দিন দিন।। সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায়।।

উদ্ধৃত: Dr. Tamonash chandra Dasgupta— Aspects of Bengali Society, Calcatta, 1935, PP. 231, 233

২. বৃষ্টি আবাহন মন্ত্রের দৃষ্টান্ত :
আয় বৃষ্টি ভাসাইয়া দে একলক্ষ ছত্রিশ হাজার গোটায়।
মাটির যোপ জাগাইয়া দে। যদি মাঠ না ভরাস
প্রতিটি কোঁটার সমান তবে হরপার্বতীর মাথা খাস্।
উদ্ধৃত: আশরাফ সিদ্দিকী—লোক-সাহিত্য, পৃঃ ১৭০

৩. তোফায়েল আহমেদ—পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক অনুষ্ঠান, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩ পৃঃ ৩১৯

সমবেত হয়ে বৃষ্টির জন্য এশতেসকার নামাজ পড়ে ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। বৃষ্টিদেবতার কাছে মন্ত্রপাঠ এবং আল্লাহর কাছে নামাজপাঠ সামাজিক প্রকারভেদ মাত্র, মূল লক্ষ্য অভিন্ন— আরাধ্যকে তুষ্ট করে বৃষ্টি কামনা করা।[১]

কোন কোন অঞ্চলে নাচের মাধ্যমে বৃষ্টি-আবাহন উৎসব (rain-making ceremony) পালিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু জাতির নারীরা উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করে ও গান গায়।[২] রেড ইণ্ডিয়ানরা মুখে কালি মেখে নাচে এবং মুখের কুলকুচা পানি চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।[৩] বাংলাদেশে রংপুর জেলায় 'হুদুম দেয়া' অনুষ্ঠানে রাজবংশীর কৃষক রমণীরা ক্ষেতে নগ্ন হয়ে নাচ-গান করে।[৪]

বৃষ্টি হলে, চাষের আয়োজন, বীজ বপনের আয়োজন। প্রথম হাল-চাষের দিন কৃষকরা নানা সংস্কার ও আচার মানে। হিন্দু সম্প্রদায়ের 'হলপ্রবাহ' নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। বীজ বপনের সময় মুসলমানরা পূর্ব সংস্কারবশে আচার পালন করে। ঐদিন কৃষাণ-মজুরদের 'কলমীর শাক' দিয়ে ভাত খেতে দেওয়া হয়।[৫] ময়মনসিংহে ধান রোপণের পূর্বে 'চিতল পিঠা' ও 'কচুর শাকের' শিরনী দিয়ে রোপণ আরম্ভ করতে হয়। লোকের ধারণা, এরূপ করলে রোয়া ধান ভাল হয়।[৬] কোন কোন অঞ্চলে

১. এতে দু'রাকাত নামাজ পড়া হয় এবং নামাজ শেষে দোয়া করা হয়। দোয়ার ভাষায় আল্লাহর স্তবস্তুতি করে প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টি চাওয়ার কথা আছে। দোয়ার অংশবিশেষ, 'আনজেল আলায়নাল গায়শা ওয়াজ আল মা আনজালতা লানা কুওয়াহাঁও ওয়াবালাগা ইলা খায়রিন।' অর্থ— 'তুমি (আল্লাহ) সম্পদশালী ও আমরা দীন-হীন। আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং আমাদের জন্য যাহা অবতীর্ণ কর তাহা আমাদের জন্য শক্তিময় ও মঙ্গলজনক কর।' উদ্ধৃতি ও অর্থ দ্রষ্টব্য: মৌলবী শামছুল হুদা—নেয়ামুল-কোরআন, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ: ১৬১-৬২
২. আশরাফ সিদ্দিকী—লোকসাহিত্য, পৃ: ১০৩
৩. মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী—লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃ ১৭১
৪. দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য—লোকায়ত দর্শন, পৃ: ৪১৩
৫. রামেশ্বর ভট্টাচার্য—শিবায়ন, বঙ্গবাসী কার্যালয় সংস্করণ, ১২৯৩, পৃ: ৭৫
৬. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২-৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৩

কৃষাণ মেয়েরা এলোচুলে বীজ পুঁতে ধান রোপণের সূচনা করে।[১] কলমীর শাক, কচুর শাক, এলোচুল ধানের ভাল গুচ্ছ, দ্রুত বৃদ্ধি, অধিক ফলন ইত্যাদি কামনার সাথে সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, এটা ঐন্দ্রজালিক সংস্কারের বিষয়। ভাল গাছ ও অধিক ফলন কামনায় পল্লীসমাজের আর একটি আচারের উল্লেখ করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষকরা আম পাতায় সুগন্ধি মসলা মেখে তা পাখাটির মাথায় বেঁধে ধানের ক্ষেতে গুঁজে দেয়। এটি যে শস্যোদগম এবং প্রচুর ফলনের উদ্দেশ্যে পালিত হয় তার প্রমাণ আনুষ্ঠানিক ছড়াতে পাওয়া যায়:

আশ্বিন যায় কাত্তিক আসে
সকল শস্যের গর্ভ বসে ॥
রামের হাতে গুয়া
ধান হইল তিন গুণা।[২] – ময়মনসিংহ

আচারটির কি নাম তা আশুতোষ বাবু উল্লেখ করেননি। শ্রীকামিনী কুমার রায় ছড়ায় উক্ত 'গুয়া' শব্দ ধরে একে 'গুয়া দেওয়া' আচার বলেছেন।[৩] শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এটিকে আমন ধানের 'সাধ দেওয়া' অনুষ্ঠান বলেছেন।[৪] ধান গাছে শীষের উদগম হলে ক্ষেতে সাধ দেওয়ার প্রথা বাংলার নানা অঞ্চলেই দেখা যায়। গর্ভবতী নারীকে যেমন সাধ দেওয়া হয়, এটি তারই অনুসরণ। 'নলসংক্রান্তি', 'গর্ভনা সংক্রান্তি' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও শস্যকে সাধ দেওয়ার প্রথা আছে।[৫]

গাছ হল, ফল হল না—মানুষের সব আশাই ব্যর্থ। পরিমিত সারের অভাবে গাছে ফল ধরে না—এটাই বৈজ্ঞানিক কারণ। গ্রামের সাধারণ মানুষ এরূপ ধারণা রাখে না। তারা লৌকিক উপায়ে বন্ধ্যা গাছে ফল ফলানোর চেষ্টা করে। এ উপলক্ষে মুসলমান সমাজে 'গাস্বী উৎসব' হয়।[৬]

---

১. ডঃ অমলেন্দু মিত্র—রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১১
২. উদ্ধৃত: বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮
৩. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫
৪. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৮৪
৫. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১০-১১
৬. জসীমউদ্দীন—জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬

বৃষ্টির অভাবে যেমন চাষাবাদ হয় না, আবার অধিক বৃষ্টি, অকাল বৃষ্টি বা বন্যা হলে ধান-পাটের ফলিত ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বৃষ্টি-বন্যা নিবারক ছড়া ও মন্ত্র রচিত হয়েছে। বিপরীত যাদুবিশ্বাস এসব ছড়া মন্ত্রের জন্ম দিয়েছে।[১]

ফসল ঘরে না তোলা পর্যন্ত কৃষকের স্বস্তি নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া কীটপতঙ্গের উৎপাতও আছে যা শস্যের ক্ষতি করে। পঙ্গপাল ফসলের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। পঙ্গপালের আক্রমণ মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু অন্য কীটপতঙ্গের অত্যাচার হর-হামেশা লেগেই থাকে। বাংলার কৃষককে এর জন্য প্রতিফলনেই খেসারত দিতে হয়। কীটনাশের অভিযানে কৃষকরা 'আলোডালো' অনুষ্ঠান পালন করে। বুলবুল, চড়ুই, টিয়া, কাকাদি 'পোকপাখালি'ও ফলমূল নাশ করে। খড়কুটা ও ছেঁড়াফাটা জামা দিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করে ফলন্ত তরিতরকারি, শাকসব্জি ক্ষেতে বেঁধে রাখে। বরিশালে এর নাম 'ভগ্গা'। ময়মনসিংহের গারোরা ফসল রক্ষার জন্য 'ওয়াংলা' আচার পালন করে। বাঁশ-খড়ের তৈরি একটা ঘোড়ার মূর্তির পাশে পাঁঠা, বানর বা ইঁদুরের মৃতদেহ বাঁশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে। এতে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা পায়।[২]

১. বৃষ্টি প্রতিরোধক : রইদ তোলাওরে দেওয়া
হাড়িত খুছি মেওয়া।

উদ্ধৃত: মোহম্মদ মতিউর রহমান বসুমিয়া—উত্তর বাংলার গেঁয়ো ছড়া, দিলরুবা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬, পৃ: ৩৫

বন্য নিরোধক : যারে দেওয়া চইল্যা যা দোহাই সোলমান পেগাম্বর
ডাকক্যা মেলল্যা ঘরে যা। বান-তুফান দূর কর।

উদ্ধৃত: মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী—লোকসাহিত্যে ছড়া পৃ: ৭৯

২. আরণ্য জনপদে, পৃ: ১৮৫-৮৬

বুলবুল, চড়ুই, টিয়া প্রভৃতি পাখি ফলমূল ও পাকা শস্য নষ্ট করে। এগুলি ধানের শত্রু।

(ক) যায় উড়ে যায় ধান নিয়া
চড়াই পাখি বনের টীয়া।

উদ্ধৃত: বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি পৃ: ৭৮

(খ) ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।

ফসল কাটার সময় এদেশে আচার পালন করা হয়। 'আওনি বাওনি' ও 'বাতা ডুগল' আচার দুটি ফসল তোলা উপলক্ষে পালিত হয়। উৎপন্ন ফসলে 'নবান্ন' জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। 'মাগন' উৎসবটি মুসলমান রাখালরা পালন করে থাকে। হিন্দু গৃহস্থরা নতুন ফলমূলে গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়। মুসলমান গৃহস্থরা গাছের প্রথম ফলমূল অথবা বছরের প্রথম ফসল মসজিদে অথবা দরগায় শিরনী দেয়; সাধারণের বিশ্বাস, এতে ফলনে বরকত ধরে।

বাংলার ফসল সংক্রান্ত লোকাচারগুলি অধিকাংশ নারীরা পালন করে প্রাচীন যুগে কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। আদিতে নারীর দ্বারাই কৃষিকাজ আবিষ্কৃত হয়েছিল। রবার্ট ব্রিফল্ট লিখেছেন, The art of cultivation has developed exclusively in the hands of woman.[১] অরণ্যচারী মানবগোষ্ঠীর পুরুষরা করত শিকার, নারী সংগ্রহ করত ফলমূল, লতাপাতা, বীজ। নারীর সংগৃহীত বীজ স্খলিত অথবা পরিত্যক্ত হয়ে এক সময় অঙ্কুরোদগম হয়, চারা বড় হলে ফলন দেখা যায়। মানুষ তখন থেকে কৃষি সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর কলা-কৌশল বিবর্তিত হয়েছে, উন্নত হয়েছে।

আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, নারীর প্রজননশক্তি আর ভূমির উৎপাদন শক্তি এক এবং অভিন্ন। নারীদেহ থেকেই আদি শস্যের উদগম হয়েছে বলেও প্রাচীন বিশ্বাস আছে। হরপ্পার একটি সিলমোহরে নগ্ননারীর যৌনাঙ্গ থেকে লতা গজানোর চিত্র দেখা যায়। এতে নারী ও কৃষি সম্পর্কে আদিম বিশ্বাসের প্রতিফলন রয়েছে।[২] নারী ও কৃষির সম্পর্ক বিবিধ। অনাবৃষ্টির দিনে উত্তর বাংলার রাজবংশী ও কোচের নারীরা বৃষ্টি-দেবতা 'হুদুম' দেবের মূর্তির সামনে নগ্ন হয়ে নাচে।[৩] উত্তর আমেরিকায় ফসলে পোকা ধরলে ঋতুবতী মেয়েরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। ক্ষেতের পোকার প্রতিষেধক হিসেবে ইউরোপের কৃষিসমাজেও এ প্রথার প্রচলন আছে।[৪] নারী ও ভূমি ক্ষেত্রজপ্রধান।

---

১. উদ্ধৃত: প্রাসঙ্গিকী, কল্যাণী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭১, পৃ: ৩
২. লোকায়ত দর্শন, পৃ: ৩৫৭
৩. ঐ, পৃ: ৪১৩
৪. ঐ, পৃ: ৪১২

উভয়ই বীজ ধারণ করে ভ্রূণাঙ্কুরে রূপান্তরিত ও জীবাবয়বে পরিণত করে। প্রচুর ও নিশ্চিত ফলাকাঙ্ক্ষায় বীজবপনের সময় ক্ষেতে কৃষাণ-কৃষাণীর রতিক্রিয়ারও প্রথা আছে। মধ্য আমেরিকার আদিবাসী বীজ রোপণের সময় মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন করে। জাভা দ্বীপের কৃষক নরনারী ধানক্ষেতে মিলিত হয়।[১]

এরূপ জীবনবাদ ও কৃষিতত্ত্বের দিক থেকে চাষের কাজে নারীর ভূমিকা বরাবর চলে আসছে। উদ্ভবকালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য ছিল, পরে পুরুষ এতে নিযুক্ত হলে তার প্রাধান্য লোপ পায়। নারী কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করলেও বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষেত্র ত্যাগ করেনি। লোকসমাজের রক্ষণশীল নারীমানস নানা আচার পালন করে পূর্বসংস্কারকে লালন করে চলেছে। বীজ বপনের ক্ষেত্রে নারীহস্তের স্পর্শ যে অধিক ফলপ্রসূ, এ বিশ্বাস সকল সম্প্রদায়ের কৃষকসমাজে আজও বিদ্যমান। অনুন্নত সমাজের মেয়েরা জমিতে বীজ ছড়ায়, চারা রোপণ করে। পর্দানশীলতার জন্য উচ্চ গৃহস্থ ঘরের মুসলমান মেয়েরা ক্ষেতে যায় না, কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, গৃহের সঞ্চিত বীজ প্রথমবার যখন চাষী ছড়াতে যায় তখন মেয়েরাই ঘর থেকে বের করে দেয়। এতে নারী কর্তৃক বীজ বপনের পূর্ব-সংস্কারই আত্মগোপন করে আছে। এতে গাছ ফলবতী হবে, এ বিশ্বাসই ক্রিয়া করে। সংক্রামক যাদুবিশ্বাস থেকে এরূপ সংস্কারের উদ্ভব।

বেঙ বিয়া

ব্যাঙের সাথে বৃষ্টির অলৌকিক সম্পর্ক আছে কিনা প্রাণিবিজ্ঞান তা সমর্থন করে না, কিন্তু প্রাকৃতমন এ সম্পর্কের উপর বিশ্বাস রাখে। খনার বচনে আছে :

বেঙ ডাকে ঘন ঘন।
শীঘ্র বৃষ্টি হবে জান।[২]

ব্যাঙের ঘন ঘন ডাক বৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত করে। বর্ষাকাল ব্যাঙের আনন্দের ঋতু। বৃষ্টিতে খালবিল, ডোবানালা ভরে গেলে ব্যাঙের চলা-

১. ঐ, পৃ: ৪২৯
২. Quot. from Aspects of Bengali Society, op. cit., p. 232

ফেরার সুবিধা হয়, আহার সংগ্রহের সুযোগ আসে। এ থেকে প্রাচীন লোকমন ধারণা করত, ব্যাঙ হল বৃষ্টির 'এজেন্ট'। বস্তুতঃ দেখা যায়, ব্যাঙের ডাকে বৃষ্টি না নামলেও, বৃষ্টি নামলে ব্যাঙ ডাকেই।

আদিম সমাজে কোন কোন প্রাণীকে বৃষ্টির প্রভু অথবা প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করা হত। সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণী এ পর্যায়ে পড়ে। উত্তর ভারতে সাপকে মেঘের দেবতা কল্পনা করা হয়। তার প্রতিমূর্তিতে পানি ঢেলে বৃষ্টি কামনা করা হয়। পাথরের গায়ে পানি ঢেলেও বৃষ্টি আবাহনের রীতি আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।[১] পেরু দেশে ব্যাঙকে জলদেবতার স্ত্রী বলে গণ্য করা হয়। শস্য-উৎসবকালে তারা শস্যমূর্তির কাছে অন্যান্য খাদ্যের সাথে একটি সিদ্ধ ব্যাঙ নৈবেদ্য দেয়।[২] ভারতের মাদ্রাজে প্রায় অনুরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার আছে। রেড্ডীর কৃষক মেয়েরা বাঁশের শাখায় ব্যাঙ বেঁধে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে যায় এবং গান করে বলে: স্ত্রী ব্যাঙ স্নান করবে, হে বৃষ্টিদেবতা তাকে একটু পানি দাও। গৃহস্থরা তখন ব্যাঙের গায়ে পানি ঢেলে দেয়।[৩] ওরিনোকো প্রদেশের ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙকে জল দেবতার স্ত্রী নয়, স্বয়ং জলদেবতা জ্ঞান করে এবং বৃষ্টির কামনায় তাকে পাত্রে রেখে প্রহার করে।[৪]

ব্যাঙ সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার লোকমনে আচারের জন্ম দিয়েছে। বৃষ্টি কামনায় 'বেঙ বিয়া' এরূপ একটি লৌকিক অনুষ্ঠান। গ্রীষ্মকালে দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে গৃহস্থ মেয়েরা দুটো ব্যাঙ ধরে পানিভর্তি গর্তে রেখে কাল্পনিক বিয়ে দিয়ে সমস্বরে ছড়া বলে। ছড়ায় ব্যাঙের কাছে প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির আবেদন জানান হয়।[৫] রাজশাহী

১. SDFML, Vol. 11, P. 921

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত, পৃঃ ২১

৩. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৪

৪. ঐ, পৃঃ ৬৩

৫. (ক) বেঙ্গী ছেড়ীর বিয়া
সোনার লাড়ুম দিয়া
বেঙ্গীলো মেঘ নামাইয়া দে।

মন্নের বউএর দাঁত খোঁটা,
মেঘ পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
এক ছিটা পানি দেও ঘরে ভিজ্যা যাই।

জেলায় প্রচলিত ব্যাঙ বিয়ার বর্ণনায় মোহাম্মদ আবদুল হাফিয লিখেছেন, "দুটি কোলা ব্যাঙকে সাজ-সজ্জা পরিয়ে নাকে নোলক দেওয়া হয়। সন্ধ্যা হলে গাঁয়ের মেয়েরা কলসীতে পানি ভর্তি করে মাঠে যায়। মাঠে মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে নাচে। বর্ষীয়সী মেয়েরা মাটিতে কলসীর পানি ঢেলে দেয় ও মাটি কর্দমাক্ত করে। পরে ব্যাঙ দুটোকে কলা গাছের খোসার বাক্সে করে পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়।"[১]

বেঙ বিয়া আচারটি প্রকার ভেদে 'ব্যাঙ কুটা' নামেও বাংলার অন্যত্র প্রচলিত আছে। রাজশাহী-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ব্যাঙ কুটা অনুষ্ঠানে ছেলেরা অংশ গ্রহণ করে। তারা ব্যাঙ ধরে গর্তে পুঁতে তার উপর পানি ঢেলে দেয়। এতে মেঘ দয়াপরবশ হয়ে মাটিতে নেমে আসে, এই বিশ্বাস। আচারটি পুরোপুরি যাদুবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।

ব্যাঙ ও বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বাংলার বাইরে এরূপ লোকাচারের সন্ধান পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে মহিলারা ঝাঁঝরের নীচে ব্যাঙ চেপে রেখে তার উপর পানি ঢেলে বৃষ্টির গান গায়। এরূপ করলে মুষলধারে বৃষ্টি হবে বলে তাদের বিশ্বাস।[২] এতে বৃষ্টির নকল করা হয়। নকল তুলে কামনা সফল করার চেষ্টা যাদুবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। আইমারা ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙ মেরে ফেলে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে বৃষ্টি আবাহন উৎসব পালন করে। একটা পাত্রের পানিতে অনেকগুলি ব্যাঙ ও

চাচা মিয়া কান্দন করে ক্ষেতের আইলে বইয়া। বেঙ্গীলো মেঘ নামাইয়া দে।
ক্ষেত খলা বিরান অইল পানি না পাইয়া। —ময়মনসিংহ
উদ্ধৃত : লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃঃ ১৭১-৭২

(খ) বেঙের ঝির বিয়া গো,
গিবস্থের অলদী দিয়া।
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেয়্যা॥
বেঙের ঝির বিয়া গো,
আফন মেন্দীর পাতা দিয়্যা।
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেয়্যা॥
দিনে হাজ করেছে রে
আইর্‌য়া কোণা দিয়্যা।
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেয়্যা॥
হগল মেঘ চাইল্যা দিলাম
বুর জমিন দিয়া।
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেয়্যা॥
এক ছিডা মেঘের লাইগ্যা
গিরছ মরে কাইন্দা।
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেয়্যা॥
উদ্ধৃত : বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৬৭

১. মোহাম্মদ আবদুল হাফিয—যাদুবিদ্যার দিগদিগন্ত, সাহিত্যিকী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫৪-৫৫
২. SDFML, Vol. 11, P. 921

জলজগাছ ভর্তি করে একজন ওঝার সঙ্গে লোকে দল বেঁধে সূর্যদেবতার বেদিতে যায়। সূর্যের তাপে পানি শুকিয়ে গেলে ব্যাঙ জলের অভাবে চীৎকার করে। তাদের বিশ্বাস, ব্যাঙের প্রতি দেবতা দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি পাঠাবে।[১]

পুতলা বিয়া

পুতলা বিয়া (পুতুল বিয়ে) অনুষ্ঠানটি পূর্ব ময়মনসিংহে কৃষক সমাজে প্রচলিত। কাল, উপলক্ষ, পদ্ধতির দিক থেকে বেঙ বিয়া ও পুতলা বিয়া অভিন্নপ্রায় অনুষ্ঠান। ব্যাঙের স্থলে জোড় পুতুলের কাল্পনিক বিবাহের আয়োজন করে গীতাদি সহকারে আচারটি পালন করা হয়। আকাশের বৃষ্টি আবাহনই এর উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে মাগন, শিরনী প্রভৃতি গ্রাম্য আচার যুক্ত হয়ে আছে। পুতুল বিয়ের আচারটি নিম্নরূপ :

"গ্রামের মেয়েরা কোন এক বাড়ীর চাতালে পুকুরের ন্যায় ছোট একটি গর্ত করে সেই গর্তের চতুষ্পার্শ্বে চুণ ও হলুদের ফোটায় চিত্রিত ও জল পূর্ণ করিয়া দুইটি পুতুল সেই গর্তের জলে রাখিয়া দেয়। অতপর একদল কিশোরী একটি কুলায় ধান, দূর্বা ও একটি জলপূর্ণ বদনাসহ গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে সমস্বরে পুতুল বিয়ের গীত গাহিয়া চাল, ডাল মাগন করে। মাগন শেষে ঐ গর্তের পার্শ্বে মাগিত চাল, ডাল রন্ধন করিয়া সকলে মিলিয়া খায়।"[২] ব্যাঙ-বৃষ্টির অলৌকিক সম্পর্ক না থাকলেও একটা নৈসর্গিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু পুতুল-বৃষ্টির সম্পর্কসূত্র দুর্ণিরীক্ষ্য। অবশ্য পানিতে পুতুল ভিজানোর মধ্যে নকল তোলার চেষ্টা আছে। মাগনের গীতে বৃষ্টির কামনা অভিব্যক্ত। বৃষ্টির অভাবে 'পুতুল বধূ'র ব্যবহারিক জীবনের দুর্ভোগের চিত্র আঁকা হয়েছে।[৩] এতে

১. Ibid., pp. 921-22

২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৩

৩. পুতলারে যাইবে পরের ঘর
ভাডীর দেশত মেঘ নাই
গোছল করবার পানি নাই
পুতলারে যাইবে পরের ঘর ।।
ভাডীর দেশত মেঘ নাই,
বাম্নুন ধুইবার পানি নাই।
পুতলারে যাইবে পরের ঘর ।।
ভাডীর দেশত মেঘ নাই,
বোর ক্ষেতের আশা নাই,
পুতলারে যাইবে পরের ঘর ।।
—ময়মনসিংহ

উদ্ধৃত : ঐ।

গ্রাম্যবধূর বাস্তব জীবনের ছায়াপাত আছে। পানির অভাবে গোসল করা, বাসন ধোয়ার অসুবিধা আর বোরধান, টোপাধান না পাওয়ার দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মাফার 'মাইঝে ভিইজ্যা' পুতুলের পরের ঘরে যাওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে অন্য একটি গীতে।[১] এতেও বৃষ্টিকে সফল হতে দেখার কামনা আছে। শুধু বৃষ্টি কামনায় নয়, বৃষ্টি বারণেও পুতুল নিয়ে আচার পালনের রীতি চট্টগ্রাম জেলায় দেখা যায়। প্রথাটি এরূপ : একটা মাটির সানকিতে দুটি পুতুল রাখা হয়। এর একটি হল বৃষ্টির দেবতা অপরটি তার শাশুড়ী। বাড়ির উঠানে গর্ত করে একটি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় পুতুলসহ সানকি গর্তে রেখে দেয়। এরপর ছড়া বলে। বৃষ্টি না থামলে শাশুড়ী-জামাই-এর স্পর্শদোষ ঘটাবে, ছড়ায় এরূপ ভয় দেখান হয়। এখানে ট্যাবুর প্রভাব আছে। শাশুড়ীকে স্পর্শ করা জামাই-এর পক্ষে অপরাধজনক— এটাই ট্যাবু।[২] স্ত্রীর মাতাকে গুরুজনবোধে মান্য করা নারীপ্রধান তথা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ। এতে প্রকারান্তরে স্ত্রীর সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া তথা নারীর প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। বৃষ্টি অথবা ফসলকে কেন্দ্র করে পুতুলের কল্পনা অন্যত্র দেখা যায়। ইউরোপে গাছের প্রতীক হিসেবে পাতায় জড়ান পুতুলের উপর পানি ঢেলে বৃষ্টি আবাহন করা হয়।[৩] কোন অঞ্চলে ফসল তোলার সময় ক্ষেতের শেষ আঁটি দিয়ে পুতুল তৈরি করে শস্যের দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। ইউরোপে এটি 'corn doll' বা 'harvest doll' নামে পরিচিত।[৪] হিন্দুসমাজে 'ধানের ছড়' (যাকে 'লক্ষ্মীর ছড়' বলা হয়) ধান ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে গৃহে যত্নের সাথে রাখা হয়।

---

১. দেশে আইল আওলি বাওলি,
আশমান আইল হাইজ্যা,
পরের ঘরে যায়গো পুতলা,
মাফাব মাইঝে ভিইজ্যা।
পুতলা যাইরে পরের ঘর।
—ঐ

উদ্ধৃত : লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০

২. Saratchandra Mitra & R. K. Bhattacharya—On some Rain-Compelling & Rain-Stopping Rites from the District of Chittagong, Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. XIII, 1924-1927, pp. 342-55

৩. SDFML. Vol. II, p. 921

৪. Ibid. p., 921

বদনা বিয়া

চৈত্র-বৈশাখের খরায় পানির অভাবে যখন মাঠ ঘাট ধু ধু করে তখন পল্লীর মেয়েরা বৃষ্টির কামনায় বদনা বিয়া আচারটি পালন করে। কবি জসীমউদ্দীনের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচটি মেয়ে মাথায় কুলা নিয়ে পাড়ার বাড়ি বাড়ি যায় এবং মেঘারানীর ছড়া বলে মাগন করে। কুলায় তেল-হলুদ এবং পানিভরা বদনা থাকে। গৃহস্থরা তাদের চাল, ডাল, নুন অথবা পয়সা দেয়। বদনা বিয়ার ছড়ায় মেঘকে আবাহন করার কামনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।
ঘরের নাঙ্গল ঘরে রইল হাইলা চাষা রইদি মইল,
দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে চলিয়া পড়।[১] —ফরিদপুর

চট্টগ্রামে হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনুরূপ আচারের কথা বলেছেন শরৎচন্দ্র মিত্র। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বৃষ্টির কামনায় একটি ছোট নগ্ন বালিকা মাথায় কলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগন করতে বের হয়। কুলায় থাকে আম পাতাসহ পানিভর্তি একটি পিতলের বদনা। ছড়া বলতে বলতে বালিকাটি গৃহে উপস্থিত হলে মেয়েরা তার মাথায় পানি ঢেলে দেয়। পানি কুলা থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে।[২] বস্তুতঃ এতে বৃষ্টি ঝরার অনুকরণ আছে। মিত্র মহাশয় এরূপ আচারকে imitative or mimatic magic-এর প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ হর্নের মতে, এরূপ আচার homeopathic magic-এব দৃষ্টান্ত।[৩]

লক্ষণীয় যে, বৃষ্টি আবাহনমূলক বেঙ বিয়া, পুতলা বিয়া ও বদনা বিয়া আচারের নামকরণে বিবাহ শব্দটি যুক্ত হয়েছে। বৃষ্টি কামনা ভাল ফসলের জন্যই, ভূমির শস্যোৎপাদন এবং নারীর সন্তানোৎপাদন সমপ্রক্রিয়ার বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই নরনারীর মিলন হয়। আদিম সমাজে চাষাবাদে নানাভাবে

---

১. উদ্ধৃত : নকসী কাঁথার মাঠ, পৃঃ ১৫-১৬
২. op. cit., JAS, Bom., Vol. XIII, pp. 342-55
৩. Saratchandra Mitra— On the Silaris or Hiralis of Eastern Bengal, JDL, Vol. XV, 1927, p. 12

নারীর ভূমিকা জড়িয়ে আছে। নারীর নগ্ননৃত্য, নরনারীর বিবাহ, নরনারীর রতিক্রিয়া ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিয়েতে নারীকে দিয়ে গাছ লাগান অথবা বরকে দিয়ে নকল চাষ করানোর প্রথা আছে দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের মধ্যে।[১] ভাল বৃষ্টি মানেই ভাল ফসল। সুতরাং বৃষ্টি এবং ফসল সমতুল্য। বৃষ্টি আবাহনে বিবাহ শব্দ সে-সূত্রেই যুক্ত হয়েছে। পূর্বে নরনারীর বিয়ে পরবর্তীকালে ব্যাঙ, পুতুল, বদনা প্রভৃতি প্রতীক বিয়েতে রূপান্তরিত হতে পাবে।

মেঘারানী

বেঙ বিয়ার মত মেঘারানী বৃষ্টি আবাহনমূলক অনুষ্ঠান। এখানে স্বয়ং মেঘকে সম্বোধন করে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব হলে গৃহস্থ রমণীবা এটি পালন করে। এর তিনটি অংশ— ছড়া, নাচ ও আচার। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মেঘারানীর আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করে লিখেছেন, "পাড়ার মেয়েরা একত্র জড় হইয়া একজন বুড়ী সাজে। মেয়েরা নূপুর পরিয়া লয়। বুড়ী তাহার মাথায় বড় একটি কুলা নেয়, কুলাটিতে নানা আলপনা আঁকা থাকে। কুলাতে কচুরিপানা রাখিয়া তাহার উপর মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বর্ষা পাগলিনীরা দলবল লইয়া ঘুরিয়া বাড়ী বাড়ী বেড়ায়। আগাইয়া আসেন বাড়ীর মেয়েরা। অনেকে একসঙ্গে উলু দিয়া উঠেন। তারপর বালতি ভরতি জল আনিয়া ঢালিয়া দেন বুড়ীর মাথায় কুলার মধ্যে। সঙ্গিনীরা বুড়ীকে ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছড়া গায়।"[২] বর্ণনাটি হিন্দুসমাজের আচারকে সূচিত করে। মুসলমান সমাজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুলা মাথায় করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছড়া আবৃত্তি করে। গৃহস্থরা কুলার উপর পানি ঢেলে দেয়। মেঘারানীর উদ্দেশ্যে রচিত ছড়ায় বৃষ্টির আবেদন প্রত্যক্ষ :

হ্যাদে লো বুন ম্যাঘারানী
হাত পাও ধুইয়্যা ফ্যালাও পানি।
ছোট ভুঁইতে চিন'চিনানি,
বড় ভুঁইতে হাটু পানি।

১. রাঢ়ের সংস্কৃতি. পৃঃ ১৬
২. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫-৪৬

ম্যাঘারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি নামলো ঝাঁকে ঝাঁকে।[১]
—ফরিদপুর

আবদুস সাত্তার 'কাদামাটি' নামে একটি গ্রাম্য খেলার উল্লেখ করেছেন, যার অন্তর্নিহিত মর্ম বৃষ্টিকে আহ্বান করা। এতে ছেলেরা অংশ নেয়। তারা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ও ছড়া বলে। তাদের কাছে কুলা বা অন্য কোন বস্তু থাকে না। বাড়ির গৃহস্থরা তাদের মাথায় পানি ঢেলে দিলে ছেলেরা উঠানে ভিজা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তাঁর মতে, এটি ঢাকা জেলায় প্রচলিত।[২] একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ হানিফ পাঠান অনুরূপ আচারকে 'মেঘমাগা' বলেছেন। তাঁর মতে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেধে বাড়ি বাড়ি যায় ও ছড়া বলে। এদের একজনের মাথায় কুলাতে জীবন্ত ব্যাঙ, আমপাতা ইত্যাদি থাকে। গৃহস্থরা কুলাতে পানি ঢেলে দেয় এবং ছেলেমেয়েদের চাল-ডাল উপহার দেয়।[৩] মেঘারানী অনুষ্ঠানে উপচারসহ কুলা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুলার গুরুত্ব থেকে এটি 'মেঘারানীর কুলা নামানো' নামেও পরিচিত।[৪]

মেঘারানী বা কাদামাটি খেলার একই উৎসমূল— যাদুবিশ্বাস। প্রত্যক্ষভাবে নকল তুলে আসল কামনা সফল করার চেষ্টায় আচারটি জন্ম নিয়েছে।

বেঙ বিয়া ও মেঘারানী অনুষ্ঠানদ্বয় বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে প্রচলিত। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ছড়াগুলি প্রায় সব জেলাতেই পাওয়া যায়। সবচেয়ে অর্থঘন, আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যবাহী বাঙালীর হৃদয় রসসিক্ত ছড়াটি এরূপ :

কালো মেঘা নামো নামো ফুল তোলা মেঘা নামো,
ধুলট মেঘা তুলট মেঘা তোমরা সবাই নামো।

---

১. ঐ, ৬৪৬
২. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ৬৭
৩. মোহাম্মদ হানিফ পাঠান—গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের গান ও ছড়া, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৪
৪. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৫

কালো মেঘা টলমল. বার মেঘার ভাই,
আরো ফুটিক জল দিলে চীনার ভাত খাই।
কালো মেঘা নামো নামো চোখে কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘার গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।[১]

—ফরিদপুর

সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বেঁচে থাকার আবেদন বিভিন্ন প্রকার মেঘের কাছে—হৃদয়ের গোপনতম বাসনাটি প্রাণের ভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

রাজশাহী জেলায় মেঘারানীর স্থলে 'মইথ্যারানী' নামটি প্রচলিত। মেঘারানীর ছড়ার সাথে মইথ্যারানীর ছড়ার আত্মিক মিল আছে:

হো হো হো মইথ্যারানী
ধানের ভুঁয়ে নাইকো পানি
কাঁথা ধুইতে নাইকো পানি।
হো হো হো মইথ্যারানী।[২]

—রাজশাহী

এখানে বিভিন্ন প্রকার মেঘের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আকুল আবেদন জানান হয়েছে। সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ আবেদন। প্রকৃতিনির্ভর কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষের আবেদন তা।

হুদুমা দেয়া

রংপুর জেলায় হুদুমা দেয়া হল মেঘের দেবতা। চৈত্র-বৈশাখের সময় খরা দেখা দিলে গ্রামের মেয়েরা একত্র হয়ে বাড়ি বাড়ি চাল ডাল মাগন করে। মেয়েদের মধ্যে একজন হয় রাজা অপরজন রানী। রাজারানীর মাথায় একজন ছেঁড়া ছাতা বা মাথাল ধরে থাকে। অপর একজন ভাঙা টিন বাজায়। এ হল মাগন যাত্রার দৃশ্য। মাগনের সময় তারা হুদুম দেয়ার গীত গায় ও নৃত্য করে। গীতের ভাষা ও নৃত্যের

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৬
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ: ১৫৫

ভঙ্গী অশ্লীল।[১] এমন অশ্লীল যে বাড়ি থেকে পুরুষদের বেরিয়ে যেতে হয়।[২] বর্ষণ, কর্ষণ, ফলন ইত্যাদি ব্যাপারে নারীর নগ্নতা বা অশ্লীলতার সম্পর্ক আদিম চেতনা প্রসূত, আমরা পূর্বে তা লক্ষ্য করেছি। হুদুম দেয়ার আচারে সেই মানসিকতা ক্রিয়া করেছে। গীতের ভাষায় বৃষ্টির কামনা স্পষ্ট :

কালা ম্যাঘোক পুজো মাও মুঁই
কালা কইতর দিয়া।
ধওলা ম্যাঘোক পুজো মাও মুঁই
ধূপ সেন্দুর দিয়া।
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া॥
তোমার নর লোক মরেছে ম্যাঘোরাজ
জল জল বুলিয়া
এক আড়া জল দে ম্যাঘোরাজ
পিরথিমী ছিটিয়া।
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া॥[৩]
-রংপুর

অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য হুদুমদেওকে প্রসন্ন করে আচার-নৃত্য পালনের প্রথাটি উত্তরবঙ্গের কোচ কৃষক রমণীদের মধ্যে চালু আছে বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪] শরৎচন্দ্র মিত্র জলপাইগুড়ি

---

১. (ক) ছিলছিলায়ছে কমরটা মোর
শিরশিরায়ছে গাও,
কোন্ঠে কিনা গেইলে এলা
হুদুমার দ্যাখা পাও॥
পাটানী খান পড়েছে খসিয়া
আইসেক রে হুদুম দেওয়া
তোর বাদে মুই আছু বসিয়া॥
উদ্ধৃত : লোকসাহিত্য, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭
(খ) হুদমার বড় সাত ভাই
কারো চাটাত পানি নাই।
হুদমা নিলে নাংগল জোংগাল
হুদমী নিলে মই।
দোলা বাড়ী যায়া হুদমা
চিত্তর হইয়া পইল।
উদ্ধৃত : পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ. ২য় সংখ্যা, ১৫৪

২. অনুষ্ঠানের বিবরণটি বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুরের কাছ থেকে গৃহীত।

৩. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ: ১৫৩

৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, প: ৭২৮

জেলায় রাজবংশীদের মধ্যে 'হুতুম দেও'কে কেন্দ্র করে নাচ ও আচার পালনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, বৃষ্টির কামনায় মেয়েরা গভীর রাত্রে দল বেঁধে ক্ষেতে যায় এবং হুদুম দেবের মাটির মূর্তির চারপাশে ঘুরে নগ্ন হয়ে নৃত্য করে। তিনি বলেছেন, হুদুমদেও নগ্নতাকে ভয় করে।[১] নগ্নতাব বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ভয়ের নয়, যৌনমিলন ও উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত। চাষাবাদে উর্বরতা ও উৎপাদন সম্পর্কে নগ্নতার উল্লেখ বিশ্বের আদিম সমাজে প্রায় সর্বত্র আছে।

বসুধারা ব্রত

হিন্দু নারীসমাজে বসুধারা ব্রতের প্রচলন আছে। বৃষ্টি-কামনা এ ব্রত পালনের উদ্দেশ্য। অন্যান্য বৃষ্টি আবাহন অনুষ্ঠানের মত বসুধারা ব্রতেও প্রাকৃতিক ক্রিয়ার লৌকিক নকল তোলা হয়। ফসলের প্রতীক গাছের ডালের আলপনা এঁকে তার মাথায় পানি চেলে মেঘের অনুরূপ বর্ষণ প্রত্যাশ্যা করা হয়। বৃষ্টি আবাহন মূলক অনুষ্ঠানগুলি গ্রাম্য ছেলেমেয়ে ও গৃহস্থ নারীরা পালন করে থাকে।

বসুধারা ব্রতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের নদী-নালা ও খাল-বিলের জল যখন শুকাইয়া আসে, তখন বৃষ্টি কামনা করিয়া আঙ্গিনার এক কোণে তিনটি গাছের আলপনা আঁকিতে হয়। একটি মাটির ঘট ফুটা করিয়া গাছের মাথায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির অনুকরণ করিয়া মেয়েরা বসুধাকে বারিধারায় সিঞ্চিত করে এবং বৃষ্টির জন্য মিনতি জানায়।"[২]

ব্রতকথার মধ্যে মিনতির স্বর আছে।[৩] অনাবৃষ্টির ভয়াবহ আশঙ্কায় নারীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা 'গঙ্গার ধারা'য় বারিবর্ষণ। মেঘারানীতে মেঘদেবতার কাছে বৃষ্টির কামনা, বসুধারা ব্রতে ধরিত্রীদেবীকে পরিসিক্ত করার কামনা আছে। আচারের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। ধরিত্রী শস্যোদপাদিকা শক্তি ধারণ করে। বারিসিক্ত হলে উর্বরা ধরিত্রী শস্যসম্ভবা হয়ে উঠে।

১. op. cit., JDL, Vol. XV, p. 13
২. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭
৩. বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে
মায়ের কূলে ফুল বাপের কূলে ফল ;
শ্বশুরের কূলে তারা
তিন কূলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা,
উদ্ধৃত : ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৮

বাটি পোঁতা

বাটি পোঁতা বৃষ্টি নিবারক আচার। শঙ্কর সেনগুপ্ত আচার সম্পর্কে লিখেছেন, "এক মেয়ের মাকে খুঁজে বের করা হয়। এক মেয়ের মা আঁটকুড়ি, সে বাটি পুঁতলে বৃষ্টি হবে না।...সন্তানহীনা হিন্দু বিধবা অনেক স্থানে বর্ষা থামাবার জন্য গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে একটি ঘটি লুকিয়ে রাখে।[১] বাটি পোঁতার সময় অনুষ্ঠানমূলক ছড়া কাটা হয়।[২] বাটি বা ঘটি পোঁতার সাথে বৃষ্টিরোধের কি সম্পর্ক আছে তা স্থির করে বলা যায় না। গাঁ-ঘরে এখনও দেখা যায়, বৃষ্টিপাতের সময় বাড়ির উঠানে কাঁসার ঘটি-বাটি থাকলে তা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলা হয়। এগুলি না তুললে 'বিজলী' পড়ে। কাঁসা বা অন্য ধাতু নির্মিত পাত্রে বজ্র পড়ার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কেননা এগুলি উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ। বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতও হয়। সুতরাং বজ্রপাত বন্ধ করতে পারলে বৃষ্টিরোধ সম্ভবপর হয়। বাটি পোঁতা আচারে এরূপ একটা ধারণা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এ ধারণা অমূলক নয়। ঘটি-বাটি বদনা-কলসিতে বৃষ্টির পানি ধরা হয়। বাটি বা ঘটি পুঁতে এর বিপরীতটা বোঝান হয়। এতে বিপরীত যাদুবিদ্যার (opposite magic) প্রভাব থাকতে পারে। যশোহরে একটি ছড়ায় আছে—'কলাবাগানে বুচা ভাঁড়, দেয়া ঠাকুর খসে পড়।'[৩] কলাবাগানে ভাঁড় উন্মুক্ত রেখে বৃষ্টি কামনা করা হয়েছে। পুঁতে রাখলে বিপরীতটাই কামনা করা হবে। এতে লৌকিকতার দিকটি আছে আচার পালনকারিণীর নির্বাচনে। সন্তানহীনা হিন্দু বিধবা প্রসববতী হতে পারে না, অতএব সে আঁটকুড়ি। এক মেয়ের মাও আঁটকুড়ি সদৃশা, সে কাকবন্ধ্যা। বিধবা, বন্ধ্যা, আঁটকুড়ি নারী অশুভ বিবেচনায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে থাকে। তারা ট্যাবু

১. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৭১-৭২

২. এক পয়সার জলদি.
বৃষ্টি থাম জলদি।
জলদি দিমু বাইট্যা,
রইদ ওঠ ফাইট্যা।
বুড়ি লো বুড়ি বকুলতলায় যাবি।
সাত খান কাপড় পাবি।
সাত বউরে দিবি।
নিজে পিনবি তান্যার খোট।
চমচমাইয়া রইদ ওঠ।

উদ্ধৃত: ঐ, প: ৩৭১

৩. উদ্ধৃত: যশোর-খুলনার ছড়া, পৃঃ ৮৬

রূপে পরিগণিত হয়। বৃষ্টিরোধক আচার কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের (black magic) বিষয়। অশুভ, অশুচি, অশিষ্ট বিষয় দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রজালিক আচার অনুষ্ঠিত হয়। আঁটকুড়ি নারীর আচরণে মেঘদেবতা ক্ষুণ্ন হয়ে বৃষ্টিপাত বন্ধ করবেন—এরূপ ধারণা থেকেই এ আচারটি উদ্ভাবিত ও উদ্‌যাপিত হয়ে থাকতে পারে। এ আচার খুব প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে আচারটির চল আছে বলে ডঃ অমলেন্দু উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পিতামাতার এক সন্তান, কোন স্ত্রীলোক অতিবৃষ্টি দমনের উদ্দেশ্যে উলঙ্গ হয়ে উঠানে একটি বাটি পুঁতে দেয়।"[১]

হলপ্রবাহ

হল প্রবাহ বা হলকর্ষণ বছরের প্রথম চাষের অনুষ্ঠান। আসন্ন মৌসুমের জন্য পূর্বাহ্নেই ভূমি চাষ করতে হয়, তাতে আগাছাদি দূর হয় এবং বৃষ্টির পানিতে মাটি সরস হয়। হলপ্রবাহ প্রধানতঃ ভূমিকে উর্বর ও ফলবতী করার অনুষ্ঠান যা fertility cult এর অন্তর্ভুক্ত। বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন গ্রামের লোকে মাঠে জমা হয়; তারা এক জোড়া আনাড়ি ষাঁড়ের গলায় নতুন ফলাযুক্ত লাঙল জুড়ে ছেড়ে দেয়। জনতার তাড়া খেয়ে ষাঁড় দুটি লেজ তুলে দৌড় দেয়— অনভ্যস্ততার কারণে এ দৌড় হয় এলোপাথাড়ি। ষাঁড় দৌড় দিয়ে যতগুলি ক্ষেত স্পর্শ করে, আসন্ন মৌসুমে সেগুলিতে ভাল ফসল হবে এটাই লৌকিক বিশ্বাস। গ্রামবাসী ষাঁড় তাড়ায় ও দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে বৃষ্টির জন্য। ছিটেফোঁটা হলেও সেদিন বৃষ্টি নামবে; বৃষ্টি হলে শুভ মনে করা হয়, অন্যথায় তা অশুভসূচক হয়।[২] সুতরাং হলকর্ষণে আছে হালচাষের নকল ও বৃষ্টির কামনা। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে 'চাষের পালা'য় এ অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।[৩]

১. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৭
২. হলপ্রবাহের বর্ণনাটি হাসান আজিজুল হকের সম্প্রতি প্রকাশিত 'জীবন ঘষে আগুন' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের উক্ত নামের গল্পটি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: হাসান আজিজুল হক—জীবন ঘষে আগুন, ঢাকা, ১৯৭৩
৩. op. cit., Aspects of Bengali Society, p. 229.

তুষ ছিটান

তুষ ছিটান বীজবপনের লোকাচার। রাজশাহী জেলায় মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এর প্রচলন আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জনৈক প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে লিখেছেন, "একবার ধান বুনবার সময় কর্তা এক ডালি তুষ মাথায় নিয়ে আগে আগে যে ধানের বীজ নিয়ে যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে তুষ ছিটিয়ে যাবার জন্য বলেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,…ঐ পথ দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে আসবে।"[১] লক্ষ্মী ফসলের তথা সম্পদের দেবী। মুসলমানরা প্রাচুর্য অর্থে লক্ষ্মী শব্দের ব্যবহার করে থাকে। উক্ত আচার দ্বারা কৃষক অধিক ফসল কামনা করে।

তুষের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্পর্ক কী? বাংলার হিন্দু রমণীরা 'তুষলীব্রত' পালন করে, যার উদ্দেশ্য সম্পদ কামনা করা।

তোষলা, তোষ-তোষলা, তোষলা গো রাই।
তোমার দৌলতে আমরা দু'বড়ি পিঠা খাই ।।[২]

এখানে লৌকিক তোষলাদেবী পৌরাণিক লক্ষ্মীদেবীর সহিত অভিন্না। তুষলীব্রতের আচারে তুষ একটি উপচার। এর আচার-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তুষ-তুষলীব্রতে গোবরের সঙ্গে নতুন ধানের তুষ মিশাইয়া নাড়ু প্রস্তুত করিতে হয়, নাড়ুর সংখ্যা ১৪৪ পর্যন্ত হইতে পারে। তারপর সেই নাড়ুর মাথায় এক একটি দূর্বা গুঁজিয়া দিতে হয়। সুতরাং ইহাতে ধরিত্রীর শস্যোৎপাদিকা শক্তিরই উদ্বোধন করা হইয়া থাকে বলিয়া মনে হইতে পারে।"[৩]

তুষলীব্রতাচারে গোবরে নতুন ধানের তুষ মিশিয়ে যে দেবীর সন্তোষ বিধানের আয়োজন, তুষ ছিটান লোকাচারে বীজবপনের সময় পথে তুষ ছড়িয়ে সেই দেবীর আবাহন দ্বারা ক্ষেত্রোন্মোচন করা হয়।

---

১. আবুল কাছির কেশরী—আমাদের দেশের কতিপয় কুসংস্কার, পূর্বদেশ, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৭

২. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৪

৩. ঐ, পৃ: ৫৮২

কুলানি

বর্ষাকালে রাজশালী ধানের 'জালা' বা চারা রোপণের আনুষ্ঠানিকতাকে 'কুলানি' বলে। সন্দীপে এটির চল আছে।[১] গৃহস্থ গ্রামের লোকজন ডেকে চারা রোপণ করতে ক্ষেতে যায়। তারা চারা রোপণ করে এবং সারিগান গায়। এ কাজে কোন পারিশ্রমিক নেই, তবে পারিতোষিক আছে, সেটি হয় ভুরিভোজনে। 'ছাইন্যা পিঠা' এর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ভাত ও অন্য মিষ্টান্নও থাকে। এর সবটুকু মিলিয়ে কুলানি অনুষ্ঠান। খুব উৎসাহ ও আমোদের মধ্যে এটি প্রতিপালিত হয়। এটি একটি বারোয়ারি কাজ। বারোয়ারি ও বেগার কাজে গোষ্ঠী সমাজের বৈশিষ্ট্য আছে।

ক্ষেত বন্ধন

বীজ রোপণ করে কৃষক মন্ত্র পড়ে ক্ষেত বন্ধন করে। লোকের কুদৃষ্টি (evil eye) পড়ে ক্ষেত নষ্ট হতে পারে। মন্ত্রবলেও এক ক্ষেতের ফসল অন্য ক্ষেতে চালান দেওয়া যায়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'কাড়ান করা' বলে।[২] কুদৃষ্টি ও মন্ত্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ক্ষেত বন্ধনের রীতি আছে। চারা রোপণ শেষ হয়ে গেলে কৃষক হাত ধুয়ে ক্ষেতের চারপাশে পানি ছিটিয়ে দেয় আর নিম্নের ছড়া বলে :

জিও জালা, জিও।
হাত ধুইয়া দিলাম পানি।
ধান অইছ পোড়া খানি।

আমার ক্ষেত দেখখ্যা যে নজর লাগায়
তার মা-পুলা ভাতে মারা যায়।[৩]

ছড়ার ভাষা প্রত্যক্ষ ও উদ্দেশ্যধর্মী। এতে দেবদেবীর দোহাই নেই, মা ও ছেলের দোহাই দেওয়া হয়েছে। মুসলমান কৃষক এ ছড়ার ধারক বলে এরূপটি হয়েছে।

---

১. রাঢ়ের সংস্কৃতি।
২. মুর্শিদাবাদে 'কাড়ান' শব্দের প্রচলন আছে। নিজস্ব সংগ্রহ।
৩. উদ্ধৃত : লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃ: ১৩৭

সাধ দেওয়া

গর্ভবতী নারীর মত ফলবতী শস্যকে সাধ দেওয়ার রীতি আছে। ঋতুবতী নারী, শস্যবতী ক্ষেত বা ফলবতী বৃক্ষ প্রজনন বা উৎপাদনের দিক দিয়ে অভিন্ন। ভাল ফসলের কামনায় গৃহস্থরা শস্যসম্ভবা ক্ষেতকে সাধ দেয়। বাংলাদেশে ধান প্রধান ফসল। আশ্বিন-কার্তিক মাসে আমন ধান ফলে। বর্ষাকালে ধানরোপণ শেষ হয়ে যায়। ভাদ্র-আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিক মাসে ধানের 'গর্ভ' বসে অর্থাৎ শিষ দেখা দেয়, অগ্রহায়ণে ছড়া বাঁধে।[১] অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাটা হয়।

আচার সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থেরা আমপাতায় সুগন্ধি মসলা মাখাইয়া ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে তাহা পাকাটির মাথায় করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসে।"[২] 'গুমা দেওয়া' আচারের প্রায় একই বর্ণনা দিয়েছেন কামিনীকুমার রায়। তাঁর ভাষায়, "ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্‌গম হইলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থরা গন্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষ্মীকে অভিনন্দিত করে।"[৩] ধান গাছকে সাধ দেওয়া উপলক্ষে ডঃ অমলেন্দু মিত্র 'গার্সেব্রত' বা 'নল সংক্রান্তি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আশ্বিন সংক্রান্তিতে মেয়েরা ধান মাঠে গিয়ে পূজা করে। এদিন ধান ক্ষেতে একটি শর অথবা নলকাঠি পোঁতার নিয়ম। ওল, মানকচু, রাই সরিষা, আউশের আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধানকে সাধ দেয়।"[৪] একই উপলক্ষে কোথাও 'গারু ব্রত' পালিত হয়। চিন্তাহরণ বাবু এরূপ একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "নানা স্থানে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে গার্সী বা গারুই বা 'গারু ব্রত' অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থানে ইহা ধান গাছকে সাধ খাওয়ানো উৎসব। চাষীরা প্রত্যূষে কাঁচা হলুদ বাঁটা সরিষা তেলের সহিত মিশাইয়া ধানের ক্ষেতে ছিটাইয়া দিয়া বলে, 'ধানের সাধ খা, পাকা ফুল্যা ঘরে যা'।...হালের

---

১. ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কার্তিক দেয় সাড়া।
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া॥
উদ্ধৃত: বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৭৩

২. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮

৩. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

৪. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১০

অর্জন, জালের মাছ এইদিনে তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"[১] ক্ষেতকে তুষ্ট করে পুষ্ট ফল পাওয়াই হল সাধ দেওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ইন্দো-নেশিয়ায় শিষসম্ভবা ধানগাছ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা ও আচারের চল আছে। ঐ সময় ধানগুচ্ছ গর্ভিণী নারীসদৃশা, পুষ্টিকর খাদ্য ধানকে খেতে দেওয়া হয়।[২]

গাস্বী উৎসব

বন্ধ্যা গাছে ফল ফলানোর জন্য গাস্বী উৎসব পালন করা হয়। তারা লৌকিক ক্রিয়া দ্বারা গাছকে ফলবতী করার চেষ্টা করে। আচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে কবি জসীমউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "গাস্বীর রাত্রে আমরা যে গাছের ফল ধরে না, একটি কুড়াল লইয়া সেই গাছে দু' একটি কোপ দিতাম আর বলিতাম, এই গাছের ফল ধরে না, এই গাছ আজ কাটিয়া ফেলিব। আর একজন যাইয়া বলিত, না না কাটিস না, এ বৎসর ফল ধরিবে। তখন নিরস্ত হইতাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল এরূপ করিলে গাছে ফল ধরিবে।"[৩]

প্রথাটি একটি কৃত্রিম অভিনয়। গাছকে ভয় দেখিয়ে ফল আদায় করার জন্য এ অভিনয়। গাছের আত্মা আছে, বোধশক্তি আছে—এরূপ লোকবিশ্বাসের দ্যোতনা এতে বিদ্যমান।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হিন্দু কৃষক সমাজে আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় 'গার্সীব্রত' বা 'গারুই ব্রতে'র উল্লেখ করেছেন যার লক্ষ্য হল, গাছকে সাধ খাওয়ান।[৪] একই উদ্দেশ্যে 'গার্সে ব্রত' বা 'গাড়সে ষষ্ঠী' অনুষ্ঠান পালনের কথা বলেছেন ডঃ অমলেন্দু মিত্র।[৫] 'গার্সে' বা 'গার্সী'র উচ্চারণ ভেদ 'গাস্বী' তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোলাম এবনে সামাদ গাছকে সাধ খাওয়ান অর্থে 'গার্সী' শব্দটি ব্যবহার

১. বাংলার পাল-পার্বণ, পৃঃ ১০-১১
২. বাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৫
৩. জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬
৪. বাংলার পাল-পার্বণ, পৃঃ ১০-১১
৫. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১০

করেছেন।[১] অনুষ্ঠানগত পার্থক্য সম্প্রদায় ভেদের কারণে আসতে পারে। তবে মূল লক্ষ্য এক— ফল কামনা করা। প্রাচীনকালের 'গর্ভধান পূজা'রই (fertility cult) নমুনা এটি।

হিরালীর আচার

খরার দিনে বৃষ্টির কামনায় যেমন লোকাচার আছে, আবার বৃষ্টির দিনে ঝড়-বৃষ্টি দূর করার জন্য তেমনি লোকাচার আছে। হিরালীর আচার ঝড় ও শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিপালিত হয়। হিরালী (< শিলারী) পেশাদার মন্ত্রগুণী। শরৎচন্দ্র মিত্রের মতে, হিন্দু যুগী অথবা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হিরালী আখ্যা পায়।[২] পূর্ব ময়মনসিংহে মুসলমান হিরালীও দেখা যায়।[৩] মূলতঃ শিলাবৃষ্টি থেকে বোরোধান রক্ষা করার জন্য হিরালীরা মন্ত্রাচার পালন করে। এছাড়া বজ্রপাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষার কাজেও তাদের ভূমিকা আছে।[৪]

চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী দেখা যায়। এতে বজ্রপাতসহ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। এ সময় ক্ষেতে বোরোধান পেকে উঠে। ঝড়ে ধানগাছ পড়ে গেলে অথবা শিলায় বিনষ্ট হলে কৃষকের অন্ন যায়। তখন ফসল রক্ষা করার জন্য তারা যৌথভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে হিরালীদের নিযুক্ত করে। আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এলে এবং শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে হিরালী নির্দিষ্ট ক্ষেতে গিয়ে মন্ত্র পাঠ করে এবং শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ তাড়ায়। সে প্রায় নগ্নাবস্থায় জমিতে যায়, তার ডান হাতে ত্রিশূল থাকে, বাঁম কাঁধে থাকে শিঙ্গা। হিন্দু হিরালী সিন্দুর দিয়ে কপাল রঞ্জিত করে এবং মাথার চুল চূড়া করে বাঁধে। ত্রিশূলেও সিন্দুর মাখান হয়।[৫] ক্ষেতের আইলে ত্রিশূল প্রোথিত

---

১. এবনে গোলাম সামাদ—নৃতত্ত্ব, পৃঃ ১৪৩ (২য় সং)।
২. op. cit., JDL, Vol. XV, 1927, p. 3
৩. প্রদত্ত ছবি দ্রষ্টব্য। ছবিটি কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত।
৪. Ibid., JDL, Vol. XV, p. 6
৫. Ibid., p. 5

করে সে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে এবং মেঘের দিকে লক্ষ্য করে শিঙ্গা বাজায়। মেঘ বাতাসে ভেসে গতি পরিবর্তন করলে শিঙ্গার মুখও পরিবর্তিত হয়। লোকের বিশ্বাস, হিরালী এরূপ আচরণ দ্বারা মেঘ তাড়িয়ে আসন্ন শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষা করে। এ সময় কোন লোক সাদা কাপড় পরে এবং ছাতা মাথায় দিয়ে ধান ক্ষেতের আইলে যেতে পারে না। কেউ গেলে মন্ত্রগুণ ক্রিয়া করে না।[১] হিরালী তার কাজের জন্য কৃষকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পায়।

শ্রীহট্ট জেলায় এদের 'ফিরাল' বলা হয়। তারা ঝড়-বৃষ্টির গতি ফিরিয়ে থাকে, এ অর্থেই তাদের ফিরাল নাম। মন্ত্রপাঠ ও শিঙ্গাবাদ্য ব্যতিরেকে তারা কতক মন্ত্রপূত ঔষধ ক্ষেতে ও গৃহে পুঁতে রাখে। একে আঞ্চলিক ভাষায় 'গুট-গাড়া' বলে।[২] জলপাইগুড়িতে এদের নাম 'শিরেল'। আঞ্চলিক বিশ্বাস, শিরেলরা বৃষ্টি আবাহন করতে পারে আবার তার প্রতিরোধ বা গতিরোধও করতে পারে।[৩]

ভগ্‌গা দেওয়া

পোকপাখালি ও জীবজন্তু থেকে ফলমূল, শাকসব্জি রক্ষা করার জন্য গৃহস্থরা ক্ষেতে ভগ্‌গা দেয়। এটি খড়কুটার তৈরি নকল মানুষ বা কুশপুত্তলি। হাত-পা-মাথা এমন নয় যে তাকে মানুষের প্রতিকৃতি বলা যায়, তবে মানুষের ছেঁড়া গেঞ্জি বা জামা পরিয়ে একে মানবাকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হয়। ব্যবহারিক উপযোগিতাই একমাত্র লক্ষ্য। তাই কোন প্রকারে মানবাকৃতির আভাস দিতে পারলেই চলে, যাতে পশুপাখি ভয় পায় এবং পালায়। অতি স্থূল হলেও লোকশিল্পের মটিফটি কিন্তু অনুপস্থিত নয়। লৌকিক মূর্তি বা চিত্রের মত এর হাত দুটো

---

১. Ibid., p. 18

২. Padmanath Bhattacharjee— Folk Customs of the Sylhet District in India, Man in India, Vol. X, 1930, pp. 126-27 Reference; Dr. Ashraf Siddique's thesis (unpublished) on 'Bengali Folklore Collections & Studies during the British Period', p. 212

৩. Ibid., JDL, Vol. XV, p. 21

প্রসারিত এবং অভঙ্গ। কোন কোন সাবধানী গৃহস্থ মাথায় চূণকালি দিয়ে মুখ-চোখের আকার দেয়। খড়ের বেণী গেঁথে চুণকালিতে রাঙিয়েও ক্ষেতে বাঁধা হয়। একে 'বেনা বাঁধা' বলে। ভগ্গার স্থলে কেবল পাতিল বা হাঁড়িতে চূণকালি দিয়ে স্থূল ছোপ ও রেখায় রাঙিয়ে ক্ষেতে দেয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'পাইল্যা রাখা' বলে। এর উদ্দেশ্যও পোকপাখালি তাড়ান। কোথাও ছেঁড়া জুতা, ঝাঁটা, পাখির পালক ইত্যাদি বাঁশে বেঁধে ক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয়। এতে করে শুধু পাখি তাড়ান হয় না, ক্ষেতে কুনজরও লাগে না। এগুলি কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের গুণ রাখে। সুতরাং বাঁশ পোঁতা, পাইল্যা রাখা, বেনা বাঁধা অথবা ভগ্গা দেওয়ার একই উদ্দেশ্য—ক্ষতি থেকে ক্ষেত রক্ষা করা।

ভগ্গা দেওয়া ঠিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে না; আপাত দৃষ্টিতে তা উদ্দেশ্যপূর্ণ বাহ্যিক লোককৃতি বলে মনে হয়। আদিতে কিন্তু এটি সংস্কারমুক্ত ছিল না। খুব সম্ভব, এটি শস্যসংক্রান্ত আদি প্রথা যা কৃষিসমাজে সুপরিচিত ছিল। দুষ্ট লোকের কুনজর এবং কুনজর থেকে সম্পদ রক্ষার এরূপ লৌকিক ব্যবস্থায় যে যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে তা প্রাচীন সমাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ পুরাকালে ক্ষেতে নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধি ও প্রজননশক্তির কামনায় নরবলির প্রথা অনেক কৃষিসমাজেই ছিল। মৃতের আত্মা ফলোৎপাদনের সহায়ক হয়। বলির পর নরদেহ ভূমিতে পুঁতে দেওয়া হত। বস্তুতঃ ক্ষেত্র ও শস্য সম্পর্কিত এরূপ চেতনা ও প্রথা খুব প্রাচীন হওয়াই স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ শব্দতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেও ভগ্গার প্রকৃতি, প্রথা ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 'ভগ্গা' শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধে এক স্থলে লিখেছেন, " 'ভগ্গা' শাব্দিক অর্থে এবং ধ্বনিতে স্লাবনিক 'বোগু', স্কটল্যাণ্ডের 'বোগগার্ড', ওয়েলশের 'বোগ', ইংরেজীর 'বগী' এবং সংস্কৃতের 'ভগ' শব্দের যে সমগোত্রীয়, তাহা বলা যায়।" তিনি ঐ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সূর্য অথবা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ দেবতা অর্থে সংস্কৃত 'ভগ' শব্দের ব্যবহার ছিল। খ্রীস্টপূর্ব আঠার শতকের দিকে ব্যাবিলোনের 'কস্‌সাইত' জাতি 'বুগস' (Bugas) বা অলৌকিক

শক্তির পূজা করত। মধ্যযুগের ইংরেজী 'বাগেগ' (Bugge) শব্দের অর্থ 'a hobgoblin' বা জুজু। জুজু দুষ্টভূত তথা অপ্রাকৃত প্রাণী। আধুনিক ইংরেজীতে এটি 'বগী' Bogey)। ওয়েল্‌সের ভাষায় 'বোগ' (Bwg) শব্দের অর্থও জুজু। স্কটিশ ভাষায় 'বোগগার্ড' (Boggard) বা 'বোগগল' (Boggle) শব্দে 'a goblin' বা প্রেতযোনিকে বুঝায়। ইউরোপের স্লাবনিক শব্দে 'বগু' (Bogu) দেবতা অর্থে প্রযুক্ত হয়। বস্তুতঃ দেবতা অথবা অপ্রাকৃত আত্মা অর্থে উক্ত শব্দগুলির উৎস যে এক তা অনুমান করা যায়। ওয়েলশের 'বোগগার্ড' শব্দের অর্থদ্যোতক 'Scarecrow' পাওয়া যায় যা শস্যসংক্রান্ত—পাখি প্রভৃতি প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য ক্ষেতে স্থাপিত বিকট মূর্তি। Scarecrow শব্দের সমতুল অর্থজ্ঞাপক বাংলা প্রতিশব্দ 'কাকতাড়ুয়া'। ভগগাকে বুঝাতে বাংলাদেশেব শিক্ষিত সমাজে কাকতাড়ুয়ার ব্যবহার আছে। ভগগা বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শব্দ।[১] স্থানীয় লোকেরা বিকট বা কুৎসিত চেহারা বুঝাতেও ভগগা শব্দটির প্রয়োগ করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, শব্দটি কি ইউরোপ থেকে বরিশালে এসেছে? সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ইউরোপের নানা জাতি প্রাচীনকাল থেকেই যাতায়াত করেছে। ইংরেজরা তো প্রায় দু'শত বছর রাজত্ব করে গেছে। সুতরাং ঐ শব্দ বাইরে থেকে বরিশালে আমদানী হতে পারে। সংস্কৃত 'ভর্গ' শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে ভগগা হতে পারে। বাংলা ভাষায় ফাঁকি বা প্রতারণা অর্থে 'ভোগা' শব্দের প্রয়োগ আছে। এটির উৎস সম্ভবত হিন্দী 'ভগল' শব্দ।[২] মুর্শিদাবাদে শব্দটি ধোঁকা, ধাপ্পা, মিছা, ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত আছে, যেমন 'ভোগা দেওয়া' বা 'ভোগা কথা'। ডঃ হকের মতে চট্টগ্রাম জেলায় ভগগার আঞ্চলিক নাম 'ধোক্কা' বা 'ধুক্কা'। ধোঁকা থেকে ধোক্কা হলে ভোগা থেকে ভগগা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রহরীরূপে ভগগা বা কাকতাড়ুয়া কাকাদি পাখি ও শৃগালাদি জন্তুকে যে ভোগা

১. নিজস্ব সংগ্রহ।
২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৭৮ (২য় সং)।

বা ধোঁকা দেওয়ার কাজ করে, তাতে সন্দেহ নেই। ফরিদপুরে 'অরগা' (ogre) এবং রংপুরে 'আচাভুয়া' নাম প্রচলিত আছে।[১]

সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও শব্দটি অর্থবহ এবং সেদিক থেকে তা স্থানীয় শব্দও হতে পারে। আদিতে যা ছিল ধর্মসংস্কারগত পরবর্তী কালে প্রথানুবর্তন হিসেবে এবং প্রয়োজনসাপেক্ষে তা চালু থেকে ক্রমে বস্তুগত অর্থপ্রযুক্ত হয়ে ঐরূপ শব্দ-নাম গ্রহণ করতে পারে।

আলোডালো

আলোডালো স্বতন্ত্র কোন অনুষ্ঠান নয়—হিন্দু সমাজে কালীপুজার রাত্রে (কার্তিকের অমাবস্যা) যে দীপালি উৎসব হয়, এটি তারই অংশ বিশেষ। গ্রামের বালক-যুবকেরা এক গাছি পাটকাটি বেঁধে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে রাস্তা, খোলা মাঠ-ঘাটে মশাল খেলে। একেই গ্রামাঞ্চলে আলোডালো খেলা বলে। এ খেলায় হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। আগুনের খেলা বলে সাধারণতঃ বয়স্করা এতে অংশ নেয়। তারা মশাল ঘুরায় ও মুখে ছড়া বলে :

আলোরে ডালোরে
পোকারে মাকড়রে
দূর হ। দূর হ॥[২]—মুর্শিদাবাদ

খেলা শেষে পোড়া পাটগাছির পরিত্যক্ত অংশ শাকসব্জি বা শস্যক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এতে গাছে ও ফলমূলে পোকা ধরে না।

বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠানটি 'ভূত খেদানো' নামে পরিচিত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "কার্তিক সংক্রান্তির সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পাটকাঠির মশাল নিয়ে ছড়া গাইতে গাইতে মাঠের মধ্যে ছোটা-ছুটি করা হয়।......উদ্দেশ্য অশুভ শক্তির কোপদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা।"[৩]

১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০
২. নিজস্ব সংগ্রহ।
৩. আবদুল মতিন—পৌণ্ড্রবর্ধনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আজকের বগুড়া (আমানউল্লাহ খান কর্তৃক সম্পাদিত), বগুড়া, ১৯৬৮, পৃঃ ৬৯

ইব্রাহিম খাঁ এ উপলক্ষে 'আলোর উৎসব' পালনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, পাটশোলায় মশাল জ্বালিয়ে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করা হয় এবং ছড়া বলা হয় :

ভালা আসে বুরা যায়।
বোচা কান মশায় খায়।[১]—ময়মনসিংহ

কামিনীকুমার রায় উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত 'লক্ষ্মী ডাক' বা 'ডাক দেওয়া' নামে একটি প্রথার উল্লেখ করেছেন যার অন্তর্নিহিত ধর্ম প্রায় অনুরূপ। আশ্বিন-সংক্রান্তির দিন কৃষকরা পাটকাঠির গোছা (আঞ্চলিক নাম উক) জ্বালিয়ে আপন আপন ধান ক্ষেতে যায় এবং ঘুরে ফিরে সেটি ক্ষেতের উপর ঘুরায়। সে-সময় তারা মুখে ছড়া বলে :

সোরহা।
সোগারে ধান টোনাসোনা,
মোর ধান পাকা সোনা।
সোরহা।[২]

ধান লক্ষ্মীস্বরূপা ; অতএব তাঁকে আহ্বান করার অর্থই হল অধিক ফলন কামনা করা। পোকামাকড়ের ধ্বংস এবং অধিক ফলন কামনা করে পূর্ববঙ্গে আজও ক্ষেতের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। যখন কীটনাশক ঔষধ ছিল না অথচ কীটের উৎপাত ছিল তখন এভাবেই লোকে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কীট-পতঙ্গ পুড়ে মরে, মানুষের এ অভিজ্ঞতা বাস্তব। আলোডালো অনুষ্ঠানে কিছুটা বাস্তবের, কিছুটা সংস্কারের মিশ্রণ আছে। ছড়ার মধ্যে সে সংস্কারের দিকটা ব্যক্ত হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে একই উপলক্ষে মাটির প্রদীপ দেওয়ার নিয়ম আছে। ময়মনসিংহ জেলায় উক্ত উপলক্ষ ছাড়াও অন্য সময়েও ভরা ক্ষেতে প্রতি-সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালায়। গৃহস্থরা ঘরে যেভাবে সাঁঝবাতি দেয়, এটি সেরূপ। সাঁঝবাতি না দিলে গৃহলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণা হন। বাড়ন্ত ও ফলন্ত ক্ষেতেও লক্ষ্মী বিরাজ করেন। অতএব তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ নিয়ম। পোকামাকড় দূর করার বা অলক্ষ্মী দূর করার একই উদ্দেশ্য,

১. বাতায়ন, পৃঃ ১১৬
২. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩

ভাল ফসল কামনা করা। বাস্তব উপায় ছেড়ে পুজারতি দ্বারা এরূপ নিয়ম পালনে মানুষের মনে প্রাচীন সংস্কারই ক্রিয়া করছে। হিন্দু সমাজে দীপালি উৎসব খুব প্রাচীন। বার শতকে নিবন্ধকার জীমূতবাহনের 'কাল-বিবেকে' দীপালি উৎসবের কথা আছে।[১] উপলক্ষ শক্তিপুজা। কৃষকরা এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে শস্যোৎসবের সাথে একে যুক্ত করতে পারে। এখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েব গৃহস্থরা এটি পালন করে।

আওনি বাওনি

আওনি বাওনি প্রথম ফসল তোলার অনুষ্ঠান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এর আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "অগ্রহায়ণ মাসে ধানগাছ কাটিয়া আনে এবং নূতন কাপড় দিয়া তাহা জড়াইয়া খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন গৃহিণীরা সেই ধানগাছ কয়টি পূজা করিয়া এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট, চৌকি, গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং ছড়া বলেন।"[২] কামিনীকুমার রায় এর প্রায় অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন; তাঁর মতে আওনি অর্থ লক্ষ্মীর আগমন, বাওনি অর্থ লক্ষ্মীর বন্ধন, চাওনি অর্থ প্রার্থনা।[৩] আওনি বাওনি হিন্দুর বাস্তুদেবতা। হিন্দু কৃষকরা আচারটি পালন করে। উত্তরবঙ্গে এটি 'আওরি বাওরি' নামে পরিচিত।[৪]

বাতা ভুগল

বাতা ভুগল ফসল কাটার পূর্বমুহূর্তের অনুষ্ঠান। লোকের বিশ্বাস, লক্ষ্মীদেবী তুষ্ট হলে মাঠের ফসল ঘরে আসে। লক্ষ্মীর অন্নেই জীব

---

১. ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস লেখার সমস্যা, সমকাল, আগষ্ট-অক্টবর, ১৯৬৭, পৃঃ ১২

২. আওনি বাওনির ছড়া অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক:

আওনি বাওনি চাওনি তিন দিন না কোথা যেও।
তিন দিন পিঠা খাওনি ঘরে বসে পিঠা খেও।

—২৪ পরগণা

উদ্ধৃত: বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৮

৩. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮

৪. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪

প্রতিপালিত। তাঁর অসন্তোষে সংসারে অকল্যাণ। এরূপ অন্ধবিশ্বাস থেকে কৃষকরা ফসলকাটার দিন লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে উক্ত আচার পালন করে থাকে। মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া'র পালায় আচারটির উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁদ বিনোদ ধান কাটতে গেলে মা তার হাতে 'ধানের কাচি' ও 'পঞ্চগাছি বাতার ডুগল' তুলে দেন। বারমাসী গাইতে গাইতে সে মাঠের দিকে রওনা হয়।[১]

আচারটির পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "প্রথম দিন ধান কাটিবার সময় পাঁচটি বাতা গাছের অগ্রভাগ লইয়া ক্ষেত্রে যায়, তাহা সিন্দূর প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত। এই বাতার পাঁচটি ডুগলের সঙ্গে পাঁচটি ধান্যের ছড়া বাঁধা হয়, তাহাই কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্থলে তুলিয়া রাখে।"[২]

মুসলমান কৃষকসমাজ এ অনুষ্ঠানটি 'ধানের আগ লওয়া' নামে প্রচলিত। বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত জনৈক সংগ্রাহকের মতে, আচারটির এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়: "অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ধান কাটিবার পূর্বে কাচি নিয়া ক্ষেতে গিয়া এক ওয়াসে (নিঃশ্বাস) পাঁচটি ধানের আগ কাটিয়া সেই আগ পাঁচটি মাথায় নিয়া ঘরের কোণায় আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।...এরূপ করিলে সেই বছরের ধানে খুব মুরাদ (বরকত) দেয়।"[৩]

ইব্রাহিম খাঁ এটাকে 'আগ ধান আনা'র অনুষ্ঠান বলেছেন। তাঁর ভাষায় আচারটি এরূপ: "ধান পাকলে চাষী পাক-সাফ অবস্থায় ক্ষেতে যেত। সঙ্গে থাকত কাশ বা বিন্না ছোপার তিনটি ডাটা। সে ধানের তিন, পাঁচ বা সাতটা শিনজা কাটত। সেই শিনজা ঐ ডাটার সাথে মিশিয়ে কলার কচি পাতায় মুড়ে কাপড় দিয়ে ঢাকত, তারপর তা সশ্রদ্ধভাবে মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরত। ধানের শিনজা কয়টি সে বড় ঘরের মধ্যম খামের আগার দিকে বেঁধে রাখত; তারপর সেই খামের

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮

২. ঐ, পৃঃ ৪৮ (পাদটীকা)।

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৩

গোড়ার কাছে সে দুধভাত খেত। এ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে সে কারও সাথে কথা বলত না।"[১]

ইব্রাহিম সাহেব আচারটিকে 'শস্য-পূজারই বিলুপ্তপ্রায় অবশেষ' বলেছেন। ডঃ অমলেন্দু মিত্র 'মুঠ পূজা'র কথা বলেছেন, সেটা শস্যপূজাই। তিনি অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছেন, "কার্তিক সংক্রান্তির দিন মাঠ থেকে এক আঁটি ধানগাছ বৌ-সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়। যে লোকটি মুঠ আনবে সে সারাপথ কোন কথা বলতে পারবে না। ছাতা মাথায় ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুঠ নিয়ে পৌঁছানোর পর তার পায়ে জল ঢালা হয় এবং জলধারা দিয়ে ঘরে বরণ করে তোলা হয়।"[২] একে 'ধানের মুঠ আনা' অনুষ্ঠানও বলা হয়। বাতা ডুগল, ধানের আগ লওয়া, আগ ধান আনা এবং ধানের মুঠ আনা অন্তর্ধর্মে একই অনুষ্ঠান, কেবল অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নাম হয়েছে।

দেনী আনা

'আগ ধান আনা' আচারে ধান কাটার শুরুতে প্রথম শস্যমুষ্টি সংগ্রহ করা হয়, 'দেনী আনা' আচারে ধান কাটার পর শেষ শস্যমুষ্টি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। ধান ক্ষেতের ঈশাণ কোণ থেকে আড়াই মুঠ পরিমাণ ধান জমির মালিক পবিত্রতার সাথে তুলে আনে। ঐ সময় ক্ষেতে শাঁখ বাজান হয়। ধানের গাদা অথবা অন্য কোথাও কুলের কাঁটা, গোবর, কেঁচোর মাটি ও আলপনা দিয়ে তা রাখা হয়। ঐদিন কৃষাণদের ভাল করে খাওয়ান হয়। এটাই 'দেনী আনা' বা 'দাঁওন আনা' অনুষ্ঠান।[৩]

পৃথিবীর নানা কৃষিসমাজে ফসল কাটার শেষ আঁটি দিয়ে উৎসব পালনের রীতি আছে। উক্ত আঁটি ফিতা দিয়ে বেঁধে ও নারীমূর্তিতে সাজিয়ে সযত্নে গৃহে রাখা হয়। একে কৃষকরা ফসলের দেবতা বলে মনে করে এবং পূজা করে। ইংলণ্ডে একে 'harvest queen'

১. বাতায়ন, পৃঃ ২৩২
২. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১২
৩. ঐ, পৃঃ ১৩

বা 'শস্যরানী' এবং জাপানে 'harvest mother' বা 'শস্যমাতা' নামে অভিহিত করা হয়।[১] পোলাণ্ডে শস্যের শেষ ঝাড়টিকে 'শস্যবুড়ি' বলা হয়। অস্ট্রিয়ায় শস্যরানীকে গাড়িতে বসিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। রাশিয়ায় 'শস্যকুমারী'কে নাচগানসহ খামারে আনা হয়।[২] বাংলায় এ শ্রেণীর শস্যমুষ্টি 'লক্ষ্মীর ছড়' নামে পরিচিত। লক্ষ্মী তথা 'শস্যদেবী' রূপে তা পবিত্রতার সঙ্গে গৃহীত ও রক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের শস্যদেবী, শস্যমাতা, শস্যরানী, শস্যবুড়ি, শস্যকুমারী বা শস্যপুতুল একই মানসিকতার সৃষ্টি, লক্ষ্যও এক— প্রতীক পূজা করে প্রচুর ফসল কামনা।

নবান্ন

নতুন ফসল ঘরে এলে নবান্নের আয়োজন হয়। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের ঘরে নতুন ফসল আমন ধান আসে। নবান্নের দিন দুধ-গুড়-নারিকেল যোগে নতুন চালের মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়। তারা পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে তা বিতরণ করে ও নিজেরা খায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অনুষ্ঠান সমান আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে পালিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধানে নবান্ন করার কথা আছে 'শান্তির বারমাসী'তে।[৩] 'কমলার বারমাসী'তে এ উৎসবে চিড়া, পিঠা, পায়েস ও খিচুরী রান্নার কথা আছে। হিন্দু সমাজে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ হিসেবে এগুলি উৎসর্গ করা হয়।[৪]

অরণ মাগন

অরণ মাগন ফসল সংক্রান্ত শেষ অনুষ্ঠান। মুসলমান রাখাল বালকেরা এ অনুষ্ঠানটি পালন করে। গৃহস্থের ধান কাটা-মাড়া শেষ হয়ে গেলে গ্রামের রাখালেরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি চাল ডাল ইত্যাদি মাগন করে

---

১. SDFML, Vol, p. 484

২. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪

৩. এই তো আগোন মাসে খ্যাতে আমন ধান,
কেউ কাটে কেউ মাড়ে কেউ করে নবান। —রংপুর

উদ্ধৃত: লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭

৪. মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২

আনে। গৃহস্থ ঘরে গিয়ে তারা মাগনের ছড়া বা গান গায়। কোন কোন ছড়ায় লক্ষ্মী ও শিবের উল্লেখ আছে। এটা হিন্দুধর্মের প্রভাবমাত্র; আচারগত পূজা-অর্চনা এতে নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, এখানে শিবলক্ষ্মীর কোন পৌরাণিক পরিচয় নেই, এঁদের নাম পূর্ব-সংস্কার হতে চলে আসছে।[১] বস্তুত: মুসলমান বালকেরা পূজার ভোগ দেয় না, মাগনের দ্রব্যাদি মাঠে রান্না করে নিজেরা ভোজন করে। বন-ভোজনের মত এটা আমোদস্ফূর্তির অনুষ্ঠান। মাগনের ছড়ার প্রথম পদ 'এলাম রে ভাই অরণে, লক্ষ্মীদেবীর শরণে' থেকে অরণ মাগন নামটি গৃহীত হয়েছে। ছড়া অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রচিত।

দুইটি ঘুঘুর দুইটি মুলা — যে দিব কাঠা কাঠা
ধান দেও গো কুলা কুলা ॥ — তার হব সাত বেটা ॥[২]

ঢাকা জেলায় এগুলি 'ওম্নিগান' নামে পরিচিত।[৩] মাগনকালে দলের মূল গায়েন প্রথমে সুর করে ছড়া বলে, পরে দোহাররা সমবেত কণ্ঠে এর পুনরাবৃত্তি করে।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য. ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯
২. উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২
৩. লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২১
অরণা > অরণি > ওম্নি।

৫

গবাদি পশু

ইংরেজী· 'cattle' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গবাদি পশু। গৃহপালিত পশু এর মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, মহিষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি প্রধান। এগুলির মধ্যে গরুর ব্যবহার ও উপকারিতা সর্বাধিক। বিশেষত: কৃষিকাজে গরুর দান বেশী। গরু কৃষকের লাঙল টানে, গাড়ি টানে, তেলির ঘানি টানে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে চাষবাসে গরুর ব্যবহার আছে। দেশভেদে ঘোড়া-মহিষও ব্যবহৃত হয়। মরুবাসীর উট আছে, মেরুবাসীর কুকুর আছে, পর্বতবাসীর ঘোড়া আছে, বেদের গাধা আছে, এগুলি তাদের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অরণ্যবাসী মানুষ পশুশিকার ও খাদ্য সংগ্রহ ত্যাগ করে যখন কৃষিকাজ শুরু করেছিল, তখন কাজের সহায়ক হিসেবে সম্ভবত: প্রথম গরুকেই বেছে নিয়েছিল। এজন্য কৃষি, শস্য, গরু নিয়ে নানা প্রাচীন সংস্কার গড়ে উঠেছে। হিন্দু লোকপুরাণে কৃষির দেবতা শিব, তাঁর বাহন বৃষ। তিনি বৃষের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করেন এবং পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করেন।[১] সংস্কৃত পুরাণে পৃথু হলেন বিশ্বপতি, তাঁর প্রজাদের খাদ্যশস্য দরকার। তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মৃন্ময় পৃথিবী গরুর রূপ নিয়ে স্বর্গময় ছুটে পালাল। কিন্তু শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পৃথুর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং গোদুগ্ধে ভূমি উর্বর করার প্রতিশ্রুতি দিল। পৃথু ধনুকবাণ দিয়ে পাহাড়-পর্বত ভেঙে ভূমিকে উর্বর করলেন এবং শস্য ফলালেন। তখন থেকে মানুষ শস্য ও শাকাদি পেয়ে আসছে।[২] কতক মানবেতর প্রাণী উর্বরতা ও উদ্ভিজ্জের সহিত জড়িত। সর্প ভূমির উর্বরতা সাধন করে বলে ভারতীয়

---

১. রামেশ্বর ভট্টাচার্য—'শিবায়ন' কাব্য দ্রষ্টব্য।

২. ERE., Vol. IV, p. 225

পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাস আছে।[১] এরূপ কোথাও ঘুঘু, কোথাও ঈগল পাখি। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় গরু, ঘোড়া ও ছাগল উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তির প্রতীক হিসেবে পরিকল্পিত।[২] রতিক্রিয়া ও প্রজনন সম্পর্কে কৃষিদেবতা ও গরুদেবতার কাহিনী গ্রীকপুরাণে পাওয়া যায়। ইউরোপা গরুজাতির দেবী, জিউস কৃষি বা শস্যের দেবতা। জিউস নিজেকে ষাঁড়ে রূপান্তরিত করে ইউরোপার সহিত মিলিত হন।[৩] ভারতীয় পুরাণে কামধেনু সকল মানববাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারত। সে সর্বশক্তির অধিকারিণী। কামধেনুর রূপে মুগ্ধ হয়ে কামাতুর এক ব্যক্তি নিজেকে ষাঁড়ে রূপান্তরিত করে তার সহিত রতিক্রিয়া করে। এতে বিশালকায় বৃষের জন্ম হয়। শিবের বাহন সেই ষাঁড়।[৪] প্রজননের ব্যাপারে মানুষ ও গরুর অলৌকিক প্রভাবের কথা আছে। প্রাচীন মিশরে মেয়েরা মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মন্দিরের রক্ষিত ষাঁড়কে নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখাত। ব্রিফল্ট বলেছেন, কুর্দ জাতির লোকেরা বিবাহের উৎসবে সমবেত হলে পর পুরোহিত নিজেকে 'Great Bull' ও নববধূ নিজেকে 'Young Cow' বলে ঘোষণা করে উপস্থিত সকলেই যথেচ্ছা সঙ্গমে লিপ্ত হত।[৫]

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙালী কৃষকের সম্বল বলতে একখানা হাল, একজোড়া বলদ আর খুব জোর একটা দুগ্ধবতী গাভী। নিজস্ব জমি না থাকলেও বর্গা নিয়ে এরই সাহায্যে সে ফসল ফলিয়ে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। পুরুষে পুরুষে বাঙালী চিরকাল এভাবে জীবন অতিবাহিত করে আসছে। উচ্চ গৃহস্থের ও জোতদারের একাধিক হাল ও গরুর পাল আছে। সাধারণভাবে বাঙালীর কাছে কৃষি-সম্পদের পরেই গো-সম্পদের স্থান।

বাঙালী কৃষক সকাল বিকাল গরু নিয়ে মাঠে লাঙল ঠেলে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গরুকে চারা দেয়, গোশালায় সাঁজাল দেয়। কৃষাণ বধূ

১. লৌকিক পুরাণে সর্পদেবী মনসা বা পদ্মা শিবের মানসকন্যা। এদিক থেকেও কৃষির সাথে সর্পের যোগ আছে। সর্প উর্বরতার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত।

২. SDFML, Vol. I, p. 60

৩. Ibid., p. 257

৪. নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত—বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৪-৪৫

৫. SDFML, Vol. I, pp. 256-57

গোবর তুলে ঘুঁটে তৈরি করে। গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে গাড়োয়ান 'ভাওয়াইয়া গান' ধরে। পল্লীর বালকেরা মাঠে মাঠে ধেনু চরায় আর বেণু বাজায়। তাদের কণ্ঠে 'রাখালিয়া গান'। এভাবে দেখা যায় পল্লীবাসীর জীবনের একটা দিক গবাদি পশুকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে।

গরুর উপকারিতা অনেক। গাভীর দুধ সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ছানা, দধি, মাখন, ঘি প্রভৃতি দুগ্ধজাত এবং দুগ্ধমিশ্রিত নানা শ্রেণীর মিষ্টান্ন বাঙালীর খাদ্যসামগ্রীতে বিশিষ্টতা দান করেছে। গরুর চামড়ায় বহু ব্যবহারিক দ্রব্য তৈরি হয়। গরুর হাড় ও গোবর উৎকৃষ্ট সার। গোবর জ্বালানি রূপেও ব্যবহৃত হয়।

হিন্দু বাঙালী গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে গো-হত্যা মহাপাপ। গোজাতি দেবকন্যা সুরভির সন্তান বলে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। 'ঋগ্বেদে' গরুর সঙ্গে পৃথিবীর অলৌকিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আবেস্তা'য় এক দেবতার নাম হল 'জিউস উর্বন' যার অর্থ গরুর আত্মা। এতে গরুকে সমস্ত প্রাণিজগতের রক্ষক বলা হয়েছে।[১] প্রাচীন মিশরে দুগ্ধবতী গাভী বা 'হ্যাথর' দেবতাজ্ঞানে পূজা পেত।[২]

প্রাচীনকালে মানুষ কোন কোন প্রাণীকে রোগব্যাধির উপশমকারী বলে মনে করত। হপি মেয়েরা বেজির চর্বি, চামড়া ও মাংসকে গর্ভপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলে মনে করে। জুনি মেয়েরা আঁতুড় ঘরে সজারুর পায়ের হাড় বিছানার নীচে রাখে। এতে কোন রোগশোক আসতে পারে না।[৩] বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মেয়েরা আঁতুড় ঘরের সামনে গরুর মাথার খুলি ঝুলিয়ে রাখে। লোকবিশ্বাস, এতে ভূত-প্রেতের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এভাবে দেখা যায়, বাঙালীর কি ব্যবহারিক জীবনে, কি ধর্মজীবনে, কি সাংস্কৃতিক জীবনে গরুর প্রভাব ছড়িয়ে আছে। উপযোগিতায়, উর্বরতায়, প্রজননে, প্রশমনে, প্রথায়, সংস্কারে গরু জাতীয় জীবনে নানা ভাবে স্থান গ্রহণ করে আছে।

---

১. ERE, Vol. IV, p. 225

২. শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়—প্রাচীন মিশরের দেবতা. প্রবাসী. কার্তিক, ১৩৩২, পৃঃ ১২

৩. SDFML, Vol. 1, p. 59

গরুর ভালমন্দের সাথে কৃষকের ভাগ্য জড়িত। এজন্য গরুর রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা, শুভাশুভের দায়িত্ব কৃষকেরই। তারা গবাদির মঙ্গল কামনায় ও নিরাপত্তাবোধে নানা আচার পালন করে। 'চাঁদবদনী' গরু-পূজার অনুষ্ঠান। 'গো-ফাল্গুনী', 'গোয়াইনার শিরনী' সাধারণভাবে গরুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পালিত হয়; 'দৈ-পান্তা' ও 'গোরক্ষনাথের শিরনী' দুগ্ধবতী গাভীর উদ্দেশ্যে পালিত হয়। 'গো-বরণ' আচারটি কুসংস্কারজাত। 'কুলের মাগন' অনুষ্ঠানে আচারধর্ম অপেক্ষা আমোদ-স্ফূর্তির ভাগ বেশী। বাংলাদেশের এ আচারগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পালন করে থাকে। অভিন্নপদ্ধতির কৃষিব্যবস্থায় যে জীবনচেতনা গড়ে উঠেছে তাতে বিপদ-বিপত্তিতে একই আর্তি জেগে উঠে। সুতরাং শুভাশুভ আকাঙক্ষায় ও আশঙ্কায় একই আচারধর্মের অনুসরণ করা স্বাভাবিক।

চাঁদবদনী

চাঁদবদনী গরুর পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠান। হিন্দু সমাজের লোকেরা দেবতাজ্ঞানে গরুকে পূজা করে। চাঁদবদনী অনুষ্ঠানে গরুকে পূজা করা হয়, আনুষ্ঠানিক গীত গাওয়া হয়, গরু-মোষের জন্ম ও জীবন বৃত্তান্ত-মূলক কথা বলা হয়। কৃষক রমণীরা কার্তিক অমাবস্যা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া—তিন দিন ধরে এ উৎসবানুষ্ঠানটি পালন করে থাকে। পূজার আচারে-উপচারে হিন্দুর ঐতিহ্যের চিহ্ন আছে। অনুষ্ঠানের আচারগত পরিচয় দিয়ে শঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন, "গোহাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং নানা প্রকার আলপনা আঁকা হয়। মাটির প্রদীপ, ফুলের মালা, সরিষার তৈল, কাঁচা হলুদ, সিঁদুর, ধান, সরিষা, মুগ, দূর্বা প্রভৃতি পিতলের থালায় করে গোহালে নিয়ে যাওয়া হয়। গরুর শিং-এ তেল-হলুদ লাগিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। গায়ে জ্যামিতিক চিত্রাদি অঙ্কন করা হয়। এবং কলার পাতায় করে গরুকে খাবার দেওয়া হয়। তারপর গরুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করা হয়। এই দিনে গরুদের বিশ্রাম।"[১]

---

১. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৭৮

গো বরণ

বাড়িতে নতুন গরু কিনে আনলে এ আচারটি পালন করা হয়। সম্পদ অর্থে গরু বাঙালীর কাছে 'লক্ষ্মী স্বরূপা'। খরিদ করে গরু আনলে সাথে লক্ষ্মীও আসেন। এজন্য তাকে বরণ করে নিতে হয়। অঞ্চল ভেদে বরণের রীতি বিভিন্ন। ময়মনসিংহে ধান-দূর্বা দিয়ে পানি ছিটিয়ে নতুন গরু বরণ করা হয়। উত্তরবঙ্গে গরুর চার পায়ে গৃহকর্তা পানি ঢেলে দেয়। ফরিদপুরে পায়ে পানি ও কপালে তেল দেওয়া হয়। এতে গরু গৃহস্থের আদুরে হবে বলে বিশ্বাস। নোয়াখালিতে সোনা-রূপা ছোবান পানি আমের কচি পাতার ডালের সাহায্যে গরুর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে গরুর 'পূর্বদোষ' দূর হয়।

আঞ্চলিক সংস্কারগুলির মধ্যে বাঙালী মানসের একটা অবিচ্ছিন্ন কামনার পরিচয় পাওয়া যায়। নিখুঁত গরু ঘরে এলে গৃহস্থের কল্যাণ। যদি গরুর দোষ থাকে, যদি তা পোষ না মানে, তবে কাজের সমূহ ক্ষতি হয়। গরীব গৃহস্থের তা কাম্য নয়। এজন্য পূর্বাহ্নে সে সতর্ক থাকতে চায়। গো বরণ আচারটিতে সে মনোভাবেরই পরিচয় নিহিত আছে।

ধান, দূর্বা বা আমপাতা দিয়ে গরুর গায়ে পানি ছিটানোর ক্রিয়ায় আদিম লোকসংস্কার থাকতে পারে। গরুর ভালমন্দের সহিত কতক গাছপালার সম্পর্ক আছে। উক্ত গাছগুলির আত্মা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় একে vegetation-spirit বলেছেন। তাঁর মতে, ভারতে এবং ভারতের বাইরে কৃষকেরা এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গরু সম্পর্কিত আচারে গাছপাতার ব্যবহার করে। ভারতের রুহিল-খণ্ডের 'আখতিজ' উৎসবে, বেরারের 'পোল' উৎসবে এবং দক্ষিণ ভারতের 'পোঙ্গল' উৎসবে গরুর মঙ্গল কামনায় কৃষকেরা আমপাতা দিয়ে আচার পালন করে।[১] গাছের আত্মা পানি-ফোঁটার ভেতর দিয়ে গরুর দেহ স্পর্শ করবে। এতে অপদেবতার কোপ অথবা ডাইনীর কুদৃষ্টি দূর হবে। গো বরণ আচারে সে সংস্কার সংগুপ্ত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ধর্মঠাকুরের

১- Sarat Chandra Mitra—On the Cult of Gorakshanath in Eastern Bengal, JDL, Vol. XIV, pp. 2-5

শিলামূর্তি ধোওয়া পানি মাথায় ধারন করে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়, এরূপ বিশ্বাস বাংলার রাঢ় অঞ্চলে আছে।[১]

গোয়াইলার শিরনী

রোগাব্যাধিব আক্রমণ থেকে গরুকে রক্ষা করার জন্য গৃহস্থরা গোয়াইলার শিরনী আচারটি পালন করে। ভাদ্র মাসের তেব তারিখে এই শিরনী দেওয়া হয়। এর আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ''গোয়াল ঘরের ভিতরে চুলা তৈরী করে ঐ তারিখের (১৩ই ভাদ্র) বিকাল বেলায় তাতে খিচুড়ি পাক করা হয়। একটি মুরগী জবাই করে তার গোস্ত খিচুড়িতে দেয়া হয়। রাত্রে এ খিচুড়ি গোয়াল ঘরে বসেই লোকজনকে খাওয়ান হয়। জবাই করা মুরগীর পালক ও নাড়িভুঁড়ি চুলায় পুঁতে তা মাটি দিয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। পাকের পাতিলটি গোয়াল ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরবর্তী বৎসরের অনুষ্ঠান পর্যন্ত তা সেখানে ঝুলান থাকে।''[২]

মুরগী জবাই করে তার প্রাণের বিনিময়ে গরুর প্রাণ কামনা করার মধ্যে যাদুবিশ্বাস আছে। প্রাচীনকালে বলিপ্রথার মূল কথা ছিল তাই। মুরগীর পালক ও নাড়ি গোয়াল ঘরে পুঁতে রাখার তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যায়। বাংলা, বিহার ও দক্ষিণ ভারতে কোন কোন অঞ্চলে শুকর বলি দিয়ে গরুর মঙ্গল কামনা করা হয়। গোয়ালরা গলা অবধি শুকরকে পুঁতে রেখে তারপর গরুর পাল দিয়ে মাড়িয়ে হত্যা করে। শরৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, এটা হল বসুমাতাকে পূজা দেওয়ার প্রথা। তারা বসুমাতাকে গোরক্ষদেবতা বলে মনে করে।[৩] এটা হিন্দুদের আচার। মুসলমান কর্তৃক মুরগী নিয়ে আচার পালনের মধ্যে বসুমাতাকে পূজা দেওয়ার পূর্বসংস্কারের প্রভাব থাকতে পারে। গরুর গোয়াল ঘরের চালায় হাঁড়ি রাখার অর্থ হল, গরুর ক্ষতি করে এমন প্রেতাত্মা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬

২. পূর্বোক্ত দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২০-২১

৩. op. cit., JDL, pp. 12-13

একই উদ্দেশ্যে গোয়াল ঘরের দরজায় ভাঙা হাঁড়ির গলা ঝুলিয়ে রাখার প্রথা মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের মধ্যে আছে।[১]

গো ফাল্গুনী

গোয়াইলার শিরনীর মত গো ফাল্গুনী গরুর রোগব্যাধি দূর করার জন্য পালন করা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষদিন এটি অনুষ্ঠিত হয়। আচারটির রীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, "সব গরুকে সেদিন গা ধুয়ে দেয়া হয়। শিমুল মান্দারাদি বার রকমের কাঁটা-গাছ পুড়িয়ে গোয়ালে ধুঁয়া দেয়া হয়। পাছনের পরিবর্তে বিশকাটালী দিয়ে গরুকে খেদিয়ে সেদিন মাঠে নেয়া হয়। গাগরা নামক একপ্রকার কাঁটাযুক্ত ছোট ছোট গাছ দিয়ে গরুর গায়ে পিটান হয়। এতে গরুর রোগ প্রতিষেধকের কাজ করে। এ উপলক্ষে রাখালকে ভরপেট দৈ দুধ খাইয়ে পরিতৃপ্ত করা হয়।"[২]

এ আচারেও গাছ-গাছড়ার প্রভাব জড়িয়ে আছে। ইউরোপের কৃষকেরা গরুর মঙ্গল কামনায় গাছের ডাল দিয়ে গরুকে খেদায় এবং ছড়া বলে। ইংলণ্ডে প্রচলিত আচার ও আচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

Under the influence of the animistic belief, the uncultured folk throughout the British Islands regard the mountain-ash, rowan-tree, wicken-tree and whitty-tree in the right of protectives against witchcraft, and strike beasts with a branch of any one of the same, by doing which they believe that their cattle will remain hale and hearty.[৩]

ভোলাভুলি

ভোলা সংক্রান্তিতে[৪] কৃষকেরা এ আচারটি পালন করে। ঐদিন তারা গরুর বিশেষ সেবাযত্ন করে। গরুর দ্বারা কোন কাজ করান হয় না।

১. Ibid., p. 23
২. পূর্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্বিন, ১২৬৩, পৃঃ ৩২১
৩. op. cit., JDL, p. 3
৪. ভোলা সংক্রান্তি বা শিব সংক্রান্তি হল কার্ত্তিকের শেষ দিন। ময়মনসিংহে 'ভোলার দিন' বলতে কার্তিকের শেষ সংক্রান্তিকেই ধরা হয়।
লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬c/১০২ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৩

এরূপ করলে 'বার মাইয়া পিছারী' রোগ থেকে গরু মুক্তি পায়। চাষীরা নিজেরা 'ঘিলা' মেখে স্নান করে পাক ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।[১]

গোরক্ষনাথের শিরনী

গরুর নিরাপত্তার জন্য গোয়াইলার শিরনী আর গাভীর অধিক দুগ্ধ পাওয়ার জন্য গোরক্ষনাথের শিরনী। আচারটি সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, "উঠানের একটি জায়গা পরিষ্কার করে লেপেপুঁছে নেয়া হয়। সেখানে বসিয়ে পাড়ার রাখাল ছেলেপেলেদের পায়েস খাওয়ান হয়।... খাওয়া শেষে তারা এঁটো হাতে গরুর পিঠে কিল দেয়। তাতে গাভীর দুধ বাড়ে। এই শিরনীর সময় পাঁচালী হয়।"[২]

'গোরক্ষনাথের সিন্নী' প্রথার কথা প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'ব্রত ও আচার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি আচারটির এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, "গো-বৎস জন্মিবার এক বিংশতিতম দিবসে গাভী ও বৎসকে স্নানান্তে কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। ঐ গাভীর দুধ দ্বারা কয়েকখানা লাড়ু প্রস্তুত করতঃ সেই সমুদয় খৈ, চিড়া, দুগ্ধ, দধি, মিষ্টিদ্রব্য ও ফলফলাদি একটি অগ্রপাতে স্থাপন করিতে হয়। সন্ধ্যায় এই নৈবেদ্য ও ধূপ-দীপ গোশালার সম্মুখে রাখিয়া প্রতিবেশীদের আহ্বান করিতে হয়। সকলে সমবেত হলে নৈবেদ্য নিবেদন করতঃ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি কথা বলিবেন।...কথা সমাপ্ত হইলে প্রসাদ গ্রহণান্তর সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিবেন।"[৩]

বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত 'শুক্খের ধারের পাঁচালী'র পরিচয় প্রসঙ্গে নিয়মিত সংগ্রাহক আবদুর রহমান ঠাকুর আচারটি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা প্রফুল্ল বাবুর প্রদত্ত বর্ণনা থেকে কিছু ভিন্ন। রহমান সাহেব লিখেছেন, "গাই বিয়ানের একুশ দিন পরে বিশেষ আয়োজন করিয়া শুক্খের ধারের পাঁচালী বলা হয়। বয়াতী গোয়াল ঘরের মাঝ দুয়ারে বসিয়া পাঁচালী বলেন। রাখালেরা তাহার চারিদিকে বসিয়া

১. আবদুল মুনীম চৌধুরী— মুসলিম জীবনে বিজাতীয় প্রভাব, আল-ইসলাহ, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭২
২. পূর্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩ পৃঃ ৩২২
৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী—ব্রত ও আচার, ঢাকা, ১৩৪৭, পৃঃ ৪৮

হেচ্ছ্ বলিয়া দোহার ধরে। বয়াতীর সামনে একটা ঘটি থাকে, আরো থাকে পাঁচ প্রকার পাতা, যেমন আম, বেল, জাম, মান ইত্যাদির পাতা। ধান, ফুল, চন্দন, তিল, আতপ চাউল, হরিতকী ইত্যাদিও দেওয়া হয়। অন্যত্র কলার মাইজ পাতায় থাকে পাঁচটা নাড়ু। আর একটা কলাপাতায় আরও পাঁচটা নাড়ু রাখা হয়। এগুলিকে বলা হয়, 'বাগনাড়ু'। ···পাঁচালী বলার পর পাঁচজন রাখালে বাগনাড়ু খায়। তারপর বয়াতী একজন রাখালকে গোয়াল ঘরে যাইতে বলেন। রাখাল গোয়াল ঘরে গেলে বয়াতী তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। রাখাল গোয়ালঘর হইতে প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়।··· সর্বশেষে বয়াতী রাখালকে গোয়াল ঘর হইতে বাহির হইতে বলেন। তখন বাহিরের রাখালেরা পানি ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে খুব সাজা দিয়া থাকে।"[১]

সম্ভবতঃ স্থানভেদে ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভেদে তাঁদের বর্ণনায় পার্থক্যটুকু এসেছে। আচারের মূল ক্রিয়া ও প্রধান উদ্দেশ্য অভিন্ন। পাঁচালীতে গরুর বেশী দুধ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

এই গাইয়ের দুই বাছুর—হেচ্ছ্।
চিতকপাইল্যা দাদুর বাছুর—হেচ্ছ্।
গাইয়ের নাম চ্যাল্লামুড়ি—হেচ্ছ্।
দুধ অয় আঠার কুড়ি—হেচ্ছ্।
গাইয়ের নাম বাসবিজলী—হেচ্ছ্।
দুধের মধ্যে চান্দের জিলি—হেচ্ছ্।
গাইয়ের নাম কাঞ্চাসুনা—হেচ্ছ্।
গাইয়ের দুধে মধুর বাসনা—হেচ্ছ্।
·· ···
রাজায় খায় প্রজায় খায়—হেচ্ছ্।
তবু দুধ গড়াগড়ি যায়—হেচ্ছ্।[২]

—ঢাকা

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'গোরক্ষনাথের পূজা'র কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গোরক্ষক হিসেবে গোরক্ষনাথের নাম এসেছে, তিনি নাথ সম্প্রদায়ের

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২, ঢাকা, ১৯৬৬
২. ঐ, 'ধান কাটি কাটি পাচালী' দ্রষ্টব্য।

আদি গুরু গোরক্ষনাথ নন।[১] প্রফুল্লবাবু এঁকে প্রচ্ছন্ন 'বৌদ্ধ দেবতা' বলে অনুমান করেছেন। তিনি গোবৎস রক্ষক হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে পূজিত।[২] আশুতোষ বাবু 'গোরক্ষনাথের সিন্নী'র অনুরূপ 'গোরক্ষনাথের পূজা'র আচারগত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রিত কৃষক ও রাখাল বালকগণ ছড়া আবৃত্তি করে।[৩] পাবনা জেলায় এ উপলক্ষে 'গোরক্ষনাথের ব্রত' পালনের কথা বলেছেন শরৎচন্দ্র মিত্র। তাঁর মতে, বাছুর হওয়ার ৩০ দিনের দিন দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দুয়ে তার সবটাই পাত্রে জাল দিয়ে গাঢ় করা হয়। তারপর চিনি মিশিয়ে তা দিয়ে গরু ও বাছুরের মূর্তি, নাড়ু, স্বস্তিকা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। সন্ধ্যার সময় একটি রাখাল বালক একটি কলাপাতায় ভোগের দ্রব্য নিয়ে গোয়াল ঘরের কোণে রেখে দেয়। লোকবিশ্বাস, গরুর দেবতা গোরক্ষনাথ এসে এ ভোগের দ্রব্য গ্রহণ করে। বালকটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলে অপর একটি বালক তাকে আশেপাশের কোন পানিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে অনেক সময় হাতাহাতি হয়। এটা আসলে ভাল দেবতার সহিত অপদেবতার সংগ্রাম। এর পর সব বালকেরা মিলে গোরক্ষনাথের পাঁচালী বলে।[৪]

দৈ পান্তা

গাভীকে উপলক্ষ করে অধিক দুধ পাওয়ার কামনায় দৈ পান্তা আচার অনুষ্ঠিত হয়। গাভীর প্রসবের সাত দিন পর প্রথম দোহন করে সেই দুধে দৈ এবং পান্তা ভাত দিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দৈ পান্তা আচারটি এরূপ : গাভী প্রথম দোহন করে কাঁচা দুধে দই পাতা হয়। পরের দিন গরম ভাত পাক করে পানি ঢেলে পান্তা তৈরি করা হয়। পাড়ার রাখালদের ডেকে এনে গোয়াল ঘরে একটি গোটা কলার পাতায় উক্ত দই ও পান্তা রেখে খাওয়ান হয়। রাখালেরা পাতার চার-দিক ঘিরে বসে আমোদস্ফূর্তি করে খায়। খাওয়ার শেষে গৃহস্থ এক

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫
২. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৮
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫
৪. op. ct., JDL, pp. 18, 24

কলসি পানি তাদের মাথায় ঢেলে দেয়।[১] পানি ঢালার মধ্যে অনুকরণধর্মী যাদুবিশ্বাসের প্রভাব থাকতে পারে। কলসিভর্তি পানির মত গরু তাদের ভাঁড়ভর্তি দুধ দেবে। আচারের দ্বারা কৃত্রিম নকল তুলে আসল ফল কামনা হল এ শ্রেণীর যাদুবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য।

কুলের মাগন

কুলের মাগন রাখাল বালকদের নিজস্ব আচার। তারা পৌষের শুক্লপক্ষে শেষের দিকে কয়েক দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে চাল সংগ্রহ করে। পীরের দোহাই দিয়ে গান গাওয়া হয়।[২] কোথাও 'গুরুনাথে'র দোহাই দেওয়া হয়।[৩] গুরুনাথ গোরক্ষনাথের সহিত অভিন্ন। গ্রামবাসীরা গোরক্ষক পীর বা দেবতা হিসেবে তাঁকে মান্য করে। 'গোরখে'র দোহাই দিয়ে কড়ি মাগনের কথা বলেছেন রওশন ইজদানী সাহেব। তাঁর মতে, চৈত্র মাসে গ্রামের হাটে 'বারুনী মেলা' বসলে কিশোর রাখাল ছেলেরা দল বেঁধে পথের ধারে গামছা পেতে গোরখের নামে শিরনী প্রার্থনা করে। একে 'গোরখের লাই' পাতা বলে। এ উপলক্ষে মাগনের ছড়া বলা হয়।

অক্ষিলো মেনা গাই
গোরখের নামে সিন্নি চাই।
গোরখের লাই, গোরখের লাই।।
এক কড়া, দুই কড়া, কড়া তিন চাইর
আরেক কড়া হইলে আমরা গোরখেরে বুঝাই।
হাটো যাও হাটুল্যা ভাই পন্থে সারি সারি,
গোরখের লাগি কিইন্যা আইনো অগ্নিপাটের শাড়ি।
আমরা যে রাখুয়াল ভাই আমরা কিছু পাই,
চালিয়া চল্লিশ কড়া গোরখের বুঝাই।[৪]

১. পূর্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২
২. ঐ, পৃঃ ৩২১
৩. গোলাম কাদির—আমাদের লোকসাহিত্যের একদিক, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৭৭
৪. রওশন ইজদানী—মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮০-৮১

প্রকৃত আচারটি পালন করা হয় পৌষ মাসের শেষ দিন। মাগনের চালে 'ফিরনী' রান্না করে রাখালেরা খায় আর 'চিতাই পিঠা' তৈরি করে গরুকে খাওয়ায়। ঐদিন সকাল বেলা গোসল করে আসার সময় পানি এনে গরুর পা ধুয়ে দেয়। চালের গুঁড়ার সঙ্গে পানি মিশিয়ে তা সাদা, লাল, নীল প্রভৃতি রঙ করে তাতে কলকের মুখ ডুবিয়ে গরুর পিঠে ছাপ দেওয়া হয়।[১] পাবনা জেলায় এ আচারটির নাম 'গরুকে পিঠা খাওয়ানো'। প্রফুল্লকুমার দাস একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বলেছেন, পৌষ সংক্রান্তির দিন রাখালেরা সকালে স্নান করে গাভীর পুচ্ছাগ্রভাগ কেটে দেয় এবং আলপনার জলে কল্কের মাথা ডুবিয়ে গরুর গায়ে ছাপ দেয়।[২]

১. পূর্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২

২. প্রফুল্লকুমার দাস—চিত্রশিল্পে পল্লীরমণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

লৌকিক পীরবাদ

খ্রীস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতক থেকে বাংলাদেশে পীরদরবেশ, সুফীসাধকগণ ইসলামধর্ম প্রচার শুরু করেন। মধ্যযুগে মুসলিম বিজয়ের পর শাসকদের সহায়তায় সে প্রচার ব্যাপকতা লাভ করেছিল। মুসলমান সুলতানগণ প্রধানতঃ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যবিস্তার এবং শাসনকার্য পরিচালনায় অধিক ব্যাপৃত ছিলেন। সরকারী অর্থানুকূল্যে কোথাও কোথাও মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে, কোন কোন পীরদরবেশ 'পীরপাল' বা নিষ্কর ভূমি অথবা মাসোহারা পেয়েছেন,[১] কিন্তু তথাপি দেশের সর্বত্র

---

১. ইবন বতুতা (১৩৪৬ খ্রীঃ বাংলাদেশে আগমন) তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেছেন, যেমনা নদীর পারাপারে পীরদরবেশদের 'পারানি' লাগত না, মুসলমান ফকিরেরা হবংক শহরে প্রবেশ করলে লোকের কাছ থেকে আধ দিনার করে দান পেতেন—এ সম্পর্কে সরকারী ফরমান ছিল। (Dr. Mehdi Hussain, ed—The Rehla of Ibn Battuta, Oriental Institute, Baruda, 1953.)
শেখ আলাওল হক (মৃত ১৩৯৮ খ্রীঃ) প্রথম দিকে গৌড়ের রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য পেতেন। সে টাকায় তিনি গরীব, ভিখারী ও পথিকদের খাওয়াতেন। (Dr. Abdul Karim—Social History of the Muslims in Bengal, p. 104)
সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫১৯ খ্রীঃ) শেখ নুর কুতব আলমকে তাঁর দরগাহর পার্শ্ববর্তী কয়েকখানা গ্রামের ভোগস্বত্ব দান করেন। (ঐ, পৃঃ ১০৮)। রাজশাহীর 'সত্যপীরের ভিটা'র স্বত্বাধিকারী লাখেরাজ জমি ভোগ করেন। (Dr. Abdur Rahim—Social & Cultural History of Bengal, Vol. 11, p. 389)
শাহ সুজা (১৬৩৯-৫২ খ্রীঃ) মাদারিয়া সম্প্রদায়ের খাদেমদের এক সনদে 'মদারী মিছিল' উদ্‌যাপন করার অধিকার দেন; তিনি কিছু পীরপাল বা মাসোহারারও ব্যবস্থা করেন। (ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৯, ২য় সংস্করণ)।

ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা সুলতান-সুবেদার-নবাবেরা গ্রহণ করেননি। এরূপ অবস্থায় ধর্ম প্রচারের ভার পীরদরবেশ-ওলি-আউলিয়াদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জনসাধারণের কাছে থেকে ইসলামের বাণী, আদর্শ ও রীতিনীতি প্রচার করেন। তাঁদের গ্রাম-নগর, শহর-বন্দর ভেদ ছিল না, তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসার প্রয়োজন হয়নি, তাঁরা বড় রকমের 'সংঘ' প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করেননি, লোকালয়ের আশেপাশে অনাবৃত আকাশের নীচে টিলায় কি গাছতলায় একটু স্থান করে নিয়ে তাঁরা একাধারে নিজেরা সাধনা করেছেন, অন্যধারে সাধনার ধন সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছেন। দেশের নানা স্থানে যে অসংখ্য আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ, চিল্লাখানাহ, মাজার, মকবরা প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে সেগুলিতে সে যুগের পীরদরবেশগণের একনিষ্ঠ ধর্মকৃত্যেরই পরিচয় নিহিত আছে। তাঁদের চারিত্র-মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগ, মানবসেবা ও ধর্মনিষ্ঠায় জনগণ আকৃষ্ট হয়ে চারপাশে জড় হয়েছে এবং সত্যধর্মের আলোকশিখায় চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তকর্মের নিশানা পেয়ে দীক্ষা নিয়েছে, মুরিদ হয়েছে। অবশ্য তাঁদের কাজ-কর্ম, প্রভাবপ্রতিপত্তি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁরা নিজেদের নানাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং নানা মত ও পথের সন্ধান দিয়ে দুর্ভাগ্য-পীড়িত দেশবাসীর চিত্তলোকে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

'পীর' ফারসী শব্দ; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বৃদ্ধ ব্যক্তি'।[১] কিন্তু প্রচলিত ধারণায় এ অর্থ প্রযোজ্য নয়; 'আধ্যাত্মিক গুরু' অর্থে মুসলমান সাধক পীর আখ্যা পেয়ে থাকেন। পীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মহাজ্ঞানী, শুধু তাই নয়, তিনি অতিমানবিক (super human) এবং অতিলৌকিক (super natural) ক্ষমতারও অধিকারী। তিনি পাপীতাপীর মুক্তি ও চিত্তশুদ্ধির পথ দেখান। তাঁর অনুগ্রহে মজলুম মানুষের কামনা হাসিল হয়। পীরের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়।[২] লোকপ্রচলিত বিশ্বাস,

---

১. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক—বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৩০

২. তসলীমুদ্দীন আহমদ— পীর, সত্যপীর, পীরবদ্রহক, বড়পীর, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১০ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২২, পৃঃ ৩৪

পীর হলেন আল্লাহর সাক্ষাৎ 'প্রতিমূর্তি'।[১] 'শেখ', 'মুর্শিদ', 'ওস্তাদ,' 'হুজুর' প্রভৃতি পীরের দোসর শব্দ।[২] হিন্দুর 'যোগী', বৌদ্ধের 'থের' প্রভৃতি পীর শব্দের সমার্থবাচক। ইসলামের সুফীমতবাদ থেকে পীরের গুরুতত্ত্বের উদ্ভব। শুদ্ধ ও সিদ্ধ ব্যক্তিই সুফী, তিনিই পীর, তিনিই মুর্শিদ।

সুফী মতে পীরবাদ এবং হিন্দুধর্মমতে গুরুবাদ একই চেতনাপ্রসূত। উভয়ই অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়। তবে গুরুবাদে গুরুর স্থান এবং পীর-বাদে পীরের স্থান এক নয়। তাঁদের সাধনার পথ ও মত ভিন্ন ধরণের। হিন্দুর যোগতন্ত্রে গুরুবাদের স্থান আছে, তান্ত্রিক আচারে গুরুর গুরুত্ব আরও বেশী। তান্ত্রিক যোগাচারের লক্ষ্য কায়াসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা। যোগাচার শারীরক্রিয়া ভিত্তিক। সিদ্ধগুরুর শিষ্যত্বে থেকে অদীক্ষিত ব্যক্তি কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা যোগতত্ত্ব আয়ত্ত করে। ভারতে তান্ত্রিক যোগধর্ম খুব প্রাচীন। বেদে তন্ত্রাচারের আভাস আছে।[৩]

বৈদিক যোগধর্ম যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন তা নানা আচার-সংস্কারে বিকৃত। নিষ্কাম কায়াসাধনা সকাম যৌনাচারে পর্যবসিত হয়েছিল। সহজিয়ামত, বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, শাক্তধর্ম, বাউলধর্ম প্রভৃতি গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ও চতুষ্পার্শ্ব অঞ্চল থেকে এগুলির উৎপত্তি। মুসলমান সুফীরা শরিয়তপন্থী নন, মারিফত বা মরমীপন্থী। শরিয়ত পন্থায় কোরান-হাদিসের বাণীই একমাত্র ধর্মসাধনার দিগদর্শন। আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্ক ভক্তি ও উপাসনার। কোরান-হাদিসের জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রাধান্য দিয়ে সুফী মরমীবাদের প্রতিষ্ঠা। বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড নয়, প্রেম ভক্তি দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ তথা তাঁর সাথে একাত্ম হওয়ার সাধনা সুফীমতবাদের লক্ষ্য।[৪] পীর-মুর্শিদের কাছে মুরিদ এরূপ সাধনায় দীক্ষা নিতে পারে। সুফীমত সম্পূর্ণ মিস্টিক, এতে

---

১. বঙ্গে সুফীপ্রভাব, পৃঃ ২২৫

২. ERE, Vol. X, p. 40

৩. ডঃ আহামদ শরীফ—বাংলার সুফী সাহিত্য, পৃঃ ঐ (ভূমিকা)।

৪. Sufism speaks of advancement in the spiritual life as a 'journey' and the seeker after God as a Salik or 'traveller', Its teaching is intended to guide the traveller to the attainment of perfect 'knowledge' (marifat) of God, the

কোন কায়া সাধনা নেই। গুরুবাদী হিন্দুধর্মের সহিত পীরবাদী সুফী-মতের এখানে মৌলিক পার্থক্য। সুফীমতের উদ্ভব আরবভূমিতেই, তবে পারস্যভূমিতে এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হয়। এটা খ্রীস্টীয় আট শতকের দিকে ঘটে।

দশম দশকের দিকে ভারতবর্ষে পীরদরবেশগণ আসতে শুরু করেন। তাঁরা তৎকাল-প্রচলিত সুফীমতের আদর্শ বহন করে এনেছিলেন। ভারতে এসে পরবর্তীকালে এদেশীয় তান্ত্রিক যোগধর্মের প্রভাবে[১] পড়ে মরমীয়া পীরবাদ ক্রমশ: আনুষ্ঠানিক পীরাচারে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে পীর গুরুমাত্র নন, হিন্দুর দেবতার তুল্যমূল্য তাঁর স্থান। জীবিত অবস্থায় কেউ কেউ হয়ত 'মানুষ-গুরু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁরা অনেকে 'দেব-গুরু'তে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে, লৌকিক চেতনায় পীরের দেবত্ববাদের ধারণাটি সুস্পষ্ট। বাঙালী

only Reality defused through all things. Subsequently, the wandering soul is led onwards by slow stages and through the experience of certain stages, along a path to desired goal of union with God, called fana-fil—haqiqat, absorption in Reality.' J. A. Subhan—Sufism, Its Saints and Shrines. Quot. from Social History of the Muslims in Bengal by Dr. Abdul Karim, p. 84

১. হিন্দু যোগদর্শনের সহিত মুসলমান সুফীরা পরিচিত ছিলেন। এমন কি তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ হিন্দু যোগশাস্ত্রের ফারসী-আরবী অনুবাদ ও অনুশীলন, যথা—কাজী রুকন-অল-দীন অল-সমরকন্দী (মৃত-১২১৮ খ্রী:) কর্তৃক সংস্কৃত 'অমৃতকুণ্ডে'র প্রথমে ফারসী ও পরে আরবী অনুবাদ। অনুবাদক লখনৌতির সুলতান আলিমর্দান খিলজির (১২১০-১৩ খ্রী:) সময়ে বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন। সমালোচকের মতে, কাজী সাহেব স্বয়ং যোগবিজ্ঞান চর্চা করে সফলতা লাভ করেছিলেন। Social History of the Muslims in Bengal, pp. 62-66
মুসলমান কবির লেখা বাংলা ভাষার কয়েকখানি যোগতত্ত্বের গ্রন্থ পাওয়া যায়:—
ক. আদ্যপরিচয়—শেখ জহিদ (পনের শতক)।
খ. জ্ঞান-প্রদীপ—সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)।
গ. যোগ-কলন্দর—সৈয়দ মর্তুজা (সতের শতক)।
ঘ. আগম ও জ্ঞানসাগর—আলি রজা (আঠার শতক)।

জনসাধারণ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক পীরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বিবিধ আচার পালন করে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশে পীরবাদ সুফীমতের প্রভাবজাত হয়েও দেবত্ব কল্পনায় একদিকে চূড়ান্ত বিকার ও অন্যদিকে স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

ডঃ এনামুল হক সাহেবের মতে, পীরবাদের 'গুরুকল্প' ও 'দেবকল্প' ধারণা বাংলার ভূমিতে জন্মলাভ করেনি, বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতে, যে সমস্ত পীরদরবেশ বাংলাদেশে ইসলামধর্ম প্রচার করেন তাঁরা প্রথমাবধি বিকৃত সুফীমতবাদেরই ধারক। তাঁর অভিমত, পীরবাদ বৌদ্ধ 'থেরবাদে'র দ্বারা প্রভাবিত— পীরপূজা থেরপূজার অনুরূপ, গোরপূজা চৈত্যপূজার অনুরূপ। পারস্য, বোখারা, সমরকন্দ, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধরা খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের দিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা নেয়; তখন থেকে তাদের মধ্যে তত্ত্বধর্মী সুফী-মতে আচারধর্মী বৌদ্ধমতের প্রভাবের ফলে শরিয়ত বিরোধী পীরবাদের উদ্ভব হয়।[1] সাধারণভাবে হিন্দুরা ঈশ্বরের 'অবতারবাদে' বিশ্বাসী। যোগতন্ত্রমতে মানুষ হল ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিভূ। অতএব অবতাররূপী মানবপূজা ঈশ্বর-পূজারই নামান্তর, জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার বাস। শূন্যবাদী বৌদ্ধরা হিন্দুর প্রভাবে পূজা করতে গিয়ে মানুষকেই দেবতার স্থানে বসিয়েছেন। থের বা ধর্মগুরু সেই দেবতুল্য মর্তমানব। একেশ্বরবাদী মুসলমানরা বিধর্মী প্রভাবে যখন বেশরা আচারের দাস হয়ে পড়েছে তখন মানুষ পীরকেই পূজ্য করেছে। পীরবাদ, থেরবাদ, অবতারবাদের এরূপ কল্পনায় পীরবাদের সাথে থেরবাদের মিল অধিক। ডঃ হকের অভিমত, ধূপ-ধূনা, চন্দন, পুষ্পাদি দ্বারা বৌদ্ধ-চৈত্যপূজা, মুসলমানের গোলাপ, আতর, লোবান, ধূপবাতি ইত্যাদি দ্বারা পীর-দরগাহ পূজা একই প্রেরণাসঞ্জাত; দ্রব্যাদির রূপান্তরে ইসলামী লেবাস পরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।[2]

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কীরা বাংলাদেশ অধিকার করেন। তখন থেকে সুফীদেব আগমনের পথ সুগম হয়। বাংলার সরস প্রকৃতি তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে (ষোল

১. বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ২২৯-৩০
২. ঐ, পৃঃ ২৩১

শতক) সুফীসাধক মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এক পত্রে লিখেছিলেন, God be praised: What a good land is that of Bengal where numerous saints and asceties came from many directions and made it their habitation and home...in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down.[১]

অর্থাৎ সুফীরা এদেশে এসে গ্রাম-ঘর-নগর-বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ধর্মপ্রচারে জীবনপাত করেছেন। বাংলাদেশকে আপন করে নিয়ে এদেশের জনগণের সহিত একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পেরেছিলেন এজন্য যে, বাঙালীর জীবনবোধ ও ধর্মবোধের সহিত তাঁদের প্রচারিত রীতি-আদর্শের কোন বিরোধ বাধেনি। বরং তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় পীড়িত মানবাত্মা পরকল্যাণব্রতী, সেবাপরায়ণ, আত্মত্যাগী সুফী-সাধকদের উদারমুক্ত ছত্রচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিল। এজন্য বাংলাদেশে সুফীমত প্রচার সম্ভব হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের পর থেকে ভারতে প্রধান প্রধান দরবেশের ব্যক্তিত্বে যে সব তরীকা সৃষ্ট হয়েছে বাংলাদেশে সেগুলির অধিকাংশেরই ভক্তদল গড়ে উঠেছে। ভারত উপমহাদেশের এরূপ কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম চিশতিয়া, কাদরিয়া, সুহরওয়ার্দীয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, কলন্দরিয়া, মাদারীয়া, অদহমিয়া, পাঁচপীরিয়া প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে বাংলায় কলন্দরী, মদারী ও অদহমী মতবাদের প্রভাব অধিক হয়েছিল।[২] এছাড়া লৌকিক সত্য-পীরকে কেন্দ্র করেও একটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রভাব আরও ব্যাপক ছিল।

বাংলাদেশে পীর ও তাঁর কেরামতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা শুরু হয় মুসলিম বিজয়ের সময় থেকেই। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজীর অলৌকিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রচয়িতা হলায়ুধ মিশ্র লক্ষ্মণ সেনের

১. Quot. from Hasan Askari in Bengal : Past and Present, Vol. XVII, pp. 35-36

২. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৭-২৮

সভাকবি ছিলেন।[১] পীর শাহ মাদারেব জিকর ধ্বনি 'দম্মদারে'র (দম-ই-মদার) উল্লেখ পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে'। এতে 'ফকির' তথা দরবেশেরও উল্লেখ আছে। পনের শতকের শেষার্ধে 'রসুল বিজয়ে'র কবি জৈনুদ্দিন স্বীয় পীরের বন্দনা করেছেন।[২] ষোল শতকের গোড়ায় কবি কঙ্ক সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। ঐ শতকের শেষের দিকে শেখ ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর' কাব্য রচনা করেন। এতে সত্যপীরেব অলৌকিকতার বর্ণনা আছে। তাঁর অন্য কাব্য 'গাজীবিজয়' পীর ইসমাইল গাজীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য। ষোল শতকের মাঝামাঝি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী ও দরগায় বাতি দেওয়া এবং পীরের নাম জপ করার কথা বলেছেন।[৩] ঐ শতকের শেষে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কালবস্ত্র পরিহিত পীরের কথা আছে।[৪] সতের শতকেব অধিকাংশ মুসলমান কবি পীর-বন্দনা করে কাব্য আরম্ভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ খান, মুহম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, আবদুল হাকিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ খান স্ব স্ব পীরের আদেশে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে আত্ম-বিবরণীতে স্বীকার করেছেন। আঠার শতকের দোভাষী পুঁথি রচয়িতারা একাধারে লৌকিক পীরকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন, অন্যধারে নানাভাবে পীরস্তুতি করে তাঁদের মহিমা প্রচার করেছেন। 'কালুগাজী-চম্পাবতী', 'সত্যপীরের পাঁচালি', 'মানিকপীরের গীত', 'বনবিবির জহুরনামা' প্রভৃতি পুঁথিতে দেবকল্প লৌকিক পীরের

---

১. ঐ, পৃঃ ২৭

২. ঐ, পৃঃ ৬১

৩. ছিলিমিলি মালাধরে জপে পীব পয়গম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
সাঁজে ডালা দেয় হাটে পীরের শীরনী বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ॥
উদ্ধৃত : চণ্ডীমঙ্গল, বঙ্গবাসী কার্যালয় সংস্করণ, পৃঃ ৮৬

৪. সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর ॥
উদ্ধৃত : চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ২২৬

মাহাত্ম্য বর্ণনা ও পূজা প্রচার করা হয়েছে। ফকির গরীবুল্লাহ সত্য-পীরের পুঁথিতে পীর বড় খান গাজীকে 'আধ্যাত্মিক গুরু' বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি পীরের স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য করে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এগুলি মঙ্গলকাব্যের দেবীবন্দনা, দেবীপূজা ইত্যাদির অনুরূপ। বাংলার পীরবাদের উপর হিন্দুর লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব আছে, এতে তারই স্বাক্ষর মিলে। শিক্ষিত কবিদের রচনার এসব দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়, পীরবাদ বাঙালীর সমাজজীবনে ও মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শিক্ষাদীক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত লোকমানসে এ প্রভাব আরও ব্যাপক, আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পীর লোকচেতনায় দেবাত্মায় পরিণত হয়েছেন। তাঁরা কেবল ধর্মজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন নয়, প্রত্যহের কর্মজীবনেও জনগণের চিত্তলোকে আসন দখল করেছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা—লোকসঙ্গীত, পালাগান, ছড়া, লোক-বিশ্বাস, প্রবাদ, কিংবদন্তী, ব্রতকথা প্রভৃতি রচনায় এবং শিরনী, মানত, কবরপূজা, দরগাহপূজা, ওরসপালন ইত্যাদি লোকাচারে ও লোকোৎসবে পীরের বিচিত্র তথ্য পাওয়া যায়। পীর সম্বন্ধে এসব লৌকিক ধ্যান-ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত হলেও নিতান্ত লঘুকল্পনার বিষয় নয়; রোগশোকপীড়িত ও অভাব-অনটন জর্জরিত লোকসমাজে পীরের সেবা, সাহায্য, অনুগ্রহ নিত্য কাম্য ছিল। সুতরাং তাঁদের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত পূজা-অর্চনা জনগণের অন্তর্লোকের গূঢ় বিশ্বাসেরই ফল।

এখানে সমাজতত্ত্বের আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পীরপীরানীদের বাৎসরিক ওরস পালন উৎসবে তাঁদের মাজার, আস্তানা বা কৃত্রিম দরগাহে 'মেলা'র আয়োজন করা হয়। মেলা হল গ্রাম-বাংলার লৌকিক আনন্দোৎসবের অন্যতম উৎস। একটি মেলায় দূর-দূরান্ত হতে ধার্মিক ভক্ত থেকে বিধর্মী দর্শক পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিড় হয়। এবং এখানে ধর্ম-কর্ম উদ্‌যাপন থেকে লৌকিক উপায়ে আমোদ-প্রমোদের যথা গান-বাজনা, খেলাধূলা, প্রদর্শনী, বেচাকিনা ইত্যাদির আয়োজন হয়। বাংলার গ্রাম্যমেলা প্রকৃতপক্ষে একটি মিলন ক্ষেত্র— হিন্দুর মেলায় মুসলমান এবং মুসলমানের মেলায় হিন্দু—উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্দ্বিধায় আগমন এবং যোগদান করতে

পারে। ভক্তরা পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী, প্রাণী, পয়সা উপহার দিয়ে মানত পূরণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মেলায় যোগদানের আমোদটুকুও উপভোগ করে। দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট একঘেঁয়ে জীবনের পীড়ন এবং যন্ত্রণা থেকে মুহূর্তের জন্য মুক্তি লাভের একটি আশ্রয়স্থল এসব বাৎসরিক মেলা। পীর-ভক্তরা পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে পবিত্র মনে এবং প্রফুল্ল চিত্তে ঐ দিনটি অতিবাহিত করে। ধর্মসম্পৃক্ত সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকেও পীরপীরানিগণ জনসাধারণের চিত্তলোকে স্থান দখল করেছিলেন। গাজীর মেলা, বনবিবির মেলা, মাদারের মেলা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বহু জাগায় উদ্‌যাপিত

এভাবে ইসলামী শরিয়ত বহির্ভূত বেশরা বেদাত পীরবাদ আশ্রিত বাংলার মুসলমান সমাজে যে নতুন ধর্মমত গড়ে উঠেছিল, পণ্ডিতগণ এর নাম দিয়েছেন 'লৌকিক ইসলাম'।[১] লোক প্রভাবিত ধর্মব্যবস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। কারণ, তার প্রতিষ্ঠিত কোন দার্শনিক ভিত্তি থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বাংলার 'লৌকিক ইসলাম' কথাটি আঞ্চলিক অর্থেই গৃহীত ও বিবেচ্য।

বাংলাদেশে পীরবাদ তথা লৌকিক ইসলামের প্রাধান্য লাভের কারণ কি তা অনুসন্ধানের বিষয়। ডঃ হক লৌকিক ইসলামের উদ্ভব-প্রভাবের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন— হিন্দু ও বৌদ্ধের ইসলাম ধর্মান্তর গ্রহণ, হিন্দুয়ানি পারিপার্শ্বিকতার সংসর্গ এবং পূর্ব সংস্কার তথা সুপ্ত মানসিকতার জাগরণ।[২] বাঙালী মুসলমানের বিশেষভাবে জাতিতত্ত্ব এবং সাধারণভাবে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ডঃ হকের এমত সংগত ও সমর্থিত। তবে মধ্যযুগের বাঙালীর জাতীয় জীবনের আরও দিক আছে। সমসাময়িক বাঙালীর ধর্মজীবন, কর্মজীবন, সমাজজীবন, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি জাতীয় জীবনব্যবস্থার এক বৃহৎ পটভূমিতে এর উৎসমূল ও সাংগঠনিক উপাদান নিহিত আছে। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, কিংবদন্তী প্রভৃতি নানা সূত্রে পীরদের পরিচয়কে কেন্দ্র করে লোকপ্রচলিত যে

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব, ২১৭
২. ঐ, পৃঃ ২১৭-২০

ধারণা গড়ে উঠেছিল তার মোটামুটি স্বরূপ হল :

ক. পীরগণ ধর্মগুরু : তাঁরা আধ্যাত্মিক মহিমায় বলীয়ান। আড়ম্বর বর্জিত শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন করেন ; ভোগ নয়, ত্যাগই তাঁদের জীবনাদর্শ। ধর্মজীবনে সাধনভজনে এবং কর্মজীবনে পরার্থপরতায় তাঁরা নিষ্কলুষ চারিত্রমহিমার অধিকারী ছিলেন।

খ. পীরগণ অতিমানবিক তথা অতিলৌকিক ক্ষমতা ধারণ করেন। তাঁদের কেরামতি সর্বজনবিদিত। এর দ্বারা তাঁরা অঘটন সংগঠন করতে পারেন। তাঁরা যত্রতত্র গমন করতে পারেন, রূপ-রূপান্তর বা অশরীরীমূর্তি গ্রহণ করতে পারেন। প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও দৈবদুর্বিপাক নিরোধ করতে পারেন। তাঁদের আশীর্বাদে মৃতব্যক্তি প্রাণ পায় ও অভিশাপে জীবিত ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

গ. তাঁরা ভবিষ্যদ্বক্তা : মানুষের জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ, কর্মের পূর্ব ফলাফল বলতে পারেন এবং তদনুযায়ী ফলপ্রদ ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

ঘ. পীরগণ সম্মোহন শক্তির অধিকারী : তাঁদের ব্যক্তিত্বে শত্রু হতচেতন এবং মিত্র মোহমুগ্ধ হয়। বৌদ্ধ ডাক-ডাকিনীরাও এরূপ ক্ষমতা রাখতেন।

ঙ. তাঁরা মনস্কামনা পূর্ণ করেন। নিঃসন্তানকে সন্তান দেন, নিষ্ফলা বৃক্ষকে ফলবতী করেন। তাঁদের নেকনজর ও অনুগ্রহে মানুষ আরব্ধ কার্যে সফলতা লাভ করে ; বিবাদ-বিসংবাদে শত্রুকে জয় ও বিমুখকে বশ করতে পারে।

চ. তাঁদের রোগ-ব্যাধি নিবারক ও নিরাময় ক্ষমতা আছে। তাঁদের চেষ্টায় অন্ধের অন্ধত্ব, খঞ্জের খঞ্জত্ব দূর হয়। তাঁরা মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, আক্রান্তকে রোগমুক্ত করেন। পীরের ঝাড়ফুঁক মন্ত্রৌষধির মত কাজ করে।

ছ. তাঁরা আর্তের সহায়ক : দরিদ্রকে অন্ন, দুর্গতকে আশ্রয়, পীড়িতকে সেবা, অজ্ঞকে জ্ঞান দান করেন। পরোপচিকীর্ষা তাঁদের ব্রত।

জ. তাঁরা জীবজন্তুর উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন। সাপ, বাঘ, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র পশু তাঁদের বশ মানে এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করে। মানুষ পীরের অনুগত হলে এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। গরু-বাছুরের জীবন-মৃত্যুও পীরের হাতে। অর্থাৎ জান-মালের জিম্মাদার তাঁরা।

ঝ. তাঁরা আগুন-পানির উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন। বিপদাশঙ্কায় তাঁদের দোহাই দিলে অথবা বিপদকালে তাঁদের চরণ শরণ করলে ভক্ত দুর্যোগ-দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পায়।

ঞ. পীরের অনুগ্রহে মানুষের যেমন ইহলোকের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাঁর মধ্যস্থতায় তেমনি পরলোকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। মুরিদের জন্য তাঁর দোয়া আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে ও মঞ্জুর হয়।

বাঙালী মুসলমানের জাতিতত্ত্বে আর্য-সেমীয় রক্ত সম্পর্ক খুব কম। নিপীড়িত বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বৃহত্তর লোকসমাজ গড়ে তুলেছে। তাদের দেহে মিশ্র ও অবিমিশ্রভাবে অনার্যরক্ত প্রবাহিত। ইসলামের উদার আদর্শ, সাম্যনীতি ও মৈত্রিগুণে তারা সহজে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। পীর দরবেশগণ যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে ধর্মান্তরীকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও প্রকৃত দীক্ষা সর্বত্র সম্ভব হয়নি। কেবল একটি কলেমা পাঠ করে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থাকে একদিনে তারা বর্জন করতে পারে না। হিন্দু নমঃশূদ্র কৃষক হল মুসলমান 'চাষা', তাঁতী হল 'জোলা', জেলে কৈবর্ত হল 'নিকারী' বটে কিন্তু পেশায় লাঙল টানা, তাঁত বোনা, মাছ ধরার রীতি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত থেকে গেল। রাজানুগ্রহ, উচ্চবৃত্তি, অর্থভোগের সুযোগ গুটিকতক লোকে পেয়েছিল, দরিদ্র পল্লীবাসীর দরিদ্রদশা দূর হয়নি। সামন্তবাদী রাষ্ট্রের ধর্ম তা নয়। রাজা প্রজাস্বার্থের চেয়ে নিজ স্বার্থ

বড় করে দেখতেন ; বেতনভুক রাজকর্মচারীরা সর্বতোভাবে রাজাকেই সাহায্য করতেন ; প্রজারা ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ফলে তাদের দরদী লোক ছিল না। এদিকে রোগ শোক, ব্যাধি-মহামারী, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, আগুন-পানি ও দস্যু-তস্করের ভয় কমবেশী পূর্ববৎ থেকেই গেল। সাপে কাটলে মন্ত্র-জ্ঞানী ওঝার আশ্রয় নিত, সাপের ভয় দূর করার জন্য মনসাদেবীর পূজা করত। মড়কের সময় এক রোগে শত শত লোক মারা যায়, তার পেছনে অপদেবতার কোপ আছে, তাকে খুশী করতে পারলে আক্রমণ প্রতিহত হয়। এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব হতে বসন্তের দেবী শীতলা, কলেরার দেবী ওলা, খোস-পাঁচড়ার দেবতা ঘেঁটু ইত্যাদির পূজা করে আসছে। সর্পদেবী মনসা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়, কুম্ভীর দেবতা কালুরায় প্রভৃতি একই মানসিকতার ফল। বহু দেবতাবাদ থেকে এগুলির জন্ম। যে শ্রেণীর হিন্দু-বৌদ্ধরা এসব লৌকিক দেবদেবীর পূজা করত তাদের এক অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। পূর্বকালের যে অসহায় জীবনব্যবস্থা এঁদের মূর্তি কল্পনায় খোরাক যোগিয়েছে, ধর্মান্তর গ্রহণের পর সে নৈরাশ্য, নিঃস্বতা জীবনমূল থেকে অপসৃত হয়নি, ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত-আর্ত মন থেকে পূর্বসংস্কারও দূরীভূত হতে পারে না। ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। মুসলমানেরা দেবপূজা করতে পারে না। রাজা ও বিত্তবানেরা জনগণের পাশে এসে দাঁড়াননি ; দুঃখের দিনে জনসাধারণ কেবল পীরগণকে কাছে পেয়েছে। দানে, সেবায়, সাহচর্যে তাঁরা পীড়িত মানবাত্মাকে সুখ, সান্ত্বনা ও নির্ভরতা দান করেছেন। এরূপ যুগরীতি ও জীবনধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা এক সময় অধ্যাত্ম মানসলোকে পীরকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাস্তব জীবনের রিক্ততার মাঝে আত্মবল ও স্থৈর্যের জন্য মানসিক আশ্রয়ের প্রয়োজন। লোকমনস্তত্ত্বের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাঙালী লোক-মানসিকতায় পীরবাদ এদেশীয় দেবতাবাদেরই বিকল্প আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। এটা পরিকল্পনাহীন, পরিচর্যাহীন লোকচক্ষুর অন্তরালে পল্লীর নিভৃত কোণে যেখানে রোগ-শোক, ভয়-ত্রাস, আপদ-বিপদ, অভাব-অনটন, সুখশান্তি নষ্ট করে লোকজীবনকে নিয়ত বেদনাভারাতুর করে তুলেছে সেখানে আপনা থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছে। লোকপূজ্য পীরদের দেবতুল্য স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হবে। হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীর সহিত

তুলনায় মুসলমান পীরপীরানীর নিম্নের তালিকাটি লক্ষণীয় :

অধিপতি দেবতা	দেবদেবী	পীরপীরানী
পানি	বরুণ	খোয়াজ খিজির
নৌকা	—	বদরপীর
আগুন	ইন্দ্র	মাদারপীর
সম্পদ	লক্ষ্মীদেবী	লক্ষ্মীবিবি
সন্তান	ষষ্ঠী, পাঁচু ঠাকুর	মনাইপীর
গরু	গোবক্ষনাথ	মানিকপীর, সোনাপীর
বাঘ	দক্ষিণরায়	গাজীপীর
ব্যাধি	শীতলা, ওলাদেবী	ওলাবিবি
বন	বনদুর্গা, বনদেবী	বনবিবি, জঙ্গলীপীর

পীরগণের অনেকে মিশ্রগুণের অধিকারী, যেমন গাজীপীর ভক্তের নানারূপ মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন, সত্যপীরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেবতা। পাঁচপীর মূলতঃ মঙ্গলামঙ্গলের দেবতা। মাদারপীর ব্যাধি দূর করতে পারেন।

হিন্দু দেবপূজার সহিত তুলনায় মুসলমানের পীরপূজার মৌলিক পার্থক্য হল, মুসলমানেরা সাধারণতঃ পীরের কোন মূর্তি গড়ে না, দু'একজন পীরের প্রতীক আছে : 'আসা' গাজীপীরের প্রতীক, 'বাঁশ' মাদারপীরের প্রতীক, 'পাটি' সত্যপীরের প্রতীক। কেবল 'গাজীর পটে' ব্যাঘ্রারোহী গাজীপীরের মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। এটি পূজা করা হয় না, পটুয়ারা পটে আঁকে ব্যবসায়ের জন্য। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে মানবাকৃতিবিশিষ্ট 'মানিকপীর' ও 'বনবিবি'র আলোকচিত্র দিয়েছেন। চিত্রদৃষ্টে তাঁদের পটাঙ্কিত মনে হয় না। তাঁরা দরগার মৃন্ময়মূর্তি হতে পারেন।[১] তাঁদের মূর্তিকল্পনা এবং পূজা-মানত লোকধর্মের

১. 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে প্রদত্ত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ মূর্তির নির্মাতা হিন্দু না মুসলমান তা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তাঁদের ভক্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক। হিন্দুরা লৌকিক দেবদেবীর প্রতীক ও প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করে। তারা পীরপূজা করলেও পীরের মূর্তি তেমন গড়েনি। ব্যক্তি, প্রতীক এবং আত্মা— এ তিনরূপে পীরগণ লোকমনে বিরাজ করছেন। ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের দিক থেকে পীরপীরানিগণকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা যায় :

এক. ঐতিহাসিক— বদরপীর, মাদারপীর, গাজীপীর।

দুই. পৌরাণিক—খোয়াজ খিজির, হাওয়া বিবি, ত্রিনাথপীর।

তিন. লৌকিক—সত্যপীর, মানিকপীর সোনাপীর, বনবিবি, জঙ্গলীপীর, মনাইপীর, ঠুনকাপীর, কাউয়াপীর, নোরাপীর, ঘোড়াপীর।

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক, যাই হোন না কেন, এঁরা লোকমানসে আত্মাবস্তুর প্রতীক অথবা দৈবশক্তির প্রতিভূ হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। লোকসংস্কৃতির সহিত এসব পীরপীরানীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

লৌকিক পীরগণের কেউ কেউ আঞ্চলিক, কেউ কেউ দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। গৃহে অসুখ-বিসুখ হলে গাজীপীরের নামে শিরনী দেওয়া হয়। 'আয়নাবিবি' পালায় দেখা যায়, মামুদ-উজ্জ্বল চাষাবাদ করে যখনঘরে ফসল তুলেছে তখন তার মা প্রথম কুলার ধানে মাদারপীরের শিরনী দিয়েছে।[১] রুজিতে বরকত ও মঙ্গল কামনা এর উদ্দেশ্য। মামুদ-উজ্জ্বল যখন বাণিজ্যযাত্রা করেছে তখন খোয়াজের উদ্দেশ্যে শিরনী দিয়েছে।[২]

পীরবাদ মধ্যযুগের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জনসাধারণের সংস্কৃতি সমন্বয় জনিত এক নব্য মানসিক ফসল। ডঃ সুকুমার সেন একে বাঙালীর অজ্ঞাতপূর্ব 'নব-পৌরাণিক' ধারা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী পীরদের আবির্ভাব, তাঁদের কেরামতি নিয়ে নানা লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব, লোকমনে এ সম্পর্কে বিশ্বাস-

---

১. আগ কুলা হইতে মায় যতনে রাখিল।
সেই ধানে পীর মাদারের সিন্নী যে করিল॥

উদ্ধৃত : পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৯৪

২. ঐ. পৃঃ ২০৮

৩. ডঃ সুকুমার সেন—ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২

সংস্কার এবং তদনুযায়ী আচার-আচরণ পালন, পূর্বপ্রচলিত হিন্দুর লোকপুরাণের সহিত সামঞ্জস্যশীল পীরপাঁচালি ইসলামী ভাবাপন্নতায় এক স্বতন্ত্র এবং অভিনব পৌরাণিকতারই বিষয়। বাঙালীর নিজস্ব চিন্তাধারা ও পূজাচারের প্রেক্ষাপটে পীরগণ এক একটি পৌরাণিক চরিত্রের রূপকল্পতা লাভ করেছেন। পল্লীবাসীরা এঁদের অনুগত ভক্ত ও পূজারী। একই জীবনযন্ত্রণা ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত মানুষ দৈবানুগ্রহের প্রত্যাশায় যে ধর্মাচার পালন করেছে তাতে মিলনই সম্ভব, বিরোধ নয়। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের মধ্যে, কালুগাজী ও দক্ষিণরায়ের মধ্যে, বনবিবি এবং বনদেবীর মধ্যে তাই বড় একটা ভেদ-রেখা টানা হয়নি। মুসলমানের পীর হিন্দুর দেবতা হয়েছেন, হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীরভুক্ত হয়েছেন। কে কার স্থলে ভাগ বসিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে তার নিশ্চয়তা নির্ণয় করা যায় না। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণকে নিয়ে এ ব্যাপারে সংশয়ের অবসান হয়নি।

লোকগাথায় নবাগত কোন কোন পীরের সহিত স্থানীয় দেবদেবীর বিরোধ এবং পীর কর্তৃক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী চিত্রিত হলেও অধিকাংশ স্থলে পরিণামে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন এবং সহাবস্থানীতিতে বসবাসের মিলনকথা বর্ণিত হয়েছে। কালুগাজীর সহিত দক্ষিণরায়ের সংগ্রাম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তারেরই সংগ্রাম। বাঘ-সৈন্য নিয়ে রীতিমত সংগ্রামের চিত্র আছে গাজীর পালাগানে। দক্ষিণ বঙ্গের দক্ষিণরায় নিজ অঞ্চলের একাংশ ছেড়ে দিয়ে ও পূজা প্রচারের অধিকার দিয়ে মিত্রতা স্থাপন করেছেন।[১] বনবিবির সহিত দক্ষিণরায়ের সংঘর্ষ এই আধিপত্য বিস্তার ও পূজা প্রচারের উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই। জঙ্গলীপীরের সহিত দক্ষিণরায়ের এবং বনবিবির সহিত নারায়ণীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাহিনী 'বনবিবির জহুরানামা' শীর্ষক পুঁথিকাব্যে বিবৃত হয়েছে। নারায়ণী পরাজিত হয়ে বনবিবির সহিত সখিত্ব স্থাপন করেছেন। বনবিবি ও জঙ্গলীপীর সহোদর ভাইবোন। দক্ষিণরায় নারায়ণীর সন্তান। পুঁখিশেষে বড় খান গাজীর মধ্যস্থতায় সকল বিরোধের অবসান হয়েছে। বনবিবি দক্ষিণরায়কে সখি-সন্তান হিসেবে বরণ করেন।[২] চম্পাবতী কন্যার পালাগানে গাজীপীর গঙ্গাদেবীকে মাসী বলে সম্বোধন করেছেন।

---

১. কালুগাজী-চম্পাবতী, সুনাই কন্যার পালাগান প্রভৃতি গাজী বিষয়ক রচনা দ্রষ্টব্য।
২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২-৯৩

পল্লীকবির বর্ণনামতে, গাজীমাতা অজুপা ও গঙ্গাদেবী সহোদরা বোন। এক কাঠুরিয়াকে ধন দিয়ে অনুগৃহীত করার জন্য গাজী গঙ্গার শরণাপন্ন হন।[১] গাজীর পটে অশ্বারূঢ় গাজীপীরের সাথে এক পাশে মকরবাহনা গঙ্গাদেবীরও ছবি অঙ্কিত হয়।[২] কেবল হিন্দুদেবতা নয়, হিন্দু রাজার সহিত মুসলমান পীরের বিরোধ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রাজকুমারীর সহিত পীরের পরিণয় তথা বৈবাহিক সূত্রে সে বিরোধের অবসান ঘটে।[৩] দেব-পীর সংঘর্ষ এবং মিলন কাহিনীতে সেযুগের সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। অতএব পীর-দেবতার এরূপ চিত্রকল্পনা বিজয়ী-বিজিতের সমন্বয়েরই দ্যোতক। মধ্যযুগের কি লোকসাহিত্য, কি উচ্চসাহিত্য উভয়ের বন্দনাংশে হিন্দুর দেবদেবী ও মুসলমানের পীরপীরানী সমানভাবে স্থান লাভ করে ভক্তের স্তুতি পাচ্ছেন। একে কৃত্রিম সমন্বয় বলা চলে না। ধর্মীয় আশ্রয়, মানবিক সেবা এবং সামাজিক সমন্বয় ছাড়াও বৈষয়িক কারণে সাধারণ লোক পীরদরবেশদের ভক্তি মান্য করত। তাঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজাবাদশা, জমিদার, সামন্তপতিরা তাঁদের সম্মান করতেন। সুতরাং তাঁদের সুপারিশে চাকরী-বাকরী অথবা বিচার সালিসীতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত। এর জন্য পরাভূত মনের গ্লানি ও ক্ষোভ নিয়েও হিন্দুরা পর্যন্ত তাঁদের ভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমান পীর-গাজী অতি সহজেই হিন্দুর থানে বা বেদীতে স্থান পেয়ে যাচেছন এবং দেবদেবীর সাথেই সমমর্যাদায় পূজা-শিরনী পাচেছন, এটাই তার অন্যতম কারণ। সুতরাং যুগ ও জীবনের পটভূমিতে এবং সাধারণ লোকমনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে পীরপূজা, পীর-স্তুতি, পীরাচার বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ এবং তা নানা প্রভাবে-স্বভাবে উদ্ভূত ভেদলুপ্ত নব্যসংস্কৃতিরই নিদর্শন। বাংলাদেশের ভূমিতে বাঙালীর মানস পরিচর্যায় তা নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

সত্যপীর

বাংলাদেশে সত্যপীরের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক। অজ্ঞাত পরিচয় পল্লীকবি থেকে উচ্চ শিক্ষিত সভা-কবি সকলেই সত্যপীরের ছড়া-কথা-পুঁথি-পাঁচালি রচনা করেছেন। শিক্ষিত কবিদের মধ্যে আছেন ষোল

১. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭০, পৃঃ ৮২-৮৩
২. বর্তমান গ্রন্থে প্রদত্ত গাজীপীরের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।
৩. পূর্বোক্ত, চম্পাবতী কন্যার পালাগান দ্রষ্টব্য।

শতকের গোড়ার দিকে কবিকঙ্ক, শেষের দিকে ফয়জুল্লাহ, আঠার শতকে বিদ্যাপতি, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র, গরীবুল্লাহ, শঙ্কর আচার্য, কৃষ্ণ হরিদাস প্রভৃতি পুঁথি ও পাঁচালি রচয়িতা। লোকসাহিত্যের ছড়া, ব্রতকথা ও পালাগানের ভেতর দিয়ে সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। কঙ্ক ময়মনসিংহের কবি। ফয়জুল্লাহ কুমিল্লার (মতান্তরে দক্ষিণ রাঢ়), ভারতচন্দ্র বর্ধমানের, গরীবুল্লাহ হুগলীর, রামেশ্বর মেদিনীপুরের। রাজশাহী জেলায় 'সত্যপীরের ভিটা' আছে।[১] 'সত্যপীরের শিরনী', 'সত্যপীরের পাট' প্রভৃতি আচার এবং পীরের অলৌকিক কেরামতি সম্বন্ধে লোক-বিশ্বাস বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।[২]

সত্যপীর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এ পর্যন্ত তার কোন প্রমাণসূত্র পাওয়া যায়নি।[৩] হিন্দুর পৌরাণিক দেবতা সত্যনারায়ণের সহিত সত্যপীরের অভিন্নতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সত্যনারায়ণের প্রাচীনতম উল্লেখ 'স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে' এবং 'বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে' পাওয়া যায়।[৪] স্কন্দপুরাণে সত্যপীরেরই উল্লেখ আছে।[৫] এদিক থেকে সত্যপীর প্রাচীন হতে পারেন, কিন্তু সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের কাহিনী পরিকল্পনায় লৌকিক প্রভাব, বাংলাদেশে পীরদরবেশদের আবির্ভাব ও প্রতিপত্তি এবং হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সূত্রে পীরস্তুতি ও

১. Social History of the Muslims in Bengal, p. 137

২. বাংলার বাইরেও সত্যপীরের প্রভাব আছে। পাঞ্জাবের জালন্ধরে সত্যপীর আছেন। সেখানে পীবের নামে মেলা হয়, তার নাম 'সত্তের মেলা'।
পঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২

৩. উত্তর বঙ্গের কবি কৃষ্ণ হরিদাস তাঁর সত্যপীরের পাঁচালি কাব্যে পীরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বর্ণনামতে, মালঞ্চার রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম হয়। আঠার শতকের কবি শঙ্কর আচার্য বলেছেন, সত্যপীর আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র। ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮১

৪. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৪

৫. স্কন্দপুরাণে দ্বিজ সদানন্দ, কাঠুরিয়া ও লীলাবতী-কলাবতী দ্বারা সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারের কথা আছে। স্কন্দপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৮, পৃঃ ৩৬০-৬২

পীরপূজার উদ্ভব ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে পণ্ডিতগণ মনে করেন, পুরাণের পীরবাদ অংশ সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত এবং অর্বাচীন।[১]

বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ। তিনি ঈশ্বর, চিরসত্য। এ অর্থে সত্য-নারায়ণের পরিকল্পনা অসম্ভব নয়। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক যে কটি কাহিনী-ধারা প্রচলিত আছে সেগুলির অধিকাংশের বিষয় হিন্দুয়ানি।[২] কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর'[৩], রামেশ্বরের 'সত্যপীরের পাঁচালী'[৪], গরীবুল্লাহর 'সত্যপীর'[৫] প্রভৃতি রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্ক স্বয়ং সত্যপীরের পূজা করেছেন এবং তাঁরই নির্দেশ শিরোধার্য করে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এদিক থেকে কেউ কেউ মনে করেন, সত্যপীরের ধারণাটা হিন্দুরাই আবিষ্কার করেন এবং কখন সত্যনারায়ণ কখন সত্যপীরের মিশ্রনামে প্রচার করতে থাকেন।[৬] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন ও সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জনজীবনে পীরদরবেশদের অলৌকিক মাহাত্ম্য কাহিনীকে আশ্রয় করে মঙ্গলকাব্যের আদর্শে প্রথম হিন্দুগণই পীরপাঁচালি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এসূত্রে হিন্দু পৌরাণিক সত্যনারায়ণ মুসলমান

---

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ: ৩১ (৩য় সং)।

২. কাঠুরিয়া. সদাগর, মদনসুন্দর, লালমোন, মালঞ্চা, শিশুপাল রাজার পালা, হীরামুচির পালা, শশীবেপারীর পালা, বগজোড়ের যশমন্ত সাধুর পালা, বনগ্রামের শুন্দি সওদাগরের পালা ও মনোহর ফাসিয়ারার পালা নামে মোট ১১টি কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এগুলি সত্যপীরের কাহিনী। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২০ (২য় সং), পঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭ (ভূমিকা)।

৩. কাব্যের নায়ক সুন্দর কর্তৃক পীরস্তুতি ও পূজাপ্রচারের কাহিনী বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। পীরের কৃপাতেই সুন্দর বিদ্যাকে লাভ করেছিল। দ্রষ্টব্য: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৬

৪. প্রথম অংশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কর্তৃক ও দ্বিতীয় অংশে সদানন্দ বণিক কর্তৃক শিরনী দিয়ে পীরপূজার কথা রামেশ্বরের কাব্যে আছে। দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃ: ৮৯৫-৯৬

৫. 'মদনকামদেব পালা'য় সওদাগর পুত্রত্রয় কর্তৃক পীরের শিরনী দেওয়ার কথা সত্যপীরের পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে। গোলাম সাকলায়েন—ফকীর গরীবুল্লাহ, পৃ: ৩৫

৬. Social and Cultural History of Bengal, Vol. 11, pp, 387-88

কোন ঐতিহাসিক পীরের ছায়াবলম্বনে সত্যপীররূপে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হতে পারেন।[১] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ঠিক সংস্কৃতি-সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা নয়, 'মুসলমান শাসকের চণ্ডনীতি' থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরা এরূপ মিশ্রদেবতার উদ্ভাবন করে নিজ নিজ ধর্মের মুসলমানী রূপান্তর ঘটিয়েছিল।[২] কিন্তু সত্যপীরের পূজা-শিরনী, কথা-কাহিনীর উদ্ভব-উদ্ভাবনের সত্যকারের ইতিহাস তা নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সত্যনারায়ণ সত্যপীরের রূপান্তর গ্রহণ করেছেন এমত স্বীকার্য নয়। সত্যপীরের ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্রানুসন্ধান করা যায় না। কিন্তু এমন পীরও আছেন, যাঁরা ঐতিহাসিক সূত্রে মুসলমান দরবেশ হয়েও হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক সমানভাবে পূজিত-হয়েছেন। তাঁদের কাহিনী পরিকল্পনাতেও হিন্দুয়ানির ভাব পুরোপুরি সংরক্ষিত। গাজীর অধিকাংশ পালাগান হিন্দু বণিক ও ব্রাহ্মণের নায়কত্বে রচিত, যেমন 'মানিক সদাগরের পালাগান', 'সুনাই কন্যার পালাগান' ইত্যাদি। মুসলমানদের আগমনের শুরু থেকেই পীরদরবেশগণ এদেশের আপামর জনসাধারণের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন। জনাব তসলীমুদ্দীন আহমদ সাহেব গোগদাদের পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানীকে সত্যপীরের সহিত সম্পর্কান্বিত করেছেন।[৩] এটা অনুমান মাত্র, নিঃসন্দেহে তা স্বীকার করা যায় না। সত্যপীর ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও লৌকিক চেতনায় তাঁর মানব পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে।

সত্যপীর ভাবাত্মক নাম হতে পারে। তসলীমুদ্দীন সাহেব সত্যপীর 'পীরবরহক' শব্দের অবিকল অনুবাদ বলে মনে করেছেন। বরহক শব্দের অর্থ সত্য বা প্রকৃত।[৪] ডঃ হক 'পীরই সত্য' এ অর্থে সত্যপীরের ধারণা লোকমানস থেকে জন্ম গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, সত্যপীরের উদ্ভাবন সম্পূর্ণ মুসলমানদের কল্পনাজাত, পরে হিন্দুরা একেই সত্যনারায়ণ রূপ দিয়েছে।[৫] 'প্রমূর্ত

১. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১ (৩য় সং)।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৭
৩. পূর্বোক্ত, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১০ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২২, পৃঃ ৪১
৪. ঐ, পৃঃ ৪১
৫. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১২

সত্য' অর্থে ডঃ আহমদ শরীফ সত্যপীরের নামকরণ সমর্থন করেন।[১] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এমত পোষণ করেন। তিনি লিখেছেন, "মুসলমানের পীরকে লোকে যেমনি পূজো দিতে আরম্ভ করেছে অমনি তাকে সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন। কিন্তু বাংলায় সত্যনারায়ণের যে পাঁচালী তাতে পীরকে মুসলমানী পোষাকই দেওয়া হয়েছে। কথা পর্যন্ত উর্দু, যেমন—জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর ইত্যাদি। এই মুসলমান পীরের উপাসনা ও শিরনী ভট্টাচার্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে। ...পীরের শিরনী বা ভোগটা হচ্ছে সুজি, বাতাসা, হিন্দুয়ানিতে বাধে না এমন সব জিনিষ এবং পায়েসের দলে সেটা প্রায় চলে গেছে।"[২]

সুতরাং সত্যপীরের উদ্ভাবক, প্রচারক এবং সেবক বাংলার মুসলমান সমাজ। সত্যপীর মতবাদের প্রথম প্রচারক হিসেবে সুলতান হুসেন শাহের নাম তারিক রচিত 'লালমোনের কেচ্ছা'য় বিবৃত হয়েছে। তিনি পীরের উদ্দেশ্যে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের শিরনী দিয়ে পীরের বরে মগানের রাজত্ব লাভ করেন।[৩] সত্যপীরের মতবাদ প্রচারে হুসেন শাহের ভূমিকার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর প্রথম জীবন হিন্দু জমিদারের (সুবুদ্ধি রায়) অধীনে কাটে।[৪] তাঁর রাজসভায় অনেক হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁরই আমলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। হুসেন শাহ বৈষ্ণবধর্মের বিরোধিতা করেননি, বরং চৈতন্যদেবকে 'গোসাঞি' (গোস্বামী)

---

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত—পুথির ফসল, পাকিস্তান পাবলিকেশানস, ঢাকা, ১৯৬৬ পৃঃ গ (ভূমিকা)।

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৬-১৭

৩. খোসালে করেন দোও আপে সত্যপীরে।
হোছেন সা বাদসাই পাইল মোগান সহরে ॥

উদ্ধৃত: আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ—পুঁথির বিবরণ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় ও৪র্থ সংখ্যা, ১৩১০, কলিকাতা।

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। গ্রন্থখানি ১৬১২ (মতান্তরে ১৬১৫) খ্রীস্টাব্দে রচিত।

বা ধর্মগুরু রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[১] সুতরাং ধর্মের ব্যাপারে হুসেন শাহ উদার মত পোষণ করতেন। এ সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কোন মধ্যম পন্থার চিন্তা গণমানসে উদিত হতে পারে। এজন্য ইসলামী ভাবধারায় পীরবাদের ভিত্তিতে কাল্পনিক সত্য-পীরের প্রচার অসম্ভব নয়। সত্যপীর-সত্যনারায়ণ নাম সে সমন্বয়কে সূচিত করে। যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ ধারণা অনুমান মাত্র. অন্যথায় হুসেন শাহের সহিত সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারের যোগসূত্র কৌতূহলোদ্দীপক লোকমনের সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত হতে পারে।

সত্যপীরের পাট : গাজীপীর, বদরপীর যেভাবে অধিপতি দেবতারূপে পরিগণিত, সত্যপীরকে সেরূপে কোন নির্দিষ্ট শক্তি বা ভাবের প্রতিভূ মনে করা হয় না। তিনি সাধারণভাবে মনস্কামনা পূর্ণকারী দেবশক্তি রূপেই পূজা পেয়ে থাকেন। হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের কোন মূর্তিপূজা নেই, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সত্যপীরের পাট' নামে প্রতীক পূজা প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কাঠের তক্তার তৈরি পাটকে পীরের আসন মনে করা হয়। লোকে ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে পাট-পূজা করে।[২] নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 'ধর্মঠাকুরের পাটপূজা'র প্রচলন আছে।[৩] এটি তারই প্রভাবজাত।

সত্যপীরের শিরনী : শুভফল কামনায় মানসিক করে সত্যপীরের শিরনী দেওয়া হয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'সত্যপীর' কাব্যে নিঃসন্তান বণিক সদানন্দ সত্যপীরের শিরনী মেনে চন্দ্রকলা নাম্নী এক কন্যা লাভ

---

১. গৌড়েশ্বর যবনরাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইঁহার মন॥

উদ্ধৃত : চৈতন্যচরিতামৃত।

২. Social and Cultural History of Bengal, Vol. 11, p. 389

৩. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকশ্রুতি, পুরোগামী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৫১

করেছিল। চন্দ্রকলা পীরের শিরনী দিয়ে তাঁর কৃপা লাভ করে বিদেশে স্বামী ও শ্বশুরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে এবং তাদের স্বগৃহে ফিরে পায়।[১] ভারতচন্দ্রের সত্যপীর বিষয়ক কাব্যে বিষ্ণুশর্মা সত্যপীরের শিরনী দিয়ে ধনসম্পদ লাভ করে।[২]

সত্যপীরের শিরনীর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায় বটতলার প্রকাশিত সত্যপীরের পুঁথিতে। সদাগর পুত্র মদন ও কামদেব বাণিজ্য শেষে ফিরে এসে নিম্নরূপে সত্যপীরের শিরনী করে :

ডাকিয়া কুটুম্বগণ আপনার ঘরে।
ছামানা করিয়া সত্যপীরের শিরনী করে ॥
সোয়া মন আনে আটা সোয়া মন চিনি।
সোয়া মন আনে দধি আর যে বিরণী ॥
পাকা কলা আটা আদি তাহাতে ডালিয়া।
ভরিল বাসন সব হালুয়া করিয়া ॥
এক হাজার পান আর যে সুপারি।
আগর চন্দন চোত্তা গোলা কস্তুরি ॥
সকল ফুলের হার আস্তানাতে দিয়া।
চৌকির উপরে সবে সাজাইল লিয়া ॥
ঘর পুর নারিকেল রাখে তার পরে।
চার তীর চারিধারে গাড়িল যে জোরে ॥
মোল্লাজি আসিয়া ফাতেহা করিল তামাম।
আল্লা আল্লা বল সবে এলাহির নাম ॥
সিরণি বাটিয়া দিল হিন্দু ও ব্রাহ্মণে।
পাইয়া সিরণি ঘরে গেল জনে জনে ॥

... ...

কাঙ্গাল গরীব জন এত কোথা পাবে।
কিঞ্চিৎ করিয়া পীরে মান্নত সুধিবে ॥[৩]

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৫-৯৬
২. ঐ, পৃঃ ৯৬০
৩. মুন্সী ওয়াজেদ আলী (মতান্তরে ফকীর গরীবুল্লাহ)—সত্যপীরের পুঁথি, বটতলা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২৭

সওয়া গণ্ডা বা সওয়া পরিমাণ ওজন বিজোড় সংখ্যা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[১] 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচয়িতা দ্বিজ শিবচরণও এরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে সত্যপীরের শিরনীর বিধান হল :

সওয়া সের দুগ্ধ আর সওয়া সের আটা।
সওয়া সের গুড় সহ কর গিয়ে ঘাঁটা॥
সওয়া গণ্ডা গুবাক আর সওয়া বিড়া পান।
সংক্ষেপে কহিনু এই সিনির বিধান॥[২]

গাজীপীর

বাঙালী হিন্দুসমাজে দক্ষিণরায়ের যে স্থান, বাঙালী মুসলমানসমাজে গাজীপীরের সেই স্থান। দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। তাঁর মাহাত্ম্য-কীর্তন ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত কবি 'রায়মঙ্গল' কাব্য লিখেছেন।[৩] দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলায় দক্ষিণরায়ের প্রভাব আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বাঘের দেবতা হিসেবে গাজীপীরকে মান্য করে। তিনি কখন 'গাজী সাহেব', কখন 'বড় খান পীর' নামে অভিহিত হন। ময়মনসিংহে বাঘের অধিপতি দেবতা হিসেবে 'বাঘাই পীরে'র নাম পাওয়া যায়।[৪] ঢাকা ও বরিশাল জেলায় বাঘের দেবতা 'কুলই ঠাকুর'।[৫] বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যথা ছড়া, মন্ত্র, ব্রত, পালাগান, পটগীতি, প্রবাদ, জনশ্রুতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন নামে বাঘের অধিপতি পীর-দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা, পূজাপ্রচার ও লৌকিক সংস্কারাদির পরিচয় আছে। লৌকিক ছড়া-পাঁচালী থেকেই রায়মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব।[৬]

---

১. মঙ্গল কার্যে বিজোড় সংখ্যা শুভজনক বলে লোকবিশ্বাস আছে।

২. উদ্ধৃত : শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—সত্যপীরের পাঁচালী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯, পৃঃ ১৩৩

৩. প্রামাণিকভাবে রায়মঙ্গলের প্রথম রচয়িতা কৃষ্ণরাম। তিনি ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাব্য লিখেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭

৪. রওশন ইজদানী—মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮১

৫. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০

পালাগান, ব্রতকথা, রায়মঙ্গলের কাহিনীর বহিরঙ্গের কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তর্নিহিত ভাব অর্থাৎ রায়-গাজীর অলৌকিক মাহাত্ম্যপ্রচার সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খাঁর প্রথমে বিরোধ ও পরে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দেখান হয়েছে। সংঘর্ষে গাজীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এখানে গাজী যোদ্ধাপীর হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।[১] এসব তথ্য থেকে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়— গাজীপীর (যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন) সতের শতকের আগের লোক। হিন্দু লোকসমাজে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা-সংস্কার পূর্ব হতে চল ছিল। মুসলমান পীরদরবেশ অথবা বিজয়ী গাজী দক্ষিণরায়ের দোসর (counterpart) হিসেবে প্রথমে মুসলমান ও পরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে দেবপূজ্য হয়ে উঠেন ত্রয়োদশ শতকের পরে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ ও ক্রমশঃ দেবত্ব প্রাপ্তিতে বেশ সময় লাগার কথা। ন্যূনপক্ষে দু'এক শতাব্দীর ব্যবধান দরকার হয়। গাজীপীরের সময়সীমা এর আলোকে বিচার করলে চৌদ্দ-পনের শতক ধরা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতিতে প্রথম দেড়শো-দুশো বছর লেগেছিল।

গাজীপীর ঐতিহাসিক কোন যোদ্ধা দরবেশের সহিত অভিন্ন হতে পারেন কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে। এযাবৎ তিনজন গাজীর সহিত তাঁর অভিন্নতার কথা উঠেছে। ব্লকম্যান সাহেবের মতে, গাজীপীর হলেন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র বড় খাঁ গাজী। তিনি চৌদ্দ শতকে জীবিত ছিলেন।[২] ডঃ সুকুমার সেনের মতে, চৌদ্দ শতকের পীর সূফী খান ষোল শতকের দিকে বড় খাঁ গাজী হিসেবে পরিগণিত

---

১. হিন্দু রাজাদের কোপে পড়ে অনেক পীরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। রাজশক্তির সহিত জড়িত থেকে কোন কোন পীর যুদ্ধ করেছেন। দরবেশ প্রবর শাহ জালাল শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলিম রাজ্যবিস্তার ও ইসলামধর্ম প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বদরপীর চট্টগ্রামে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য সেনাপতি কদল খান গাজীকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন বলে কিংবদন্তীতে প্রকাশ। (মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়, পীরদরবেশদের কেউ কেউ বীর যোদ্ধাও ছিলেন।

২. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part. I, No. IV, Calcutta, 1870, pp. 280-82

হন।[১] কারো কারো মতে, পনের শতকের বীর যোদ্ধা ইসমাইল গাজী (রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সেনাপতি) বড় খাঁ গাজী হতে পারেন।[২] কিন্তু এ মতগুলি কতদূর সত্য, তা নির্ণয় করা যায় না। ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ সত্যপীর কাব্যে পীরস্তুতিতে এঁদের নাম করেছেন।

আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড় মান্দারণে।
বন্দিব জেন্দা পীর কামাএর কুনি
বড় খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার সাফি খাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ।[৩]

বিদ্যাপতি রচিত 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে প্রায় অনুরূপ পীরবন্দনা আছে।[৪] এখানে ইসমাইল গাজী, সূফী খান ও জাফর খান গাজীকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়। এঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রমাণ আছে। এঁদের সঙ্গে বড় খান গাজীব উল্লেখে এটাই প্রতীত হয় যে, তিনি এঁদের সমসাময়িক অথবা অল্প আগেপাছের প্রভাবশালী একজন স্বতন্ত্র পীর ছিলেন। লোক-সাহিত্য শাখার গাজীপীর বিষয়ক একটি পালাগানে আছে, তিনি বইরাট নগরের শাহ সেকান্দরের ঔরসে অজুপার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ফকিরবেশে বেরিয়ে পড়েন। বাঘসৈন্য নিয়ে তিনি চম্পাবতীর পিতা বিম্বিং রাজার সহিত যুদ্ধ করেন এবং জয়ী হয়ে চম্পাবতীকে লাভ করেন। তাঁর চেষ্টায় তথায় ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়।[৫] এ কাহিনীরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।[৬] গাজীপীরের ঐতিহাসিক পরিচয় থাকলেও লোকচেতনায় তাঁর বাস্তব সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন

১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৬
২. ফকীর গরীবুল্লাহ, পৃঃ ২৩
৩. উদ্ধৃত: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮০
৪. ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০৫
৫. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান' দ্রষ্টব্য।
৬. সেকান্দর শাহকে স্থানীয় ধনাঢ্য জমিদার হিসেবে ধরে তাঁর সন্তান গাজীপীর ওরফে বড গাজী খানকে জনাব আবদুল জলীল 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে ঐতি-হাসিক ব্যক্তি বলে মনে করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এটা তাঁর অনুমান মাত্র, এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রামাণিক তথ্য সরবরাহ করেননি। এ. এফ. এম. আবদুল জলীল—সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৪

হয়েছে। তিনি হিন্দুর দেবতার মত আধ্যাত্মিক আত্মায় পরিণত হয়েছেন। দেবাত্মা রূপেই তিনি ভক্তের শিরনী পেয়ে থাকেন। তিনি যে আত্মা স্বরূপ, ময়মনসিংহে প্রচলিত 'বাঘাইপীর' নামকরণে তার সমর্থন আছে। হিন্দু দেবদেবীর অনুকরণে 'বাঘচালান মন্ত্রে' গাজীপীরের দোহাই দেওয়া হয়েছে।[১] ব্যাঘ্রভীতি থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লোকমানসে তাঁর দেবমূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। বাংলাদেশে সর্পদেবী মনসার পূজার কথা সংস্কৃত পুরাণে আছে, কিন্তু ব্যাঘ্রদেবতার পূজার কোন উল্লেখ নেই।[২] মধ্যযুগে লোকসংস্কৃতির বিকাশের কালে হিন্দুর অন্যান্য ব্রত-সংস্কারাদির অনুকল্পে ব্যাঘ্র পূজার উদ্ভব হতে পারে। পীরের অলৌকিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ পল্লীবাসী দক্ষিণরায়ের পাশে গাজীপীরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতাপে গাজীপীর দক্ষিণরায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। মধ্যযুগের ধর্মশাসিত সমাজজীবনের এক বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। গাজীপীর সে-সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত। গাজীপীরের দরগার ফকিরদের একটা সাধারণ বোল হল :

গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হল।
হিন্দুগণে বল হরি মোমিনে আল্লা বল ॥[৩]

হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের সুর এ বোলে ধ্বনিত। এ সমন্বয়ের সুর মাঝিমাল্লার বোলেও আছে :

আমরা আছি পোলাপান
গাজী গঙ্গা নিঘাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর ॥[৪]

নগেন্দ্রনাথ বসু একটি প্রবন্ধে বড় খান গাজীকে মোবারক গাজী বলে উল্লেখ করেছেন। 'গাজী সাহেবের গান' শীর্ষক লোকগাথায় মোবারক গাজী ও মদন রায়ের কথা আছে। মদন রায় শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬৪-৭৮ খ্রীঃ ও ১৬৭৯-৮৮ খ্রীঃ) ঢাকায় নীত হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু—গাজী সাহেবের গান, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৫, পৃঃ ৩১-৫৬

১. বর্তমান গ্রন্থে 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' অধ্যায়ের 'বন্ধন মন্ত্র' অংশ দ্রষ্টব্য।
২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭২৭
৩. উদ্ধৃত : বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৪৩
৪. উদ্ধৃত : পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক, পৃঃ ৭

পটাঙ্কিত ব্যাঘ্রারোহী গাজীপীরের মূর্তি দেশব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এখানে তাঁকে সৌম্য ও বীরমূর্তি দেওয়া হয়েছে। মুখে দাড়ি, লম্বা জুল্‌ফি; মাথায় পাগড়ী, পরনে চোগাচাপকান পাজামা। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে 'বড় খাঁ গাজী' পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন, তাতে তাঁকে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখা যায়। এখানেও তিনি সৌম্য ও বীরপুরুষ : মাথায় পাগড়ী, পরনে চোগাচাপ-কান, পায়ে জুতা, মুখে লম্বা দাড়ি, লম্বা গোঁফ, লম্বা জুল্‌ফি। সবকিছু মিলিয়ে মুসলমান বীরের মূর্তি তাঁর।[১]

বগুড়া জেলা শেরপুরে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজীকালুর নামে মেলা বসে।[২]

গাজীপীর প্রধানতঃ কাঠুরিয়া, মউল্যা, শিকারী, রাখাল প্রভৃতি লোকগোষ্ঠির কাছে বাঘের দেবতারূপে মান্য ও পূজ্য হলেও সাধারণ লোকসমাজে কোথাও কোথাও তিনি মনস্কামনা পূর্ণকারী ও রোগব্যাধি উপশমকারী পীররূপে চিত্রিত হয়েছেন। ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত 'গাজীবিদায়ের পালাগানে' তাঁকে চারটি গুণের অধিকারী বলা হয়েছে। শিষ্য কালাচানের এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি নিধুয়াকে ধন দিতে পারি; নিপুত্তরোকে পুত্তরো দিতে পারি—সিদ্ধি করতে পারি কাম; মরা বিরিক্ষ বাহাতি পারি নিলে আমার খোদাতালার নাম।'[৩] স্পষ্টতঃ গাজীপীর এখানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পীর হিসেবে বর্ণিত। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত 'মানিক সদাগরের পালাগানে' গাজি কালু মলকুত রাজাকে পুত্রের বর দিয়েছেন।[৪]

---

১. 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে প্রদত্ত বড় খাঁ গাজীর আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

২. সুন্দরবনের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৪

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৩১ (ফরিদপুর), ১৯৬৪

৪. অহরে মলকুত রাজা তোরে দিলাম বর।
এক পুত পাবি তুই বছরের ভিতর॥
এই কথা গাজুকালু রাজারে বলিয়া।
আন দেখা হইয়া গেল এলাহি ভাবিয়া॥

লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/৬৪ (চট্টগ্রাম), ১৯৬২

বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত 'বাঘাইর শিরনী' এবং রোগশোক দূরীকরণ নিমিত্ত 'গাজীগানের পালা দেওয়া' গাজীর উদ্দেশ্যে এ দুটি লোকাচার পল্লীসমাজে আছে। এছাড়া 'গাজীর বাঁশ দেওয়া', 'গাজীর বাঁশ বিয়া'রও প্রচলন আছে।

বাঘাইর শিরনী : বাঘের দেবতা হিসেবে হিন্দুসমাজে 'বাঘাইব্রত' এবং মুসলমান সমাজে 'বাঘাইর শিরনী' নামে লোকাচার বাংলার নানা স্থানে পালিত হয়।[১] উভয় ক্ষেত্রেই মাগন করা হয়। বাঘাই পীরের শিরনী উপলক্ষে যে মাগন হয় তাতে গ্রামের রাখাল বালকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছড়ায় 'বাঘের বয়ান' গায় ও চালডাল সংগ্রহ করে। রওশন ইজদানীর মতে, মোমেনশাহীর উত্তর অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস ও ভাটি অঞ্চলে বৈশাখ মাস যথাক্রমে আমন ও বোরোধান তোলার মৌসুম হল মাগনের কাল।[২] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষ মাসকে মাগনের কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন কুলই ঠাকুরের পূজা হয়।[৩] প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, "পৌষ মাসের প্রথম ভাগ হইতে মাঘী পঞ্চমী পর্যন্ত পূর্ব মৈমনসিংহে পল্লী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান রাখাল বালক সম্মিলিত হইয়া বাঘের 'চরণ' বা পাঁচালী গাহিয়া চাউল, তরকারী, পয়সা সংগ্রহ করে।... শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সকলে সমবেত হইয়া চাউল, তরকারী প্রভৃতি দ্বারা মাঠে 'বাঘের দেবতা'কে অর্চ্চনা করে ও প্রসাদ ভক্ষণ করে। গৃহস্থগণ বাটিস্থ ছেলে-মেয়েদের খড়িমাটি দ্বারা ব্যাঘ্ররূপে চিত্রিত করেন। গোশালার দরজার সম্মুখভাগে অগ্রপাতে পায়েস ও পিস্টক রক্ষিত হইলে ব্যাঘ্রের ভান করিয়া ছেলেমেয়েগণ সে সমুদয় উদরস্থ করে।"[৪] মাগনের ছড়ায় বাঘাইপীরের দোহাই দেওয়া হয়।[৫] এসব মাগন করা, বাঘাইর বয়াত গাওয়া ও শিরনী

---

১. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী—ব্রত ও আচার, পৃঃ ৫১-৫২

২. মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮১

৩. বাংলাব ব্রত, পৃঃ ৫৯

৪. ব্রত ও আচাব, পৃঃ ৫২

৫. আইলাইন গো বাঘাইর নাতি।
আইলাইন বাঘাই দিলাইন বর,
ধান চাউল বাইর কর।

দেওয়ার মূল লক্ষ্য হল বাঘের আক্রমণ থেকে গরু-বাছুর রক্ষা কবা।[১]

গাজীগানের পালা দেওয়া : সাধারণতঃ বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, আত্মীয় পরিজনের রোগমুক্তি ও প্রবাসগত প্রিয়জনের বিপদমুক্তির জন্য গাজীর নামে মানত করে আচার পালন করা হয়। এটি 'গাজীগানের পালা দেওয়া' নামে পরিচিত।[২] কামনা সফল হলে গৃহস্থ কোন একদিন গাজীগানের আসর বসায়। পেশাদার বয়াতি ও পাড়ার লোকজনকে ডেকে আনা হয়। একটি ঝুড়িতে গাজীর শিরনী রাখা হয়। ঝুড়ির পাশে 'গাজীর আসা' পোঁতা থাকে। চট্টগ্রামে প্রচলিত গাজীগানের আসরের বর্ণনা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "আসরের চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোতা ;...উত্তর দিকের মাঝামাঝি একটি লোহার খুঁটি, মাথায় একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহবলয় ধারণ করিয়া ভূপ্রোথিত ছিল।... নীচে একখানি কুলায় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সাজান ছিল। সেগুলি গাজীর সিন্নি। হিন্দুমুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্প্রদায়ই এই সিন্নি মানত করিয়া বাড়ীতে গাজীর গীত দিয়া থাকে।"[৩]
আসরে বয়াতি গাজী বিষয়ক গান গায়।[৪] অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাগতরা শিরনী পায়, বয়াতিও পুরস্কৃত হয়।

> ধান দিবে না কড়ি দিবে,
> বাঘাইর নামে সিন্নী দিবে।
> ... ...
> আমাবে সিন্নী দিতে যে কবিল হেলা
> তাব দুটি চোখ খাইব ঠিক দুপুইর বেলা।

উদ্ধৃত : বাংলাব লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭২-৭৩

১. যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক—বাঘাইব বয়াত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯ পৃঃ ১৬৭

২. বর্তমান গ্রন্থের 'লোকাচার' অধ্যায়ের 'ব্যাধি ও মৃত্যু' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৯

৪. খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চলে গাজীর নামে সাতটি পালাগানেব প্রচলন আছে। এগুলি হল : আত্তাপ মহাত্তাপ, গাজীর জন্মপালা, গাজীর বিয়ে, জামাল বাদশাহ, দিদার বাদশাহ, সেকেন্দার বাদশাহ, তায়জল বাদশাহ। বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক জনাব নূরুল হক মোল্লা আমাকে এই নামগুলি দিয়েছেন। তাঁর মতে, এগুলি 'গাজীগানের সাত পালা' নামে পরিচিত।

গাজীর বাঁশ দেওয়া : উদ্দেশ্য ও ফলকামনার দিক থেকে গাজীগানের পালা দেওয়া ও গাজীর বাঁশ দেওয়া অনুষ্ঠান দুটি অভিন্ন— বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা। সন্তানহীনা নারী সন্তানবতী হওয়ার জন্য গাজীপীরের উদ্দেশ্যে বাঁশ দেওয়ার মানত করে। বছরের কোন একদিন সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এর প্রচলন আছে।

অনুষ্ঠানটিকে রূপ দেওয়ার জন্য পেশাদার 'নাড়া' ও 'চেলা' আছে। মানতকারিণীর আহ্বানে তারা গার্জীর দরগায় উপস্থিত হয়। এই দরগাহটি তৈরি করায় মানতকারিণী নিজেই। একটা খোলামেলা জাগায় উঁচু মাটির ঢিপি লেপেপুছে গাজীর দরগাহ তৈরি করা হয়। দরগার সামনে তিনটি বাঁশ পোঁতা থাকে—মাঝের বাঁশটি অপেক্ষাকৃত লম্বা। এটাই গাজীপীরের প্রতীক বাঁশ। বাঁশগুলির মাথায় চামর বাঁধা। চামর গাজীর বাঁশের অত্যাবশ্যক উপকরণ। বিশেষজ্ঞের অভিমত, চামর ছাড়া গাজীর বাঁশ অর্থহীন। গভীর বন থেকে অতি কষ্টে তা সংগ্রহ করা হয়। বন্য পশুর হাতে প্রাণ হারালেও লোকে ক্ষান্ত হত না।[১]

অনুষ্ঠানের দিন চেলা গাজীব বাঁশটি মাটি থেকে তুলে নাভীর উপর রেখে দরগার চারপাশে নাচের ভঙ্গিতে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। ঢুলি বাজনা বাজায় তার নাচের তাল জোগাবার জন্য। দরগার সামনেও কিছুক্ষণ তার নাচ চলে। তারপর নাড়া আসে প্রশ্ন করতে, চেলা নাচতে নাচতে সে-প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্নোত্তরে আছে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ফল ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি।

নাড়া—ডিজ্জা ডিজুর ডিজ্জা ডিজুর
বাঁশ গাড়িল কে ?
চেলা—খোলার মাউগে মান্নত করিচে।
নাড়া—মান্নত করে ক্যান ?
চেলা—ছাওয়া না হয় ক্যান ?
নাড়া—ছাওয়া দিবে কে ?
চেলা—গাজী বাবা দয়া করিবে।[২]

গাজী বাবার দয়ায় মানতকারিণী সন্তানবতী হবে— সারা অনুষ্ঠানের

১. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৩০
২. উদ্ধৃত: ঐ, পৃঃ ১৩১-৩২

এটাই মূল লক্ষ্য। নাচগান ও প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে পর বাঁশ থেকে চামর খুলে সযত্নে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। বন্ধ্যা নারী সেই পানি সাত দিন, চৌদ্দ দিন অথবা একুশ দিন পান করে। এতেই সুফল ফলে। গাজীপীর সন্তানহীনাকে সন্তানের বর দিতে পারেন— এরূপ লৌকিক বিশ্বাস থেকে এ-আচারের উৎপত্তি।

গাজীর বাঁশ বিয়া : গাজীর বাঁশের সাথে মানব কন্যার কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা বগুড়া জেলায় মুসলমান কৃষক সমাজে প্রচলিত ছিল। যে পিতামাতার সন্তান হয়নি অথবা সন্তান হয়ে মারা গেছে, সাধারণতঃ তারাই মানত করে এ আচারটি পালন করে। মৃতবৎসার কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করলে একটি সুসজ্জিত বাঁশের সাথে তার কৃত্রিম বিবাহ দেওয়া হয়। তাদের ধারণা, এ ধরনের পরিণয় হলে সে নারীর গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘজীবী হয় ও বংশ রক্ষা পায়। মানত করার পর যদি কোন সন্তান না জন্মে তবে বাঁশের সাথে বাঁশেরই কৃত্রিম বিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বছর ১০ই জৈষ্ঠ্য এর উদ্‌যাপনের কাল।[১] সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; ঐ মেয়ে ফকিরী জীবন যাপন করে। এটি অনেকটা হিন্দুর 'দেবদাসী' প্রথার অনুরূপ। হিন্দুসমাজে 'দোবধরা' নামে একটা অনুষ্ঠান আছে যার মূল লক্ষ্য হল, দেবতার নামে সন্তানকে উৎসর্গ করা। সাধারণতঃ সন্তানহীন দম্পতি মানতের পর সন্তান লাভ করলে তাকে উক্ত দেবতার 'দোবধরা' করে রাখে। এতে তার সকল ফাঁড়া দূর হয়।[২]

বলা বাহুল্য, এই বাঁশটি হল গাজী মিয়ার প্রতীক। স্থান বিশেষে এটি 'মাদারের বাঁশ' নামেও প্রচলিত। মাদারের প্রতীক বাঁশ আছে, ফকিরনাচে তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে গাজীর বাঁশই ব্যবহৃত হয়। বিহারের মুসলমান দফালিরা রোগ-শোক তাড়ানোর জন্য যে লম্বা লৌহদণ্ড নিয়ে মাগন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আচার পালন করে, সেটি গাজী মিয়ার প্রতীক হিসেবেই পরিগণিত হয়। এটিকে লাল কাপড় ও ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়।[৩] বিবাহ উপলক্ষে ব্যবহৃত

১. হারামণি, ২য় খণ্ড, গ্রন্থে উৎকলিত বগুড়া গেজেটিয়ার্সের ইংরেজী উদ্ধৃতি থেকে তথ্য গৃহীত। ঐ, পৃঃ ১॥/.-১॥৶. (ভূমিকা)।

২. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫

৩. ঐ, পৃঃ ১॥৶. (পা. টী.)।

গাজী মিয়ার প্রতীক বাঁশ ও সঙ্গের অন্যান্য বাঁশের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ওড্নেল সাহেব। তিনি লিখেছেন,

The ceremony is performed by the neighbouring villages, who collect at the appointed time carrying bamboos intended to represent different persons and variously dressed. First there is the Ghazi Miyan bamboo, clothed in the red cloth called Salu and with a narrow strip of white round it spirally from bottom to top, the whole ending a Chamar or tuft of cow Chamar-hair. By side of this is carried a bamboo called Hatila Sahib dressed in plain red with numerous cow hair tufts along it. Near them follows a third called the 'Bibir Bans' or waman's bamboo. It is precisely like the first except that it is shorter and smaller. Behind these came two bamboos called Shah Madar and Baro Madar. They are dressed in black with white similarly wound round them.[১]

এখানে মোট পাঁচটি বাঁশ আছে— গাজী মিয়ার বাঁশ, হাতিলা সাহেবের বাঁশ, বিবির বাঁশ, শাহ্ মাদারের বাঁশ ও বড় মাদারের বাঁশ। একে বলা যায়, বাঁশের বরযাত্রা। এ প্রথা অধুনা লুপ্ত।

গ্রামাঞ্চলে প্রথা আছে, কোন রমণীর সন্তান হয়ে মারা গেলে, সে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ বা কড়ি দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে, এদের নাম হয় ক্ষুদে, এককড়ি, তিনকড়ি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এটা কৃত্রিম বিক্রয়; মায়ের বিশ্বাস, এভাবে নবজাতককে বিক্রয় করলে মৃতবৎসা মায়ের নাড়ীর দোষ আর তার উপর বর্তায় না। এটি পুরোপুরি বিপরীত যাদুবিশ্বাসের ফল। গাজীর বাঁশ বিয়ার সংস্কারের পেছনেও একই মনোভাব সংগুপ্ত।

মাদারপীর

ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাদারপীর বাঙালীর লোকমানসে দেবাত্মায় পরিণত হয়েছেন। তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে, লোকাচার গড়ে উঠেছে। এমন কি, পুঁথিসাহিত্যেও তাঁর অলৌকিকতার

১. উদ্ধৃতি গৃহীত: হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১॥৵. (ভূমিকা)।

বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] মাদারপীর স্থানভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হন। নামগুলি তাঁর আত্মিক রূপেরই দ্যোতক। বাংলা এবং বাংলার বাইরে সাধারণভাবে তিনি 'শাহ্ মাদার' নামে পরিচিত। 'দম মাদার' তাঁর বিশিষ্ট নাম। পূর্ববঙ্গে তিনি 'জিন্দা পীর' নামেও পরিচিত।[২] ময়মনসিংহে তাঁকে 'মাদার' বলা হয়। এখানে তিনি অগ্নি-দেবতা রূপে কল্পিত।[৩] কোথাও তাঁকে ব্যাধি উপশমকারী দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়।[৪]

পীর বদর শাহের মত শাহ মাদার ঐতিহাসিক ব্যক্তি।[৫] ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চিশতিয়া, কলন্দরিয়া, নকশবন্দিয়া প্রভৃতি সূফী সম্প্রদায়ের মত এদেশে

১. সায়াদ আলী রচিত 'শাহ্ মাদার' শীর্ষক পুঁথি দ্রষ্টব্য। ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৭৭

২. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৷৷৹ (ভূমিকা)।

৩. শ্রীকামিনী কুমার রায়—ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার নিয়মের বিবরণ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৮

৪. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৷৷৶৹ (ভূমিকা)।

৫. শাহ্ মাদার সম্পর্কে আব্দ্ আল-রহমান চিশতি সাহেবের ফারসী গ্রন্থ 'মিরাত-ই-মাদারী' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ফারসী পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত, নং ২১৭) এবং শেখ আব্দ্ অল-হক দেহলভি সাহেবের আরবী গ্রন্থ 'আখবর অল-আখইয়ার ফি আসরার অল-আবরার' (দিল্লীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত) থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ: মাদার শাহের পূর্ব নাম বদি আল-দীন; শাহ মাদার তাঁর উপাধি। তিনি সিরিয়ায় ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবু ইসহাক শামী ছিলেন হজরত মুসার ভ্রাতা হজরত হারুনের বংশধর। শাহ মাদার দীর্ঘ বার বছর অনাহারে ও এক বস্ত্রে থেকে কৃচ্ছ্র সাধনা করেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। লোকে তাঁর মুখশ্রী দেখে বিভোল হয়ে যেত বলে তিনি মুখোশ পরে থাকতেন। তিনি ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করেন। ভারতে গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর রাজত্বকালে তিনি ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে কানপুরের মকনপুরে দেহ রক্ষা করেন।
Social History of the Muslims in Bengal, p. 113
Social and Cultural History of Bengal, p. 128

মাদারীয়া সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল।[১] এটা তাঁর প্রভাবের গভীরতাকে সূচিত করে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুফী দরবেশ শাহ বদীউদ্দীন মাদারকেই লোকপূজ্য মাদারপীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। মকনপুরে তাঁর মকবরায় মৃত্যু দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ২০শে ডিসেম্বর মেলা বসে।[২] শাহ মাদার বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা তার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ডঃ আবদুল করিম সাহেবের মতে, বদীউদ্দীন শাহ মাদার বাংলাদেশে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি।[৩] শাহ্ মাদার বাংলায় আসুন অথবা না আসুন, ভক্ত মুরিদের প্রচারণায় তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকসাহিত্যে ও পুঁথিসাহিত্যে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা ও স্তবস্তুতি জনপ্রিয়তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

'শূন্যপুরাণে'র 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশে বেহেস্তের অবতার নিরঞ্জনের মুখের বোল ছিল 'দম্বদার'।[৪] ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'দমমাদার' ফকির শাহ মাদারের চেলাগণের বোল।[৫] সায়াদ আলী খোন্দকার রচিত বাংলা পুঁথিসাহিত্যে দম মাদার বা শাহ মাদার সম্পর্কে অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত ও কাল্পনিক নামকরণ পাওয়া যায়। আল্লাহর ফেরেস্তা হারুত ও মারুত যথাক্রমে মানব ও মানবীর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন ভোগ কামনায়। মাদার তাঁদেরই সন্তান। জন্মমাত্র পিতামাতা

---

১. বাংলাদেশে মাদারীয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে ডঃ এনামুল হক লিখেছেন, "বদীউদ্দীন শাহ-ই-মদার মদারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।··· শাহ আল্লাহ নামে তাঁহার এক শিষ্য শহর-ই-নো বা গৌড়ে মাদারী মত প্রচার করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতান শাহ শুজা এক সনদ দিয়া শাহ সুলতান হুসৈন মুরিরাহ বরহিনা নামক এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বঙ্গীয় খলীফাকে বহু বিশিষ্ট অধিকার দান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে 'মদারী-মিছিল' বাহির করিবার অধিকারও একটি।"
মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৯

২. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রাচীন যুগ, পৃঃ ১১৯ (৩য় সং)।

৩. Dr. Abdul Karim—Impact of Islam, East Pakistan a Profile *1962, p. 35*

৪. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৭

৫. বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রাচীন যুগ, পৃঃ ১১৯
শূন্যপুরাণের এ অংশটি প্রক্ষিপ্ত।

মাদার গাছের তলায় তাঁকে ফেলে চলে যান; এক শিকারী শিশুকে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করেন, মাদার নামক গাছের তলায় পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখেন মাদার দেওয়ান বা শাহ মাদার।[১] ঐ কাব্যে তাঁর দম মাদার নামকরণ সম্পর্কে অন্য ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। পীরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বড় পীরের সহিত 'লুকোচুরি' খেলার এক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে মাদার হাওয়ায় মিশে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দমে বা নিঃশ্বাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বড় পীর খুঁজে বের করতে না পেরে পরাজয় স্বীকার করেন। মাদার বড় পীরের ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরিয়ে আসেন। কবির ভাষায়,

খেচিয়া উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হৈতে
দম মাদার বলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে।
দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল
কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল।[২]

এখানে বড়পীর তথা গাজীপীর অপেক্ষা দম মাদারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। পুঁথিকারের মতে, মাদার পুরুষও নন, স্ত্রীও নন, তাঁর আহার নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি 'দমের মাদার'।[৩]

লোকসাহিত্যের 'মাদারের গান'[৪] শীর্ষক গাথায় মাদার মণি বা মাদার পীরকে অন্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে মাদার 'বরকত মা'র (ফাতেমা বিবি) সন্তান। সুমার পর্বতে যাবার জন্য বরকত মার কাছে তিনি অনুমতি চান। মার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দশ হাজার 'মলঙ্গ ফকীর' নিয়ে যাত্রা করেন। পথে এক ডাকাত দলের সহিত তাঁর সংগ্রাম হয়। তিনি ডাকাতদের পরাজিত করেন ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন।

---

১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৭৮-৭৮

২. উদ্ধৃত: ঐ, পৃঃ ১৭৮-৭৯

৩. ঐ, পৃঃ ১৮০

৪. বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর 'মাদারের গান' ঢাকা জেলা থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে একাডেমীর লোকসাহিত্য সংগ্রহে (খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২, ঢাকা, ১৯৬৬) রক্ষিত আছে। জনাব আশরাফ সিদ্দিকী 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রাজশাহী জেলায় 'মাদারের গান' প্রচলিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য: লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৩৬

এখানে তাঁর অলৌকিক কলাকৌশলের বর্ণনা আছে। তিনি অশরীরী অবস্থায় মেঘে আত্মগোপন করতে পারেন বলে তার উল্লেখ আছে।[১] মাদারের গানটি পীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। পল্লীর ফকীর সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গেয়ে তাঁর মহিমা প্রচার করে থাকে। মাদার পীরের এ কাহিনীটিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কেননা নবী দুহিতা ফাতেমার মাদার নামে কোন সন্তান ছিলেন না।

মাদারপীর সম্পর্কে কয়েকটি প্রথা ও আচার পূর্ববঙ্গে দেখা যায়— 'মাদারের বাঁশ তোলা', 'মাদারীর শিরনী', 'মাদারের লুট পোড়ান', 'মাদারের বাঁশ বিয়া', 'নল্যা ডাকা' ইত্যাদি।

মাদারের বাঁশ তোলা : বছরে একবার পীরের স্মৃতি উদ্দেশ্যে 'মাদারের বাঁশ তোলা' অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। ডঃ আবদুল করিম সাহেবের মতে, উত্তর বঙ্গে কোন কোন জেলায় মাদারীয়া সম্প্রদায়ের ফরিরেরা এটি উদযাপন করে।[২] আচারটির বিবরণ তাঁর আলোচনায় পাওয়া যায় না। বাংলা একাডেমীর সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুরের মতে, আচারটি ঢাকা জেলায় 'মাদারের জোড় বাঁশ' নামে পরিচিত। তিনি এর বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, "জোড় বাঁশকে লাল কাপড় দিয়া মোড়া হয়। মাদারভক্ত লোকেরাই মাদার বাঁশ বাহির করিয়া থাকে। মাদার বাঁশের দলে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক থাকে। একজনের হাতে একটি চমর থাকতে দেখা যায়। তাহারা লোকের বাড়ি বাড়ি উঠিয়া গান গাহে। মূল বয়াতি মাঝ দুয়ারে থাকিয়া গান করেন। দোহারেরা বয়াতীকে ঘিরিয়া দোহার ধরে। সবাই দাঁড়াইয়া গাহে।"[৩]

অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপনের কোন কাল রহমান সাহেব উল্লেখ করেননি। এটি 'মাদারী মিছিল' নামেও পরিচিত।[৪] বগুড়া জেলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে 'মাদারের মেলা' বসে।[৫]

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২ (ঢাকা), ১৯৬৬
২. Social History of the Muslims in Bengal, p. 170
৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২ (ঢাকা), ১৯৬৬ সংগ্রাহককৃত মাদার গানের 'প্রসঙ্গ কথা' অংশ দ্রষ্টব্য।
৪. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৯
৫. কাজী মোহাম্মদ মেছের—বগুড়ার ইতিকাহিনী, বগুড়া, ১৯৫৭, পৃঃ ৪০৮

মাদারীর শিরনী : মাদারীর ভোগ বা মাদারীর শিরনী নামে আর একটি আচার গ্রামাঞ্চলে পালিত হয়। পীরের দরগাহ সংলগ্ন পুকুরে যে মাছ বা কুমীর পোষা হয় তারই উদ্দেশ্যে শিরনী দেওয়া হয়। এ ধরনের মাছ ও কুমীর মাদারী নামে আখ্যাত হয়ে থাকে।[১] মানসিক করে সুফল পাওয়ার আশায় এ ভোগ দেওয়া হয়।

মাদারের লুট পোড়ান : লোকসাধারণের বিশ্বাস, আগুন হল মাদার পীরের চেলা। তিনি মন্ত্র পড়ে আগুন নিভাতে পারেন। শ্রীকামিনী কুমার রায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহস্থরা বিশ্বাস করে, গাঁ-ঘরে আগুন লাগে মাদার পীরের প্রতি অবজ্ঞার কারণে। তিনি আগুন দিয়ে লোকের সর্বস্ব ধ্বংস করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'ধ্বংসী মাদার'। লোকের বিশ্বাস, মাদারের লুট পোড়ান আচার পালন করলে আগুন থেকে বাঁচা যায়। তিনি আচারটির এরূপ বিবরণ দিয়েছেন, "মাদারের লুট পোড়াইবার পূর্বদিন রাত্রিতে নিরামিষ খাইয়া কুমারীরা পাঁচ সের পরিমাণ চাউলের গুড়া তৈয়ারী করে। সেই গুড়াতে কাঁচা হলুদ, আদা, পেঁয়াজ ও লবণ মাখিয়া 'রোটি পিঠা' হয়। একটি মোরগ জবাই করিয়া ও পোড়াইয়া, ঢেকিতে কুটিয়া মসলা মাখিয়া তাহার কতক অংশ এবং পাঁচটি পিঠা ও অপর একটি মিঠা পিঠা আগপাতে করিয়া মাদারের উদ্দেশ্যে দেয়। পরে তাহার কিছু ছাইয়ের নীচে পুঁতে রাখে। বাড়ির বাহিরে মাঠে মোরগটি পোড়ান হয়, ইহাকেই লুট পোড়ান বলে।"[২]

প্রবন্ধকারের মতে, মুসলমান গৃহস্থের বিবাহকালে এ অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। তিনি এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেননি। আচারের রীতি থেকে বলা যায়, বিয়ের পর পরের ঘরে গিয়ে রান্নার ভার নববধূর উপর পড়ে। বধূর হাতে ঘরে আগুন লাগলে মহাবিপত্তি ঘটে। নতুন সংসার-জীবনে প্রবেশ করার আগে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মেয়েরা মাদারের লুট পুড়িয়ে ও শিরনী দিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়। তাতে ভবিষ্যতে মেয়ের মান বাঁচবে, মর্যাদা রক্ষিত হবে।

মাদারের বাঁশ বিয়া : মাদারের বাঁশের সহিত মানব কন্যার কৃত্রিম বিবাহ প্রথা বগুড়া জেলায় প্রচলিত ছিল। যে পিতামাতার সন্তান হয়নি

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ১১২

২. পূর্বোক্ত : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃ: ২১৮

অথবা সন্তান মারা গেছে, সাধারণতঃ তারাই মানত করে এ আচারটি পালন করেন। মৃতবৎসার সন্তান হলে বাঁশের সঙ্গে তার কৃত্রিম বিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ধারণা, এ ধরনের পরিণয় হলে সে নারীর গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘজীবী হয় ও বংশ রক্ষা পায়। মানত করার পর যদি কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ না করে তবে বাঁশের সঙ্গে বাঁশেরই কৃত্রিম বিয়ে দেওয়া হয়।[১] এ বাঁশ হল মাদার পীরের প্রতীক। এটি বগুড়া জেলার লোক-প্রথা। প্রতি বছর ১০ই জ্যৈষ্ঠ এর উদ্‌যাপনের কাল।[২]

নল্যা ডাকা : গ্রাম-ঘরে কলেরা মহামারী শুরু হলে মাদারীয়া ফকিরেরা এটা পালন করে। জনাব মনসুর উদ্দীনের মতে, নল্যা ডাকা পাবনা জেলায় চল ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, "যতদূর মনে হইতেছে মাদারের বাঁশ কলেরা প্রভৃতির আগমনে কিংবা বিশেষ মানসিক করিয়া সারাদিন দেখাইয়া রাত্রির বেলা সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভজন করে বা নল্যা ডাকে। নল্যা শব্দটি সম্ভবতঃ ফারসী নালিদান (অর্থ ক্রন্দন করা) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।"[৩]

কলেরাদি মহামারী ছাড়া সর্পাদি কীটের দংশন থেকে বাঁচার জন্য নল্যা ডাকা তথা মাদারের জিকির করার প্রথা আছে। জনৈক প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে লিখেছেন,

Dam-i-Madar (or vulgarly, Dhum-Madar) is still a popular ceremony with the agricultural and lower classes in India. It originally consisted by holding a bamboo banner (chhari) in hand and jumping into fire, and treading it out with the exclamation of Dam-i-Madar. It is devoutly believed that not a hair of these devotees gets signed and that those who practise the ceremony are secure against the venoms of snakes and scropoins. He is believed to be still alive, and hence is styled 'Zinda shah Madar'.[৪]

---

১. হারামণি (২য় খণ্ড) গ্রন্থে উৎকলিত বগুড়া গেজেটিয়ার্সের ইংরেজী উদ্ধৃতি থেকে তথ্য গৃহীত। ঐ, পৃঃ ১৷৴০-১৷৵০ (ভূমিকা) দ্রষ্টব্য।

২. ঐ, পৃঃ ১৷৴০ (ভূমিকা)।

৩. ঐ, পৃঃ ১৷৵০ (ভূমিকা)।

৪. উদ্ধৃতি গৃহীত : ঐ, পৃঃ ১৮৩ (অতিরিক্ত টীকা-টিপ্পনী)।

এখানে হিন্দুর মনসার তুল্য মাদারের স্থান।

বাংলাদেশে প্রচলিত এসব লোককথা ও লোকাচারে ঐতিহাসিক পীর শাহ মাদার অজ্ঞ ও অন্ধ ভক্তের কাছে আত্মাবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তিনি মিশ্র দেবগুণের অধিকারী।

বদর পীর

বাংলার হিন্দু-মুসলমান মাঝি-মাল্লারা নদীপথে অথবা সমুদ্রপথে খেয়া পারাপার ও বাণিজ্যযাত্রার সময় 'পাঁচ পীর বদর বদর' উচ্চারণ করে প্রথম পাড়ি জমায়।[১] ঝড়-তুফানে অথবা খরস্রোতে পীরগণ তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, এরূপ বিশ্বাস থেকে তাঁদের নাম স্মরণ-করা হয়। দেশের মাঝিমাল্লারা তাঁদের নদী-নৌকাদির অভিভাবক দরবেশ বলে মনে করে থাকে।

ঐতিহাসিক দরবেশ প্রবর বদর শাহ যে বদর পীর, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। বহু স্থলে বহু বিষয়ে তাঁর নাম পাওয়া যায়। উচ্চ সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে পীর বন্দনায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। বহু দরগাহ ও মকবরা তাঁর নামের সহিত জড়িয়ে আছে। চট্টগ্রামে মুহসিন আউলিয়ার মাজারের এক প্রস্তর ফলকে পীর বদর শাহের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে।[২] তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এতেই তার প্রমাণ।

বর্ধমান জেলার কালনায় 'বদর সাহিবে'র কবর আছে; সেখানে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তাঁর উদ্দেশ্যে মাটির ঘোড়া, ফলফলারি, শিরনী ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে থাকে।[৩] দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে পীর বদর

১. সম্পূর্ণ বোলটি হল:

(ক) মুসলমানী ভাবাশ্রিত—
আমরা আছি পোলাপাইন,
গাজি আছে নিগাবান
আল্লা, নবী, পাঁচ পীর, বদর বদর।

বঙ্গে সূফী প্রভাব. পৃঃ ২৪২

(খ) হিন্দুয়ানি ভাবাশ্রিত—
আমরা আছি পোলাপাইন
গাজি গঙ্গা নিগাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচপীর বদর বদর॥

পূর্ব পাকিস্তানের সূফীসাধক পৃঃ ৭

২. পূর্ব পাকিস্তানের সূফীসাধক, পৃঃ ৮
৩. বঙ্গে সূফীপ্রভাব, পৃঃ ১৩২

অল দীন নামে এক দরবেশের দরগাহ আছে। জনশ্রুতি, তিনি সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সহায়তায় হিন্দু রাজা মহেশকে পরাভূত করে তথায় ইসলামধর্ম প্রচার করেন।[১] বাংলার বাইরে বিহারের 'ছোট দরগাহ' পীর বদরউদ্দীন বদর-ই-আলমের বলে পণ্ডিতগণ চিহ্নিত করেছেন। বদর শাহ প্রকৃতপক্ষে এখানেই সমাহিত (১৪৪০ খ্রীঃ মৃত) বলে তাঁদের অভিমত।[২] বদর পীরের সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি চট্টগ্রামে। এখানে বিভিন্ন নামে তাঁর পরিচয়: 'বদর আলম', 'বদর মকাম', 'বদর পীর', 'বদর আউলিয়া', 'অভিভাবক দরবেশ' ইত্যাদি। চট্টগ্রামে বদর পীর ইসলামধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি একখানা পাথরের উপব চড়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি ভূত-প্রেত, জীন-পরী অধ্যুষিত অঞ্চলে ইসলামের আলোকশিখা প্রজ্বলিত করেন এবং মগদের অত্যাচার দমন করে মনুষ্যের বসবাসের উপযোগী করে তোলেন। তিনি মাটির 'চাটি' বা প্রদীপ জ্বালিয়ে যে পাহাড়ে ধ্যান করতেন তার নাম 'বদর পাটি'। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সকলে মানসিক করে সেখানে সন্ধ্যাবাতি দেয়। চট্টগ্রামে বর্তমানে প্রতি বছর ২৯শে রমজান বদর পীরের 'উরস' হয়। উরসে অভ্যাগতদের মধ্যে শিরনী বিতরণ করা হয়।[৩]

মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির আত্মবিবরণী ও বন্দনা অংশে বদর পীরের নাম পাওয়া যায়। পনের শতকের কবি মুজম্মিল 'সায়াৎনামা' কাব্যে লিখেছেন,

শাহ বদরুদ্দিন পীর কৃপাকুল হরি।
শত মুখে সে বাখান কহিতে না পারি ॥[৪]

ষোল শতকের কবি দৌলত উজীর বাহরাম খান 'লায়লী-মজনু' কাব্যে লিখেছেন,

চৌদিকে বিশাল গড় উজল বিস্তর সর
তাহে সাহা বদর পয়ান।[৫]

১. Bengal District Gazetteers: Dinajpur. 1912, p. 20
২. Social and Cultural History of Bengal, p. 129
৩. Social History of the Muslims in Bengal, pp. 114-15
৪. উদ্ধৃত: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৬৮
৫. ঐ, পৃঃ ৯৫

সতের শতকের কবি মুহম্মদ খানের 'হানিফার লড়াই' কাব্যের বন্দনায় আছে,

চাটিগ্রাম বন্দি কহিমু বদর আলম।
তাহান চরণে মোর হাজারো ছালাম ॥[১]

বাংলার লোককবির বন্দনাতেও বদর পীরের নাম পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'নূরন্নেছা কবরের কথা'র বন্দনাংশে আছে,

আশী হাজার পীর মানম ন'লাখ পেকাম্বর।
শিরের উপরে মানম চাটিগার বদর ॥[২]

চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত 'পরীবানুর হাঁহলা' পালাগানে আছে,

সুজা বাদসার আওরাত পরী বানু নাম
চাডিগাঁতে আসি তারা বদরের মোকাম
বহুত খরাত দিলা সোনা ভরি ভরি রে।[৩]

এ সমস্ত দৃষ্টান্ত একজন পীর সম্পর্কেই অন্বিষ্ট হতে পারে। একজন পীরের পক্ষে চটগ্রাম, দিনাজপুর, বর্ধমান, বিহার অঞ্চল ভ্রমণ করা অসম্ভব ছিল না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানতাপস ও ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক পীর বদর লোকচেতনায় সম্ভবতঃ রূপক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁর পুণ্যস্মৃতি জনসাধারণের মানসলোকে স্থান পেলে ক্রমে তিনি পূজ্য পীররূপে সন্ধ্যাবাতি, শিরনী, স্তবস্তুতির কারণ হয়ে উঠবেন, তা স্বাভাবিক। লক্ষণীয় সত্যপীরিয়া, মাদারীয়া প্রভৃতি মতবাদের মত বদর পীর সম্পর্কিত কোন মতবাদ এদেশে পরিলক্ষিত হয় না।

পাঁচপীর

বদর পীরের সঙ্গে পাঁচপীরের নাম স্মরণ করে মাঝিরা নৌকা পাড়ি দেয়। বদর পীরই প্রকৃতপক্ষে নৌকাদির অভিভাবক দেবতা; তাঁর সাথে পাঁচপীরের নাম নেওয়া হয় মঙ্গল কামনায়। পাঁচপীর মঙ্গলের

---

১. ঐ, পৃঃ ১৮৬
২. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৩
৩. ঐ, পৃঃ ৪৫৬

দেবতা। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' গীতিকায় সখিনা পরিচালিকা দরিয়াকে বলেছে,

পঞ্চপীরের দরগাব মাটি আন্যা রাখ ঘরে।
রণে জিত্যা আইলে স্বামী দিতাম তার শিরে ॥[১]

পশ্চিমবঙ্গে গৃহদেবতা হিসেবে পাঁচপীরের পূজার প্রচলন আছে। ভক্ত গৃহস্থ বাড়ির কোন একটি ঘরের উত্তর পশ্চিম-কোণে মাটির উচু ঢিপি দিয়ে পীরের বেদী তৈরি করে। বেদীর উপর মানুষের হাতের আকার বিশিষ্ট একখণ্ড লোহা পোঁতা হয়। এর প্রতিটি আঙুল হল এক একজন পীরের প্রতীক। কব্জী বরাবর লোহা খণ্ডটি হলুদ কাপড়ে জড়ান থাকে।[২] অনুষ্ঠান সহকারে সাধারণ মুসলমান গৃহস্থ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এরই উদ্দেশ্যে শিরনী দেয়।

সোনারগাঁয়ে পাঁচপীরের মাজার আছে। এতে পাশাপাশি পাঁচটি কবর আছে। কোন প্রাচীন ফলকে অথবা সমসাময়িক নথিতে এঁদের পরিচয় জ্ঞাপক নাম উৎকীর্ণ বা লিখিত হয়নি। কেবল লোকস্মৃতিতেই পাঁচপীর নাম প্রচারিত হয়ে আসছে। বগুড়ায় লোকনাথ পাহাড়ের নিকটে পাঁচপীরের দরগাহ আছে।[৩] সিলেটের জিন্দাবাজার মহল্লায় পাঁচপীরেব মোকাম নামে কবর আছে।[৪] খুলনা জেলায় লাবসা অঞ্চলে পাঁচপীবের দরগাহ আছে এবং বারবাজারের কাছে পাঁচপীরের নামে পুকুব আছে।[৫]

বাংলার বাইরে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে এঁদের প্রভাব আছে।[৬] বিহারের মুসলমান দফালীরা পাঁচপীরের পূজা করে। গ্রামে কলেরাদি মহামারী দেখা দিলে তারা ঢোল বাজিয়ে গৃহে গৃহে ফিরে জিকির করে; গৃহস্থরা তাদের সাদকা দেয়। তাদের হাতে লাল কাপড়ে জড়ান লৌহ শলাকা থাকে। এটিকে গাজী মিঞার (পাঁচপীরের

১. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৯
২. ERE, Vol. IX, 1917, p. 600
৩. বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃঃ ৮৫
৪. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫
৫. ঐ, পৃঃ ৪০৬
৬. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।/. (ভূমিকা)।

একজন) প্রতীক জ্ঞানে ফুল দিয়ে পূজা করা হয়।[১] সুতরাং পাঁচপীরের ধারণা ও বিশ্বাস সর্ব ভারতীয়।

পাঁচপীরের নামের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নানা মত ও পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। মনসুর উদ্দীন সাহেব লিখেছেন, "পাক পাঞ্জাতন হইতে সম্ভবতঃ এই পাঁচপীর ধারণা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গ্রাম্যগানে পাকপাঞ্জাতনের বারংবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পীরের ধারণা মুসলিম সমাজে নূতন নহে। মুসলমানের পাঁচবার পবিত্র উপাসনা করিতে হয়।"[২]

'পাক পাঞ্জাতন' নামে একখানি বটতলার পুঁথিতে হজরত মহম্মদ, বিবি ফাতেমা, হজরত আলি, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন—পাঁচজন মহাত্মার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরাই পাক পাঞ্জাতন নামে অভিহিত। তাঁরা 'পঞ্চনূরী' নামেও পরিচিত।[৩] পাঁচপীরের নাম পরিকল্পনায় এ পাঞ্জাতনের প্রভাব আছে কিনা তা স্থির করে বলা যায় না। ডঃ এনামুল হক হিন্দু-মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণকাব্যাদিতে মানুষ-স্থান-গুণ-ভাব বাচক পাঁচ সংখ্যার সাদৃশ্যে পাঁচপীরের নামের উদ্ভব অনুমান করেছেন।[৪] বৌদ্ধদেব মহাযানী শাখায় 'পঞ্চ তথাগত' বা 'পঞ্চধ্যানী বুদ্ধে'র ধারণা আছে। এঁরা হলেন ককসন্দ বুদ্ধ, কনকমন বুদ্ধ, কশ্যপ বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ এবং মৈত্রেয় বুদ্ধ। বৈরোচন, অক্ষোভ্য রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি —এই পঞ্চ নামও প্রচলিত আছে।[৫] প্রথম চারজনের নামে একই বুদ্ধ চার যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, মৈত্রেয় বা অমোঘসিদ্ধি বুদ্ধ এখনও অনাগত। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তিত একটি শাখা ধর্মপূজায় 'পঞ্চ পণ্ডিতে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণে' এ

১. George Grierson—Behar Peasant Life, p. 407

২. হারামণি. ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।/• (ভূমিকা)।

৩. মক্কা ঘরে যেই দুয়ারেরে নামাজ পড়ছে পঞ্চনূরী।
তিরিশ দানা পঞ্চমানিক দিয়াছেন নবী॥ —বাউল গান
উদ্ধৃত : ঐ, পৃঃ ৫৮

৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৪২-৪৮

৫. ডঃ আশা দাস—বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ৭৮-৭৯

সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ধর্মপ্রচারক যথাক্রমে সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত ও রামাই পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েছেন; 'কল্পযুগ' বা শূন্যযুগে' গোঁসাই পণ্ডিত আসবেন।[১] মুসলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধদের একটি বিরাট অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তন ধারায় অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা পূর্বসংস্কার বশতঃ পরবর্তীকালে পঞ্চপীরের কল্পনা করতে পারে বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া নাথধর্ম বা ধর্মপূজার গুরুবাদের সহিত সফীমতের পীরবাদের অনেক মিলও আছে। সূফীর ভূমাতত্ত্বে পাঁচটি স্তর কল্পনা করা হয়েছে যার ভেতর দিয়ে আত্মা পরমাত্মার দিকে প্রয়াণ করে; এ পাঁচটি স্তর হল:

ক.	নস্থত	—	মানবজগৎ
খ.	মালাকুত	—	জ্ঞানজগৎ
গ.	জবরুত	—	শক্তির জগৎ
ঘ.	লাহুত	—	ধ্বংসের জগৎ
ঙ.	হাহুত	—	নীরব জগৎ।[২]

বৌদ্ধের 'ভদ্রকল্প', নাথের 'শূন্যযুগ' এবং সুফীর 'হাহুত' প্রায় একই অর্থ বহন করে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুগৃহে 'পাঁচকুমারের ব্রতে'র প্রচলন আছে। পাঁচকুমার হলেন ফুলকর, দুধকর, জলকর, কালকর ও সকালকর। তাঁরা মহাদেবের পঞ্চপুত্র; অন্নব্যঞ্জনের আধিপতি। তাঁদের ইচ্ছায় প্রাণিজগৎ খায় অথবা উপবাস থাকে।[৩] বাঙালীর লোকমনে পাঁচপীরের ধারণা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিবিধ ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে। পঞ্চ শব্দ সম্পর্কে ঐতিহ্যিক সংস্কার পীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঁচ-পীরের ধারণা গঠিত হয়েছে। এটি লৌকিক চিন্তার ফসল। বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট পাঁচজন পীরকে কেন্দ্র করে সার্বজনীন এবং সর্বকালীন অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন নাম-তালিকা পাওয়া যায় না। এক এক অঞ্চলে তাঁদের নাম ভেদ আছে। দেশ-কালভেদে যাঁরা অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদেরই সমাহারে পঞ্চপীর নিরূপিত হয়েছেন। পাঞ্জাব প্রদেশে দুটি তালিকা আছে,

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫
২. Geiger—Civilization of Eastern Iranians, Vol. I, p. 104
৩. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭

তাতে একটির সাথে অপরটির মিল নেই, তবে সব পীরই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।[১] উত্তর প্রদেশের তালিকায় দুজন ব্যক্তির ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, বাকী তিনজন লৌকিক।[২]

বাংলাদেশে পাঁচপীরের নির্দিষ্ট কোন তালিকা নেই। স্থান ভেদে তাঁদের নাম ভেদ আছে। সোনারগাঁয়ে সমাধিস্থ পাঁচপীরের নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষে' তাঁদের নাম এরূপে লিখিত হয়েছে: গায়স্‌উদ্দীন, সামস্ুদ্দীন, সিকন্দর, গাজী ও কালু।[৩] এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে পারেন; পরের দুজনের ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কিশোরগঞ্জে একটি লোক প্রচলিত তালিকা অনুযায়ী পাঁচপীরের নাম হল: বদরপীর, মাদারপীর, খোয়াজ খিজির, মানিকপীর ও কালুপীর।[৪] বদর পীর

১. প্রথম তালিকা: খাজা কুতব উদ্দীন, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি, শেখ নিজাম উদ্দীন আউলিয়া, নাসির উদ্দীন আবুল খায়ের ও সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ।

দ্বিতীয় তালিকা: বহাউদ্দীন জাকারিয়া, শাহ রুক-ই-আলম হজরত, শাহ শামস্-ই-তাব্রিজ, শেখ জালাল মখদুম জাহানিয়া ও শেখ ফরিদ উদ্দীন।

ERE, Vol. IX, p. 600

২. উত্তর প্রদেশের তালিকাটি এরূপ: গাজী মিঞা, আমিনা সতী, ভইরণ, বুগ্রাহ্না, ও বন্দে। Ibid, p. 600

৩. একটি 'গাজীর গীতে' নামগুলি এরূপে পাওয়া যায়:

পোড়া গাজী গয়েশ্‌দী তার বেটা সমসদী
পুত্র তার সাই সেকন্দব।
তার বেটা বড় খান গাজী খোদাবন্ধ মলুকের কাজী
কলিযুগে তার অবসর॥
বাদশাই ছিড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কালুর সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।

উদ্ধৃত: সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫

৪. বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক জনাব মোহম্মদ সাইদুরের কাছ থেকে সংগৃহীত।

ও মাদার পীর ঐতিহাসিক চরিত্র ; খোয়াজ খিজির পৌরাণিক চরিত্ররূপে পরিগণিত ; কালু পীরের মত মানিকপীর লৌকিক কল্পনাজাত। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত পাঁচপীরের নামের একটি তালিকা এরূপ : বড় খান গাজী, জাফর খান, খান জাহান, পীর বদর ও খোয়াজ খিজির।[১] এঁদের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ভিত্তি আছে। তালিকা তিনটিতে একটি নামও সাধারণ নয়। বদর পীর ও খোয়াজ খিজির দুটি তালিকায় পাওয়া যায়।

দেশ প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী পাঁচপীরের বিচিত্র অলৌকিক গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হক লিখেছেন, "বঙ্গের পাঁচপীর সমষ্টির ভক্তেরা বিশ্বাস করে, এই পীরগণের মনসন্তুষ্টি সম্পাদন করিলে তাহাদের সর্বমঙ্গল সাধিত হয়। তাহাদের বিশ্বাস, এই পীর তাহাদিগকে আকস্মিক বিপদ, দৈবদুর্ঘটনা, মহামারী, ওলাউটা, ম্যালেরিয়া, নৌকাডুবি প্রভৃতি অসংখ্য আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। সন্তানসন্ততিকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা, বন্ধ্যা গাছকে ফলন্ত করা, গাভীকে অপর্যাপ্তরূপে দুগ্ধবতী করা এবংবিধ ছোট বড় অনেক কাজে পাঁচপীর সমষ্টির সাহায্য পাওয়া যায়। ....পাঁচপীর যেন বঙ্গের হিন্দুমুসলমানের সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ বা এবংবিধ কোন দেবতার প্রকাশ।"[২]

খোয়াজ খিজির

আরবীয় পৌরাণিক দরবেশ খাজা খিজির বাংলাদেশে খোয়াজ খিজির বা খোয়াজ পীর নামে অভিহিত। তিনি সর্বত্র 'পানির মালিক' হিসেবে পরিগণিত ও সম্মানিত হয়ে আসছেন। সাধারণের বিশ্বাস, খোয়াজ খিজির নৌকাডুবি থেকে যাত্রীদের রক্ষা করেন। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, ভক্তের আহ্বানে তিনি সশরীরে আবির্ভূত হয়ে বিপদমুক্তির পথ দেখান। তিনি কেবল নদী-দরিয়ার অধিপতি নন, খোদ 'আব-হায়াতে'রও উৎসমূল হিসেবে পরিগণিত হন।[৩] জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের বিশ্বাস যে, নদী-সমুদ্রের তীর হতে

---

১. নিজস্ব সংগ্রহ।

২. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৪৪-৪৫

৩. A. R. Mallik—British Policy and the Muslims in Bengal, p. 16

চল্লিশ দিন ধরে প্রত্যক্ষ করলে খোয়াজ খিজিরকে মূর্তিমান দেখা যায়।[১] ভারতীয় হিন্দুপুরাণে বরুণ জলদেবতা। ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খোয়াজ খিজির মৌলিকভাবে সে স্থান গ্রহণ করেছেন। বাঙালীরা তাঁকে সে মূর্তিতেই মান্য করে। 'নছুর মালুম' পালাগানে (চটগ্রাম থেকে সংগৃহীত) খোয়াজ খিজির সমুদ্রের ঝড়-তুফানের কারণ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। আকাশে তুফানের সম্ভাবনা দেখে মাঝিরা বলেছে, 'কেরামত করে বুঝি খোয়াজ খিজির।'[২] আবার ব্যাত্যাহত নছুরকে উদ্ধার করতে অন্য মাঝিরা এগিয়ে এলে পল্লীকবি গেয়েছেন,

দরেয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির।
শুনিল শুনিল যেন তাহার জিকির ॥[৩]

খোয়াজ খিজির বিপদ আনেন, আবার ভক্তের বিপদ দূর করেন।

পণ্ডিতগণের মতে, নবী ইলিয়াস পরবর্তীকালে রূপক চরিত্র খোয়াজ খিজিরে পরিণত হয়েছেন। ইলিয়াস ইহুদীদের এলিজার রূপান্তরিত চরিত্র।[৪] খ্রীস্টীয় আট শতকে দরবেশ ইব্রাহিম ইবন অদহম সূফী-সাধনায় খোয়াজ খিজিরের অলৌকিকত্ব প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যরাই ভারতে খিজিরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে খিজিরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ কখন প্রবেশ করে তা ঠিকভাবে জানা যায় না। ঢাকায় মুঘল সুবেদার মুকরম খান (১৬২৬-২৭ খ্রী:) খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে 'বেরা উৎসব' পালন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। পরে মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-২৭ খ্রী:) আরও জাঁকজমকের সহিত উৎসবটি উদযাপন করেন।[৫] তখন থেকে জনসাধারণ উক্ত উৎসব এবং উৎসবের কেন্দ্র চরিত্র খোয়াজ খিজির সম্পর্কে কৌতূহল পোষণ করে আসছে। গরীবুল্লাহর রচিত 'আমীর হামজা' পুঁথিতে

১. James wise—Notes on the Races and Castes and Trades of Eastern Bengal, London. 1883, p. 12
২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড. ২য় সংখ্যা, পৃ: ২৬
৩. ঐ, পৃ: ৩৯
৪. ERE, Vol. VII, p. 694
৫. Social and Cultural History of Bengal, Vol. II, p. 258

খোয়াজ খিজির কবির আধ্যাত্মিক গুরু রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।[১] এটি আঠার শতকের শেষের দিকের রচনা। এসব প্রমাণ সাপেক্ষে সাধারণভাবে বলা যায়, মুঘল আমলেই খিজিরিয়া সম্প্রদায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং তারপর থেকে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র সকল প্রকার লোকের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বাংলার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে খোয়াজ খিজিরের প্রভাব আছে।[২]

লোকবিশ্বাস মতে, খোয়াজ খিজির অমর বা চিরঞ্জীব। এ অর্থে তিনি 'জিন্দাপীর' নামে সচরাচর অভিহিত হন।[৩] খিজির পীর সস্ত্রীক পানিতে বাস করেন। কামিনীকুমার রায় ময়মনসিংহে প্রচলিত একটি লৌকিক গল্পে বলেছেন, খোয়াজ খিজিরের জন্ম হলে দরবেশের নির্দেশ মত তাঁর মা দু'মাসের বয়সকালে এক যুবতী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এরূপ না করলে তাঁব মৃত্যু হত। মেয়ের বয়স বেশী বলে লোকে

১. Dr. Qazi Abdul Mannan—The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal, University of Dacca, Dacca, 1966, p. 112

২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৯

৩. জিন্দাপীর কে হতে পাবেন এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে। গাজীপীব, মাদারপীর ও খোয়াজ খিজির অঞ্চল বিশেষে তিন জনই জিন্দাপীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। লোকরচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মহুয়া'র বন্দনায় আছে—'সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর।' (মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩) পূর্ববঙ্গ গীতিকায় 'পীর বাতাসী'র বন্দনায় আছে—'আসন থাইক্যা জিন্দাগাজী মোরে দেউবাইন বর।' (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহ মাদারকে জিন্দাপীর বলে চিহ্নিত করেছেন। (হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১॥/.)। মাদার পীরের জিকিরের বুলি দম-মদার। ফারসী দম শব্দের অর্থ শ্বাসবায়ু। শ্বাসপ্রশ্বাসেই জীবন, এরূপ অর্থে জিন্দা কথাটি আসতে পারে। বাউল সাধনায় দম বা শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধক যোগক্রিয়ায় দম-মাদারের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে। বাউল কবি নারায়ণ লিখেছেন,

দম-মাদারকে ডেকে এনে দমেতে মন কর ভর,
দমের আগে মানুষ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর।

নিন্দা করলে একদিন তিনি শিশু খোয়াজকে পানিতে ফেলে দেন। খিজির একটি ভেলায় আশ্রয় নেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন যে, আড়াই দিন অপেক্ষা করলে তাঁরা ধনী হতে পারতেন। মনো-দুঃখে স্ত্রী পানিতে ঝাঁপ দেন। সে অবধি তাঁরা পানিতে বাস করেন।[১] কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে প্রায় অভিন্ন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ছয় মাসের খোয়াজের সহিত যুবতী নারীর

আট কুঠুরি বন্দ করে উজান তোল তাবে।
অধর চাঁদকে ধরবি যদি দম কষে দম সাধন কর।

(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃঃ ২৮৯)।

চিরঞ্জীব অর্থে খোয়াজ খিজিরকেও জিন্দাপীর বলা হয়। সিন্ধু প্রদেশের লোকেরা খোয়াজ খিজিরকেই জিন্দাপীর বলে থাকে। তাদের বিশ্বাস, খিজির পীর 'আব-হায়াত' পান করে অমর হয়েছেন। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। (H. T. Soreley—Shah Abdul Latif of Bhit, Oxford, University Press, 1966, p. 169).

খোয়াজ খিজিরকে পানির দেবতা বলা হয়। জিন্দাপীরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি বাউল গানে আছে—'যাও জিন্দাপীরের খান্দানে, আবহায়াতের মর্ম যে জানে।' (উদ্ধৃত : সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ২০)। আব (ফারসী শব্দ) অর্থ পানি, হায়াত (আরবী শব্দ) অর্থ জীবন। আব-হায়াতের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Water of Life'। খোয়াজ খিজির এর উৎস আবিষ্কার করেন। পবিত্র কোরাণে 'Fountain of Life' বা জীবন-উৎসের যে কথা আছে, মুসলিম ধর্মবেত্তাদের অভিমত খিজিরই তার প্রতিভূ। (ERE, Vol. VII, p. 694).

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে খোয়াজ খিজির জিন্দাপীর হতে পারেন। পীরের আত্মা অমর এ অর্থে যে কোন পীরই জিন্দাপীর নামে অভিহিত হতে পারেন। পৌরাণিক বিশ্বাস মতে, একমাত্র খোয়াজ খিজির সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভক্তকে বিপদমুক্তির পথ দেখান। গাজীপীর বা মাদার পীরের এ গুণ নেই, তাঁরা অলক্ষ্যে থেকে ভক্তকে সাহায্য করেন। চিরঞ্জীব বলেই খোয়াজ খিজির কায়া ধারণ করতে পারেন। সুতরাং পূর্বাপর মতের গুরুত্বে আমরা খোয়াজ খিজিরকে জিন্দাপীর বলার পক্ষপাতী। অন্যদের প্রতি এরূপ নাম আরোপ এর প্রভাব জনিত হতে পারে।

১. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৬

বিবাহের কথা আছে। সে লোক-নিন্দার জন্য 'চাইর গাছি রাম কেলার বেরুয়া' তৈরি করে তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। মাঝ নদীতে গিয়ে খোয়াজ খলখল করে হেসে স্ত্রীকে জানান যে, সে যদি সতী হয় তবে রোজকিয়ামতে তাঁদের মিলন হবে।[১]

খোয়াজ খিজিরের নামে একটি উৎসব জনসাধারণ পালন করে, তা 'বেরা ভাসান'। বাংলার নবাব সুবেদাররাও উৎসবটি পালন করেছেন। লোকসমাজে সেখান থেকে প্রেরণা এসেছে।

বেরা ভাসান: বিভিন্ন সমালোচকের বর্ণনা থেকে নবাবদের দ্বারা উদ্‌যাপিত বেরা ভাসান উৎসবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মোটামুটিভাবে এরূপ: বছরে ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। তখন নদী ভরা টইটম্বুর। কলার গাছ ও বাঁশ দিয়ে ভেলা তৈরি করা হয়। তার উপর কাগজের ঘর ও মসজিদ তৈরি করা হয়। নানা ফুল ও প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে সন্ধ্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সুসজ্জিত ও সুশোভিত ভেলাকেই 'বেরা' বলে। নবাব মুর্শিদকুলি খান তিন শত ঘনফুটের বেরা ভাসিয়ে ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কয়েক শত ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন।[২] জেম্‌স ওয়াইজ বেরার বর্ণনায় লিখেছেন, The Bera, usually made of paper ornamented with tinsel has a prow resembling a female falcon with the crest and breast of a peacock, in imitation of the figure head on the bow of the Morpankhi pleasure boat. The effigee placed on a raft of plantain stems is set afloat at sunset and with its flickering lights gives a picturesque aspect to the dark and flooded stream.[৩]

ঢাকার বেরা উৎসবের বর্ণনায় যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, "অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এতদুপলক্ষে ঢাকায় মহাসমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দিক হইতে কদলী বৃক্ষ এবং বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড লোকযান প্রস্তুত হয়, তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে

১. লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬৩
২. Social and Cultural History of Bengal, Vol. II, p. 259
৩. Notes on the Races and Castes and Trades of Eastern Bengal.

মণ্ডিত তরণী, গৃহ, মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ...এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে আর্দ্রক, তণ্ডুল ও কদলী সমন্বিত নৈবেদ্যসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা নদী বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। মোসলমানগণ ব্যতীত জালিক ও নমঃশূদ্রগণ কর্তৃকও এই পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"[১]

ময়মনসিংহ জেলায় গ্রামাঞ্চলে মুসলমান গৃহস্থ কর্তৃক বেরা ভাসান উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী, "ভাদ্র মাসের ২০ তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত যে কয়টি রবিবার ও বৃহস্পতিবার পড়ে, সেই কয় দিনে সন্ধ্যার সময় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে জলে ভেড়ুয়া বা ভেলা ভাসাইতে হয়। দরিদ্র গৃহস্থগণ মাত্র একটি রবি কিংবা বৃহস্পতিবারে এইরূপ ভেলা ভাসাইয়া থাকে। তিনটি কলা গাছের একটি ভেলা, কলার খোলের ছাদ; তাহার ভিতর ঘিয়ের বাতি, সবরী কলা, চিনি, সাত জোড়া আতপ চাউলের রোটি পিঠা, পাক করা আস্ত মোরগ, একটি পয়সা কিংবা কয়েকটি কড়ি খোয়াজ খিজিরের নামে সেলাম করিয়া দিতে হয়।"[২]

কোন কোন অঞ্চলে খোয়াজ খিজিরের নামে মানসিক করে সুফল পেলে লোকে বছরের যে কোন সময় বেরা ভাসিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের দিন কুমারী মেয়েরা ভোর বেলায় ভেজা কাপড়ে বাড়ি বাড়ি মাগন করে আনে। মাগনের চাল-ডালে শিরনী রান্না করে একটা ছোট ভেলায় কিছু অংশ দিয়ে ভাসিয়ে দেয়।[৩] ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি গীতে লাল-নীল কাপড়, পঞ্চপ্রদীপ, ফুল, কলা, ধান, দূর্বা, সিন্দুর ও দুগ্ধ দিয়ে বেরা সাজিয়ে ভাসানোর বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪] এগুলি হল খোয়াজ খিজিরের ভোগ। লোকবিশ্বাস, তিনি দক্ষিণে (অর্থাৎ সমুদ্রে) পাতালপুরীতে অবস্থান করেন। বেরা স্রোতে ভেসে তাঁর কাছে যায়, তিনি তা গ্রহণ করেন।[৫] এক্ষেত্রে খোয়াজ খিজির

১. যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৫৫৮
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৬
৩. লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬ (ভূমিকা)।
৪. ঐ, পৃঃ ১১০
৫. ঐ, পৃঃ ১১১

সকল প্রকার আপদবিপদের ত্রাণকর্তারূপে পূজিত হন। এতে আচারের ধর্ম বেশী।

মানিক পীর

মানিক পীর লোকসাহিত্যের 'জাগগানে' গৃহস্থের গরুবাছুরের রক্ষাকর্তা এবং পুঁথিসাহিত্যের 'মানিক পীরের গীত' কাব্যে (ফকীর মহাম্মদ কর্তৃক রচিত) ব্যাধির দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। উক্ত পুঁথির বন্দনা অংশে দেখা যায়, মানিক পীর ব্যাধিকে দমন করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কাহিনীতে রোগব্যাধির প্রকোপ-প্রশমন সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই। 'দুখে' নামে এক গরীব বাগদী রাখালের সহিত এক রাজকন্যার বিবাহের কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মানিক পীরের সহায়তায় ও দূতপনায় দুখে রাজকন্যা, রাজত্ব ও ধনসম্পদ লাভ করে তাঁর নামে শিরনী দিয়েছে।[১] কাব্যবন্দনায় পীরকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, কাব্যকাহিনীতে তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি। তবে অন্যত্র ব্যাধির পীর হিসেবে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ দুটি চরণ :

> মাথায় রঙ্গিন টুপি ব্যেধের জাম্বিল।
> হাতে লয়ে আসাবাড়ি ফেরে মানিক পীর।[২]

মানিক পীরের এক হাতে আসাদণ্ড, অপর হাতে রোগব্যাধির 'জাম্বিল' বা পাত্র। এতে নানা রোগের বীজাণু আছে। ক্রুদ্ধ পীর বীজাণু ছড়িয়ে মোড়ক তথা ধ্বংস ডেকে আনতে পারেন। তুষ্ট পীর ভক্তকে রোগমুক্ত করতে পারেন।[৩] শুধু তাই নয়, তিনি পারলৌকিক মুক্তিরও এজেন্ট বা মধ্যস্থতা-কারী—'মানিক পীর ভবনদীর পারে যাবার না।'[৪] 'মানিক পীরের জহুরনামা'তে তাঁকে কলিকালের অবতার রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

---

১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৬৮-৭৯

২. উদ্ধৃত : বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৩

৩. ডঃ আবদুল করিম একটি প্রবন্ধে মানিক পীর অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি কোন লৌকিক দৃষ্টান্ত দেননি। op. cit., East Pakistan a Profile, p. 51

৪. উদ্ধৃত : বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৩

স্বয়ং খোদা বেহেস্তের সভায় বলছেন,

সেই জনে দিব আমি দুনিয়ার ভার।
কলিকালে মানিক হবে অবতার।[১]

এসব অতিরঞ্জিত অশাস্ত্রীয় কল্পনা। মধ্যযুগের হিন্দু রচিত মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল তা। গরুবাছুরের 'অভিভাবক' পীর হিসেবে লোক-সমাজে তাঁর স্তুতিবন্দনা সমধিক প্রচলিত।

পূর্বের দৃষ্টান্তে মানিক পীরকে রঙিন টুপি পরিহিত আসাদণ্ডধারী বলা হয়েছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু তাঁর গ্রন্থে মানিক পীরের একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন। সেখানে তাঁকে বীরের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান দেখায়। মাথায় পাগড়ি, লম্বা বাবরি চুল, পরনে আলখাল্লা; ডান হাতে আসাদণ্ড। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে, এ চিত্র মানিক পীরের দরগাহ থেকে সংগৃহীত—পীরের পূর্ণাবয়ব মৃণ্ময় মূর্তি।[২]

পল্লীসমাজে গোরক্ষনাথই গোরক্ষক দেবতারূপে পূজ্য। নাথধর্মভুক্ত বৌদ্ধরা ইসলামধর্মে দীক্ষা লাভের পর গোরক্ষনাথের ছায়ায় মানিক পীরের কল্পনা করতে পারে। কেউ কেউ গোরক্ষনাথের সহিত মানিক পীরের সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করতে চান।[৩] কিন্তু তা অবাস্তব কল্পনা, গোরক্ষনাথ প্রাচীনকালের লোক: মুসলমানদের আগমনের পর পীর সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠে। জাগগানে মানিক পীরকে সোনাপীরের সহোদর ভাই বলা হয়েছে।[৪] এ সম্বন্ধেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তিনি সম্পূর্ণ লৌকিক পীর হতে পারেন। রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি জাগগানে মানিক পীরের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।[৫] এটি সামান্য কথান্তরে ঐ জেলায় সোনাপীরের জন্মবৃত্তান্ত হিসেবে চালু আছে।[৬]

---

১. উদ্ধৃত: ঐ, পৃ: ১৭৪
২. ঐ, পৃ: ১৭৪
৩. Dr. Shashibhusan Dasgupta— Obscure Religious Cult, Calcutta, 1962, pp. 370-71
৪. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮–৪৯
৫. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯১
৬. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮

ডঃ হক বলেছেন, মানিক পীরের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীরা দুধ ও ফল-ফলারি ভোগ দিয়ে থাকে। তাঁর মতে, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে মানিক পীরের প্রভাব আছে।[১] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু বলেছেন, খুলনা, চব্বিশ পরগনা, হুগলী ও নদীয়া জেলায় মানিক পীরের থান বা দরগাহ আছে।[২] হরিণঘাটার কাঠডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বছর ১লা মাঘ মানিক পীরেব উরস উৎসব হয়।[৩]

মানিক পীরের দোহাই : মানিক পীবের 'দোহাই' ও 'ফুলী' জাহির করে আচার পালনেব রীতি আছে গো-মোড়ক বা মহামারীর সময়। মানিক পীরেব সেবক ফকিররা এরূপ আচারে অংশ নিয়ে থাকে। একে 'গ্রামবন্ধন' আচাবও বলা যেতে পারে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "দেশে মহামার্বী বা গো-মোড়ক প্রাদুর্ভূত হলে (ফকিররা) ওঝা-গিরি করেন, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক দ্বারা গ্রামবন্ধন করেন, যাতে পল্লীবাসী ও তাদের গৃহপালিত পশুপক্ষী অকালে মৃত্যুব হাত থেকে রক্ষা পায়। ওঝা-ফকিররা গ্রামবন্ধনকল্পে অনেক সময় চারটি বাঁশের খুঁটি মন্ত্রপূত করে পল্লীর চারদিকে পুঁতে দেন। কোন কোন ফকির কয়েকটি ছোট ছোট সরায় লাল কালিতে বয়েৎ লিখে গ্রামের সর্বত্র বিশেষ করে পথের তেমাথায় বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেন। মানিক পীরের 'দোহাই' ও 'ফুলী' জাহির করেন। পল্লীবাসীদেব বিশ্বাস, ফকিরদের এই প্রক্রিয়ার জন্য তাবা ও তাদের গৃহপালিত পশুপক্ষী মহামারী মোড়কের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে।"[৪]

সোনাপীর

বর্তমানে 'সোনাপীরের জাগগান' ও 'সোনাপীরের শিরনী' এ দুটি লৌকিক উপাদান বাংলাদেশে সোনাপীরের অস্তিত্ব বহন করছে। জাগ-গানের বর্ণনা থেকে মনসুর উদ্দীন সাহেব সোনাপীরকে পাবনার চাটমোহরের

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৪০
২. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৪
৩. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩
৪. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৫

বাসিন্দা বলে দাবী করেছেন। তার মতে, চাটমোহর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল—এখানে প্রাচীন মসজিদ ও পুকুর আছে।[১] কিন্তু এগুলির একটিও সোনাপীরের নামের সহিত জড়িত নয়।

হিন্দুসমাজে সোনারায়ের নাম পাওয়া যায়। তিনি লৌকিক দেবতা। সোনাপীর সোনারায় অভিন্ন দেবতা। রংপুরে প্রচলিত 'সোনারায়ের পাঁচালী'তে সোনারায়ের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। গোয়ালিনী যশোদা ধর্মঠাকুরের পূজা করে পুত্র-সন্তানের বর পান। যশোদা উর্ধ্ব-মুখী হয়ে হাই তুললে কৃষ্ণ 'শ্বেতমাছি'র আকার ধারণ করে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেন। সন্তান ভূমিষ্ট হলে পর তাঁর নাম রাখা হয় সোনারায়।[২] বলা বাহুল্য, এটি অবাস্তব কল্পনা। জাগগানে মানিক পীরের সহোদর ভাই হিসেবে সোনাপীর বা সোনারায়ের সম্পর্ক স্থাপন ভক্তের কারসাজি; শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় মনে করেন, সোনারায়ের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ, তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য ভক্তরা অধিক প্রভাবশালী মানিক পীরের সহিত তাঁর নাম জুড়ে দিয়েছে।[৩]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সোনারায়কে আলিবর্দীর সমসাময়িক ময়মনসিংহের কোন এক জমিদারপুত্র বলেছেন।[৪] এতদঞ্চলে প্রচলিত সোনারায়ের জাগগানে আলিবর্দীর নাম আছে।[৫] রংপুরের পাঁচালীতে সোনাপীর মুঘল সৈন্য কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬] এসব তথ্য থেকে সোনাপীরের অবির্ভাব কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায় না। ধর্মঠাকুরের বরে

---

১. চাটমোহর সহর নিয়া সোনাপীরের বাড়ী,
চল্লিশ হাজার ঘর যাহার দক্ষিণ দুয়ারী।
উদ্ধৃত: হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৷৷৵. (ভূমিকা)।

২. শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ১৭৫

৩ Saratchandra Mitra— On the cults of Sonaraya in Northern Bengal, JDL, Vol. VIII, 1922, pp. 165-66

৪. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৫৬৩-৬৬

৫. ঐ, পৃঃ ৪৭৮

৬. পূর্বোক্ত, রঙ্গপু-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ১৭৬-৭৭

যশোদা কৃষ্ণকে জন্মান্তরে সোনারায় রূপে লাভ করেছেন, তিনিই বাঘ-সৈন্য নিয়ে মুঘলের সহিত লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। এসব বিচিত্র তথ্যে কল্পনার বিস্তার আছে, তথ্যনিষ্ঠা নেই।

জাগগানে সোনাপীরকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী করে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি নিজ ক্ষমতায় গরুবাছুর ধ্বংস করতে পারেন, আবার জীবিত করতে পারেন। রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি জাগগানে আছে,

> জিন্দা চার যুগের সার,
> মারিয়া জিলাতে পার,
> অপার মহিমা তোমার।[১]

রংপুর জেলায় প্রচলিত জাগগান ও পীরাচারে তাঁকে বাঘের দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'সোনারায় ঠাকুরের গানে' আছে,

> বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকেবে
> ও ঠাকুর সোনারায় বাঘ সব ডাকে।
> বাড়ি বাড়ি বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া।[২]

এখানে প্রকারান্তরে তিনি গোরক্ষক দেবতাই। বাঘের আক্রমণ থেকে তিনি গরুবাছুর রক্ষা করেন। সুতরাং রাজশাহী ও রংপুরের ধারণাটি অভিন্ন। কোন কোন অঞ্চলে সোনাপীর হলেন রোগশোকের ত্রাণকর্তা। তাঁর অভিশাপে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, আর অনুগ্রহে তা দূরীভূত হয়। একটি জাগগানে আছে,

> এইনা সোনা রায়কে কে করিবেক হেলা
> গলায় গবপুল নামব, চক্ষে নামব ঢেলা ॥
> ঢেলা নয় কেবলত গায়ে আযর জ্বর।
> এই জ্বরে কাঁপুনি মায়ের দহিব অন্তব ॥[৩]

জোলামুনি খাওয়া : জোলামুনি খাওয়া হল সোনাপীরের শিন্নী-আচার। পাবনা জেলার মুসলমান সমাজে উক্ত নামে আচারটির চল

১. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০
২. op. cit , JDL, Vol. VIII, 1922, p. 160
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭

আছে।[১] জাগগানে আচার সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :

গাজীর পীরের লাগ্যা আমরা ছিন্নি কিছু খাই।
নয়া ধানের নয়া চাল দুগ্ধ দুটি দিবা।
ক্ষিরগ্যা লইতে তোমরা পীরের ঘাটে যাবা।
পীরের ঘাটে গেলে পর চরণ দর্শন পাবা।[২]

সাধারণতঃ দুধ, কলা ও ক্ষীর সোনাপীরের ভোগ। পৌষসংক্রান্তির দিন গ্রামের যুবক ও রাখাল বালকেরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে মাগন করে ভোগোপকরণ সংগ্রহ করে এবং মাঠে রান্না করে পীরের নামে শিরনী দিয়ে নিজেরা খায়।[৩] রংপুর জেলায় সোনারায়ের পূজার উপকরণ হিসেবে এক কুলা ধান, নয় বুড়ি কড়ি ও পাঁচটা সুপারির উল্লেখ আছে,

সোনারায়ের দক্ষিণ লাগে ভরণ কুলা ধান।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি গুয়া পঞ্চ খান॥[৪]

মনাই পীর

মনাই লৌকিক পীর। তিনি সন্তানের দেবতা রূপে কল্পিত। হিন্দুর কার্তিকের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। কার্তিক সন্তানের দেবতা আর ষষ্ঠী সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দেবী। মনাই পীরের উদ্দেশ্যে যে আচার পালন করা হয় তাতে বন্ধ্যা নারীকে সন্তানবর্তী অথবা নিষ্ফলা গাছকে ফলবর্তী করার কামনা ব্যক্ত হয়। এদিক থেকে কার্তিকের সঙ্গে মনাই পীরের অধিক সাদৃশ্য।

পীরের দরগাহ তোলা : মনাই পীরের নামে দরগাহ তুলে আচার পালন করা হয়। শ্রীকামিনীকুমার রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "মনাই সন্তানের পীর— তাঁহার ইচ্ছায় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, মৃত শিশুও প্রাণ

---

১. op. cit., JDL, Vol. VIII, 1922, p, 174 ;
সুরেশচন্দ্র রায়—পাবনা জেলার পৌষ পার্বণ উৎসবে গ্রাম্য সঙ্গীত, প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৭ পৃঃ ৩৪৭

২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৮

৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০

৪. op. cit., JDL, Vol. VIII, 1922, p. 152

পায়।... তাঁহার খেয়ালের উপরেই সন্তানের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে। লোকে মানত করে, যদি নিষ্ফলা গাছ ফলে, আমার কিংবা অমুকের সন্তান হয়, তাহা হইলে মনাই পীরের দরগাহ তুলিব।"[১]

মানতকারিণী স্বগৃহে কৃত্রিম ও অস্থায়ী দরগাহ তৈরি করে পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী দেয়। একটা পূর্ণাঙ্গ আচারের ভেতর দিয়ে তা সম্পন্ন হয়। ময়মনসিংহে ফাল্গুন মাসের উনিশ-বিশ তারিখে এটি পালিত হয়। যে দরগাহ তোলে ও শিরনী দেয় আঞ্চলিক ভাষায় তাকে 'কর্মস্থানী' বলে। তার বাড়ির উঠানে চালাঘর তুলে তার তলায় মাটির উঁচু দরগায় চাঁদোয়া খাটান হয়। সাত-আট দিন আগে থেকে পান-সুপারী দিয়ে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। বন্ধ্যা নারী (সন্তানবতীও) সিন্দুর, বাতি ও ধান-দূর্বা সমেত একটি কুলা মাথায় করে পুরল বা ঘট ভরতে যায়। ঘটটি দরগায় রেখে তার মুখে সরিষা তেলের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, সারারাত্রি তা জ্বলে। মানতকারিণীর বাড়ি হতে হাঁড়িতে পুলিপিঠা, সরাইতে মিষ্টান্ন ও পোলাও আসে। মানতের মুরগী জবাই করা হয়। পীরের দরগায় এগুলি সাজান হয়। চাঁদোয়ার কাপড়ে কলা ও চিনি থাকে। শিরনীর দিন বন্ধ্যা নারী একটি বাতি মাথায় নিয়ে পীরকে সালাম করে দাঁড়িয়ে থাকে। একে 'বাড়া' নেওয়া বলে। বাতিটি মাথা থেকে আপনা আপনি না পড়া পর্যন্ত তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ সময় অন্যান্য মেয়েরা পীরের উদ্দেশ্যে নানা গীত গায়। গীতগুলি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত।[২] গীতাদির সময় লাঙল টানা ও ধান বোনার কৃত্রিম অভিনয় হয়। মেয়ে-ছেলেরা রাত্রি শেষে পোলাও-পিঠা খায়। সূর্য ওঠার সাথে সাথে প্রত্যেকে নিজ নিজ হাঁড়ি নিয়ে

---

১. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১২

২. আইলাইন মনাই সারি সারি,
বইলাইন আঙ্গিনা ছান্দিয়া।
ওরে হদি ভাই কুলা দিবা জুড়া জড়া,
আউলিয়া মনাইর বিয়া।
ওরে বাবই ভাই, পান দিবা গাদী গাদী,
আইলিয়া মনাইর বিয়া।

উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৪

বাড়ি ফিরে। সম্পূর্ণ আচারটির বিভিন্ন অংশ—দরগাহ তোলা, পুতুল ভরা, বাড়া নেওয়া, বীজ বোনা ইত্যাদি। বীজ বোনার অভিনয়ে সন্তান উৎপাদনের অনুকরণ আছে। এটি যাদুবিশ্বাসের ফল। লোক-চেতনায় শস্যোৎপাদন ও সন্তানোৎপাদন সমপ্রক্রিয়ার বিষয়। পল্লীনারী এভাবে বন্ধ্যা নারীকে সন্তানবতী করার প্রয়াস পায়।

ঠুনকাপীর

ঠুনকাপীর পানের দেবতা। কোন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে ঠুনকাপীরের পরিচয় জানা যায় না। খুব সম্ভব, তিনি কাল্পনিক পীর। ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর প্রভাব আছে। বাংলাদেশে পানের ব্যবহার খুব প্রাচীন; পান অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ। হিন্দুনারীর ব্রতাদিতে পানের দেবী সুবচনীর নাম পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজে 'দরবেশের সেবা' নামে একটি অনুষ্ঠানে তামাক খাওয়ার রীতি আছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমানের বিধবা স্ত্রীলোকেরা কোন একদিন বিকেলে দরবেশের উদ্দেশ্যে একাধিক হুঁকা-কল্কিতে তামাক সাজিয়ে ব্রতশেষে নিজেরা সেবন করে।[১] সুবচনীব্রত ও দরবেশের সেবা উভয়ের প্রভাবে ঠুনকাপীরের উদ্ভব হতে পারে। হিন্দুর লৌকিক ব্রতাচার ধর্মান্তরিত মুসলমানের কাছে পীরাচারে পরিণত হয়েছে। ঠুনকাপীরের লোকাচার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "ঠুনকাপীর ব্রতে একটি কি দুটি পিঁড়িতে ১০/১২টি গোটাপান ও সুপারী সাজাইয়া দিয়া ব্রতিনী অপর কয়েকজন স্ত্রীলোককে লইয়া উঠানে বসেন এবং কথা বলেন। পরে সকলে পীরের উদ্দেশ্যে ভক্তি জানাইয়া পান-সুপারী খান এবং পিক ফেলেন— এইরূপে ঠুনকাপীর ব্রত শেষ হয়।"[২]

---

১. কামিনীকুমার রায়—সভ্যতায় পান-তামাক, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃঃ ৬০

২. ঐ, পৃঃ ৬০

ত্রিনাথ পীর

ত্রিনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র দাস 'ত্রিনাথের পাঁচালী'তে লিখেছেন,

ওহে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।
তিনদেব এক ওরে পূজা প্রকাশের তরে
ত্রিনাথ হইল তদন্তর ॥[১]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্রে ত্রিনাথ মূর্তি গ্রহণ করেন অর্থাৎ ত্রিনাথ সত্ত্ব, রজ: ও তম: ত্রিগুণের সমীভূত সত্তা— এমত সমর্থন করেছেন চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী।[২] অন্য একটি পাঁচালীতে ত্রিনাথের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সিদ্ধির অভাবে দুর্গা শিবকে শরীরের 'মলা' খেতে দেন। শিব মলা দিয়ে বটিকা তৈরি করেন। এ বটিকা হতে ত্রিনাথের জন্ম হয়। তাঁর তিন মাথা, ছ'খানা হাত, গায়ের রং কাল।[৩] উপরের পাঁচালী দুটিতে ত্রিনাথকে একই ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নাথ সম্প্রদায়ে ত্রিনাথ বলতে নাথধর্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাধক গোরক্ষনাথ মীননাথ ও জালন্ধরী পাদকে বুঝায়।[৪] এখানে ত্রিনাথ নামটি পূরণবাচক; কিন্তু লোক-প্রচলিত ত্রিনাথ সংখ্যাবাচক। তিনি নাথত্রয়ের সমষ্টি নন, একই ব্যক্তি।

---

১. শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী—ত্রিনাথ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৭

২. চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী—ত্রিনাথের উপাখ্যান, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮, পৃঃ ২৫

৩. নন্দী কন সিদ্ধি নাই পার্বতী কহিল।
সিদ্ধি বিনিময়ে এই মলা খেতে দিল॥
এত শুনি শীঘ্র করি মলা হাতে লয়ে।
বটিকা তৈয়ার কৈলা বিষণ্ণ হৃদয়ে॥
বটিকা হইতে হলো মূর্তি অপরূপ।
তিন বক্ত্র ষড়ভুজ কৃষ্ণবর্ণ রূপ॥…
ত্রিনাথ তোমার নাম রাজা কিংবা প্রজা।
জাতি বর্ণ নির্বিশেষে করিবেন পূজা॥

উদ্ধৃত: শশিভূষণ হোমচৌধুরী সম্পাদিত—ত্রিনাথের পাঁচালী, পৃঃ ২-৩

৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৩

প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, বৌদ্ধদেবতা ত্রিনাথ মুসলমানী পীর আখ্যা পেয়ে ত্রিনাথ পীর হয়েছেন।[১] তিনি এ বিবর্তনের কোন ধারা আলোচনা করেননি। নাথ সম্প্রদায়ের ধারণা থেকে ত্রিনাথ শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। শূন্যপুরাণে ত্রিনাথের উল্লেখ আছে। চম্পক নগরে রামাই কর্তৃক তাঁর পূজা প্রচারিত হয়।[২] শূন্যপুরাণ ধর্মপূজার গ্রন্থ। নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মের বিকৃত বিবর্তিত রূপ। পাঁচালীকার মহেশচন্দ্র বলেছেন কৃষ্ণাঙ্গ ত্রিনাথ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] প্রফুল্ল বাবু লিখেছেন, বাংলার পল্লী অঞ্চলে ত্রিনাথের সেবা দেওয়া আচারে রাত্রিকালে যে বৈঠক বসে তাতে বাউল গান গাওয়া হয়।[৪] বাউলরা ত্রিনাথকে গ্রহণ করেছে। বাউলরা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রধারার অনুসারী। এখান থেকে ত্রিনাথের প্রভাব ক্রমে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ত্রিনাথের নাম স্মরণ করে। 'ত্রিনাথের গানে' আছে— 'সাধুরে ভাই দিন গেলে তেননাথের নাম লইও।'[৫] ত্রিনাথ সম্পর্কিত এসব নিদর্শন থেকে বলা যায়, আদি বৌদ্ধদেবতা বাংলার নাথ-বৈষ্ণব-বাউল ধর্মের ভেতর দিয়ে বিবর্তিত হয়ে মুসলমানদের কাছে পীররূপে পরিগণিত হয়েছেন। প্রফুল্লবাবুর বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিনাথ পীর গাঁজার দেবতা।[৬] গাঁজা তাঁর পূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।[৭] কামিনীকুমার বাবুর মতে ত্রিনাথ মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেবতা। তিনি ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে প্রচলিত যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তাতে হারান গরু ফিরে পাওয়ার কথা আছে।[৮] এখানে প্রকারান্তরে তাঁকে গরুর দেবতা বলা হয়েছে। নাথসিদ্ধা গোরক্ষনাথ গরুর দেবতা

১. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৬৬. (ভূমিকা)।
২. রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।
৩. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৮
৪. ঐ, পৃঃ ৪৭
৫. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬
৬. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৭
৭. ত্রিনাথের পূজার মোট তিনটি উপচার—সরিষা তেলের তিন বাতি, তিন ভাগ পান-সুপারি ও তিন কল্কি গাঁজা। 'ত্রিনাথের গানে' এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬
৮. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ ২২৯-৩০

রূপে পূজ্য। এতোদ্দেশ্যে মুসলমানরা গোরক্ষনাথের শিরনী দিয়ে থাকে। তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা।[১] জনৈক প্রবন্ধকার ত্রিনাথের গুণাবলী সম্বন্ধে লিখেছেন, "ভক্তিভাবে ইঁহার পূজা করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও দরিদ্রতা দূরীভূত হইয়া দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইঁহার পূজা মানসিক করিলে, যে কোন প্রকার অনুষ্ঠিত কার্য সুসম্পন্ন হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পীড়াদি ও দুর্বলতা দূরীভূত হয়। পঙ্গু পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। বোবাও বাকশক্তি পাইতে পারে, অন্ধও ত্রিনাথের মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে; প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ত্রিনাথের পূজা করিলে ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল লাভ হইতে পারে।"[২]

এখানে ত্রিনাথকে মিশ্রগুণের দেবতা রূপেই পাওয়া যায়। ব্যাধির দেবতা হিসেবে ত্রিনাথের পরিচয় গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যায়:

আমার ঠাকুর তিন্নাথের যে করিবে হেলা।
হাত পা কইতবের নলা, চোখ দিয়া বেররে ঢেলা॥[৩]

ত্রিনাথের সেবা দেওয়া: ত্রিনাথ পীরের একটি আচার আছে, তা হল ত্রিনাথের সেবা দেওয়া বা ত্রিনাথের মেলা দেওয়া: শ্রীকামিনীকুমার আচারটির নিয়ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন "উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া আসন জলঘট, ধূপ, বাতি ও গাঁজা পূর্ণ কল্কি দিয়া সকলে গান আরম্ভ করেন। গানের অবসরে ত্রিনাথের কথা বলা ও গাঁজ খাওয়া হয়।... মুসলমানেরা নিজ বাড়িতে এই ত্রিনাথের মেলা দেন না। মানসিক সিদ্ধ হইলে তিনি কোন গাঁজাসেবীকে গাঁজা কিংবা গাজার পয়সা, পান সুপারী ইত্যাদি দিয়া দেন। ঐ ব্যক্তি আরও কয়েকজন গাঁজাসেবীর সমবায়ে ত্রিনাথের মেলা দিয়া থাকেন।"[৪]

শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, "বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে ত্রিনাথের সেবা দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হইয়া কোন গৃহে ত্রিনাথের আসন

---

১. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৮
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮, পৃঃ ২৬
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭ (পাদটীকা)।
৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ২২৯

স্থাপন করেন। একখানা কাষ্ঠাসনোপরি ফুল, প্রদীপ, মিষ্টদ্রব্য, নতুন গামছা ও সম্ভব হইলে একখানা শিবের মূর্তি সজ্জিত করা হয়। আসনের তলদেশে সিদ্ধির কল্কি ও যে পরিমাণ সিদ্ধি ত্রিনাথকে নিবেদন করিতে হইবে তাহাও সংরক্ষিত হয়। সম্মিলনের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি পূজা দিয়া কথা বলিবেন। তাহার পর নিজেই সিদ্ধি গ্রহণ করতঃ অন্যদেরও প্রসাদ দিবেন।"[১]

আচারের তিনটি অংশ— পূজা, গান ও গাঁজা। গাজীর পালা দেওয়া অনুষ্ঠানে বয়াতির যে ভূমিকা ত্রিনাথের মেলা দেওয়া অনুষ্ঠানে গাঁজা-সেবকের সে ভূমিকা। মানতকারীর পক্ষ থেকে তারা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে। ত্রিনাথের মেলার উদ্দেশ্য গানের ভাষায় স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে :

কলিতে তিননাথের মেলা
খোড়ায় নাচে কানায় দেখে
বোবায় বলে বোমভোলা।[২]

ময়মনসিংহ জেলায় ত্রিনাথ পীরের প্রভাব আছে। ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর একবার ত্রিনাথের মেলা হয়।[৩] 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরে ত্রিনাথের প্রভাবের কথা বলেছেন।[৪]

কাউয়া পীর

কাককে পীররূপে গণ্য করে তার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেওয়া ও ব্রত কথা বলে আচার পালন করার রীতি পূর্ব ময়মনসিংহে দেখা যায়।[৫] আচারটির বিবরণ পাওয়া যায় প্রফুল্লবাবুর ব্রত ও আচারগ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "রবি ও বৃহস্পতিবারে আতপের অন্ন, শাক প্রভৃতি অগ্রপাতে দিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে হয়। ব্রত হইয়া গেলে কাক, কোকিল প্রভৃতি পাখীকে এই ব্রতের প্রসাদ খাওয়াতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানে পাখীরা ফল, শস্য নষ্ট করে না ও তাহাদের আশীর্বাদে দারিদ্র্য অভাব গৃহে

১. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৭
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬ (পাদটীকা)।
৩. শ্রীআনন্দ রায়—ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃঃ ১৪
৪. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৭২
৫. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৪

প্রবেশ করিতে পারে না।"[১] কাক ফল নষ্ট করে, পূজা দিয়ে তার অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অনুকূল। এদিক থেকে ব্রতটির বাস্তব ভিত্তিক আবেদন আছে।

ব্রতকথায় কাকের জন্মবৃত্তান্তে এক অতিথির অভিশাপে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর যথাক্রমে কাক ও বাদুড়ে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী পাওয়া যায়।[২] এতে কোন পীরের উল্লেখ নেই।

নোরাপীর

সাধারণতঃ বটগাছকে কেন্দ্র করে নোরাপীরের সংস্কারটি গড়ে উঠেছে। বটতলা হিন্দুদের লৌকিক দেবতার পূজার স্থল। শেওড়াতলায় বনদেবীর পূজা হয়।[৩] তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে বৈষ্ণবেরা পূজা করে। বটতলায় মুসলমানের পীরের দরগাহ বা মাজার দেখা যায়। নোরাপীর বটগাছ তলায় আশ্রয় নিয়ে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, এরূপ বিশ্বাসে তাঁর উদ্দেশ্যে মানসিক করে 'নোরা' দানের প্রথা চালু হয়েছে।[৪]

'নোরা' নোড়া শব্দের উচ্চারণভেদ। গোল পাথর-টুকরা হল নোড়া (< লোষ্ট্র)। গ্রামাঞ্চলে খড়কুটার গুচ্ছকেও নোড়া বলে। কামিনীকুমার নোরা অর্থে খড়-ঘাসের গুচ্ছকেই বুঝিয়েছেন। এক মুঠো খড় বা ঘাস মাঝখানে গিঁট দিয়ে বেঁধে পীরের উদ্দেশ্যে গাছতলায় দিয়ে আসে। এতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলে লৌকিক বিশ্বাস।[৫] পীরের দরগায়, গাছতলায় বা গাছের শাখায় বাতি, ঢিল, নোড়া, ন্যাকড়া ইত্যাদি উৎসর্গ করার রেওয়াজ দেশের নানা স্থানে দেখা যায়। পীরের মাজারে বাতি দেওয়া একটি সাধারণ প্রথা। সন্তানের কামনায় পথের ধারে

---

১. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৪৬
২. ঐ, পৃঃ ৪৬-৪৭
৩. শ্রীকামিনীকুমার রায়—বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৫২, পৃঃ ৩১৭
৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ ২২৩
৫. ঐ, পৃঃ ২২৩

কোন এক গাছতলায় ঢিল দিয়ে মানত পূর্ণ করতেও দেখা যায়। গাছের ডালে ন্যাকড়া বেঁধে মানসিক করার রীতিও প্রচলিত আছে। বিহারে এ উপলক্ষে একজন স্বতন্ত্র পীর কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর নাম 'চিরকট্টা পীর'।[১] উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে একই উদ্দেশ্যে 'টেনাপীরে'র অস্তিত্ব আছে।[২] বগুড়া জেলায় নোরাপীর ও টেনাপীরের আচার আছে।[৩] নোরাপীর, টেনাপীর প্রভৃতি বস্ত্র সম্পর্কিত নাম। বস্ত্রপূজা এদের কল্পনার মূল।

ঘোড়াপীর

খঞ্জের খঞ্জত্ব দূর করার জন্য লোকসমাজে ঘোড়াপীরের দরগায় মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়। বগুড়া জেলায় সোনাতলার কাছে ঘোড়াপীরের উদ্দেশ্যে বার্ষিক মেলা বসে। মালদহ, বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা জেলায় মাটির ঢিপিতে মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করা হয়।[৪]

ঘোড়াপীরের সংস্কারটি যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত। ঘোড়া দ্রুতগামী প্রাণী। খোড়া ব্যক্তি ঘোড়ার মত চলতে পারবে—একপ কামনা এতে সংগুপ্ত। নকল দিয়ে আসল বস্তুর শক্তি-সামর্থ কামনায় সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের লক্ষণ আছে।

জঙ্গলী পীর

জঙ্গল বা অরণ্যের অধিকর্তা (sylvan god) হিসেবে জঙ্গলীপীরের কল্পনা। বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল অরণ্যাবৃত; উত্তর ও পূর্বাঞ্চলেও পাহাড়তলীর অরণ্য; এছাড়া মাঝের সমতলভূমিতেও ছোটখাট বন-জঙ্গল আছে (যেমন মধুপুরের জঙ্গল)। সাধারণত: পাতা, কাঠ, মধু, ও পশুপাখি শিকারের জন্য বনজঙ্গলের সাথে বাঙালী বরাবর যোগ-স্থাপন করে আসছে। এর জন্য মউল্যা, বাওয়ালীয়া, বহরদার, ব্যাধ,

---

১. JISOA, Vol. VII, 1939, p. 146
২. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৩৯
৩. বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ ৪০২
৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২৩৮

মালঙ্গী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।[১] এরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক। বনে বাঘ, সাপ, কীটপতঙ্গ, কুমীর, এমনকি, ভূত-প্রেতেরও ভয়। এ অবস্থায় মানুষের জীবন বিপদমুক্ত ছিল না। গরুবাছুরের জীবনও বিপন্ন হত। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জঙ্গলীপীর, বনবিবি, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি বনের অধিপতি পীরপীরানী ও দেবদেবীর কল্পনা লোকমানস থেকে সহজেই উৎপন্ন হয়েছে।

ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় জঙ্গলীপীরের শারীরিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

জঙ্গলীপীর খাটাখুটা মুখে চাপদাড়ি।
নীল ঘুড়া দৌড়াইয়া যায় গুয়ালিনীর বাড়ি।[২]

বাঘের দেবতা গাজীপীরের 'চাপদাড়ি' আছে, কিন্তু পটে তাঁকে 'খাটা-খুটা' দেখায় না। জঙ্গলীপীরের বাহন 'নীলঘোড়া'; গাজীপীরের বাহন মুখ্যত বাঘ। সুতরাং জঙ্গলীপীর গাজীপীর থেকে ভিন্ন। ঐ ছড়ায় জঙ্গলীপীরকে গোরক্ষক দেবাত্মারূপে কল্পনা করা হয়েছে। সোনাপীরের কেরামতির মতই তাঁর কেরামতি। তাঁর অভিশাপে গরুবাছুরের মৃত্যু, শিরনী দিয়ে তাদের পুনরুদ্ধারের গতানুগতিক ছবি ছড়ায় আছে। এটি জাগগান, গোরক্ষনাথের মাগন ছড়া ইত্যাদির প্রভাবজাত।

---

১. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে এক স্থলে বাউলে, মৌলে, মালঙ্গী, শিকারী, মৌজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম করেছেন। এরা সুন্দরবনে যাতায়াত করে। (পৃঃ ৮) মউল্যা ও বাওয়ালীয়া যথাক্রমে মৌলে ও বাউলে শব্দের রূপভেদ। মধু সংগ্রহকারী মউল্যা ও কাঠ সংগ্রহকারী বাওয়ালীয়া নাম খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে পরিচিত। মউল্যা ও মালঙ্গী শব্দদ্বয় কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে (১৬৮৬) পাওয়া যায়।

কাকুটী নাকুটী আর করে রঙ্গভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মালঙ্গী॥

বহরদার মন্ত্রগুণী, বাঘের বন্ধনমন্ত্র পড়ে তারা কাঠুরিয়াদের সাহায্য করে। এটি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক শব্দ (বাতায়ন, পৃঃ ১২০)।

২. উদ্ধৃত: বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫৭১

শা' জঙ্গলীপীরের নাম পাওয়া যায় 'বনবিবির জহুরনামা'তে।[১] এখানে তাঁকে বনবিবির সহোদর ভাই বলা হয়েছে। রসুলের আদেশ পেয়ে তাঁরা মক্কা থেকে এদেশে আসেন এবং 'ভাটি' বা দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেন। প্রথমে দক্ষিণ রায় ও তাঁর মাতা নারায়ণীর সাথে জঙ্গলীপীর ও বনবিবির সংঘর্ষ হয়। জঙ্গলীপীর ভগ্নিকে লড়াই-এ সহায়তা করেছেন, বনবিবির মত তিনিও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—এটুকু তথ্যই উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়।[২] বনবিবির জহুরনামা পুঁথিসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পুঁথিরচয়িতাগণ এ কাহিনী লোকজীবন থেকেই নিয়েছেন। তবে এ কাহিনীর প্রকৃত উৎস কি তা বলা যায় না। জঙ্গলীপীর ও বনবিবির কোন ঐতিহাসিক চরিত্রসূত্র নেই। লোকমানসের কল্পনার উপর রঙ চড়িয়ে পুঁথিকারগণ এ ধরনের কাব্য রচনা করেছেন।

ঢাকার উত্তর-পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে 'শাহ পীর জঙ্গলী'র মাজার আছে বলে ডঃ গোলাম সাকলায়েন উল্লেখ করেছেন।[৩] তিনি এর কোন পরিচয় দেননি। মাজারের শাহ পীর জঙ্গলী, পুঁথির শা' জঙ্গলী পীর এবং ছড়ার জঙ্গলীপীর যে একই ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। এঁর কেরামতি, অলৌকিক শক্তি এবং দৈবীচেতনা সর্বত্রই স্বীকৃত।

বনবিবি

মুসলমান সমাজে বনবিবি হিন্দুসমাজের বনদেবী বা বনদুর্গার নকল। বনদেবতার (Sylvan goddess) বিশ্বাস ও পূজা আরণ্যক সমাজের অবদান। ফলমূল সংগ্রহ ও পশুপাখি শিকার দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করত তারাই আরণ্যক সমাজের প্রবর্তক, পরিপোষক ও প্রতিপালক। কৃষিকাজ জানবার আগে পর্যন্ত মানুষ এ সমাজের অন্তর্গত ছিল। বাংলার অনার্যভুক্ত নিষাদ গোষ্ঠীর লোকেরা শিকারজীবী ছিল। দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকায় অরণ্যের প্রভাব প্রচুর। সুন্দরবনের দান আজও অব্যাহত। বনজঙ্গল শ্বাপদসঙ্কুল।

---

১. মহম্মদ খাতের, মুন্সী বয়নদ্দী প্রমুখ পুঁথিকাররা এ নামে কাব্য রচনা করেছেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২; বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১০

২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২-৯২

৩. পূর্ব পাকিস্তানের সুফীসাধক, পৃঃ ৪৪

অতএব মানবজীবনের নিরাপত্তা সেখানে অনিশ্চিত। বাঘের দেবতা, সাপের দেবতা, কুমীরের দেবতা, বনের দেবতা এ-নিরাপত্তা দিতে পারেন। সুতরাং তাঁদের দেবরূপ ভাবা, মূর্তি গড়া, পূজা করা বাঁচার তাগিদেই অত্যাবশ্যক ছিল। বাঙালীর সরস কল্পনায় তাঁরা রূপ পেলেন; ভক্তের দ্বারা পূজা পেলেন। প্রথমে গাছের পূজা, পশু পূজা ছিল। গাছ পূজার, পশু পূজার এখনও চল আছে। এ মানুষের বাস্তব দৃষ্টির ফল। তারপর কল্পনা এল। কল্পনায় ভর করে ক্রমে গাছের ও পশুর অধিপতি দেবতার আবির্ভাব ঘটল। মানুষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী হল। বৃক্ষপূজা থেকে বনদেবীর পূজার বিবর্তন ও প্রবর্তন এভাবে ঘটাই সম্ভব। অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে বনদেবী অতি সহজেই বনবিবিতে পরিণত হয়েছেন। এভাবে ওলাদেবী ওলাবিবি, লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীবিবি হয়েছেন। মুসলমানরা নরদেবতার তুল্য পীরকে, নারীদেবতার তুল্য পীরানীকে আশ্রয় করে ধর্মপিপাসা নিবৃত্ত ও জাগতিক বাসনা সফল করতে চেয়েছে। হিন্দু যোগিনী, বৌদ্ধ ডাকিনী এবং মুসলমান পীরানী যথাক্রমে হিন্দুদেবী বৌদ্ধ-দেবী, মুসলমানী বিবি অভিধা পেয়েছেন। বিভিন্ন আবরণে সম্প্রদায় ভেদে তাঁরা একই মন ও মানসিকতার স্পষ্ট ফল। হিন্দুর দেবীর স্থলে বিবি আখ্যা দিয়ে ইসলামী ভাবাপন্ন করা হয়েছে মাত্র।

বনবিবির কথা ও পরিচয় আছে লোক-ছড়া, লোককথা ও পুঁথিসাহিত্যে। দরগাহ ও পটে বনবিবির মূর্তি স্থান পেয়েছে, লোকাচার ও শিরনীতেও বনবিবির নাম প্রযুক্ত হয়েছে। মুন্সী বয়নদ্দী ও মহম্মদ খাতেরের লেখা 'বনবিবির জহুরনামা' পুঁথিসাহিত্যের বিষয়। এতে তাঁর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁকে মধু-মোম সংগ্রাহকদের সাহায্যকারিণী দেবী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। মক্কাবাসী বিরাহিম ফকির, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গোলাম বিবি— তাঁদেরই সন্তান বনবিবি ও জঙ্গলীপীর। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় গোলাম বিবি নির্বাসিতা হন। সেখানেই তিনি শিশুকন্যা ও সন্তানকে লালনপালন করেন। ক্রমে খোদার আদেশ হল 'যাহ দোহে বাদাবনে ভাটির সহরে।' তাঁরা প্রথমে মদিনা শরীফে মুরিদ হন এবং পরে সেখান থেকে বাদাবনে আগমন করেন। বাদাবন তথা সুন্দরবনের অধিপতি ছিলেন দক্ষিণ রায়, তাঁর মাতা নারায়ণীর সাথে বনবিবির লড়াই হয়, পরে নারায়ণী পরাজিত হলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি

ও সখিত্ব স্থাপিত হয়। আঠারভাটি ভাগাভাগি করে তাঁরা বাস করতে থাকেন। এ পর্যন্ত বনবিবির জহুরনামার উত্তরপর্ব, কবির ভাষায় নারায়ণীর জঙ্গপর্ব। এর সবটুকুই কাল্পনিক। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড, দেবাশ্রিত কুমার-কুমারীর মর্তে আগমন, দেবানুগ্রহে তাঁদের ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনী, বনবাসের রীতি আরব্য উপন্যাসের প্রভাবজাত। পুঁথির দ্বিতীয়াংশ 'ধোনা দুখের পালা'। এটি লৌকিক আখ্যান। ধোনা মোনা দুই ভাই, সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে। তারা একবার গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো দুখেকে বনে নিয়ে গেল। সে ছিল খুবই গরীব। ধোনা সেবার দক্ষিণ রায়ের পূজা করতে ভুলে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং স্বপ্নে নরমাংস মানত দিতে বললেন। সে দুখেকে ভোগ স্বরূপ বনে রেখে চলে এল। দক্ষিণ রায় বাঘের রূপ নিয়ে দুখেকে গ্রাস করতে এল। দুখে ভয়ে বনবিবিকে স্মরণ করলে তিনি সহোদরসহ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে তাকে উদ্ধার করলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে মার কাছে প্রেরণ করলেন। সে গ্রামে বনবিবির নামে দরগাহ তৈরি করে শিরনী দিল। তখন থেকেই বনবিবির 'পূজা হাজোতে'র প্রচার। বলা বাহুল্য, এটিও কাল্পনিক আখ্যান— ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের ঢঙে রচিত। লোকাখ্যানের সাথে আল্লাহ-রসুল, মক্কা-মদিনা, পীর-পীরানী যুক্ত করে ইসলামী পরিবেশ রচনা করা হয়েছে মাত্র।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু হিন্দু ও মুসলমানের অঞ্চলভেদে বনবিবির দু'রকম মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় "মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এঁর আকৃতি ও বেশভূষা খানদানী মুসলমান ঘরের কিশোরী বালিকার ন্যায়, মাথায় টুপী (বন্য লতাপাতা আঁকা), চুল বিনুনী করা, মাথায় টিকলী, গলায় নানা রকম হার, বনফুলের মালা, পরিধানে পিরাণ বা ঘাঘরা পাজামা, পায়ে জুতামোজা, পাৎলা ওড়নাও ব্যবহার করেন। প্রহরণ বলতে কিছু দেখা যায় না, কোন কোন স্থানে এঁর হাতে আসাবাড়ি (বা দণ্ড) এবং ঝাণ্ডা থাকে। বাহন মুরগী বা বাঘ। ·· হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে এই বনবিবির আকৃতি অন্য রকমের হয়। বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় হার ও বনফুলের মালা, সর্ব অঙ্গে নানারূপ অলঙ্কার, দুটি চোখ, হাতও দুটি, কোন প্রহরণ বা আসাদণ্ড থাকে না, কোলে একটি শিশু (বোধ হয় মাতৃদেবতা বলে), কোন কোন স্থানে শিশু থাকে না, বাঘের উপর

উপবিষ্টা দেখা যায়।"[১] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ঐ গ্রন্থে বনবিবির আলোকচিত্রও দিয়েছেন। তাতে তাঁকে মুরগীবাহনা, বেশবাস ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা লাবণ্যময়ী রূপে দেখা যায়। বনবিবি দয়াবতী, ভক্তবৎসলা—তাঁর রূপসী মূর্তিতে সে-ভাবই ফুটে উঠেছে।

মাদার পীর, পাঁচপীরের অনুরূপ বনবিবির ভক্তদের দ্বারা কোন সম্প্রদায় (cult) গড়ে উঠেনি, বাংলাদেশের বাইরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শোনা যায় না। আবার বাংলার কেবল দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন সংলগ্ন জনসমাজেই তাঁর অস্তিত্ব এবং প্রভাব। এজন্য তাঁর ঐতিহাসিকত্ব একেবারেই কল্পনা করা যায় না। তিনি লোকমানসপ্রসূতা পীরানী; হিন্দু-ব্রতকথার বনদেবীর মুসলমানী দোসর (counterpart)। দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর সঙ্গে শাহ জঙ্গলীপীর ও বনবিবির বিবাদ, সংঘর্ষ, জয়-পরাজয় এবং পরিশেষে মিলন চিত্রণে মোটামুটিভাবে একটা ঐতিহাসিক যুগপটভূমি অনুধাবন করা যায়—মুসলমানের বিজয়, বিজয়ীর শাসনামলের ভাবকল্পনায় ও আখ্যান প্রণয়নে বিজিতের হীনমন্যতা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সহাবস্থাননীতি ইত্যাদি বিষয় সংকটোত্তর এবং পরিবর্তনান্তর একটি সুস্থ সবল স্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতিকে জ্ঞাপিত করে; এটা ষোল-সতের শতকের দিকে মোঘল শাসনাধীনে ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। 'বনবিবির জহুরনামা' আঠার-উনিশ শতকের রচনা। বনবিবির প্রাচীনতম উল্লেখ জমিদারদের প্রাচীন নথিপত্র-দলিল-দস্তাবেজে আছে। মধ্যযুগের ভূস্বামীরা বনবিবির দরগাহর ব্যয়ভারের জন্য তাঁর সেবায়েৎ বা ফকিরদের পীরোত্তর জমি দান করেছেন, দলিলে তারই উল্লেখ আছে।[২]

বনবিবি ভক্তবৎসলা এবং ত্রাণকর্ত্রী হিসেবেই কল্পিত ও পূজিত। বাঘের আক্রমণ থেকে দুখে রক্ষা পেয়েছিল তাঁকে স্মরণ করে তাঁরই কৃপায়—সে অর্থেই তিনি বনগামীদের ত্রাণকর্ত্রী।

১. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৮
২. ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—চিঠিপত্রে সেকালের কথা।

একটি ছড়ায় অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী বনবিবির এরূপই চিত্র পাওয়া যায় :—

মা বনবিবি, তোমার বালক এল বনে।
থাকে যেন মনে।
শত্রু দুষমন চাপা দিয়ে রাখ গোড়ের কোণে॥
দোহাই মা বরকদের, দোহাই মা বরকদের॥[১]

বনবিবির মুরগী মানত : এটি তাঁর নিজস্ব ও নির্দ্দিষ্ট লোকাচার। অন্য দেবদেবী-পীরপীরানী মুরগী, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদি পান মানত ও বলি হিসেবে, এগুলির কোনটা সুনির্দ্দিষ্ট কোনটা ঐচ্ছিক। বনবিবি কেবল মুরগী পান। চব্বিশ-পরগনার মুসলমান প্রজারা বনবিবির দরগায় শুভ ফল কামনায় মুরগী মানত করে। কখনও তারা বনবিবির উদ্দেশ্যে মানতী মুরগী ছেড়ে দেয়। একে 'বনবিবির মুরগী' বলে। একে কেউ ধরে না বা বধ করে না।[২] মানত ছাড়াও সাধারণভাবে 'বনবিবির শিরনী' প্রচলিত আছে। 'ক্ষীরসা' তাঁর ভোগের সামগ্রী। দুখে তাঁর উদ্দেশ্যে গ্রামের ছেলেদের ডেকে ক্ষীর বিতরণ করেছিল।[৩] গোপেন্দ্রকৃষ্ণের মতে বনবিবির শিরনীতে দুধ, কলা, আটা, গুড়, বাতাসা, কদমা, পাটালি ও ফলমূল থাকে।[৪]

সাতবিবি

পাঁচপীরের মত সাতবিবি পূরণবাচক—ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, মড়িবিবি, আসানবিবি, আজগৈবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনবিবি নাম্নী সাতজন পীরানীর সমাহার। চব্বিশ পরগনা জেলায় মুসলমানদের মধ্যে এঁদের প্রভাব আছে। সাতবিবি সম্পর্কে ঐ জেলায় লোকগাথাও প্রচলিত আছে। এরূপ একটি লৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন গোপেন্দ্রকৃষ্ণ

১. উদ্ধৃত : বাংলার লৌকিক দেবতা পৃঃ ৭
২. Saratchandra Mitra—On a Musalmani Legend about the Sylvan Saint Bana-Bibi and the Tiger Deity Dakshina Raya, JDL, Vol. X, 1923, p. 155
৩. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৯৪
৪. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৮

রসুল। তাঁর ভাষায়, "দুনিয়ার লোক অধার্মিক ও অসৎ হয়েছে, তারা খোদাকে ভুলতে বসেছে, একথা বেহেস্ত থেকে খোদা জানতে পেরে প্রতিবিধানের জন্য তাঁর সাতটি মানসকন্যাকে দুনিয়াতে পাঠাবেন মনস্থ করলেন, কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা সহজে তাঁর কন্যা বা বিবিদের স্বীকার করবেন না এ কথা মনে হতে তিনি অস্ত্ররূপে রোগের বীজপূর্ণ কয়েকটি আধার কন্যাদের দিলেন। অবিশ্বাসী বা অসৎ ব্যক্তিদের রোগগ্রস্ত করলে যখন তারা ব্যাকুল হবে তখন দেবীরা কেরামতি দেখিয়ে তাদের নিরাময় করে দেবেন, লোকেরা এইভাবে তাঁদের ভক্তি করতে শিখবে। ব্যাধির বীজ-ভরা কুঁজ নিয়ে সাতবিবি আসমান থেকে সোজা বাদশার শয়নকক্ষে উপস্থিত হলেন, তখন গভীর রাত। বিবিরা বাদশার উদ্দেশ্যে বললেন—

শুন বাদশা গুণমনি, ঘুমে দেছ মন।
শিয়রে মা সাতবিবি ডাকে হওরে চেতন ॥
হাজোত যদি না দিবে, ভালে ভাল।
কাল তোমার সহরে দিব মড়া জাঙ্গাল ॥

সকাল বেলায় দরবারে বাদশা সকলকে গত রাতের কথা জানালেন। তিনি ভয় পেয়েছেন বিবিদের দেখে, তাঁদের হাজোত দেবেন মনস্থ করেছেন, কিন্তু উজীর-নাজীর বাধা দিলেন। অশরীরী অবস্থায় সাতবিবি সেখানেই ছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে মারণমন্ত্র ছাড়লেন।...ঠিক ঐ সময় উজীরের সাত পুত্র রক্ত বমি করে প্রাণ হারাল। বাদশা ভয়ে ভক্তিতে সাতবিবির কৃপা প্রার্থনা করলেন।...সাতবিবির কৃপায় সকলেই প্রাণ ফিরে পেলে সেই থেকে সর্বত্র তাঁদের পূজার প্রচলন হল।"[১] বলা বাহুল্য, সাতবিবির লোকগাথা হিন্দুর ব্রতকথার ঢঙে রচিত, কেবল বাদশা, উজীর, বিবি, আল্লাহ, রসুল ইত্যাদি চরিত্র যোগে মুসলমানী ভাব আরোপ করা হয়েছে। হিন্দুসমাজে সাতদেবী ভগ্নীর নামে পূজাচার প্রচলিত আছে। রুক্মিণী, সনকিণী, চমকিণী প্রভৃতি তাঁদের নাম। তাঁরা প্রত্যেকে এক এক ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[২] সুতরাং সাতবিবি

---

১. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৯৭-৯৮
২. ঐ, পৃঃ ৯৬

সাতজন বনদেবীর রূপান্তর। লোকমানসে দেবীদের ও বিবিদের স্থান সমতুল্য। কলেরার ওলাদেবী ওলাবিবি হয়েছেন, হাম-বসন্তের শীতলাদেবী ঝোলাবিবি হয়েছেন; মড়িবিবি সান্নিপাত জ্বর, বিকার প্রভৃতি রোগের দেবী; কারো বিকার হলে ধরা হয় তার 'হাড় মুড়মুড়ির ব্যারাম' হয়েছে। বাংলা রূপকথা ও লোককাহিনীতে এ ধরনের অসুখের উল্লেখ আছে।[১] 'মড়ি' শব্দ সেখান থেকে আসতে পারে।[২] আসানবিবি বালা-মসিবত দূর করে আসান বা নিষ্কৃতি দান করেন। তিনি ব্যাধি-নিরাময়ের দেবী। সুতরাং দেবী-বিবি অভিন্না। ত্রিপুরায় বিবি 'পরী' হয়েছেন। সেখানকার অনুন্নত মুসলমানরা সপ্তপরীর হাজোত দেয়।[৩]

বর্ণ হিন্দুসমাজে 'সপ্তমাতৃকা'র পূজা হয়। ব্রাহ্মী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, বরাহী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সপ্তমাতৃকা। লোকসমাজে সপ্তভগ্নীর কল্পনা সপ্তমাতৃকার অনুকরণজাত। দক্ষিণ ভারতে ভগ্নীরূপা সপ্ত বনদেবীর পূজা আছে। খ্রীস্টান শাস্ত্রে সপ্ত প্লেগভগ্নীর উল্লেখ আছে—তাঁরা ভক্তের পূজা পান।[৪]

যেহেতু সাতবিবি ব্যাধির পীরানী, সেহেতু তাঁদের মান্য করলে এবং শিরনী দিলে রোগশোক, জ্বরজ্বালা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়—এরূপ বিশ্বাস থেকে লোকসমাজে তাঁদের প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা।

ওলাবিবি

সাতবিবির একজন হলেন ওলাবিবি। সাতবিবির দরগায় তাঁর মূর্তি অথবা প্রতীক 'ছলন' থাকে, আবার আলাদাভাবে তাঁর নিজস্ব দরগাহও আছে। বিসূচিকা বা কলেরা রোগের গ্রাম্য নাম 'ওলাউঠা'।[৫] এ রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ওলাদেবী'। হিন্দুর ওলাদেবী মুসলমানের

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২৯
২. মড়মড়, কড়মড় প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ: কঠিন দ্রব্য ভাঙার বা চিবানর ধ্বনি। মড়ক শব্দ থেকেও মড়ি বা মুড়ি শব্দ উৎপন্ন হতে পারে।
৩. বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৯৮
৪. ঐ, পৃঃ ৯৬, ৯৮
৫. ওলা=(দাস্ত) নামা; উঠা=(বমন) উঠা। কলেরায় দাস্ত নামে ও বমি উঠে। এ থেকে এর গ্রাম্য নাম ওলাউঠা। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' দ্রষ্টব্য।

ওলাবিবি হয়েছেন এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। শীতলা দেবীর মত ওলাদেবীও সারা বাংলায় সুপরিচিত। বসন্ত ও কলেরা প্রায় প্রতি বছরই হয়। কোথাও কোথাও তা মড়ক আকারে দেখা দেয়। বিস্তৃত এলাকায় খুব দ্রুত এসব রোগ ছড়ায় বলে গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে যে, এগুলির পেছনে অপদেবতার ক্রিয়া আছে। এগুলির প্রকোপ থেকে বাঁচতে হলে এদের অশরীরী আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়। গ্রামে, পথে, মাঠে, ঘাটে, গঞ্জে এদের থান বা দরগাহ গড়ে উঠে; বিপন্ন লোকে পূজা-মানত করে। কতকাল আগে থেকে এঁরা পূজা পেয়ে আসছেন তা স্থির করে নির্ণয় করা যায় না। ব্রতকথায় এঁদের নাম আছে। এঁরা অনার্যদেবী। সাধারণতঃ মন্দির বিহীন মুক্ত থানে অবস্থান এবং মাগনাদি দ্বারা পূজাপদ্ধতিতে অনার্যচেতনা এখনও বজায় আছে। ওলাবিবি কোথাও কোথাও পাকা মন্দির অথবা মাজার পেয়েছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত লোকের পর্যন্ত মানত-শিরনী পান। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু খোদ কলিকাতা ও হাওড়া শহরের মধ্যেই অনেকগুলি ওলাবিবির আস্তানার উল্লেখ করেছেন। সেখানে রীতিমত তাঁর মূর্তিই পূজিত হয়।[১] ওলাবিবির সাধারণ শিরনী সন্দেশ, বাতাসা, পান-সুপারি; বিশেষ পূজায় ছাগ-বলিও হয়। তাঁর উদ্দেশ্যে গানাসর ও লোকোৎসব হয়।[২] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে ওলাবিবির একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন। এখানে তিনি পদ্মাসনের ভঙ্গিতে উপবিষ্টা: বরাভয় দানের ভঙ্গিতে তাঁর হাত দুটি ঈষৎ উত্থিত, দুহাতে দুটি বলয়। শাড়ি-ব্লাউজ পরিহিতা তিনি, তাঁর মাথায় মুকুট আছে। মুখের গড়ন খুবই সুশ্রী— সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারীর মত। মূর্তিটি কোথা থেকে সংগৃহীত তা লেখক উল্লেখ করেননি।[৩]

---

১. তাঁর মতে মধ্য কলিকাতায় ধর্মতলা ষ্ট্রিট, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি ষ্ট্রিট, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, উত্তর কলিকাতায় বেলগাছিয়া, দক্ষিণ কলিকাতায় টালিগঞ্জের বাবুরাম ঘোষ ষ্ট্রিট, হাওড়ায় কাসুন্দিয়া ওলাবিবি লেন প্রভৃতি স্থানে ওলাদেবী ও ওলাবিবির মন্দির ও দরগাহ আছে।
বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৮৭-৮৮

২. ঐ, পৃঃ ১৮৯-৯০

৩. ঐ, পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য।

মাগুন করা : পল্লীতে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিলে 'মাগুন করা' অনুষ্ঠান পালিত হয়। গ্রামের মাতব্বরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুল, ফল মাগুন করে এবং তদ্দ্বারা ওলাবিবির পূজা করে। পল্লীতে এ উদ্দেশ্যে বিবির মাহাত্ম্যসূচক গান হয়। লোকে দরগায় মাটির ঘোড়া বা হাতি মানত করে। একে 'ছলন দেওয়া' বলে। কেউ কেউ রোগমুক্তি অথবা অন্য কোন মনস্কামনায় দরগায় ঢিল ঝুলিয়ে 'ঢিল-বাঁধা' মানত করে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে পরে ওলাবিবির পূজা করে।[১]

লক্ষ্মীবিবি

সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে লক্ষ্মীবিবির কল্পনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে শিরনী মানত করা সম্পূর্ণ লোকাচারের বিষয়ভুক্ত। লক্ষ্মীর পাঁচালি গেয়ে মুসলমান ফকিরেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। সাধারণতঃ ঘরগৃহস্থালির কথা, গুরুজনের সেবা ও গরুবাছুরের যত্নের কথা, নারীর চারিত্রিক লক্ষণের কথা পাঁচালির বিষয়বস্তু।[২] লক্ষ্মীবিবির শিরনী উপলক্ষে রাখাল বালকেরা যে ছড়া আবৃত্তি করে তাতে লক্ষ্মীর দোহাই দিয়ে ও গৃহস্থের স্তুতি গেয়ে চাল-ডাল মাগন করার কথা আছে।[৩] যে মাসে নতুন ধান ঘরে আসে সে মাসের কোন এক বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর শিরনী দেওয়া হয়। কামিনীকুমার বাবু বলেছেন, আউস ধান এলে শ্রাবণ মাসে, আমন ধান এলে অগ্রহায়ণ মাসে এবং বোরো ধান এলে বৈশাখ মাসে এ উৎসব হয়। দরিদ্র গৃহস্থ বছরে একবার তা পালন করে।[৪] চিতইপিঠা, মিষ্টান্ন, চিনি, কলা, দূর্বা ও সিন্দুর শিরনীর উপকরণ। গ্রামবাসীরা আস্ত একটি কলাপাতায় পাঁচ জোড়া পিঠা ভাঁড়ার গোলার উপরে এবং অপর একটি পাতায় পাঁচ জোড়া পিঠা নীচে রেখে মোল্লা ডেকে

---

১. ঐ, পৃঃ ১৮৯

২. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৫৩

৩. মাগনের ছড়ার লোকপ্রচলিত দু'টি চরণ:

আইলামরে অবণে লক্ষ্মীবিবির চরণে।
লক্ষ্মীবিবি দিল বর, চাইল কড়ি বাইর কর।।

উদ্ধৃতি : ঐ, পৃঃ ৫৩

৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ ২২১

ফাতেহা পড়ে শিরনী উৎসব পালন করে। নীচের পিঠা সকলে ভাগ করে খায়, উপরের পিঠা বনবিবির ভোগ হিসেবে দিন কতক রক্ষিত থাকে।[১] লক্ষ্মীব্রতে হিন্দুরা ব্রতের স্থানে লক্ষ্মীর আলপনা দিয়ে ও নানা নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করে। মুসলমান সমাজে এরূপ কোন মূর্তি নেই। ব্রত ও শিরনীর উপকরণের কিছু ভেদ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সম্পদের অধিপতি হিসেবে পুরুষ পীরের পূজা পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত আছে। ডঃ হক এঁর নাম করেছেন 'জুম্মাপীর'।[২]

হাওয়া বিবি

মুসলমান সমাজে আদম ও হাওয়া মর্তের আদিম নরনারী। খ্রীস্টান সমাজে আদম ও ঈভের একই স্থান। তাঁরা স্বর্গবাসী ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে তাঁরা মর্তে প্রেরিত হন। পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্য জাতি তাঁদেরই বংশধর।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আদম-হাওয়া সম্পর্কিত পৌরাণিক চিন্তাধারা জনগণের মনে বিস্তার লাভ করে। হাওয়া বিবির সম্মানে শিরনী দেওয়ার রীতি আছে। কবি জসীমউদ্দীন এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় হাওয়া সিন্নির উৎসব হইত। একটা চিত্রিত হাঁড়ির মধ্যে খই মুড়ির মোয়া-লাড়ু বাতাসা প্রভৃতি ভরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখা হইত। সামনে থাকিত দুইচারখানা পাকা কলার কাঁদি।"[৩]

---

১. ঐ, পৃঃ ২২১-২২

২. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২০৯

৩. জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪

সপ্তম অধ্যায়

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

ইংরেজী 'Folk belief' ও 'Superstition'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোক-বিশ্বাস' ও 'লোক-সংস্কার' গৃহীত হয়েছে। বিশ্বাস মনোজ। বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। মনের আকাশে কতক বিশ্বাস অদৃশ্য ধূলিকণার ন্যায় তরল অবস্থায় ভেসে বেড়ায়; সেগুলি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কতক লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গভীরে স্থান পায়। আচরণসিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমরা 'সংস্কার' নাম দিতে পারি। অমূলক ও অকারণ বলেই এগুলিকে কুসংস্কার বলা হয়।

বিশ্বাস ও সংস্কারের কার্যকারণ সম্পর্কে লোকের ধারণা অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত হলেও সবকিছুই মূঢ়তাপ্রসূত নয়, অনেক সময় মানবজীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বাংলাদেশে কালবৈশাখীর সময় দিগন্তরেখার 'মেঘস্তম্ভ' দেখে লোকে মনে করে ইন্দ্রের ঐরাবত শুঁড় দিয়ে সমুদ্র থেকে জল তুলছে; তাই বৃষ্টি হয়ে ঝরবে।[১] এটা অবাস্তব কল্পনা। বর্ষণ শেষে আকাশ প্রান্তে রামধনু দেখে

---

১. আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ডঃ শহীদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত 'ভূমিকা' (পৃঃ ২৩) দ্রষ্টব্য।

লোকের ধারণা হয় যে, আর বৃষ্টি হবে না। রামধনু বৃষ্টি প্রতিহত করে না; মেঘের জলকণা লঘু হয়ে এলে তাতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে। ঘনমেঘে তা দেখা যায় না। এটা বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে এর একটা মিল আছে। মিলটা এখানে আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক নয় এজন্য যে, এর পিছনে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ক্রিয়া করছে। খনার বচনগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে যে জ্যোতিষী মন্তব্য আছে, সেগুলির পেছনেও অভিজ্ঞতা আছে বলে ব্যবহারিক সত্যফল তার মধ্যে পাওয়া যায়। এজন্য বলা যায়, লোক-বিশ্বাসের সবটাই অজ্ঞতাপ্রসূত, তমসাবৃত ও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বিষয় নয়। অসহায় মন থেকে কুসংস্কারের জন্ম হয়ে থাকে। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃতির সকল শক্তির চেয়ে বলীয়ান নয়। আত্মশক্তি ও দৈহিক-শক্তির অভাব জীবন-বিড়ম্বনার কারণ। মানুষ এর প্রতিকার কামনা করে। জীবনকে সে ভালবাসে, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই। পীড়িত, বিঘ্নিত, লাঞ্ছিত জীবন দুঃখ ভোগ করে। যে জীবন পদ্ধতি এমন, যেখানে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ও ক্ষণে ক্ষণে বিপত্তির আশঙ্কা আছে, সেখানে তাকে পূর্বাহ্নে সচেতন হতে হয় এবং তার ফলাফল বিচারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংশয়সন্দিগ্ধ মনের এই দোলাচল অবস্থাতেই বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব পড়ে বেশী।

সকল সংস্কারের মূলে আছে অমঙ্গল চিন্তা। অর্থহানি, স্বাস্থ্যহানি, শাস্তিভোগ, বিচ্ছেদ-বিড়ম্বনা ও বিপদ-আশঙ্কা থেকে অমঙ্গল চিন্তার উদ্ভব। অকল্যাণের মূলে আছে অপদেবতার কোপ, শয়তানের দুষ্ক্রিয়া, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি। এদের প্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়োজন। লৌকিক উপায়ে মুক্তির দুটো পথ—মন্ত্র ও ক্রিয়া। কতক ক্ষেত্রে শ্লোক, ছড়া, গান ও ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা হয়, কতক ক্ষেত্রে লৌকিক আচরণ ও বাহ্যবস্তুর প্রয়োগ দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা কখন একত্রে, কখন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়। এসব মন্ত্র ও ক্রিয়ার কার্যফলের পেছনে যে শক্তির প্রভাব আছে তা হল যাদুবিদ্যা।

যাদুবিদ্যার প্রভাব বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সব প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে যাদু ও মন্ত্রের প্রচলন ছিল। আদিম মানবজাতির কাছে যাদু ছিল ধর্মের অঙ্গ। টাইলরের মতে সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাস থেকে যে

সব লোক-সংস্কার গড়ে উঠে যাদুবিদ্যা তাদের অন্যতম।[১] অর্থাৎ যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস ও তদ্‌সংক্রান্ত আচার পালন সর্বপ্রাণবাদে সমর্থনের নামান্তর। অবশ্য যাদুর কোন আধ্যাত্মিক দিক নেই, সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দিক আছে। প্রতিরক্ষা বা চিকিৎসার দ্বারা উপকার সাধন হোক, অথবা 'দারুটোনা' দ্বারা ক্ষতি সাধন হোক যাদুর প্রয়োগে পার্থিব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করা হয়। যাদু হল একটা আর্ট বা কৌশল, যার সাহায্যে মানুষ তার ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনতে ও আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পারে। প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত ঘটনাকে অলৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার নাম যাদুবিদ্যা।[২] এ অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির বাহ্যিক অস্তিত্বের তিনটি উপাদান আছে—মন্ত্র, মন্ত্রপূত বস্তু ও মন্ত্রাচার।[৩] মন্ত্র হচ্ছে যাদুর বাঙ্ময় রূপ—মন্ত্রের মধ্যেই যাদুশক্তি আছে, মন্ত্র আবৃত্তির সাথে সাথে তার শক্তির প্রকাশ ঘটে। মাদুলী, তাবিজ, কবচ, তাগা প্রভৃতি যাদুর বস্তু উপকরণ। এগুলির মধ্যে আছে যাদুর ঔষধিগুণ। কতক বস্তুর সঙ্গে মন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—বস্তুকে মন্ত্রপূত করলে তবে যাদুগুণপ্রাপ্ত হয়। যাদুকৃত বস্তুতে মন্ত্রকে আবদ্ধ ও স্থায়িত্ব দান করা হয়। ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা যাদুর কর্মফল প্রয়োগক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ও ক্রিয়া একসঙ্গে সম্পাদিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ছাড়াই কেবল লৌকিক আচার দ্বারা যাদুক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মন্ত্র, বস্তু ও ক্রিয়া কোথাও পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত থেকে, কোথাও স্বতন্ত্রভাবে যাদুশক্তির প্রকাশ ঘটায়।

যাদুবিদ্যার সহিত কয়েকটি দিক জড়িয়ে আছে—প্রয়োগকারী, প্রয়োগ-ক্ষেত্র, প্রয়োগকাল, প্রয়োগের উপায় ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। যাদু প্রয়োগকারী হিসেবে সাধারণতঃ গুণী, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধুসন্ন্যাসী, পীরফকির, বেদেবেদেনী, ধাত্রী ইত্যাদি পেশাদার

১. মুহম্মদ আবদুল হাফিজ—যাদুবিদ্যার যুগ-যুগান্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১০৪

২. The art of compulsion of the supernatural; also, the art of controlling nature by supernatural means. SDFML, Vol. 11, p.760.

৩. Encyclopeadia Brittanica, Vol. XIV, Magic শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এদের প্রভাবক গুণ থেকে যায়।[১] এজন্য যাদুক্রিয়া ফলবতী হয়। সদৃশ যাদুবিদ্যা এবং সংক্রামক যাদুবিদ্যা একত্রে সমপর্যায়ের যাদুবিদ্যার (sympathetic magic) বিষয়ভুক্ত।

আত্মার বিশ্বাস থেকে প্রেততন্ত্রের উদ্ভব। জীবের আত্মা অবিনশ্বর। দেহ নষ্ট হলেও অশরীরী আত্মার প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে যায়। যাদুমন্ত্র বলে এসব আত্মাকে বশ করা যায়। ভূত-প্রেত সংক্রান্ত মন্ত্রাচার এর মধ্যে পড়ে। ডাইনী শ্রেণীর নারীরা এর চর্চা করে। শুধু প্রাণী নয়, জড়বস্তু এবং নৈসর্গিক ঘটনারও আত্মাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয়। যেমন ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। মানুষ যাদুমন্ত্রের সাহায্যে এসব শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। কতক লৌকিক আচরণ দ্বারা অথবা মন্ত্রপূত বস্তু দ্বারা যাদুর প্রকাশ ঘটে থাকে। মন্ত্রগুণে আত্মার রূপরূপান্তর ঘটান যায়। এরূপ অঘটন সংঘটনের যাদুবিদ্যা তেলেসমাতি (Sorcery) নামে পরিচিত। অনিষ্ট করাই প্রেততন্ত্রের কাজ। সুতরাং তা ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার বিষয়।

অজ্ঞাতমূল যে সমস্ত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে, অনভিজ্ঞ মানুষ তাকে জানতে ও আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। পূর্বাহ্নেই এ সম্বন্ধে জানার কৌশলকে 'আগম কথা' বলে।[২] জ্যোতিষচর্চায় হস্তরেখা গণনা, 'ঠিক' দেখা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে।

বাঙালীর সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসে যাদুবিদ্যা ও প্রেততন্ত্রের প্রভাব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এগুলির বহু দৃষ্টান্ত আছে যাদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য অর্থসূত্র পাওয়া যায় না। মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি আবাহন করা, মাটিতে ডাল পুঁতে তাতে পানি ঢেলে বৃষ্টির নকল তুলে

১. এ সম্বন্ধে ফ্রেজারের অভিমত : 'things which have been in contact with each other continue to act on each other at a distance after the physical contact has been severed.' The Golden Bough, p. 14

২. Divination are these divices by the helf of which the superstitions man tries to find out the phenomena of life and nature which do not yield themselves to his intellect. উদ্ধৃতি গৃহীত : লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৬৩-৬৪

আগল বৃষ্টি কামনা করা—এরূপ লৌকিক বিশ্বাস ও আচারের উদ্ভব মূল যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে না পেরে আদিম মানব মন অলৌকিক উপায়ে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে— যাদুবিদ্যা সেই অতীন্দ্রিয় ক্রিয়াকলাপের বিষয়। বাংলাদেশে লোকজীবনে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, দারুটোনা, মারণ-উচাটন, বন্ধন প্রভৃতি বিবিধ মন্ত্র ও মন্ত্রাচারে যাদুবিদ্যার প্রভাব অদ্যাবধি চলে আসছে। যাদুবিদ্যা চর্চা করত এমন ডাকিনী, যোগিনী, ওঝা, গুণী প্রভৃতি শ্রেণীর নরনারীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা প্রাচীন যুগ থেকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগুরু, নাথযোগী, হিন্দুতান্ত্রিক, মুসলমান ফকির, বৈষ্ণব বৈরাগী গুণমন্ত্র ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা যে যাদুবিদ্যার চর্চা করতেন তার প্রমাণ ডাকতন্ত্র, বিবিধ বচন, নাথসাহিত্য, যোগতন্ত্র, ফালনামা প্রভৃতি রচনা গ্রন্থ। গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারিণী ছিলেন। মহামন্ত্র জপ করে তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বুঝতে পারতেন। মন্ত্রগুণে তিনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১] হিন্দুতান্ত্রিকরা শব সাধনার দ্বারা প্রেতাত্মার শক্তির অধিকারী হত এবং তদদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করত।[২] বাংলার সীমান্ত অঞ্চল কামাখ্যা বা কামরূপ ছিল যাদুবিদ্যার কেন্দ্রস্থল। এদেশের তন্ত্রেমন্ত্রে কামরূপের কামাখ্যাদেবীর বহু উল্লেখ আছে। এক সময় যাদুমন্ত্র শেখার জন্য লোকে সেখানে গমন করত।

বাংলার লোকসাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার যাদুমন্ত্র ও যাদুমন্ত্রের চর্চাকারী বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যারা মন্ত্রাদির সাহায্যে সাপের বিষ নামায়, ভূত তাড়ায় তারা ওঝা বা গুণী। গাছ-গাছড়া, তুকতাকের সাহায্যে চিকিৎসা করে যারা, তারা কবিরাজ বা ওস্তাদ। রোগব্যাধি দূর করার জন্য পেশাদার পীর-ফকিরও আছে। এছাড়া ধাত্রী, বেদে, নটীরাও মন্ত্রগুণী হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি রোধ করার জন্য পূর্ববঙ্গে 'হিরালি' শ্রেণীর পেশাদার ওঝাদের বাস ছিল। মেঘবাদলের দিনে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে ও মন্ত্র পাঠ করে হিরালি শিলা, বজ্র ও

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—গোপীচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য।
২. William Crooke—Natives of Northern India, London, 1907, pp. 256-57

বৃষ্টির গতি নিয়ন্ত্রিত করে কৃষকদের ফসল রক্ষা করত।[১] ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি পালায় হিরালি ও তাদের মন্ত্রজ্ঞান শিক্ষার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ভাটী দেশে নানান গাঁয় হিরালিরার ঘর।
কেহ কেহ শিখতে যায় কেউবা জবর ।।
নমঃশূদ্র যুগী নাথ গুরু মন্ত্র লৈয়া।
হিরালিরার পেশা করে সাধনা করিয়া ।।
পাড়ায় পাড়ায় হিরালিরা গুণমন্ত্র জানে।
ওস্তাদের বাড়ীত গিয়া শিখ্যা দ্যাখ্যা আনে ।।
মাথাত মানসিক চুল নিয়ম সেবা খায়।
দাঁড়ি চুল নৌখ রাখ্যা গুরুর বাড়ীত যায় ।।
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান।
মন্ত্রের রাগিনী শিখে নানান গুণজ্ঞান ।।
আশমান চিনে জমিন চিনে চিনে সকল দিক।
তারা চিনে চান্দ চিনে বাতাস চিনে ঠিক ।।
কি রকমের দেওয়ার সাজ কি রঙের বাতাস।
কিবা বার কিবা তিথি কোন বাইরা মাস ।।
কোন তিথিতে মাসের পরথম কিবা বার হয়।
জলেতে চান্দের রেখা কোন কথাটা কয় ।।[২]

বৌদ্ধ নাথযোগী, হিন্দু নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে হিরালি নামে পরিচিত হত। 'জৈত্যা হিরালি'র পালায় জৈত্যা ছিল নমঃশূদ্র সন্তান।[৩]

সাপ ধরে ও খেলা দেখিয়ে বেদেরা এখনও জীবিকা নির্বাহ করে। এদের অনেকে দক্ষ গুণী ও চিকিৎসক। বেদে ছাড়া সাধারণ গ্রামবাসীর কেউ কেউ মন্ত্র শিখে ওঝা ও গুণী আখ্যা পেয়ে থাকে। এরা পেশাদার নয়, লোকহিতে চিকিৎসা করে থাকে। রোগীর কাছ থেকে ওঝারা

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২
২. ঐ, পৃঃ ২০২-০৩
৩. ঐ, পৃঃ ৬৬০

সাধারণতঃ পারিশ্রমিক নেয় না। অনেকের সংস্কার, টাকা-পয়সা নিলে নাকি মন্ত্র খাটে না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওঝা আছে। তবে মুসলমান ওঝার সংখ্যা বেশী। বিশেষজ্ঞের মতে, ময়মনসিংহ জেলায় সাপের ওঝা শতকরা ৯০ জন মুসলমান।[১] দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, বাংলাদেশের সাপ ও ভূতের ওঝাদের অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমান; হিন্দু ও বৌদ্ধগুণীরা ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও পূর্ব পেশা ও সংস্কার ত্যাগ করেনি।[২] 'পীরবাতাসী' পালায় মন্ত্রজ্ঞানী সুনাই ওঝার পরিচয় পাওয়া যায়। সে মূলতঃ সাপের ওঝা; তবে সে অন্যান্য মন্ত্রও জানে। সে মন্ত্রগুণে খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে নদী পার হতে পারে।[৩] শিষ্য বিনাথকে সুনাই মোট নয়টি মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। এর অধিকাংশ সাপের মন্ত্র। মন্ত্রের নাম ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এরূপ :

পরথমে শিখিল মন্তর নামে ফুল কড়ি।
জঙ্গলার যত সপ্প আনে তারে ধরি ॥
দ্বিতীয়ে শিখিল মন্ত্র ওস্তাদে বাখানি।
থাপার চুইডেতে দেখ বিষ করে পানি ॥
তিতিয়ে শিখিল মন্ত্র বরম্মজাল নামে।
চালুনি ভরিয়া জল আনে যার গুণে ॥
চতুর্থে শিখিল মন্ত্র নালে নামে বিষ।
পঞ্চমে শিখিল মন্ত্র উত্তর পাতর।
বাসুকী নোয়ায় মাথা ঝারি সে মন্তর ॥
ষষ্ঠেতে শিখিল মন্ত্র নাম তার খৈয়া।
কালীদহে কালীনাগ যায় পলাইয়া ॥
সপ্তমে শিখিল যত ধুলাপড়া আছে।
কেউটিয়ার ফণায় বিনাথ খাড়াইয়া নাচে ॥
অষ্টমে শিখিল মন্তর নামেতে গাড়ুইয়া।
ধন্বন্তরীর যশ রৈল মরা বাঁচাইয়া ॥

---

১. শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০

২. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৪৫

৩. **Dr. Dinesh Chandra Sen—Folk Literature of Bengal, University of Calcutta, Calcutta, 1920, pp. 86-99**

জীয়ন মন্তর শিখে বিনাথ ওস্তাদের চরণে।
ছয় মাসের মরা জিয়ে যে মন্ত্রের গুণে ॥[১]

এখানে মন্ত্রগুলির নাম 'ফুলকড়ি', 'চাপড়মন্ত্র', 'ব্রহ্মজাল', 'নাল', 'উত্তর পাথর', 'খৈয়া', 'ধূলাপড়া', 'গাবুড়ী' ও 'জীয়নমন্ত্র'। এর মধ্যে ব্রহ্মজাল মন্ত্রের গুণে চালুনিতে পানি আনার কথা বলা হয়েছে। বাকীগুলি সাপ ধরা ও বিষ ঝাড়ার মন্ত্র। সম্ভবতঃ ব্রহ্মজালও সাপের মন্ত্র। ঐ পালায় অন্যত্র আছে 'কেউটা রোখা বর্মজাল নোওয়ায় দেইখ্যা মাথা।'[২] 'মানজুর মা' পালায় মণির ওঝা 'গাড়রী', 'দেবংশী', 'জল ঝাড়া', 'চালুন ঝাড়া', ও 'পলা ঝাড়া' মন্ত্রের সাহায্যে সাপের বিষ নামাতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গাড়রী (<গরুড়ী) মন্ত্রে মৃতব্যক্তি প্রাণ পায়, দেবংশী মন্ত্রের গুণ অব্যর্থ।[৩] 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে বীরসিংহ কামিনীমুল্লুকে মাইয়ানা বুড়ির কাছে জীয়ন ও মারণ মন্ত্র শিখেছিলেন। মারণমন্ত্রে শত্রুকে পাষাণে পরিণত করা যায়। এ ছাড়া তিনি ধূলামন্ত্র ও বড়িমন্ত্র শিখেছিলেন। ধূলামন্ত্রে শত্রুকে বশ করতে ও বড়িমন্ত্রে নিজ দেহের রূপান্তর ঘটাতে পারতেন।[৪] ময়মনসিংহে বাঘবন্ধন মন্ত্র পড়ে বাঘ তাড়ানোর জন্য পেশাদার মন্ত্রগুণী থাকতো, এদের নাম ছিল 'বহরদার'। এ সম্পর্কে জনাব ইব্রাহিম খাঁ লিখেছেন, "জঙ্গলে সেকালে ছন, কাঠ ইত্যাদি কাটতে গেলে লোকে বহরদার মোতায়েন করত; বহরদারেরা মন্তর দিয়ে বাঘকে ভাগিয়ে রাখত; দরকার হলে সমস্ত বাঘ চালান দিয়ে এক জঙ্গল হতে অন্য জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারত।"[৫] পাকাকান, পোকালাগা-দাঁত ও অন্যান্য ঘা-ধসর চিকিৎসা করে থাকে পেশাদার বেদেবেদিনীরা। বেদেরা গরুরও চিকিৎসা করে। এসব কাজে গাছগাছড়া এবং তুকতাকের ব্যবহার হয়ে থাকে।

---

১. ঐ, পৃঃ ৩৫০-৫১
২. ঐ, পৃঃ ২৪৫
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১১-১৫
৪. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা; 'ভারইয়া রাজার কাহিনী' দ্রষ্টব্য
৫. বাতায়ন, পৃঃ ১২০

শুভাশুভ চিহ্ন

সাধারণতঃ যাত্রাকালে এবং কোন শুভকাজ করার সময় শুভাশুভ বিচার করা হয়। কতক বস্তু ও ঘটনা কুলক্ষণাক্রান্ত; সেসব দেখা এবং শোনা অশুভসূচক। মানুষ এগুলি এড়িয়ে চলতে চায়। গৃহ-পরিবেশ মানুষের একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, সেবা, সাহায্য গৃহ পরিবেষ্টনে পরম নির্ভরতা এনে দেয়। ঘরের বাইরে পা বাড়ালে এ ভরসাটুকু আর থাকে না। পথের বাধাবিঘ্ন অনেক। শ্রমক্লান্তি, অসুখ-বিসুখ, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈব দুর্বিপাক ইত্যাদি কারণে যাত্রীর জান ও মালের বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সংসার জীবন-যাত্রার পথে মানুষের এ নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়। গৃহের বাইরে ব্যক্তির আত্মনির্ভরতাই একমাত্র সম্বল; দৈবনির্ভরতা মনোবল জোগায় বটে, কিন্তু তা আশ্বাসমাত্র, তার কোন বাস্তবভিত্তি নেই। বহিঃশক্তির তুলনায় আত্মশক্তি যেখানে সীমিত সেখানে মানুষ ভয়মুক্ত হতে পারে না। এ যেমন গৃহত্যাগে যাত্রাপথের দুশ্চিন্তার কথা, আবার যাত্রার উদ্দেশ্যের ফলাফল অনিশ্চিত বলে সেখানেও মন ভাবনামুক্ত হতে পারে না। এ উভয়বিধ কারণে মানুষ যাত্রাকালীন শুভাশুভ বিচার এবং তদ্‌সংক্রান্ত আচার পালন করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজনে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখতে হয়, স্থানান্তরে গমনাগমন করতে হয়। এছাড়া তীর্থযাত্রা, শিকারযাত্রা, বাণিজ্যযাত্রা, যুদ্ধযাত্রাও আছে। সর্বত্র ধন-জন, প্রাণ ও মান-মর্যাদা জড়িয়ে আছে।

সংস্কারপ্রবণ মনে যাত্রা শুভ, কি যাত্রা নাস্তি তা বিচার করা হয় কতকগুলি জাগতিক বস্তু ও মানবিক ক্রিয়ার চিহ্ন দেখে। কোন বস্তু দেখা বা কোন ঘটনা ঘটার সঙ্গে যাত্রার ভবিষ্যৎ ফলাফলের বাস্তব সম্পর্কটি দুর্নিরীক্ষ্য; অলীক কল্পনার বিষয় বলেই দুর্নিরীক্ষ্য। এটি অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ দুর্বল মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, এর পেছনে বাস্তবের কোন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে এগুলির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আছে। শুভলক্ষণ মানুষের মনে উদ্যম উৎসাহ সঞ্চার করে, অশুভ লক্ষণ আশঙ্কা সৃষ্টি করে, হতাশা এনে দেয়। মানব মনের বিচিত্র রহস্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শুভাশুভ বাছবিচার মূল্যবান উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বাঙালীর জীবনে কতক বস্তু শুভ বলে গণ্য করা হয়, যেমন ধান, দূর্বা, কুলা, শাঁখা, সিন্দূর ইত্যাদি। ধর্মাচার পালনে ও সামাজিক শুভ কাজে এগুলি ব্যবহার করা হয়। অশুভসূচক বস্তু ও ঘটনার একটি তালিকা দিয়েছেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী' গ্রন্থে, যেমন কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, বনকুক্কুট, রক্তপাদ, বনকপোত প্রভৃতি পাখির মাথার উপর পতন অথবা গৃহে প্রবেশ, পেঁচার ডাক, অকালে ফুলফলের জন্ম ইত্যাদি। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে এগুলির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন।[১] লোকজীবনে এছাড়া আরও অনেক বিষয় ও ঘটনা আছে যা অশুভসূচক বলে বিবেচিত হয়। স্বয়ং মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া শুভাশুভের সহিত জড়িত। এয়ো ও সন্তানবতী রমণীর সংস্পর্শ ও সাহচর্য শুভসূচক। বন্ধ্যা রমণী কিংবা 'আঁটকুড়ে' পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাজ্য। আঁটকুড়ে রাজার মুখ দেখা যাত্রানাস্তির কথা নানা গাথা ও গল্পে পাওয়া যায়।[২] লোককাহিনীর এটি একটি উল্লেখযোগ্য ট্যাবু-মটিফ।[৩] কাল বামুন, রাঙা চাঁড়াল এবং নির্দাঁড়িয়া মুসলমান—এ তিন শ্রেণীর মানুষের মুখ দেখা অমঙ্গলজনক বলে প্রবাদ আছে।[৪] 'হাঁচি' মঙ্গলজনক-অমঙ্গলজনক দুই হতে পারে। কোন কাজে হাঁচি শুভ এবং কোন কাজে অশুভ এ সম্বন্ধে খনার বচনে নির্দেশ পাওয়া যায়।

> শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে।
> বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে।।
> এই সপ্তকর্মে হাঁচি আদি সুশোভন।
> অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন।।
> বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি,
> যত্ন পূর্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি।।
> গোধনে হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ।
> জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ।।[৫]

---

১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃঃ ২০৬
২. আশরাফ সিদ্দিকী—লোকসাহিত্য, পৃঃ ২২৭
৩. ঐ, পৃঃ ২৩৩
৪. ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এরূপ লোকপ্রবাদ শোনা যায়। নিজস্ব সংগ্রহ।
৫. পি, এম, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, বৃহৎ খনার বচন, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃঃ ৬৭

আমেরিকার লোকসংস্কারে ডানদিকে হাঁচি পড়া সৌভাগ্যসূচক, বামদিকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। খাবার সময় হাঁচি পড়লে গৃহে অতিথি আসে। অতএব তা মঙ্গলজনক। সকালে শয্যা ত্যাগের আগে বিছানায় হাঁচি পড়া অমঙ্গলজনক।[১] সাধারণতঃ 'পাছুডাক' অশুভসূচক ; কিন্তু মায়ের পাছুডাক শুভসূচক। মায়ের পাছুডাক সন্তানকে গৃহে ফিরিয়ে আনে বলে সাধারণ বিশ্বাস।[২] সংখ্যা ও প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কেও শুভাশুভের ধারণা আছে।

শূন্যসংখ্যা বা গোলচিহ্ন অশুভজনক। এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা শুভজনক। বিবাহ-অনুষ্ঠান, বরণ-উৎসব ও ধর্ম-কর্মে বিজোড় সংখ্যার ব্যবহার বেশী। মুসলমানের বিবাহে তিনবার কবুল করতে হয়। হিন্দুর বিবাহ-বাসরে বরবধূকে সপ্তপদ গমন করতে হয়। খ্রীস্টান সমাজে 'তের' সংখ্যাকে অশুভসূচক বলা হয় ; ঐদিন যীশুখ্রীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হন। হিন্দুসমাজে 'স্বস্তিকা' শুভচিহ্ন, 'ক্রুশচিহ্ন' খ্রীস্টান সমাজে পবিত্রতার লক্ষণ। 'পদ্ম' বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। এরূপ রঙ সম্বন্ধে শুভাশুভ ধারণা আছে। কাল রঙ শোকের চিহ্ন। খ্রীস্টানরা মৃতাশৌচ পালনে কাল রঙ এর পোশাক পরে। মুসলমানের মহরমের মিছিলে কাল পোশাক পরার রীতি আছে। লাল রক্তের প্রতীক ; তা বিপদ সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে জীবন ও যৌবনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে লাল দ্রব্য এবং বিশুদ্ধতার চিহ্ন হিসেবে হলুদের ব্যবহার আছে। আলতা, আবীর, কুঙ্কুম, সিন্দুর, মেহেন্দি প্রভৃতি রক্তিম পদার্থ বিবাহে ব্যবহৃত হয়। বিবাহের পূর্বে বরকনেকে হলুদ মাখান অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়। এদেশে গৈরিক বর্ণ বৈরাগ্যের চিহ্ন। বৌদ্ধভিক্ষু, বৈষ্ণব বৈরাগী ও বাউলরা গেরুয়া রঙের বস্ত্র পরিধান করে। সাদা পবিত্রতা ও রিক্ততার চিহ্ন। হিন্দুসমাজে বিধবাদের সাদাবস্ত্র পরতে হয়। রঙ মোহ সৃষ্টি করে। মোহ ত্যাগ ও সংযম সাধনা বৈধব্য জীবনের লক্ষণ। মুসলমানদের দাফন-কাফনে সাদা কাপড় ব্যবহৃত হয় পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে।

---

১. Harry Middleton Hyatt—Folklore from Adams County Illunois, 1965, pp. 179-80

২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৫ (ভূমিকা : ডঃ শহীদুল্লাহকৃত)।

যাত্রা শুভ

'চম্পাবতী' পালাগানে শুভযাত্রার কয়েকটি সুলক্ষণের নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

বাইর হয়া দ্যাকে গাজী যায় কতক দূরে
সামনে দেকিল হাতী মাউত ওপরে।
আর দ্যাকে ফুলের ডালি মাতাতে করিয়া
গাজীর সামন দিয়া যায় যে চলিয়া।
দুদ দই নিয়া দ্যাকে ডাকায় গোয়ালিনী
ভরা কলসী কাকোত নিয়া যায় যে অমনি।
শুবো যাত্রা দ্যাকে গাজী আপোন চউকেতে
চইলবার নাগিল পত দ্যাকো আনোন্দিত মনে।[১] —রংপুর

এখানে শুভচিহ্নের চারটি চিত্র পাওয়া যায়—হাতীর সওয়ারী মাহুত, ফুলের ডালি হাতে মালী, দুধ-দই কাঁধে গোয়ালিনী এবং ভরা কলসী কাঁখে রমণী। হাতীর যাত্রা জয়যাত্রার লক্ষণ; মালীর ফুল দিয়ে দেব-পূজা হয়, বরণোৎসব হয়, অতএব তা শুভ; দুধ দই উপাদেয় খাদ্য; ভরা কলসী আশা পূর্ণের পূর্বাভাস। সুতরাং এগুলি শুভচিহ্ন। 'সত্য পীরের পুঁথি'তে শিকার যাত্রাকালের আরও কয়েকটি শুভচিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায় :

শিকারী সকল রাহি হইল রাহেতে।
সুক্ষণ দেখিল তারা যাত্রার কালেতে॥
বেল করি করে তারা মস্তকে ভ্রমণ।
পদ্মের উপরে পদ্ম দেখিল খঞ্জন॥
দেখিল স্বরূপ ঘোড়া লালজিন পিঠে।
ভরনির কলস ভরা পুকুরের ঘাটে॥
কলসী কাখেতে নারী শঙ্খ দুই হাতে।
জল লইয়া আসে সবে দেখা হইল পথে॥[২]

---

১. লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭০, পৃঃ ১৩৩
২. মুন্সি ওয়াজেদ আলী—সত্যপীরের পুঁথি, বটতলা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২০

ভরা কলসী কাঁখে রমণী, পদ্ম, খঞ্জন পাখি ও লালজিন পিঠে সওয়ারী—এ চারটি চিত্রের কথা আছে। 'শোয়াপক্ষী' শিকার করতে গিয়ে আখটিগণ এগুলি দেখেছিল। 'পদ্ম' লক্ষ্মীর বাহন, সুতরাং তা সম্পদের চিহ্ন, খঞ্জন পোষ-মানা পাখি। লালজিন ঘোড়া বীরত্বকে সূচিত করে। আখটিগণের প্রচুর শিকার মিলবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে ভাল রোজগার হবে—এ চিহ্নগুলি তারই তাৎপর্য বহন করে। এগুলি সবই সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের লক্ষণযুক্ত।

যাত্রানাস্তি

একটি লোকপ্রবাদ আছে—

শূন্য কলসী, শুকনো না,
শুকনো ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা
এক পাও বেরিও না বাপা।
এ সকলেও পায়ে ঠেলি
যদি না সমুখে দেখি তেলী।

দাড়িগোঁফহীন ধোপা, নেয়ে এবং তেলী—তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে তেলীকে অধিক হীনার্থক বলা হয়েছে। নেয়ে বা মাঝির সম্পর্কে ঘর ছাড়ার ভাব আছে, কারণ তারা প্রায় বিদেশ-বিভুঁই-এ দিন কাটায়। ধোপা অধিক শ্রমের এবং তেলী দারিদ্র্যের সহিত জড়িত। এদেশের সমাজব্যবস্থায় এরা তপশিলীভুক্ত ব্রাত্য মানুষ। এসব অশুভ চিহ্নে লোক-বিশ্বাসের পেছনে সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাব আছে অর্থাৎ এদের জীবনে যে, দুর্গতি, যাত্রাকালে এদের দর্শনে যাত্রীর জীবনেও সে দুর্গতি আসতে পারে। একটি ডাকের বচন :

কাক, নাক, ফণী, মাকড়, গোধা।
সমুখে দেখিতে পাইব বাধা॥[১]

অর্থাৎ কাক, খাঁদাবোঁচা লোক, সাপ, মাকড়সা, গোসাপ দেখা যাত্রার পক্ষে অশুভ। যাত্রানাস্তির নানা দৃষ্টান্ত অন্যান্য লোক-রচনাতেও পাওয়া

১. সত্যরঞ্জন সেন—প্রবাদ-রত্নাকর, ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ২২৪

যায়। 'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকায় দুলাল কতকগুলি কুলক্ষণ দেখেছিল। পতির বিচ্ছেদে সতী মদিনা মৃত্যুবরণ করেছে, দুলালের তা অজ্ঞাত ছিল। সে পরিত্যক্ত গৃহে ফিরে এসে ঐ দু:সংবাদ পায়, পথের চিহ্নগুলি এজন্য অশুভসূচক। পল্লীকবি লিখেছেন,

যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল।।
তার পরে মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া।।[১]

এখানে পাঁচটি 'অলক্ষুণে' চিহ্ন আছে: দুটি পাখী—কাক ও চিল, একটি প্রাণী— গর্ভবতী শৃগাল, একজন মানুষ— তেলী এবং একটি লৌকিক ক্রিয়া— হাঁচি।[২] দেওয়ানা মদিনা ময়মনসিংহ জেলার লৌকিক গাথা। রংপুর থেকে সংগৃহীত চম্পাবতী পালাগানে দক্ষিণরায় কালুগাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে হাঁচি; মাছি, হোঁচট, কাঠুরিয়া, পাছুডাক ও শব মোট ছ'টি কুলক্ষণ দেখেছিলেন; এগুলিতে তাঁর পরাজয় ও ধ্বংসের পূর্বাভাস আছে; পল্লীকবি যুদ্ধে তাঁর পরাজয়েরই বর্ণনা করেছেন। যাত্রাকালীন কুলক্ষণসমূহের বর্ণনা এরূপ:

যাবার সোমে হাচি তার বামেতে পড়িল।
চউকোতে আসিয়া মাচি উড়িয়া বসিল।।
চইলবার যায়া পড়িল বীর উষ্টা খায়া পায়।
দ্যাকে একজন কাটুরিয়া কাঠ নিয়া যায়।।

---

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃ: ৩৮৩

২. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাঁচি ও আরও কয়েকটি অলক্ষুণে চিহ্নের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ রাধিকাকে বাঁশী চুরির অপবাদ দিলে রাধিকা বলেছিলেন,

কোন আসুভখনে পাত্র বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁচি জিঠী উঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞোঁর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।।— বংশীখণ্ড

হাঁচি এবং শৃগালের কথা উভয় রচনাতে মিলে।

থাকো থাকো পাচ ডাক শুনিলো পাচোতে।
সামনেতে মরা এক পাইলো দেখিতে ॥
কুযাত্রা দেখিয়া বীর ভাবে মনে মনে।
ঘুরিয়া না আইসে তাই লজ্জায় কারোণে ॥[১]

পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'বীরনারায়ণের পালা'য় টিকটিকির ডাক ও মানুষের হাঁচিকে অশুভ চিহ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] 'রতন ঠাকুরের পালা'য় শুকনো ডালে কাকের ডাক ও ঘরে পেঁচার ডাককে কুলক্ষণ বলা হয়েছে।[৩] এটি ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন। 'ঋগ্বেদে' পেঁচার ডাককে মৃত্যুর লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪] 'রোমে পেঁচার ডাককে মৃত্যুর পূর্বাভাস বলা হয়েছে, অগাস্টাস ও সিজারের মৃত্যুর পূর্বে পেঁচার ডাকের বর্ণনা আছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পেঁচার ডাক হল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস।[৫] বাংলাদেশে পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন হলেও, ঘরে পেঁচার পতন বা প্রবেশ, রাত্রে পেঁচার ডাক ইত্যাদি ঘটনাকে অমঙ্গলজনক বলেই গণ্য করা হয়। নবজাত শিশুর উপর পেঁচার কুদৃষ্টি পড়লে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এরূপ ছেলেকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে। কাকের কোন কোন ডাক শুভ, কোন কোন ডাক অশুভ। কাকের এক ধরণের ডাকে গৃহে অতিথি বা প্রিয়জন আসে বলে লোকবিশ্বাস। কর্কশ ডাক দুঃসংবাদ বহন করে। রাত্রে কাকের ডাক অধিক অমঙ্গলজনক। মৃত্যুর পূর্ব-ঘোষণা বলে মনে করা হয়। গৃহের চারপাশে কাকের দল ঘুরাফিরা করলে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়।[৬]

পশুপাখির জগৎ মানবজগৎ থেকে স্বতন্ত্র। তাদের হাঁক-ডাক, চলাফেরা মানবজীবনের উপর কোন বাস্তব ছায়া ফেলে না সত্য, কিন্তু

১. লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮
২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯৩
৩. ঐ, পৃঃ ৩০৪
৪. লোকসাহিত্য, পৃঃ ২২ (ভূমিকা)।
৫. SDFML, Vol. 11, p. 838
৬. 'জ্যোতিষ-রত্নাকর' গ্রন্থে কাকের চার রকম ডাকের শুভাশুভ সম্বন্ধে চারটি অর্থের নির্দেশ আছে: কৃক কৃক কল্যাণজাত, কঃ কঃ রাজোপদ্রব, কর কং কর কং বন্ধু সাক্ষাৎ, কেতং কেতং রত্নহানি। লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৪ (ভূমিকা)।

লোক-সংস্কারে এসবের প্রভাবে বিশ্বাস করে। সংস্কার বিজ্ঞানের পথ ধরে চলে না। দুর্বল মন অমূলকভাবে তা বিশ্বাস করে এবং অমূলক ভাবেই তা লালন করে।

জ্যোতিষ গণনা

গ্রহ নক্ষত্র সংক্রান্ত আলোচনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়। ইংরাজীতে একে Astronomy বলা হয়। এটি গণিতবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আবার আকাশের জ্যোতিষ্কের অবস্থান লক্ষ্য করে মানবভাগ্যের শুভাশুভ নির্ণয় করার শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ বলা হয়।[১] ইংরেজীতে একে Astrology বলে। এ শ্রেণীর জ্যোতিষ বলতে দিনক্ষণ, বারতিথি, আবহাওয়া প্রভৃতি নৈসর্গিক এবং হস্তরেখা, ঠিকুজি, কুলজি প্রভৃতি মানবিক বিষয়ের আলোচনা, বাছবিচার, প্রথাপ্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝায়। লোক-সংস্কারে এর স্থান আছে গণজীবনে যার নানা প্রভাব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে যিনি জ্ঞান রাখেন তিনি জ্যোতিষী, সাধারণভাবে তিনি 'গণক' বা 'নচ্ছুন' নামে অভিহিত। গণক রাশিচক্র, জন্মলগ্ন, অদৃষ্টলিপি ইত্যাদি বিষয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন এবং মানবভাগ্যের শুভাশুভ নির্ণয় করতে পারেন। তিনি কেবল ভালমন্দ নির্ণয় ও ভবিষ্যদ্বাণী করেন না, এর অনুকূলে-প্রতিকূলে বিধিবিধানের নির্দেশও দিয়ে থাকেন। জ্যোতিষে যাদুবিশ্বাস ও মানব অভিজ্ঞতা দুই আছে। মানুষের দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন থেকে এর কোন কোন অংশ গড়ে উঠেছে। বাকী অংশ অনুমাননির্ভর। এজন্য তার ফলাফল অভ্রান্ত নয়। তথাপি সমাজজীবনে জ্যোতিষের প্রভাব গভীর। জ্যোতিষের ফলাফলের উপর বিশ্বাস করে মানুষ মানুষকে কঠোর পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছে এমন নজির লোক-রচনায় বিরল নয়।

বাংলাদেশে চাষবাস ও আবহাওয়া সম্পর্কে জ্যোতিষচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। খনার বচনগুলি এ উদ্দেশ্যেই রচিত। দ্বিতীয়তঃ গর্ভস্থ শিশুর পরিচয় নির্ণয়ে জ্যোতিষী গণনার রীতি আছে। তৃতীয়তঃ বিবাহাদি শুভকর্ম ও শুভযাত্রার দিনক্ষণ স্থির করা হয় জ্যোতিষী বিচার করে। চতুর্থতঃ আকস্মিক দুর্যোগ, দুর্বিপাক উপস্থিত হলে

১. বিশ্বকোষ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৭০

অথবা কোন কিছু হারিয়ে গেলে তার স্বরূপ নির্ধারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য জ্যোতিষের আশ্রয় নেওয়া হয়।

বর্তমান সমাজজীবনে জ্যোতিষের প্রভাব নগণ্য ; জনসাধারণ বরকনে নির্বাচনে কুলজি-ঠিকুজি বিচারে, লগ্ন নির্ণয়ে পঞ্জিকা পাঠে ও হস্তরেখা গণনায় এখনও বিশ্বাস করে বটে তবে সর্বত্র তেমন নিষ্ঠার সাথে পালন করে না। কিন্তু পূর্বকালে জ্যোতিষের ফলাফলে সমাজের সকল স্তরের লোকে বিশ্বাস করত ও তার চুলচেরা বিচার মানত। রাজ-রাজড়া সভাসদদের মধ্যে জ্যোতিষী রাখতেন। তিনি আপদবিপদে রাজাকে মন্ত্রণা দিতেন, ভবিষ্যদ্বাণী করে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলতেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে এ ব্যাপারে কিংবদন্তী আছে। লক্ষ্মণ সেন যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন জ্যোতিষিগণ ক্ষণতিথি বিচার করে বলেছিলেন, নির্দিষ্ট লগ্ন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে জন্ম হলে সন্তানের জীবননাশের সম্ভাবনা আছে, পরে জন্ম হলে তিনি আশি বছরের আয়ু নিয়ে রাজত্ব করবেন। অশুভলগ্ন রোধ করার জন্য গর্ভবতী মাতার পা উপরে বেঁধে নীচের দিকে মাথা রেখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে অশুভক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছিল বটে কিন্তু সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির প্রাণ বিয়োগ ঘটেছিল। লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন।[১] দিল্লীর রাজদরবারে জ্যোতিষীর প্রভাব ছিল বলে বার্নিয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধযাত্রা থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনের দৈনন্দিনের তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি কাজে জ্যোতিষের পরামর্শ নেওয়া হত। কথায় কথায় ও পদে পদে গণৎকারের প্রভাব দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন, "মনে হয় এ দেশের লোক জন্ম থেকে জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে।"[২] বলা বাহুল্য, জ্যোতিষ চর্চায় যাদুবিশ্বাসের 'আগম কথা' শাখার প্রভাব আছে।

১. লক্ষ্মণ সেনের ব্যক্তিগত জীবনে জ্যোতিষের প্রভাবের এসব তথ্য পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তাবাকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। মিনহাজ সেন রাজত্বের পতনের ন্যূনাধিক চল্লিশ বছর পর বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে মোট দুবছর (১২৪২-৪৪ খ্রী:) অবস্থান করে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য : **Elliot & Dowson ed.—History of India as told by its own Historians, vol. II.**

২. বিনয় ঘোষ অনূদিত—বাদশাহী আমল [মূল : ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত—**Travels in the Mugul Empire** ***(1656-1668 A. D.)***]

খনার বচনে[১] দিনকাল, মাসঋতুতে প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং তদনুপাতে চাষাবাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মূলতঃ ফলিত জ্যোতিষের বিষয়। দীর্ঘকাল ধরে সময় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠ নিয়ে এবং চাষাবাদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান রেখে তবে বচনগুলি রচিত হয়েছে, এর সঙ্গে বাস্তবতার অনেকখানি যোগ আছে। ঋতুতে ঋতুতে বাংলার প্রকৃতি যে মূর্তিতে সত্য, খনার বচন সে অনুপাতে অভ্রান্ত; ব্যতিক্রম ঘটলে জ্যোতিষ ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু মিথ্যা হয় না, কারণ প্রকৃতির নির্ভরতায় যে জ্যোতিষের উদ্ভব, প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে তার কার্যফলেরও প্রভেদ ঘটে।

বাংলাদেশে লোকপ্রচলিত খনার ও ডাকের বচন গুলিতে মানবভাগ্য, জন্মমৃত্যু, মাসফল, চাষবাস, শস্য-ফলন, বন্যা, বর্ষা, বৃষ্টি, মড়ক ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা যায়। যেমন হালচাষ সম্বন্ধে খনার একটি বচন:

পূর্ণিমায় অমায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ সর্বকাল॥
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত॥
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি॥[২]

খনার মতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হালচালনা করা নিষিদ্ধ। এতে গরুর বাত হয়। ব্যাধি হলে হালচাষ বন্ধ হয়, ঘরে ফসল আসে না। বর্ষা-বৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বচন:

শ্রাবণে বয় পূবে বায়।
হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়॥

---

১. বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধযুগের খনা নাম্নী কোন এক মহিলার রচনা খনার বচন নামে প্রচলিত। ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের সম্পদ হিসেবে লোকমুখে এগুলি চলে আসছে। ফলে এতে লোকচেতনার সংস্কার ধরা পড়ে।

২. সুশীলকুমার দে—বাংলার প্রবাদ, পৃঃ ৩৯৭

ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান।
কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ ।।
বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সেই বৎসর বর্ষা হয় ।।
ভাদুরে মেঘে পূবে বায়
সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায় ।।[১]

শ্রাবণ মাসে পূর্বমুখী বাতাস অনাবৃষ্টি এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঈশানমুখী বাতাস বৃষ্টির লক্ষণ। বাংলাদেশে মোসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ অনুমান অবাস্তব নয়, ববং ফলপ্রসূ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বার অনুযায়ী মাসের প্রথম দিন ভালমন্দ বহন করে। খনার বচনে এ সম্বন্ধে আছে,

মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার ।।
সোম শুক্র, গুরু আর।
পৃথ্বী সয় না শস্যের ভার ।।
পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ।।[২]

মধুমাস বা চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হলে সুবৃষ্টি, বুধবার হলে দুর্ভিক্ষ, সোম, শুক্র ও বৃহস্পতিবার হলে প্রচুর শস্য। উক্ত মাসে পাঁচটি শনিবার হলে মহামারী। বলা বাহুল্য, এর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নেই। সৌরমণ্ডলে গ্রহের অবস্থান হেতু ভূপৃষ্ঠে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে এবং তাকে কেন্দ্র করে অনিয়মিত বৃষ্টি, শস্যহানি এবং মড়কাদি হতে পারে, কিন্তু তা কোন বিশিষ্ট ভূখণ্ডে হলেও, সর্বত্র নয়। বাংলা খনার বচন, ডাকের বচন এদেশের প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে রচিত ; সুতরাং এগুলিতে এদেশের প্রাকৃতিক রহস্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, বিশ্বের নয়।

১. ঐ, পৃঃ ২৯৩
২. ঐ, পৃঃ ৩৯৬

দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা— এর এক এক প্রহর সম্বন্ধে মানুষের মনে সংস্কার আছে। 'সাত সকাল', 'ভর দুপুর', 'পাঁচ সন্ধ্যা,' অথবা 'নিষুতি রাত' প্রভৃতি প্রহরগুলি 'বারবেলা' হিসেবে বিবেচিত হয়। বারবেলায় শুভ কাজ বর্জনীয়।

সাত বারে সপ্তাহ। খ্রীস্টানদের কাছে রবিবার শুভদিন, শুক্রবার মুসলমানদের শুভদিন, এদেশে বৃহস্পতিবারকে 'লক্ষ্মীবার' বা 'গুরুবার' বলা হয়। এটি শুভদিন।[১] শনিবার অশুভ দিন। শনিবারে শনির প্রভাব অর্থাৎ দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকে। প্রবাদ আছে, 'শোনে ক্ষেতি বুধে ঘর। মাহুতে কয় না কর।'[২] অর্থাৎ শনিবারে বীজবপণ এবং বুধবারে ঘর নির্মাণ দোষের, মহৎ ব্যক্তি তা নিষেধ করেছেন। বুধবার আবার যাত্রার পক্ষে শুভদিন, যথা— 'মঙ্গলে উষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'[৩]

প্রহরের মত, বারের মত, মাস সম্বন্ধেও ভালমন্দের লৌকিক বিশ্বাস আছে। এক এক কাজের জন্য এক এক মাস উত্তম। কোন মাস কৃষিকাজে উত্তম, কোন মাস শিকারে উত্তম, কোন মাস বিদেশ যাত্রায় উত্তম, কোন মাস বিবাহের কাজে উত্তম— এ ব্যাপারেও বাছবিচার করা হয়। বিবাহের পক্ষে কোন মাস ভাল, কোন মাস মন্দ, মলুয়া গীতিতে তার উল্লেখ আছে। এতে শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বিবাহকার্য নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কেন নিষিদ্ধ তার কারণও বর্ণিত হয়েছে— শাস্ত্রমত, দেশাচার ও সংস্কার এর কারণ। কার্তিক ও মাঘ বিয়ের উত্তম মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৪] বিয়ের লগ্ন ঠিক করা হয় পঞ্জিকায় শুভক্ষণ দেখে। জন্মবারে বিয়ে নিষিদ্ধ।[৫]

জ্যোতিষের সাহায্যে গর্ভস্থ শিশু ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, তার ভাগ্য ভাল হবে কি মন্দ হবে, এ সম্বন্ধে গণনা করা হয়। একটি বচনে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

১. বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৭
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/৯৯ (ঢাকা), ১৯৬৩
৩. উদ্ধৃত: লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭ (ভূমিকা)।
৪. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৩
৫. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/৯৯ (ঢাকা), ১৯৬৩

বাণের পৃষ্ঠে বাণ।
পেটের ছেলে গণে আন॥
নামে মাসে করি এক
আটে হরে সন্তান দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারীর পুত্র জান॥
দুই চারি থাকে ছয়।
অবশ্য তার কন্যা হয়॥
যদি থাকে শূন্য সাত।
তবে নারীর গর্ভপাত॥[১]

অর্থ: বাণের পৃষ্ঠে বাণ অর্থ পঞ্চান্ন, গর্ভবতীর নামের অক্ষর-সংখ্যা ও গর্ভের মাস-সংখ্যা পঞ্চান্নের সহিত যোগ করে যে সমষ্টি হবে তাকে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে। যদি অবশিষ্ট এক, তিন বা পাঁচ হয় তবে সে গর্ভে পুত্র সন্তান হবে, আর যদি দুই, চার বা ছয় হয় তবে কন্যা সন্তান হবে। আর যদি সাত বা শূন্য হয় তবে গর্ভ নষ্ট হবে। নবজাতকের জন্মকালীন গ্রহফল দেখে সন্তান ও সন্তানের পিতামাতার ভালমন্দ, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি গনণা করার নির্দেশ খনার বচনে আছে। পিতামাতাব জন্মমৃত্যুর হিসাব পাওয়া যায় 'পিতৃরিষ্টি' ও 'মাতৃরিষ্টি'তে। পিতৃরিষ্টির বচনটি এরূপ:

লগ্নে পাপ সাতে পাপ
জন্মিলে মাত্র পীড়ে বাপ।
যদি শুভগ্রহ না দেখে লগ্নে
অবশ্য ইহাকে পোষে অন্যে।[২]

এর ভাবার্থ হল শিশুর জন্মকালীন লগ্নে ও সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করলে তার পিতা পীড়াগ্রস্ত হন এবং শুভগ্রহ কর্তৃক লগ্ন দৃষ্ট না হলে তবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মাতৃরিষ্টির বচন—

১. বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৪৭
২. ঐ, পৃঃ ৬৯

অলি চাপলগ্নে বৈশে ঘটে
গুরু শশী ষষ্ঠে
চাঁদের ষষ্ঠে পাপে মিলন
সপ্তম দিনে তার মাতৃমরণ।[১]

অর্থাৎ জন্মকালীন বৃশ্চিক, ধনু ও কুম্ভলগ্নে গুরু ও ষষ্ঠস্থানে যদি চন্দ্র থাকে এবং চন্দ্রের ষষ্ঠ স্থানে যদি পাপ-গ্রহ বাস করে তবে জন্মাবধি সপ্তম দিনের মধ্যে জাতকের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করা একটি সাধারণ রীতি। এ রীতি আজও অব্যাহত। হাতের রেখা গণনা করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে দেখা যায় 'চম্পাবতী' পালাগানে। খড়ি দিয়ে হাত গণনা করে সে দেখে গাজীর সাথে তার বিবাহের নির্দেশ আছে। সে এটাকে বিধিলিপি বলে মনে করেছে।[২] সন্নমালা (স্বর্ণমালা) পালাগানে আছে—স্বর্ণমালার জন্ম হলে পর রাজা জ্যোতিষী ডেকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানতে চান। গণকেরা রাজকন্যাকে অলক্ষুণে বলে ঘোষণা করে।

অলক্ষ্মীর অংশে জন্ম কৈন্যার শুন নরপতি।
ঐ কৈন্যার লাগ্যা তোমার নিবিব ঘরের বাতি॥
... ...
রাজভাণ্ডারের ধন রাজা ফুঁ যাইবে উড়ি।
দিনে দিনে অইবারে তুমি কড়ার ভিখারী॥[৩]

এই দুর্যোগের প্রতিকার স্বরূপ গণক রাজকন্যার বনবাসের নির্দেশ দেয়। রাজা স্বর্ণমালাকে বনবাসে দেন। এখানে ভাগ্য গণনার পদ্ধতির উল্লেখ নেই, কিন্তু খনার বচনে 'অদৃষ্ট গণনাচক্র' আছে এবং তদ্‌সঙ্গে আর্যাও আছে, জ্যোতিষিগণ চন্দ্র ও আর্যা পাঠ করে ভাগ্যফল নির্ণয় করে থাকেন।[৪]

---

১. ঐ, পৃঃ ৬৮
২. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৭৭
৪. বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৬১-৬৩

তন্ত্রমন্ত্র তথা যাদুবিদ্যার সাহায্যে ভূতভবিষ্যৎ বলা হয়। মন্ত্রে গণনা ওঝার কাজ, জ্যোতিষীর নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মন্ত্রগুণী ভূতভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তথ্য নির্দেশ করেছেন। বিশেষত: হারান জিনিসের তত্ত্বানুসন্ধানে গণকের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। চম্পাবতী পালাগানে আছে, রাজকুমার জুলহাস শিকারে গিয়ে অন্তর্ধান করলে পিতা সেকান্দর বাদশাহ গণকের সাহায্যে পুত্রের হদিস পান ; গণকেরা বলেন,

বাঁচিয়া আছে যে ব্যাটা পাতাল নগরে।
জংগো রাজার বেটিক তাঁই বিয়ে যে করিবে।[১]

গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, গৃহস্তের গরু বাছুর হারিয়ে গেলে গণক ডেকে 'ঠিক' দেখার ব্যবস্থা হয়। গণক মন্ত্রাচারের সাহায্যে হারান বস্তুর ঠিকানা বলে দিতে পারে। এখানে 'তেলেসমাতি' যাদুর প্রভাব আছে। সাধারণত: মাটিতে দাগ কেটে, নখে তেল মেখে ঠিক দেখা হয়। ঠাকুরমার ঝুলির 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী' গল্পে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ আঙুল গুণে দাগ কেটে ও মন্ত্র পড়ে রাজকন্যার হারান হার উদ্ধার করেন।[২] জ্যোতিষের সাহায্যে সুস্বপ্ন বা দু:স্বপ্নের ফলাফল জানার প্রথাও পূর্ব-কালে ছিল। রাজাবাদশারা অস্বাভাবিক কোন স্বপ্ন দেখলে গণক বা ব্রাহ্মণ ডেকে তার তাৎপর্য জানতে চাইতেন। জ্যোতিষ বিদ্যার সাহায্যে গণক তার ফলাফল ব্যাখ্যা করতেন।

জ্যোতিষের সাহায্যে জন্মমৃত্যু তথা আয়ুষ্কাল গণনা করার রীতিও আছে। গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী নিজ মহাজ্ঞানে দ্বারা পুত্র গোপীচন্দ্রের আঠার বছর বয়সে যে মৃত্যু হবে সে খবর পূর্বাহ্নে জানতে পেরেছিলেন। তিনি পুত্রকে দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও তপশ্চর্যা পালনে বাধ্য করেন। এতে বিধির বিধান খণ্ডিত হয়।[৩] জ্যোতিষের সাহায্যে মৃত্যুফল গণনার কথা

১. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯
২. দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত—ঠাকুরমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯ (২০শ সং)। 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী' গল্প দ্রষ্টব্য।
৩. গোপীচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য।

বচনে পাওয়া যায়।

তিন বুধ দুই মঙ্গল যবে বৈসে,
লিখিয়া দশ শূন্য যবে আইসে।
শনি রবি মঙ্গল বৎসরের গণনা,
সেই বৎসর মরণ বলে খনা।[১]

এর অর্থ, যে বছর সপ্ত শূন্য—চক্রে দশশূন্য পড়ে এবং তিন বুধ ও দুই মঙ্গল থাকে এবং ঐ বর্ষে ত্রিপাপ-চক্রে শনি রবি ও মঙ্গল এই গ্রহত্রয় অবস্থান করে তবে সে বছর তার মৃত্যু হবে। পরমায়ু গণনার কথাও বচনে আছে।

কিসের তিথি কিসের বার।
জন্ম নক্ষত্র কর সার ॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন।
পলকে আয়ু বারদিন ॥[২]

এর ভাবার্থ, যে নক্ষত্রে সন্তান ভূমিষ্ট হবে সে সময় হতে সেই নক্ষত্রের যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে তার প্রতি পলে বার দিন হিসেবে ধরে যত মাস বা যত বৎসর হবে ততকাল সেই শিশু জীবিত থাকবে।

নামকরণ

কতক নামকরণ বা নামোচ্চারণে বিধিনিষেধ মানা হয়। অকল্যাণ-কর কতকগুলি বস্তু বা প্রাণী আছে যাদের নাম সরাসরি উচ্চারণ করা হয় না, অন্য শব্দ দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করা হয়। যেমন গ্রামের লোক সাপ উচ্চারণ করে না, প্রতীক শব্দ দিয়ে তাকে বুঝান হয়। সাপের দুটি প্রতীক বা সাংকেতিক নাম—ময়মনসিংহে 'লতা' এবং রাজশাহীতে 'কাল'। 'সাপ দেখেছি' না বলে, বলা হয় 'লতা দেখেছি' বা 'কাল দেখেছি'। সাপ বিষধর জীব; সাপে কামড়ালে লোকে প্রায়ই বাঁচে না। সাপ-নাম এজন্য ভীতির সঞ্চার করে। নাম ধরে ডাকলে তার আগমন ঘটতে পারে। এজন্য ভিন্ন নাম দিয়ে

---

১. বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৭৮
২. ঐ, পৃঃ ৪০

ডাকতে হয়। এখানে সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাব আছে। কুষ্ঠ-ব্যাধিকে 'বড়রোগ' বা 'মহারোগ' বলা হয়। এ রোগের উপশম নেই, রোগীকে ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হয়। বংশ পরম্পরায় এ রোগের ধারা চলে। মলুয়া গীতে আছে, 'মহারোগীর বংশ বল্যা কন্যা দিতে নাই।'[১] অনুরূপ ভাবে বসন্ত রোগকে 'মায়ের দয়া' নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দু সমাজে শীতলা বসন্তের দেবী; তাঁর জন্যই এ-রোগ ছড়ায়: রোগ দূর করার ক্ষমতাও তাঁর। কারো বসন্ত হলে, বলা হয় মায়ের দয়া হয়েছে। রোগের নাম সরাসরি নিলে শীতলার কোপ বাড়তে পারে, এরূপই অলৌকিক ভীতি আছে। শিশুর গায়ে হাম হলে বলা হয় 'মাসীপিসী' বেরিয়েছে।[২] উদ্দেশ্য একই—শুভ ও শোভন নাম দিয়ে অশুভ ও অকল্যাণকে ঠেকানো। মুসলমানের কাছে শূকর হারাম। তাঁরা একে 'দাঁতাল' বা 'খবিস' বলে। জীন-ভূত প্রভৃতি অশরীরী আত্মা মানুষের ক্ষতি করে। এগুলিকে প্রতীক ভাষায় 'হাওয়া-বাতাস' বলে। জীন-ভূত নাম করলে তারা কুপিত হয়ে ক্ষতি করতে পারে। হলুদের নাম সরাসরি করা হয় না, এর পরিবর্তে 'বন্নো' (∠বর্ণ) বলা হয়। এতে পয় খারাপ হয় বলে লৌকিক বিশ্বাস।[৩] রাত্রি বেলা চূণ ও খয়ের উচ্চারণ নিষিদ্ধ, 'সাদা' ও 'রঙ' বলে বস্তু দুটিকে বুঝান হয়। চুনের 'পান খাউনি' নামও প্রচলিত আছে।[৪] এগুলি মূলতঃ ট্যাবু যা সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাব থেকে উদ্ভূত।

সন্তান-সন্ততির নামকরণে হীনার্থক, ঘৃণার্থক অথবা তুচ্ছার্থক শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন দুঃখ, পচা, তিতা, ঝাটন, গুইয়া, গোবরা প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "যে সব মায়ের ছেলে আঁতুড়ে মারা যায়, তাদের ছেলেদের নাকি বিশ্রী নাম রাখলে যমে ছোঁয় না। তাই এই রকম নামকরণ করা হয়। এই রকম মায়ের ছেলে হলে কখন কখন কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আসলে বেচা নয়,

---

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৩
২. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭
৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপুর), ১৯৬৭,
৪. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৷৵. (ভূমিকা)।

কেবল যমকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বেচা। এই সকল ছেলের নাম হয় এককড়ি, তিনকড়ি পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি।"[১]

এটি বিপরীত যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ঘৃণা দিয়ে, অনাদর দিয়ে অশুভকে প্রতিহত করা হয়। যম-ভূতাদি অপ্রাকৃত প্রেতাত্মারা তুচ্ছ বা অশুচি বস্তু স্পর্শ করে না। উইলিয়ম ক্রুক বলেছেন, শিশুর গুপ্তনাম দিয়ে প্রেতাত্মীর প্রভাব থেকে শিশুকে রক্ষা করা হয়।[২]

কোন কিছু যখন ওজন করা হয়, তখন প্রথম পাল্লার মাপকে 'এক' না বলে, বলা হয় 'রাম' অথবা 'বরকত'। পরের মাপগুলি সংখ্যা দিয়েই গণনা করা হয়। পরিমাপের ক্ষেত্রে এক সংখ্যা স্বল্পার্থে অশুভসূচক। বাড়তি বা লাভের আশায় শুভ শব্দ রাম, বরকত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এটিও সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত। গৃহের বাইরে পা বাড়ালে পদে পদে বিপদ, তাই যাত্রার মুহূর্ত শুভ হোক এবং নির্বিঘ্নে গৃহে ফিরে আসুক—এরূপ কামনা একান্ত হয়ে উঠে। প্রাচীনকালে দূরের যাত্রা বিপদসংকুল ছিল, প্রায় জীবন বিপন্ন হত। এজন্য যাত্রাকালে 'বিদায়' শব্দটি অশুভসূচক ছিল। 'মিলন' শব্দ দিয়ে বিদায়কে বুঝান হত, বলা হত 'মেলানি'। 'মেলা দেওয়া' অর্থ হল যাত্রা করা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। সামাজিক জীবনবোধের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় ধারণা এর মধ্যে নিহিত আছে।

বশীকরণ

অপরকে ইচ্ছার অনুকূলে বা স্ববশে আনার নাম বশীকরণ। বশীকরণের মন্ত্র এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল মন্ত্র পাঠ বা জপ করে বশে আনা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে আচারও পালন করতে হয়। স্ত্রী স্বামীকে, পুরুষ নারীকে, অথবা শত্রু শত্রুকে বশ করার জন্য যাদুক্রিয়া বা 'দারুটোনা'র[৩] আশ্রয় নিয়ে

১. লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৯ (ভূমিকা)।

২. Natives of Northern India, p. 262

৩. ফারসী 'দারু' শব্দের অর্থ মদ বা ঔষধ, 'টোনা' বন্ধনী বা আবরণ। যেমন কলুর বলদের চোখের অথবা মাড়নের গরুর মুখের জন্য ব্যবহৃত জালের টোনা। এ থেকে দারুটোনার অর্থ দাঁড়ায় মন্ত্রৌষধিতে মোহাবদ্ধ। কাউকে দারুটোনা করা হয়েছে বললে বুঝায় মন্ত্রের সাহায্যে বশীভূত করা হয়েছে।

থাকে। যে ব্যক্তি বশ করতে চায় সে নিজে অথবা গুণীর সাহায্যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। দারুটোনার সাহায্যে নরনারীকে বশ করার রীতি পদ্ধতির একটি বর্ণনা পাওয়া যায় 'নছুর মালুম' গীতিকায়।

শনি মঙ্গলবারে যদি অমাবস্যা পায়।
গাছের হিঁয়র তুলে আনি অসুদ বানায়॥
যুবতী নারীর লাগে ঝোঁড়ার আগার চুল।
আর লাগে বাসি বিয়ার মুকুটের ফুল॥
আঙ্গুলের নোক আর অঞ্চলের কোণা।
এসব জিনিষ দিয়া করে দারুটোনা॥[১]

এখানে মন্ত্রের প্রয়োগের কাল শনি বা মঙ্গলবারের অমাবস্যার রাত্রি। বাংলার লোক-বিশ্বাসে বারের মধ্যে মঙ্গলবার ও শনিবার এবং তিথির মধ্যে অমাবস্যা কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।[২] উপরের উক্তিটিতে বশীকরণের ছবি আছে। গাছের শিকড়, নারীর মাথার চুল, মুকুটের ফুল, হাতের নখ ও শাড়ির কোণা—এ কয়টি মন্ত্রপূত করার দ্রব্য। শিকড় কোন গাছের তার উল্লেখ নেই। চুল, নখ, কাপড়ের টুকরা যাকে বশীভূত করা হবে তারই হওয়া আবশ্যক। নছুর মালুম পালাটি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। উত্তরবঙ্গে নারীকে বশ বা গুণ করার প্রায় অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। বিয়ের কনের গায়ে-মাখা হলুদ, হলুদ-মাখা শাড়ি, সদ্য কাটা নখ, চুল, গায়ের ময়লা ইত্যাদি দিয়ে তাকে গুণ করা যায়।[৩] এটা সংক্রামক যাদুবিদ্যার দৃষ্টান্ত। উক্ত পালাগানে 'তেলপড়া'র সাহায্যেও নারী বশ করার চিত্র আছে। এতে প্রয়োজন ঘানির প্রথম 'সাতফোটা' সরিষার তেল। বুধা গুণী শনিবারে এ তেল পড়ে দিলে এসহাক তা মুখে মেখে আমিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়।[৪] বুধা গুণীর মন্ত্রপূত তাবিজও নারী-পুরুষকে বশীভূত করতে পারে।

---

১. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১১
২. গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ৪৩৬ (টীকা)।
৩. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৫-৩৬
৪. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩

বুধা গুণীর দোয়া তাবিজ অচানক দাবাই ॥
পুরুষ দেবানা হয়, নারী ছাড়ে ঘর।
পররে আপন করে আপনারে পর ॥[১]

'কমলা'র পালাগানে 'তেলপড়া' ও 'পানপড়া'র সাহায্যে নারীকে বশ করার চিত্র পাওয়া যায়। চিকন গোয়ালিনী এখানে মন্ত্রজ্ঞানী। কারকুন তার সাহায্য নিয়ে কমলাকে বশীভূত করতে চেয়েছিল। তেলপড়া, পানপড়া ছাড়া বড়িপড়া মন্ত্রও চিকন গোয়ালিনী জানে যা অব্যর্থ ঔষধ। পল্লীকবি লিখেছেন,

আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
গিরধনির কানে আর কালপনা মাছে ॥
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পরিমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া ॥
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ খুরি কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী ॥
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে ॥[২]

মন্ত্রের বড়ি তৈরি করার উপকরণ তিনটি— গৃধিনীর কান, কালপনা মাছ ও পেঁচার মাংস। এগুলি দুষ্প্রাপ্য উপকরণ। গৃধিনী ও পেঁচা অশুভ পাখি বলে লোক-সংস্কার আছে।

ঝাড়-ফুঁক

সাধারণতঃ চিকিৎসার কাজে ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা হয়। টোটকা চিকিৎসায় ক্রিয়া আছে, মন্ত্র নেই ; ঝাড়-ফুঁকে মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠান উভয় বিদ্যমান। অর্থাৎ মন্ত্র পড়ে এবং তৎসঙ্গে কিছু লৌকিক আচার পালন করে রোগীর উপশমের চেষ্টা করা হয়। ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে ঝাড়া হয় না, দোয়া-দরুদ পড়ে রোগীকে ফুঁক দেওয়া হয় বটে তবে তাবিজ কবচ, গাছগাছালি প্রভৃতি তুকতাকই সেক্ষেত্রে লৌকিক চিকিৎসা।

---

১. ঐ, পৃঃ ১১
২. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ১২৪ (৩য় সং)।

কোন বিষাক্ত কীটে দংশন করলে অথবা ভূত-প্রেত, ডাইনী প্রভৃতি দেহে আসর করলে, কুস্বপ্ন বা বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয় পেলে ঝাড়-মন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণভাবে বিষঝাড়া ও ভূতঝাড়া নামেই তা পরিচিত। দেহের কোন অঙ্গে ঘা-ঘসড়া বা অন্য ব্যাধি হলেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়, যেমন ঘাঝাড়া, পেটঝাড়া, মাথাঝাড়া, চোখঝাড়া, বাত-ঝাড়া ইত্যাদি।

সাপ, বোলতা, শিঙ্গিমাছ, কুকুর, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীতে কাটলে বা কামড়ালে দেহে বিষ লাগে। সাপের বিষে রোগী প্রায়ই মারা যায়। বোলতা, বিছা, ভিমরুল, মাকড়সা, কাঁকড়া ইত্যাদি কীটে কাটলে রোগী কষ্ট পায়। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়। বাঘের কামড়ে বা নখরের আঁচড়ে রোগীর প্রাণ সংশয়াপন্ন হয়। এসব আপদ-বিপদে ওঝা বা গুণী ডেকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। মন্ত্র পড়ে ও আচার পালন করে সাপের বিষ ঝাড়ার রীতি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। কাউকে সাপে কাটলে ওঝা এসে প্রথমে রোগীর চোখে মুখে বুকে ফুঁ দেয়। ফুঁকের একটি মন্ত্র এরূপ :

লাউ লতা ঘাওলি খা মুখে।
মুখে যাহার সূর্যের রেখা।
সুন্দরিয়া বোড়ায় খায় জল।
থাক জলে বোরা
জলে তোমার আহার
তাহারও কামড়ে কাহারও নাহিক নিস্তার।
এতো বোড়ার নাম জাপি
কত কব বাপি।
মা পদ্মার স্মরণে
বিষ তোরে করবো পানি।[১] —ফরিদপুর

তারপর রোগীর ক্ষতস্থানের উপরে বাঁধন দেয়। বন্ধনের মন্ত্র এরূপ :

ধন্নী বাঁধন ধন্নী বাঁধন
লখাইর মায় জোরে কাঁদন।

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (ফরিদপুর), ১৯৬২

এই বিষ না মাথায় খায়
ঠাঁয়ের বিষ রয় ঠাঁয়।
বাপ ভাতারী বাঁধন ধর
বিষ না যেন দেয় লড়।[১]

এরপর শুরু হয় ঝাড়মন্ত্র। ঝাড়মন্ত্রের নানা পদ্ধতি— পানিঝাড়া, ফুলঝাড়া, গাছ্‌ঝাড়া, গামছাঝাড়া, হাতঝাড়া, মুরলীঝাড়া ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে ক্রিয়ানুষ্ঠানও চলতে থাকে। বিষক্ষরণ এর মূল লক্ষ্য। মন্ত্র যাজ্ঞা করে না, জোর করে, দাবী করে। মন্ত্র হল ইচ্ছাশক্তি যা অবশ্যই ফলবে—'a wish which must without fail be fulfilled.'[২] এ জন্য মন্ত্রের শ্লোকে প্রার্থনার সুর নেই, দোহাই-এর সুর আছে। দোহাই-এর মধ্যে শ্লীল-অশ্লীলের বালাই নেই। দেবদেবী বা কোন মহাপুরুষের নামে অশ্লীল কটূক্তি করা হয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, দোহাই-এর ভাষায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিষক্রিয়া বিনষ্ট করবেন।[৩] এখানে যাদুর যে প্রভাব আছে তা বিপরীত যাদুবিদ্যার মধ্যে পড়ে। বিষ ঝাড়ার যাদুক্রিয়া প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য তা শুক্ল ইন্দ্রজাল।[৪] লক্ষণীয় যে, মন্ত্রের মধ্যেই যাদুশক্তি আছে। সুতরাং মন্ত্র ছাড়া ক্রিয়ানুষ্ঠান নিরর্থক। সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র নিম্নরূপ :

ওরে ওরে কালিয়া তোর বিষ মারিব আমি।
ক্ষুরে ক্ষুরে ধরিয়া নরুণে কাটিয়া ক্ষেধারি বিষ ॥
মানিক্য বরণ, কাজলী কাজলী বরণ, দুই চক্ষু রুই বরণ।
নাই কাণ্ডারী পদ্মামায়ের ভার ॥
আরে বিষ তুই নিজ ঝরে ঝাড়, নিজ ঝরে ঝাড়।
কি জানি কি জানি সম্মুখে বারিয়া দিলাম সাগরের পানি ॥
ইহা শুনিয়া গঙ্গা বলে ইস।
পানিতে ডুবিয়া মইল কালকূট বিষ।[৫] —ফরিদপুর

১. বাতায়ন, পৃঃ ১২৯
২. উদ্ধৃতি গৃহীত : লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৬৮
৩. এদেশের লৌকিক-পৌরাণিক বিশ্বাসে 'মনসা' সর্প দেবী তাই অধিকাংশ সাপের বিষঝাড়া মন্ত্রে মনসাদেবীর উল্লেখ আছে।
৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০
৫. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (ফরিদপুর), ১৯৬২

এখানে মন্ত্রের ভাষা প্রত্যক্ষ, জোরাল এবং ঝাঁঝাল। বিষের দেবীকে ভয় দেখান হয়েছে; ভয়কে ভয় দিয়ে তাড়ান যা লোকতত্ত্বের terrifying motif, এখানে সেই মনোভাব ক্রিয়া করেছে।

হাত চালিয়ে বিষনামানোর মন্ত্র আছে। মন্ত্রের গুণে রোগীর দেহে হাত চালিয়ে বিষ নামান হয়। বিষ নামানোর আচারে ফুঁ-মন্ত্র হোক বা কোন দ্রব্য চালনা হোক দেহের উপর দিক থেকে নীচের দিকে টানা হয়। বিষ উপরের দিকে উঠে, মাথায় গেলে মূর্চ্ছা ও মৃত্যু ঘটে। সেজন্য বিষকে ঝেড়ে নীচের দিকে নামান হয়, পদতল বা ক্ষতস্থান দিয়ে বিষ বেরিয়ে যায়। হাত চালান মন্ত্রের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

হিংলার পর্বতে হিংলার অক্ষ।
শিবের বাপে ঝিয়ে দুইজনে যার গক্ষ॥
কালিয় নাগে দিচ্ছে ঘা।
হাড় পাঁজর ছাড়িয়া বিষ তুই পাতাল পুবে ধা॥
লাউয়া টেপা গুইয়া বোরা সর্পনাগিনা।
কোন নাগে দিচ্ছ ঘা কাহারও না জানি॥

আমি বিষ ভস্ম কবিয়া মারিলাম।
ছাপায়কুটি বোরার বিষ।
আয় বিষ আয়
খেউকা বোরার বিষ হাতের পৌছনে আয়।[১] —ফরিদপুর

ডোর বা সুতার সাহায্যে বিষ নামানোর রীতিও দেখা যায়। এতে সংক্রামক যাদুবিদ্যার ক্রিয়া আছে। সুতা সাপের প্রতীক বা নকল। মন্ত্রশক্তিতে বিষকে সুতার মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়।

কালিরে কালিরা কালকুটো কাজলমুখা
আগে নামে কালকুটা নাগের বিষ।
পিছে ভাঙে ধুরা খেজ্জা খেজ দ্যাস।

---

১. ঐ।

কালকুটো নাগের বিষ উভনালে ধায়
মনোষার স্মরণে বিষ ডোরের মধ্যে আয়।[১]

চালুনঝাড়া ও পলাঝাড়ার সাহায্যে সাপের বিষ নামানোর উল্লেখ পাই 'মানজুর মা' পালাগানে। জামালদি ফকিরকে সাপে কামড়ালে মণির ওঝা রোগীকে উক্ত ঝাড়মন্ত্রে সুস্থ করার চেষ্টা করে।[২]

বিছার লোম, বোলতার হুল, শিঙ্গির কাঁটার বিষেও মানুষ কাতর হয়। তখনও ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা হয়। বোলতার বিষঝাড়া একটি মন্ত্রে আল্লা-রসুলের দোহাই দেওয়া হয়েছে। সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রের মত এতেও জোর-দাবী আছে।

হে বোল্লা তুমি অমুককে খেয়্যাছ
তা আমি জানি।
কুড়ুম বিষ নাঞী কুড়ুম বিষ নাঞী।
ওঁ বাচ ইছাতে হেঁটে দলদল উপরে আসমান।
নাঞী বিষ খোদা প্রমাণ।
হে খোদা কি হল্যো বিষের জ্বালা।
চড়চাপড়ে বিষ তুঞী উড়িয়া পালা।
খোদা গুরু আদম শিষ্যি মহাম্মদের আজ্ঞা।
অমুকের নির্বিষ নাঞী বিষ মহাম্মদের আজ্ঞা।[৩]

রোগীকে চাপড় বা থাবা মেরে বিষ ঝাড়া হয়। এখানে বিপরীত যাদু-বিদ্যার প্রভাবটি গালিগালাজ করে বা ভূয়া ভয় দেখিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে ক্রিয়া করে বিষক্রিয়া নিরোধ করা হয়। শিঙ্গিমাছের বিষ ঝাড়া মন্ত্র বেশ সরল। ভাষার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ আছে, কিন্তু জোরজবরদস্তি নেই। খুব সম্ভব, মাছের বিষ তত মারাত্মক নয় বলে ভাষাতে রূঢ়তা ও অশ্লীলতা আসেনি। রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি মন্ত্র এরূপ :

১. ঐ।
২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫
৩. শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—পুঁথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২

শিঙ্গি বিঙ্গি চোখের মুড়ি
কোঠে পালু তুই বিষের হাঁড়ি।
বিষের হাঁড়ি পায়া
শিঙ্গি গেলো ধায়া।
আগে যায় গরু পিছে যায় শিষ
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া নামাও কেছুয়া শিঙ্গির বিষ।[১]

ভূতঝাড়ার মন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত। জীন-পরী, ভূত-প্রেত অলৌকিক ও অশরীরী আত্মা যেখানে সেখানে যাতায়াত করতে পারে, মানুষের ক্ষতি করাই এদের কাজ; শিশু ও নারীদের উপর এদের দৌরাত্ম্য বেশী। পূজাবেদী, পোড়োবাড়ি, গোরস্থান, শ্মশানভূমি, শেওড়াতলা ইত্যাদি নির্জন স্থানে ভরাদুপুর, কাকসন্ধ্যা বা নিষুতিরাতে ভূত-প্রেতের প্রকোপ পড়ে। একা পেলেই এরা আক্রমণ করে; দেহে আসর করে রোগীর মনে ও দেহে বিকার সৃষ্টি করে। তখন ওঝাকে ডাকা হয়। সে ঝাড়মন্ত্রাদি পড়ে চিকিৎসা করে। ভূতঝাড়ার মন্ত্রের কথাগুলি বেশ উদ্দাম ও স্পর্ধিত। সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রের মত এতে দেবদেবী, আল্লা-রসুল এমনকি পীর-দরবেশদের দোহাই দিতে দেখা যায়। ধর্ম-গুরুর দোহাই দিয়ে ভূতঝাড়ার একটি মন্ত্র এরূপ :

খাকি মা বসু মাতা, তুমি বর বীর
দানবদূত পদতলে থুইয়া আমি হইলাম স্থির।
বাপ নরসিংসিদ্ধি গুরু ওমাদেবী ওমা
ছয় কাড়ি ছয় দানব দূত লইয়া শিঘ্রই চইলে যা।
আগে পিছে চলে দানব করে মোরামুরি
নীলদূত স্বর্গে লইয়া স্বর্গে লাগায় ডালি।
ডাক ডাকিনী নাচ, পেচাপেচী ফিরিয়া চাও
মনের কথা কহিয়া যাও।
যদি অমুকের অঙ্গে ফিরিয়া চাও
দোহাই ধর্মগুরুর মাথা খাও।[২] —ফরিদপুর

---

১. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৯
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪, ১৯৬২

এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী ও ডাকডাকিনীর উল্লেখ আছে। বিষনাগান, ভূততাড়ান ও বশীকরণ মন্ত্রে এদেশীয় তান্ত্রিক আচারের প্রভাব আছে।[১] ইসলামী ভাবধারায় ও ভাষাভঙ্গিতে ভূতঝাড়ার মন্ত্র পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে।

আদ্যচন্দ্র গুরুমুখে জান অনুমানচন্দ্র।
রাখিলে প্রাণ গরলচন্দ্র ভক্ষণক গোরখনাতে।
উদ্রচন্দ্র পিণ্ডারসার করিলে দিননাতে।
শাহাদাৎ কলেমা শাহা নাম ধ্বনি শাহাদাৎ কলেমা।
মোর ফলনার পিণ্ডাব সরিলের সার।
শাহাদাৎ কলেমা দিয়া খেদেরা মার দইব।
দানভূত পিশাষ বাগ বুড়ি সোমান মান শ্মশান।
চড়কা মড়কা চোর চোঠটা অন্তর ধেয়ান।
চাইর চন্দ্র কথা জেবা নরে জানে, থাউক।
বইল দেও দেবতা, চারি ফেরেশতা মান্যি করে।
হা হাক্কা মাব ধাক্কা।[২]

এখানে 'কলেমা শাহাদত' ও 'চার ফেরেশতা'র উল্লেখ ইসলামের প্রভাব থেকে এসেছে। 'চারিচন্দ্র' হিন্দু যোগতন্ত্রের বিষয়। 'গোরখনাত' নাথদেবতা ; দানব, ভূত, পিশাচ, দেও প্রভৃতি হিন্দু প্রাচীন অলৌকিক প্রেতাত্মার নাম। বাংলার লোকজীবনে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়কালে এ ধরণের মন্ত্র প্রচার লাভ করেছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবের প্রাধান্য থেকে অনুমিত হয়, মন্ত্রগুলি পূর্বকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, পরে স্থানে স্থানে দু'একটি আরবী-ফারসী নাম, শব্দ অথবা বাক্য দ্বারা ইসলামী আবরণ দেওয়া হয়েছে। ধর্মান্তরিত মুসলমান ওঝাদের দ্বারা এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

অসুখ-বিসুখেও ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র আছে। রোগব্যাধি ঝাড়া মন্ত্র স্পষ্ট, প্রত্যক্ষও প্রতিস্পর্ধী। এখানেও শক্তিশালী ব্যক্তির দোহাই কিংবা বস্তুর

---

১. পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯ (ভূমিকা)।
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৭

উপযায় ব্যাধি তাড়ানোর ভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকচেতনায় এক একটা ব্যাধির পেছনে এক একজন অপদেবতার কল্পনা করা হয়। অপদেবতা বা দৈবশক্তির অভিশাপ থেকে দেহকে মুক্ত করতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। শীতলা, ওলা, শনি প্রভৃতি বসন্ত, কলেরা, মড়ক ও অমঙ্গলের দেবতা। মানবদেহকে এদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারলে অসুখ দূরীভূত হয়। মন্ত্র দ্বারা এসব অপদেবতাকে তাড়াতে হয়। ইসলামী ভাবধারায় রচিত একটি রোগঝাড়া মন্ত্র :

ওহে ওহে জিবরিল কি কর বসিয়া।
আল্লার আলংকো দোহে দেখনা আসিয়া।
এই রোগীর অঙ্গে চৌষট্টি ব্যাধি
আপত বালাই করে যাও পানি।
মুণ্ডে থাকে, মুণ্ডের থেকে ছাড়,
হাড়ে থাকে, হাড়ের থেকে ছাড়,
নাড়ে থাকে, নাড়ের থেকে ছাড়।
বত্রিশ পাঁজর ছাড়িয়া হুঙ্কার দিয়া
পড় গিয়া লঙ্কার দ্বার।
লঙ্কার দ্বারের থেকে করতে আস যা
ওস্তাদ পীরের মাথা খা।[১] —ফরিদপুর

চোখ-উঠা, লাল-হওয়া, পানি-ঝরা প্রভৃতি ব্যাধিতে চোখঝাড়া মন্ত্র আছে। রংপুর থেকে সংগৃহীত হিন্দু ঐতিহ্য-আশ্রিত চোখঝাড়া মন্ত্রের একটি নিদর্শন :

নদীর পারেতে যবে জানকী যাইল,
সেই সনে চক্ষুশূল তাহার জন্মিল।
যন্ত্রণায় অস্থির সীতা করেন রোদন
রামচন্দ্র বেদনা তার করেন নিবারণ।[২] —রংপুর

টোটকা চিকিৎসা

টোটকা চিকিৎসা কোন বিজ্ঞানের বিষয় নয়। নিতান্ত লৌকিক উপায়ে কতক বিধিবিধানের নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। লোক মনস্তত্ত্বের বিচারে

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪, ১৯৬২
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৩

যাদুবিদ্যাই এর উৎসমূল। যাদু বস্তুগুণকে স্বীকার করে আবার বস্তুগুণের অতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপে ও কার্যফলে আস্থা রাখে। টোটকা চিকিৎসার কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর গুণধর্মের প্রভাব থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার লক্ষণ থাকে না; তখন যাদুগুণের মধ্যে অর্থসূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। টোটকার কার্যকারিতা তুকতাকের মত, কিন্তু এর ঔষধ মন্ত্রপূত নয়। তুকতাকে মন্ত্রৌষধি ব্যবহৃত হয়। কবিরাজী চিকিৎসার মত এতে গাছ্-গাছড়ার ব্যবহার আছে। তবে এর কোনটাই সেব্য নয়, এমন কি লেপ্য নয়; তাবিজ-মাদুলীর ন্যায় টোটকার ঔষধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধারণ করা হয়।

দাঁতের বেদনা হলে ডালিম গাছের শিকড় যে পাশে বেদনা সে পাশের কানের সাথে সূতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; এতে বেদনার উপশম হয়। হাতের কব্জিতে ব্যথা হলে এক গাছি 'কাল সূতা' এঁটে বেঁধে দেওয়া হয়। সূতা বাঁধার উপকারিতা বাস্তব—শিরা-উপশিরার টানে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ব্যথার উপশম হওয়া স্বাভাবিক। এখানে সংস্কারটা আছে কাল সূতার ক্ষেত্রে, অন্য রঙের সূতায় এ উপকার হয় না বলে লোকের বিশ্বাস। গায়ে ঘামাচি হলে শ্যামলতার মালা গলায় পড়া হয়। লোকের বিশ্বাস, লতা যেমন শুকাবে ঘামাচিও তেমনি শুকাবে। শ্যামলতার সাথে ঘামাচির সম্পর্ক নেই। এতে সদৃশ যাদুবিদ্যার ধর্ম আছে।

গলায় ব্যথা হলে কলার শুকনো ছাল বেঁধে দেওয়া হয়। কেউ বাঁধার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে তা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। এতে গলার ব্যথা যে জিজ্ঞাসা করেছে তার গলায় চলে যায়। এটি সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত। 'আধ-কপালি' হলে কপালের যে দিকে ব্যথা সে দিকের চুলে মিষ্টি কুমড়োর শুকনো ডাঁটা বেঁধে দিলে বেদনা সেরে যায়।

চোখে 'টুসি পোকা' হলে ভোরবেলায় মুখ না ধুয়েই একগাছা দূর্বা দিয়ে চোখের দু-পাতা ঘষতে হয়। একটি কলাপাতা নীচে ধরে, টুসি পোকা পড়ল কিনা তা পরখ করার জন্য। অতি ক্ষুদ্রাকার সাদা পোকা পড়ে কলাপাতায় নড়াচড়া করে, তা খালি চোখেই দেখা যায়।

হাত-পায়ে ঘা-ঘসর হয়ে নখের আঁচড়ে বা অন্যভাবে 'তেলবিষ' (সেপ্টিক) লাগলে হুকার বাসি পানি ও ঘুঁটার ছাই একত্রে মিশিয়ে এক গাছা চুল দিয়ে ঘাটা বার-কয়েক মুছে নিতে হয়। সকাল বেলা এরূপ করতে হয়। এতে তেলবিষ দূর হয়। ঘা দীর্ঘদিন ধরে ভাল না হলে হাতে-পায়ে চুল অথবা কাল সূতায় কড়ি পড়তে দেখা যায়। এটা শত্রুর মন্ত্রবাণ এড়ানোর জন্য করা হয়।

কতক টোটকা চিকিৎসায় ঔষধের ব্যবহার নেই, কেবল লৌকিক ক্রিয়া পালন করতে হয়। কুকুরে কামড়ালে রোগীকে তৎক্ষণাৎ সাতটি মাস-কলাই সাতটি পাতকূয়ায় নিক্ষেপ করতে হয়। এতে রোগের ভয় থাকে না। রাত্রে শোয়ার কারণে ঘাড়ে ব্যথা হলে ব্যবহৃত বালিশ রোদে দিতে হয়। এতে বেদনা সারে। গোয়াল ঘরে গরুর খুঁটায় সাত দিন ধরে পেট ঘষলে পেটের 'পিলাই' (<প্লীহা) সারে।[১] মায়ের আঁচল লেগে ছেলে শুকিয়ে গেলে 'কাল গাভী'র কাঁচা দুধে পানি মিশিয়ে তাকে স্নান করালে উক্ত দোষ দূর হয়।

প্রসব বেদনা কালে গর্ভবতীর চুলে 'ধান-পোকা' দিলে সহজে ও তাড়াতাড়ি প্রসব হয়।[২] নষ্টগর্ভা রমণীর পেটের মাঝে 'আষাঢ়িয়া নাইল্যার পাটে'র একটা খোয়ায় একুশটা গিরা দিয়ে বেঁধে দিলে আর গর্ভ নষ্ট হয় না।[৩]

তুকতাক

টোটকার মত তুকতাক লৌকিক চিকিৎসার বিষয়। মন্ত্রপূত তাবিজাদি ধারণ অথবা খাদ্যদ্রব্য বা গাছগাছালি ভক্ষণ বা লেপনকে তুকতাকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যাদুগুণই তুকতাকের চিকিৎসার মূলশক্তি। যাদুমন্ত্রের ক্ষেত্রে সব সময় কিছু বিধিনিষেধ, সতর্কতা, গোপনীয়তা পালন করতে হয়। মন্ত্রপূত বস্তুর নির্বাচন, সংগ্রহ ও সেবনের কাজে সময়ের নির্দিষ্টতা ও রোগীর আচরণে বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হয়। তুকতাকের চিকিৎসক

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপুর), ১৯৬৭
২. ঐ, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫
৩. ঐ, খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫

কোন পেশাদার ওঝা অথবা হাতুড়ে কবিরাজ, পীরফকির, সাধুসন্ন্যাসী হতে পারে। নদের চাঁদের জ্বর হলে তার চিকিৎসার জন্য ভগ্ন মন্দিরে অবস্থানরত এক জটাজুট সন্ন্যাসী মহুয়াকে ঔষধ সংগ্রহে যে নির্দেশ দিয়েছিল তুকতাকের চিকিৎসার তা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্বাসেতে ধরিয়া পাতা আন নদীর পানি।
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরানি ॥[১]

গাছের পাতা হাতে নিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে নদীর পানি আনলে তবে ঔষধ মন্ত্রপূত করা হয়, তাতে ব্যাধি সারে। অন্যথায় ঔষধ কার্যকরী হয় না। অন্যত্র সন্ন্যাসী মহুয়াকে শনিবারের পূর্ণিমা রাত্রে গভীর বন থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতে বলেছে।[২] উমর খাঁর অসুখে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান এক ফকিরের ছদ্মবেশে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে তুকতাকের চিকিৎসার লক্ষণ আছে। মন্ত্রপূত পানি ও তাবিজ এখানের ঔষধের সামগ্রী। মন্ত্রের পানি যে কোন স্থানের হলে চলে না ; 'তেনালা'র বা তিন খালের পানির প্রয়োজন। পল্লীকবি লিখেছেন,

দেওয়ানের তাবিজ দিল কিবা দিল আর।
তেনালার পানি দিয়া দিল যে উতার ॥[৩]

ফুসমন্তর

শ্লোক-মন্ত্র ও দোয়াদরুদ পড়ে কোন বস্তুকে ফুঁক দিয়ে ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের রীতি লৌকিক চিকিৎসায় দেখা যায়। চিকিৎসা ছাড়া দারু-টোনার কাজেও ফুসমন্তরের ব্যবস্থা করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য মন্ত্রপূত করা হয়। বাংলার গ্রামজীবনে চিকিৎসা ও বশীকরণের কাজে পানিপড়া, দুধপড়া, তেলপড়া, ঘিপড়া, চালপড়া, কলাপড়া,

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩১
২. ঐ, পৃঃ ৩৪
বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অনুরূপ কুসংস্কারের উল্লেখ আছে। শ্যামসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য বন থেকে এলোচুলে গাছ সংগ্রহ করার বর্ণনা আছে সেখানে। 'কপালকুণ্ডলা' দ্রষ্টব্য।
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৫০

গুড়পড়া, হলুদপড়া, পানপড়া ইত্যাদির চল আছে। এছাড়া ধূলাপড়া, সুতাপড়া, পাতাপড়া, লতাপড়া, শিকড়পড়া ইত্যাদিও আছে। পানিপড়া লৌকিক চিকিৎসার বহুল প্রচলিত প্রথা— বিভিন্ন রোগে তা ব্যবহৃত হয়। বিশেষত: ছোট ছেলেমেয়ের জ্বরজ্বালা হলেই গ্রামের পীর-মোল্লার পানিপড়া প্রথম ব্যবস্থা। অসুখে পানিপড়ার একটি ফুসমন্তর এরূপ :

কাল ফিরানী কাল ফিরানী
জমজমের ঠাণ্ডা পানি।
খা আজরাইল পানি খা
এবার তুই ফিরে যা।[১]

নারীর প্রসবেও পানিপড়াব রীতি আছে। এরূপ একটি ফুসমন্তর :

ফকির বোলায় ও আমিনা, ব্যথায় দুক্ষু পাও।
বিছমিল্লা বিছমিল্লা কইয়া পানিপড়া খাও।
পানিপড়া খাইয়া শীগগির খালাস হইয়া যাও।[২]

বশীকরণে তেলপড়া, পানপড়া. সিন্দূরপড়া ও ফুলপড়া অব্যর্থ ঔষধ। 'রতন ঠাকুরের পালাগানে' দুষমনকে পানপড়া দিয়ে বশীকরণের চিত্র আছে।

দুষমনে সুহৃদ করে পান পড়া দিযা।
সতী নারীর পতি সে যে নেয়ত ভুলাইয়া।
এক ফোটা জল পড়া গায়ে ছিটা দিলে।
পাগলিনী হইয়া সতী আপন পতি ভুলে।[৩]

কুকুরের কামড়ে ঘিপড়া ও গুড়পড়া দিতে হয়। চোর ধরার কাজে চাল পড়ে সন্দেহকারীকে খেতে দেওয়া হয়। পড়া-চাল খেলে প্রকৃত চোরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে বলে বিশ্বাস আছে। সরিষাপড়া দিয়েও চোর

---

১. বাতায়ন, পৃঃ ১২৬
২. ঐ, পৃঃ ১২৬
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা. পৃঃ ৩১

ধরতে দেখা যায়। পেটের বেদনার রোগীকে চালপড়া খেতে দেওয়া হয়। গ্রামে বসন্ত দেখা দিলে 'কানজী পড়া' খেতে দেওয়ার রীতি আছে।[১] পানির পোকামাকড়ে কামড়ালে হলুদপড়া দেওয়া হয়। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে পাকা কলা পড়ে রোগীকে খেতে দেওয়া হয়। ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেলে সুতা পড়ে কোমরে বা গলায় বেঁধে দেওয়া হয়। এক একটি মন্ত্র বা দোয়া পড়ে সুতায় গিঁট দিতে হয়। মন্ত্রপূত সুতা থাকলে ভূত-প্রেত দেহে আসর করতে পারে না। ঘা-বসড়ায় ধূলা পড়ে চিকিৎসা করতে দেখা যায়। 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় আছে—

নামি ডাকি পীর তার বড় হেকমত।
ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত।[২]

কাটা ঘায়েব রক্ত বন্ধ করার জন্য ধূলাপড়া দেওয়া হয়:

ধূলা নাড়ো ধূলা চাঁড়ো ধূলা করম সার।
এ ধূলা অমুকার অঙ্গে রক্ত নাঞী আর॥[৩]

বশীকরণে ধূলা পড়ার রীতি আছে। গ্রামের বালকেরা খেলাধূলায় ধূলা মন্ত্রপূত করে প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অবশ ও ধরাশায়ী করে। ধূলাপড়া মন্ত্রে শত্রুসৈন্যকে আচ্ছন্ন ও বন্দী করতে দেখা যায় 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে। ধূলাপড়ার মন্ত্রগুণ সম্বন্ধে পল্লীকবি লিখেছেন,

এক মুঠা পন্থের ধূলা হাতে ত লইয়া।
ভারই রাজা ভালা মন্ত্র যে পড়িল।
মন্ত্র পড়িয়া রাজা ধূলা উড়াইল॥
যে জন হইল রুষ্ট মূল কাটে তার নালে
বাঁচিতে নাই সে পারে লোক লুকাইয়া সায়রের জলে॥[৪]

১. বাতায়ন, পৃঃ ১১৯,
কানজী ভাতের মাড় বা ফেন থেকে তৈরি।
২. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ২৭৪
৩. পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪
৪. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬৩

ধূলা পড়া দিয়ে আগুন নিভানোর বর্ণনা আছে 'চম্পাবতী কন্যার পালাগানে'। কালুগাজী রাস্তার ধূলা পড়ে 'ছাপাই নগরে'র আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন।[১]

সাপে কাটলে কড়ি পড়ে রোগীর অঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। শিশুর অঙ্গে 'পোড়াগতর' (ফোস্কা জাতীয় ঘা) হলে তালপাতা পড়ে সূতা দিয়ে বেঁধে হাতে বা গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। আদা পড়া দিয়ে গর্ভপাতের কথা পাওয়া যায় রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলী গীতে। প্রসবকালের বেদনা উঠলে প্রথমে পানপড়া, পানিপড়া ও তেলপড়ার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু এতে ফল পাওয়া যায়নি, শেষে আদাপড়া কার্যকরী হয়।

ঐ পাড়ার মেয়েগুলা আদা পড়া জানেরে।
আদা পড়া দিয়ে হামার পানিবষ্টি ভাঙ্গলরে ।।[২]

বাণমারা

ঝাড়মন্ত্র ও ফুসমন্তরের ভালমন্দ দুদিকই আছে, কিন্তু বাণমন্ত্র কেবল অনিষ্ট করে। শত্রুকে পঙ্গু বা হত্যা করে শাস্তি দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। বাণমন্ত্র অব্যর্থ, এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই, কেবল প্রতিমন্ত্র দিয়ে এর ক্রিয়া রোধ করা যায়। বাণমারা ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার বিষয়। গুণী গোপনীয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করে মন্ত্র পড়ে ও কিছু ক্রিয়া করে শত্রুকে বাণ মেরে থাকে। এর নানান পদ্ধতি। কখন শত্রুর নাম নিয়ে মন্ত্র পড়লেই মন্ত্রের ভাষণ অনুযায়ী তার দেহে বিকার দেখা দেয়। মাটিতে বা কলাগাছে কাঁটা পুঁতে বাণ মারা হয়। কখন মাটিতে শত্রুর মূর্তি এঁকে তার এক এক অঙ্গে ক্ষত করে শত্রুকে আঘাত করা হয়। পদচিহ্নে এমনকি ছায়ায় বাণ মারা হয়। বাণ মারার পদ্ধতি সম্পর্কে জনাব ইব্রাহিম খাঁ লিখেছেন, "সেকালে দুশমন দমনের অন্যতম পথ ছিল বাণ-মারা। বিশেষ বিশেষ গুণী লোক বাণ-মারা জানত। কখনো কচি লাউ কেটে কিংবা ময়দা দিয়ে শত্রুমূর্তি বানান হত;

১. লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৮
২. উদ্ধৃত : উত্তর বঙ্গের মেয়েলীগীত, পৃঃ ১০৪

তারপর মন্তর পড়ে সেই লাউ বা ময়দার মানুষের বুকে মারা হত তীর; তীর বুক ভেদ করে যেত, দুশমনও অমনি তার বাড়ীতে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিত আর বুক ধরে চীৎকার করত, তারপর হয়ত মরেই যেত।"[১] স্পষ্টতঃ এটি সংক্রামক যাদুবিদ্যার বিষয়।

বাণমন্ত্রের ভাষা হল ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যেমন :

এজাজিল জেলাতিল আরজে জানেলা
ফলানীর পাঁচ তনু জলে জা।[২]

এটি মুসলমানি ভাবে রচিত। হিন্দুয়ানি ভাবাশ্রিত বাণমন্ত্র আছে।[৩] ফোড়ার উপর বাণ মেরে শত্রুকে ঘায়েল করা হয়। এর একটি মন্ত্র :

উঠ্ ফোট্ চোট
পাকিস না গলিস না
দোম্বল বাইন্ধা উঠ।[৪]

মন্ত্র দিয়েই মন্ত্রের প্রতিকার করা হয়। বাণমন্ত্রের সাহায্যে কারও ক্ষতি করাকে 'নাগানি ঝাঁপানি' বলে। নাগানি ঝাঁপানির একটি মন্ত্র নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহে বেঁটকাটো ছেঁটকাটো
মোর গিয়ানে পর গিয়ানে কাটো।
পর গিয়ানে মহাগিয়ান কাটো।
অমুকের তিনকোণ পৃথিবী,
মোর গিয়ানে না সয় টান
আখেরের বাণ দারু দপপন,
ক্ষেতিমাত্রি, দেও দাহন, কুমঙ্গল,
ভূতপ্রেত, কুস্বপন, নাগানি ঝাঁপানি।
এই ঝাড়ানিতে কাটিয়া করিস খান খান।[৫]

১. বাতায়ন, পৃঃ ১২২
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৯
৩. বাতায়ন, পৃঃ ১২৫
৪. লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৭১
৫. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৮-৩৯

শেষ দু'চরণে নাগানি ঝাঁপানি ছাড়া দেও-দেবতা, ভূত-প্রেত, কুস্বপন ও অমঙ্গলের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে ওঝা রোগীর রোগ নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বাণমন্ত্রের সঙ্গে ঝাড়মন্ত্র মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ছ'টি চরণ প্রতিরোধক বাণমন্ত্র। এতে বিপরীত যাদুবিদ্যার বৈশিষ্ট্য আছে।

মানুষ ছাড়া গরুবাছুর, ক্ষেতফসলের উপর বাণ মারা হয়। ভাল গরুর বাঁটে বাণ মেরে দুধ বন্ধ করা যায়। কলা, কদু, পান প্রভৃতি গাছগাছালিতেও বাণ মেরে লোকের ক্ষতি করা হয়। খনার বচনে কলা নষ্ট করার একটি মন্ত্র এরূপ :

রাবণে কাটিলে গলা
শীতে দিলে জাগ।
যে বরণের কলাটি
সে বরণে থাক।[১]

খই মুড়ি ভাজার সময়, বড়ি দেওয়ার সময় অথবা পিঠা তোলার সময় মন্ত্র পড়ে তা নষ্ট করা হয়। মন্ত্র-দুষ্ট মুড়ি ফোটে না, বড়ি সিদ্ধ হয় না, পিঠা ফোলে না। ভাপাপিঠা নষ্ট করার একটি মন্ত্র এরূপ :

আলোধানের কালো পিঠা
তিন গাইনে বাণে আটা।
একটা ধানের দুইটা তুষ,
পিঠা তলায় ভুষাভুষ।[২]

ভাল কাজে বাণমন্ত্রের প্রয়োগ নেই। কদাচিৎ চিকিৎসার কাজে এর ব্যবহারে উপকার করা হয়। রোগীর প্লীহা বড় হলে বাণ মেরে তা নষ্ট করার মন্ত্র আছে।[৩]

---

১. বৃহৎ খনার বচন দ্রষ্টব্য।
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪০
৩. বাতায়ন, পৃঃ ১২৬

বন্ধন মন্ত্র

বন্ধন মন্ত্র প্রতিষেধক নয়, প্রতিরোধক। তুকতাক, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা রোগশোক, ভূতপ্রেত, দৈবদুর্বিপাকের প্রকোপ ও প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা হয়। ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা হয় রোগী আক্রান্ত হলে। বাণমন্ত্র প্রয়োগ করা হয় শত্রুকে ব্যাধিগ্রস্ত, যন্ত্রণাবিদ্ধ করার জন্য, ফুসমন্ত্র ভয়, ব্যাধি, বিপদ দূর করার জন্য। অর্থাৎ এসব মন্ত্রের গুণ নিরাময় করা; কিন্তু বন্ধনমন্ত্র প্রতিরক্ষামূলক, আক্রমণের পূর্বেই প্রতিরোধের চেষ্টা করা। মন্ত্রপূত কবচ-মাদুলীর মধ্যেও এ গুণ আছে। ভবিষ্যৎ আপদবালাই থেকে, ক্ষয়ক্ষতি থেকে দেহকে নির্মুক্ত রাখার জন্য রক্ষাকবচ ধারণ করা হয়। আগুন লাগলে ধুলা পড়ে তা নিভান হয়, কিন্তু আগুন যাতে না লাগে তার জন্য 'অগ্নিবন্ধন মন্ত্র'। সাপে কাটলে বিষঝাড়া মন্ত্রে তার চিকিৎসা হয়। কিন্তু সাপ ধরার সময় যাতে না কামড়ায় তার জন্য 'সাপবন্ধন মন্ত্র'; বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য 'বাঘবন্ধন মন্ত্র', হাতি শিকারের সময় 'হাতিবন্দন মন্ত্র', মধু সংগ্রহের সময় মৌমাছির দংশন থেকে বাঁচার জন্য 'বোলতাবন্ধন মন্ত্রে'র প্রচলন আছে। এরূপ বন্যা প্রতিরোধের জন্য 'বন্যাবন্ধন মন্ত্র', ব্যাধির প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য 'গ্রামবন্ধন মন্ত্র', চোরের চুরি রোধ করার জন্য 'ঘর-বন্ধন মন্ত্র', ফসলের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'ক্ষেতবন্ধন মন্ত্র', ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সব স্থল থেকে ভয়ের উৎপত্তির কারণ, জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ, সেখানেই বন্ধন মন্ত্র দ্বারা রক্ষাব্যূহ তৈরি করা হয়। যে সমাজে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার বন্দোবস্ত নেই সে সমাজের মানুষ এরূপ লৌকিক উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। দৈবনির্ভরতা যেখানে সবকিছু, সেখানে এর দ্বারা কিঞ্চিত মানসিক শক্তি ও আস্থা সঞ্চয় করা হয় মাত্র, অন্যথায় বন্ধন মন্ত্রের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। অনগ্রসর সমাজের মানসক্রিয়ার ফল বন্ধন মন্ত্রগুলি।

ঝাড়মন্ত্রের মত বন্ধন মন্ত্রেও দেবদেবী, পীর-মুর্শিদের দোহাই দেওয়া হয়। শক্তিশালী প্রতীক বা উপমার সাহায্যে আক্রমণকারীকে সন্ত্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত করা হল এর উদ্দেশ্য। বন্ধন মন্ত্রের ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রকাশ্যে

আচরণীয়, এজন্য তা 'শুক্ল ইন্দ্রজালে'র অন্তর্ভুক্ত। এর নিরোধক গুণ আছে বলে যাদুবিদ্যার পরিভাষায় তা প্রতিরোধক যাদুবিদ্যার বিষয়। শরীরবন্ধন মন্ত্রের অপর নাম 'আত্মসার।' হিন্দুয়ানিভাবে রচিত আত্মসার মন্ত্রের নমুনা :

মণিমুক্তা দোলে মা মনসার গলে
আমাকে দেখিয়া ভূত পিসাষ না চলে।
ডাকি ডাকিনি প্রেতভূত তোমরা পঞ্চ ভাই
আমার সরিরে আসি কারও সাধ্য নাই।
কাঙ্গুরি কামিক্ষা মা চণ্ডীর আজ্ঞা হারিঝিব পা
দই মা কংকালি দই মা ফুল্লরা দই মা কালি।[১]

এটি ভূত-প্রেত প্রতিরোধক বন্ধন মন্ত্র, ব্যাধির বন্ধন মন্ত্র পাওয়া যায় ইসলামী ভাবধারায় :

ডাইনে আল্লাহ বাঁয়ে মহম্মদ
সামনে মা বরকত আলী
স্বর্গ দিয়া আসে স্বর্গ দিয়া যায়।
যদি আমার দিকে বালা ফিরিয়া চাস
দোহাই তোর সমর্থ আলীর মাথা খাস।[২]

'ওজুদবন্ধের মন্ত্র'[৩] নামে শরীর বন্ধনের অপর নাম পাওয়া যায়। বাণ মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, সাপ-বাঘের আক্রমণ, ছুরি-তীর-বন্দুকের আঘাত, অপদেবতার প্রকোপ, দুষমনের অত্যাচার ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওজুদবন্ধের মন্ত্র পড়ে দেহ সুরক্ষিত করতে হয়।[৪]

প্রেতাত্মার প্রভাব অথবা আগুন ও মড়কের গ্রাস থেকে গৃহ অথবা গ্রাম রক্ষা করার জন্য বন্ধন মন্ত্র আছে। পেশাদার ওঝা, পীর, ফকির মন্ত্র ও দোয়াদরুদ পড়ে গ্রামবন্ধন করে। আশেপাশে মহামারী দেখা দিলে

---

১. পুঁথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১
২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (ফরিদপুর), ১৯৬২
৩. ওজুদ শব্দের অর্থ 'চিরস্থায়ী সত্তা', আরবী বুজুদ থেকে উৎপত্তি ; হরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৬-৪৭

রাত্রি জেগে তারা কতক মন্ত্র পাঠ, কতক আচার পালন করে বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। টাঙ্গাইল থেকে সংগৃহীত বাড়িবন্ধের মন্ত্রের একটি নিদর্শন :

বিছমিল্লা নামে করি বাড়ীঘর বন্ধন,
দূর দূর শয়তান জীন পরী দেয় দৈত্যজন।
উত্তরে দাঁড়ায় আলী, দক্ষিণে ওমর,
পশ্চিমে ওছমান রাখে, পুব আবুবকর।
আসমানে হোছেন বীর, জমিনে হাছান,
কোণে কোণে আমিনা আর ফাতেমার পরাণ।
ঘরেতে খদীজা বিবি, বাহিরে রছুল,
যাদের ইমান মহব্বত দিলে ফুটায় ফুল।
ফেরেস্তা দিনরাত পড়ে কোরানের আয়াত
তামাম ঘর বাড়ী জোড়া খোদার রহমত।[১]

এসব মন্ত্রপাঠের সহিত কিছু লোকাচার আছে। মন্ত্রপূত বোতল পুঁতে ব্যাধি তাড়ানোর আচার কিশোরগঞ্জে পাওয়া যায়।[২] ভূত-প্রেতের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গৃহবন্ধনের আচারে বাড়ির চারপাশে লোহার পেরেক পোঁতা হয়। লোহা প্রেতাত্মা স্পর্শ করে না।

চোর যাতে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্রপূত গৃহে চোর এলেও সে অবশ হয়ে যায় ও সহজে ধরা পড়ে। শোয়ার আগে গৃহকর্তা মন্ত্র পাঠ করে থাকেন। সাধারণভাবে এগুলি 'চোর বন্দীর মন্ত্র' নামে পরিচিত।

চোর চোরানি গাছের পাতা।
যে চোর আইয়্যে কাট মাথা॥
ভাঙ্গা লাঙ্গল পুরান ঈশ।
চোরার বানলাম চৌদিশ॥
আসব চোরা হাস্যা।
মরব চোরা কাইন্দা॥
ঘরের গিরির দুয়ার বান্দা।

---

১. বাতায়ন, পৃঃ ১২৭-২৮
২. বর্তমান গ্রন্থের লোকাচার অধ্যায়ের 'ব্যাধি ও মৃত্যু' অংশ দ্রষ্টব্য।

তেলের হাঁড়িত চকমক নুনের হাঁড়িত ফুল।
হিন্দের মুখ বাইন্ধা থইছি ন'জন চোর ॥[১]

কলেরা-বসন্ত দেখা দিলে ওঝারা ধূলা দিয়ে গ্রামবন্ধন করে থাকে। এতে ব্যাধির অপদেবতারা আর গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। বসন্ত রোগের একটি মন্ত্র :

যাওরে শীতলা সইরা যাও
উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও
কামিখ্যার পর্বতে যাও।
যদি না যাও
তবে মহাদেব আর পার্বতীর মাথা খাও।[২]

বাঘের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'বাঘের মুখ খিলানী মন্ত্র' আছে।[৩] এমন্ত্র পাঠ করলে বাঘ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামবাসীর মধ্যে এসব মন্ত্রের প্রচলন আছে। তারা কাঠ, পাতা, মধু সংগ্রহ করতে বনে যায়। এক বন থেকে অন্য বনে বাঘ চালান দেওয়ার মন্ত্রও আছে। ইসলামীভাবে রচিত বাঘ চালান দেওয়ার একটি মন্ত্র এরূপ :

বিছমিল্লা নামে গাজী হইলা ফকীর,
বিছমিল্লা নাম লৈয়া করিলাম ফিকীর।
গাজীসাব কইয়া দিছে ওরে বাঘ ভাই,
আজি হতে এ জঙ্গলে তোমার ঠাঁই নাই।
ঘর ছাড়িয়া পালাও, গাজী গাজী বল,
ইষ্ট বান্ধব লিয়া তোমরা আর জঙ্গলে চল।
তোমাদের লাগি খেলায় গাজী বোলায় আশা দিয়া
নিমেষে চল, চাহিস না আর পিছনে ফিরিয়া।
এই দিক যদি ফিরিয়া চাও
তোমার বাচ্চা কাচ্চার মাথা খাও।[৪]

---

১. লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৭০
২. ঐ, পৃঃ ১৬৯
৩. ঐ, পৃঃ ১৭১
৪. বাতায়ন, পৃঃ ১২৭

বাঘের মুখ খিলানী মন্ত্রের মত 'হাতি খেদানো মন্ত্র' প্রচলিত আছে, হাতির দল শস্য নষ্ট করে, তাদের গতিরোধ করার জন্য এবং শিকারের সময় বন্দী করার জন্য মন্ত্রপড়া হয়। হাতিবন্ধের একটি মন্ত্র :

হাতি বান্ধ হাতি বান্ধ দেবী তোবে ডাকেরে।
কি কারণে দেবী মাগো আমার তলব রে ॥
তুমি কি পারিবা উষার খ্রত ভাঙ্গিবারে।
আমি মাগো না পারিলে পারিবে কেমুন জনেরে।
হাতিবাণ মারিল উষা দুই হাত খেঁচিয়া রে ॥[১]

পুতপুতি পাখির ডাক অমঙ্গলজনক; তার ডাক বন্ধ করার জন্য মন্ত্র আছে। পাখি যতবার ডাকবে ততবার মন্ত্রের এক একটি শব্দ উচ্চারণ করলে ডাক বন্ধ হয়ে যায়। মন্ত্রটি এরূপ :

আইন গাইন ছম
হুঙ্কার মুদ্দাই
দুষমন কর সংহার।[২]

শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র নিম্নরূপ :

জাড়ে মইলাম গো বুড়া মাই,
বালিশ আছে কাঁথা নাই।

কলার তলে পদ্ম ফুল,
পিথ্থিম ফাটা রোদ তুল।[৩]

কুনজর

লোকের বিশ্বাস, কোন খাদ্যদ্রব্য, ক্ষেতফসল বা শিশু সন্তানের উপর মন্দ লোকের কুনজর পড়লে ক্ষতি হয়। ডাইনী শ্রেণীর নারী শিশুদের উপর নজর দিয়ে রক্ত শোষণ করে। ফলে শিশু শুকিয়ে যায়। ডাইনীর প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা ছেলেকে 'তেল কাজল' দেওয়ার সময় কপালের একপাশে কাজলের ফোঁটা দিয়ে থাকেন। এতে

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩
২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪২
৩. বাতায়ন, পৃঃ ১২৫

আর ডাইনীর প্রভাব পড়ে না। একই উদ্দেশ্যে শিশুর হাতে-পায়ে লোহার বালা বা মল পরান হয়। জন্মের পর শিশুর কান ছিদ্র করা হয়। খুঁত থাকলে প্রেতাত্মারা তা স্পর্শ করে না। শিশুর উপর কুনজর পড়লে সন্ধ্যা বেলায় তিনটি শুকনো মরিচ ও তিনটি লেবুর পাতা আগুনে দিয়ে শিশুকে সেঁকলে তার প্রভাব দূর হয়।

বীজ বুনে বা চারা রোপণ করে কৃষকেরা ক্ষেত বন্ধনের মন্ত্র পড়ে যাতে মন্দ লোকের নজর না পড়ে।[১] এমন লোক আছে যে এক জমির ফসল অন্য জমিতে চালান করতে পারে।[২] গ্রামাঞ্চলের ভাষায় একে 'কাড়ান' করা বলে। মাটির হাঁড়িতে চুণ দিয়ে মানুষের মুখ এঁকে ক্ষেতে ঝুলিয়ে রাখলে কুনজর দূর হয়।[৩] অপয়া লোকের ছায়া, ছোঁয়াচ বা নজর পড়লে ভাল খাদ্যবস্তু নষ্ট হয়ে যায়। বাড়া ভাতে নজর পড়া ঘোর অমঙ্গলের কারণ। এগুলি প্রেততন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত; এতে মন্ত্র নেই, কেবল ছুঁৎছায়ার প্রভাবেই অঘটন ঘটে।

টুকা

গ্রামাঞ্চলে 'টুকা' বা 'মুখলাগা' নামে আর এক রকমের বিশ্বাস আছে। নজর দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষতি করা; মুখলাগার উদ্দেশ্য ক্ষতি করা নয়, তবে কোন কিছুতে মুখ লাগলে পরিণামে ক্ষতিই হয়। কোন কিছু না বলে কেবল দৃষ্টি দিলেই কুনজরের দোষ বর্তায়, কিন্তু মুখলাগার ক্ষেত্রে কিছু বলতে হয়। মূলতঃ তা প্রশংসার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। ফল হয় বিপরীত। সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুর প্রশংসা করে কেউ যদি বলে, ছেলেটি কি সুন্দর মোটাসোটা হয়েছে। তখনই বলা হয়, ওভাবে টুকো না, মুখ লেগে ছেলে শুকিয়ে যাবে। বাপ-মায়ের টুকা নাকি শিশুর পক্ষে একেবারেই সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কুফল ফলে। বিশেষতঃ মায়ের মুখলাগা বেশি অমঙ্গলজনক। এরূপ ভাল গাছপালা ও ফলমূলে মুখ লাগলেও সেগুলির ক্ষতি হয়। এতে বিষয়ীর প্রশংসা প্রকাশ্যেই করা হয়, অতএব ক্রিয়ার দিক থেকে তা শুক্ল ইন্দ্রজালের বিষয়; কিন্তু

---

১. বর্তমান গ্রন্থের লোকাচার অধ্যায়ের 'ফসল' অংশ দ্রষ্টব্য।

২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৭০

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৩

ফলটি ফলে কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের। মুখলাগার জন্য কোন লৌকিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কালের ব্যবধানে এর দোষ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়।

দিব্যদান

সত্যতা নিরূপণার্থে সাক্ষী মানা ও শপথ জ্ঞাপনার্থে দিব্যদান লোক-বিশ্বাসের আরও দুটি রহস্যময় দিক। কোন একটি সংশয়াপন্ন বিষয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ও প্রতীতি উৎপাদনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তি বা সত্তার কাছে দিব্য দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ঈশ্বর, দেবদেবী, প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি ও মহামানবের নামে সাক্ষী মানা হয়। আগুন, বাতাস, মাটি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে সাক্ষী মেনে কাজ করার দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায়। মহুয়া চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী মেনে নদের চাঁদকে পতিত্বে বরণ করে।[১] আদিম জাতির সর্বপ্রাণবাদে সকল বস্তুর আত্মার উপর বিশ্বাস রেখে পূজা করার রীতি ছিল। আকাশ, মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য এ বিশ্বাস থেকে পূজা পেত। প্রাকৃতিক বস্তুগুলির দৈহিক বিশালতা, কর্মগুণের প্রসাবত্তা অসহায় মানুষের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আকর্ষণের মূল কারণ ছিল। লোকমনে সংস্কাররূপে তা আজও ক্রিয়া করে চলেছে।

গোপন হোক, প্রকাশ্য হোক কোন কাজে সততা এবং নিষ্ঠা রাখার জন্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শক্তির কাছে যে শপথ করা হয়, তাই দিব্য দেওয়া। মুসলমানেরা আল্লাহ-রসুলের নামে এবং হিন্দুরা দেবদেবীর নামে দোহাই দিয়ে দিব্য দেয়। পার্থিব ক্ষতির ভয় দেখিয়েও দিব্য দেওয়া বা 'কিরা' কাটা হয়। কোন সত্যতা যাচাই, কোন অভিযোগ খণ্ডণ বা কোন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নিজ অঙ্গ স্পর্শ করে কিরা কাটতে দেখা যায়। মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কিরা কাটেন।

কোন বস্তু স্পর্শ করে বা নাম করে দিব্য দেওয়ার পেছনে সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাব আছে। যার নামে দিব্য দেওয়া হয়, সে যদি তা ভঙ্গ করে তবে তার বিপদ আসতে পারে। দিব্যদান একটা অদৃশ্য বাক্ বন্ধন যার সাহায্যে অলৌকিক ভীতির উদ্রেক করে সে-সম্পর্কে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। অনিষ্ট বা কুফল প্রতিবন্ধকতায় এটি লৌকিক মানসক্রিয়া। এ অংশও ট্যাবু লক্ষণাক্রান্ত।

---

১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ১৩ (৩য় সং)।

বিধিনিষেধ

Taboo-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'বিধিনিষেধ' গ্রহণ করা যায়।[১] পলিনেশিয়ার কোন এক উপজাতির ভাষা থেকে ট্যাবু শব্দের উৎপত্তি। ঐসব দেশে ট্যাবুর ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা আছে।[২] এগুলি খুব সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। কোন কিছু করা বা না করা, বলা বা না বলা, ছোঁয়া বা না ছোঁয়া, শোনা বা না শোনা ইত্যাদি ব্যাপারে যে প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস পোষণ করা হয় এবং সে সম্পর্কে লৌকিক বিধিবিধান প্রশ্নহীনভাবে মান্য করা হয় তাই ট্যাবুর বিষয়ভুক্ত। ভয় ও শঙ্কা থেকে ট্যাবুর উদ্ভব। বিপদের সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণে বিধিনিষেধ আরোপ করে পূর্বাহ্নে সতর্কতা গ্রহণ করে। সুতরাং জীবননিরাপত্তার কারণে ট্যাবুর কল্পনা করা হয়েছে। ট্যাবু ফলিত যাদুবিদ্যার বিষয়।[৩] বন্ধনমন্ত্র হঁ্যা-ধর্মী যাদুবিদ্যা, ট্যাবু না-ধর্মী যাদুবিদ্যা। কতক ট্যাবু ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত ভালমন্দের বাছবিচার থেকে উদ্ভূত, যার বাস্তব গুণাগুণ আছে। কতকগুলি প্রথাবদ্ধভাবে অন্ধবিশ্বাসের অনুসরণ মাত্র। খাদ্যবস্তুর উপর বিধিনিষেধের কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফল থাকতে পারে, কারণ খাদ্যদ্রব্যের বস্তুগুণ দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। নাম ও সংখ্যা সংক্রান্ত ট্যাবুগুলি সম্পূর্ণ অমূলক। রাত্রিবেলা সাপ বা বাঘের নাম নিলে তাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে, এজন্য তাদের নাম নেওয়া হয় না। এতে বাস্তব কার্যকারণের কোন সম্পর্ক নেই। ট্যাবুতে যে নিষেধের নির্দেশ করা হয়, তা প্রায়শঃ ভয়ঙ্কর গোছের হয়, এজন্য যে শাস্তির ভয়ে নিষিদ্ধ কাজ করতে লোকে সাহসী হবে না। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে

---

১. ট্যাবুতে নিষেধাজ্ঞা আছে এবং কেন নিষেধ করা হয়েছে তার লোকপ্রচলিত বিধিও আছে। এ অর্থে ট্যাবুর বাংলা প্রতিশব্দ 'বিধিনিষেধ' যুক্তিসঙ্গত।

২. SDFML, Vol. 11, p. 1098

৩. Taboo may be defined as the negative side of practical magic.
J. C. Frazer— The Golden Bough, Vol. 1 , London, 1960. p. 29, (2nd. edition).

বিধি পালনে বাধা করা হয়। ট্যাবু ভঙ্গ করলে আইনানুগ কোন লৌকিক শাস্তির ব্যবস্থা নেই, ট্যাবুর বিধানই ট্যাবু ভঙ্গকারীকে দৈবভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের চারপাশে নানা ঘটনা, বিষয় ও বস্তুকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বিধিনিষেধ ছড়িয়ে আছে।

ফ্রেজার ট্যাবুর পাত্র ও ক্ষেত্র হিসেবে বিশিষ্ট মানুষ, বিশেষ কাজকর্ম, বিশেষ বিশেষ বস্তু, নির্দিষ্ট নাম-শব্দ প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নরনারীর মধ্যে আছে দলপতি, রাজা, শোক প্রকাশকারী, ঋতুবতী ও গর্ভবতী নারী, যোদ্ধা, শিকারী ইত্যাদি। এদের কাউকে দেখা বা কাউকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ। কাজ-কর্মের মধ্যে রাজাকে পানাহার করতে দেখা, অতিথির সহিত মেলামেশা করা, নিজগৃহ ত্যাগ করা ইত্যাদি ব্যাপারে বাছবিচার আছে। বস্তুর মধ্যে ধারাল অস্ত্রশস্ত্র, রক্ত, হাড়, নখ, থুথু, অঙ্গুরী, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এগুলির দ্বারা সহজে গুণ করা যায়। গুরুজনের নাম, রাজা-পুরোহিতের নাম, মৃতের নাম, ভূত-প্রেতের নাম নেওয়া নিষিদ্ধ।[১]

বাংলাদেশে কমবেশি সব শ্রেণীর ট্যাবু আছে। কাজকর্ম ও খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত ট্যাবুর সংখ্যা বেশি। পাত্র, ক্ষেত্র, স্থান, কাল ভেদে ট্যাবু আরোপিত হয়। শিশুর পক্ষে যে বস্তু বা কাজ ট্যাবু, বয়স্ক লোকের কাছে তা নয়; আবার নারীর পক্ষে যা ট্যাবু, পুরুষের কাছে তা নয়। শিশু আয়নাতে মুখ দেখলে বোবা হয়, কিন্তু বয়স্ক লোকে দেখলে কোন ক্ষতি হয় না। ঋতুবতী ও গর্ভবতী থাকা-কালীন নারীর যে খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্য সময় তা নয়। নারী নিজ স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের নাম উচ্চারণ করে না। পুরুষে স্ত্রীর নাম করতে পারে। কোন শুভ কাজের সময় ডিম বা কলা খেতে নিষেধ, খেলে ঐ কাজে সুফল আসে না। অন্য সময় এ খাদ্য নিষিদ্ধ নয়। রাত্রিবেলা কতক দ্রব্য ধার দেওয়া নিষিদ্ধ, এতে লক্ষ্মী চলে যায়। কিন্তু দিনের বেলায় ধার দিলে ক্ষতি হয় না।

১. Ibid., pp. 257-245

গর্ভবতী ও প্রসূতী রমণীর কাজকর্ম, খাদ্যদ্রব্য ও গতিবিধি সম্পর্কে কতক ট্যাবু এরূপ :

ক. গর্ভবতীকে মাছের জোড়া ডিম খেতে নেই, খেলে তার জোড়া লাগা সন্তান হয়।[১]

খ. গর্ভবতীকে ঘটি, মুচি, ঢাকনা ইত্যাদি পাত্রে খেতে নেই, খেলে সন্তানের পেট বড় হয়।[২]

গ. গর্ভবতীর পান ছিঁড়ে খেতে নেই, খেলে সন্তান 'নুলা লেংড়া' হয়।[৩]

ঘ. গর্ভবতীর লাউ বা শিম বীজ লাগান অনুচিত, লাগালে যতদিন উক্ত গাছে ফল না ধরে ততদিন তার প্রসব হয় না।[৪]

ঘ. আঁতুড় ঘরে থাকাকালীন প্রসূতি টাকি মাছ, শইল মাছ ও গজাড় মাছ খেতে পারে না, খেলে শিশুর দেহে 'মুছরানী বেমার' হয়।[৫]

দৃষ্টান্তগুলি[৬] সমপর্যায়ের যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত। সদৃশ কারণে সদৃশ ফল ফলে। অতএব অবাঞ্ছিত ফল এড়াতে হলে এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। এগুলি রক্ত সম্পর্কের ট্যাবু।[৭]

অনেক কাজ আছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ। আগুনে নুন পোড়ান নিষেধ, পোড়ালে মুখে 'কাইসা দাগ' পড়ে।[৮] কুয়ার পানিতে নিজের ছায়া দেখলে 'গা ফোলা বেমার' হয়।[৯] দাও অথবা

---

১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ঐ, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৪
৬. অধিক দৃষ্টান্তের জন্য বর্তমান গ্রন্থের লোকাচার অধ্যায়ের 'শিশু-জন্ম' অংশ দ্রষ্টব্য।
৭. ঐ, 'শিশু-জন্ম' অংশ দ্রষ্টব্য।
৮. পূর্বোক্ত, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৪
৯. ঐ।

কাঁচির উপর বসলে দাঁতে 'পোকা' হয়।[১] এগুলি ছাড়া নাম, সংখ্যা রঙ সম্পর্কে ট্যাবু আছে, পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।[২]

কুলকেতু

মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ অথবা জড়বস্তুকে পূর্বপুরুষ, জ্ঞাতিপুরুষ অথবা প্রতীক মনে করে সে সম্পর্কে অমূলক বিশ্বাস পোষণ ও সংস্কার পালনের রীতি বিশ্বের নানা আদিবাসীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক উপজাতির মধ্যে ঐরূপ রীতি আছে। গোত্রবিশেষের আদি-পিতা বা জ্ঞাতিপুরুষ অথবা প্রতীকরূপী উক্ত প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তুকে সে-গোত্রের টোটেম[৩] বা কুলকেতু বলা হয়। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের ছোটনাগপুরের ওরাঁওদের বিভিন্ন গোত্রের মোট ৬২টি টোটেমের নাম পাওয়া যায়।[৪] পূর্বপ্রান্তের পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি ও মুরংদের গোত্র-বিশেষে কয়েক প্রকার টোটেম আছে। যেমন মুরংদের মধ্যে দেঙ্গোয়া, প্রামসাং, গ্নারো গ্নুনর গোত্রভুক্ত লোকেরা যথাক্রমে কলা গাছ, মোরগ-ফুল, ও কাঁঠাল গাছকে পূর্বপুরুষ মনে করে বিবিধ আচার-সংস্কার, বাচবিছার পালন করে। ঐগুলি তাদের টোটেম। কুকিদের টোটেম হল বাঘ।[৫]

আধুনিক সমাজবিদরা মনে করেন, আদিবাসীদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় টোটেমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। টোটেম স্বগোত্রের মানুষের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন; সে তাদের রক্ষক ও উপকারী। গোত্রপরিচয়, বিবাহ, যৌনসম্পর্ক, আহার্য, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে টোটেমপ্রথা প্রভাব বিস্তার করেছে। আদিবাসী স্বীয় টোটেমের উদ্ভিদ অথবা অলংকার-পরিচ্ছদ ধারণ করে নিজেদের অনন্য পরিচয় রক্ষা করত এবং শত্রুমিত্র

---

১. ঐ।

২. এ অধ্যায়ের 'শুভাশুভ' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. মূল টোটেম (totem) শব্দ উত্তর আমেরিকার ওজিবওয়া ইণ্ডিয়ানদের ototeman (his sibling kin) ও আলগোনকুয়ানদের nto'tem (his kin) শব্দ থেকে উদ্ভূত। SDFML, Vol. 11, p. 1120

৪. ERE, Vol. VII, p. 397

৫. আরণ্য জনপদে. পৃঃ ১৬, ১২৩

যাচাই করে আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিত। অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ টোটেমপ্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সাধারণতঃ একই টোটেমভুক্ত পরিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।[১] টোটেমের প্রাণী, উদ্ভিদ এমন কি জড়বস্তুকেও আঘাত, হত্যা বা ধ্বংস করা নিষিদ্ধ। উক্ত প্রাণীর মাংস ও উদ্ভিদের ফলমূলপাতা খাওয়াও নিষিদ্ধ। ওরাঁওদের মধ্যে যাদের টোটেম গাছ, তারা সে গাছের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। যাদের টোটেম বাঘ, তারা কাঠবিড়ালি পর্যন্ত মারে না, কেননা বাঘের গায়ের রঙের সাথে কাঠবিড়ালির গায়ের রঙের মিল আছে।[২]

প্রাচীনকালে ভারতের অনার্যদের অনেক গোত্রের মধ্যে টোটেম সংক্রান্ত সংস্কার ছিল। বিশেষ করে, দ্রাবিড়দের মধ্যে এর আধিক্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের ঐ গোত্রের লোকদের টোটেম-সংস্কার আজও বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আর্যোত্তরকালে হিন্দুধর্মের বিস্তারের ফলে টোটেমের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পায়। বিশেষ করে, বর্ণপ্রথা (caste system) প্রবর্তনের ফলে সাধারণ সমাজে টোটেমের প্রভাব অনেক কমে যায়। তবে একথা স্বীকার্য যে, ঐ সময়ের অনেক নিম্নবর্ণের সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় টোটেমের ভিত্তিতেই। উত্তর প্রদেশের এরূপ বর্ণের লোকের নামধাম আছে। যেমন কচ্ছপ অর্থভাষিত মুরকান বর্ণের লোকেরা এখনও কচ্ছপ মারে না, বা খায় না। এরূপ শানোয়াঁ বর্ণের লোকেরা শনের চাষ করে না, শন ব্যবহারও করে না। গ্রীধলে বর্ণের লোকেরা শকুন হত্যা করে না।[৩]

বর্তমানে বাংলার সাধারণ লোকসমাজে ঘোড়া, বিড়াল, কাক, হনুমান গরু, শূকর, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীকে আঘাত করা, হত্যা করা, তাদের মাংস ভক্ষণ করার ব্যাপারে কুসংস্কার ও বিধিনিষেধ আছে। এসবের পেছনে বিস্মৃতকালের টোটেম-সংস্কার থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভারতের হিন্দুসমাজে ঘুরগোটিয়ারা ঘোড়া, হনুমান বর্ণের লোকেরা হনুমান, চিরাই বর্ণের লোকেরা চড়ুই আঘাত করে না, বা হত্যা করে না।[৪] নিম্নবর্ণের

১. Encyclopeadia Britannica, Vol. XXII, 1968, p. 103
২. ERE, Vol. VII, p. 397
৩. Ibid., p. 402
৪. Ibid., p. 402

হিন্দুরা যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিজ নিজ দেবীদের উল্কি আঁকে, তার কোন কোনটির পেছনে টোটেমের প্রভাব থাকতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রেততত্ত্বের আত্মাবস্তু সম্পর্কে ধারণা থেকে টোটেমের উদ্ভব হতে পারে।

আত্মার রূপান্তর

মানবদেহের অন্যপ্রাণী বা বস্তুতে অথবা প্রাণী বা বস্তুর মানবদেহে রূপান্তর গ্রহণ লোককাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ। আত্মার রূপান্তর (transformation of Soul) মটিফকে স্টিথ থমসন সাহেব ডিO-ডি ৬৯৯ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মন্ত্রগুণে মানুষ অদৃশ্য হতে বা কায়া বদলাতে পারে। রূপান্তর সাধনের হাতিয়ার হয় মন্ত্র অথবা মন্ত্রপূত বস্তু। যাদুপ্রয়োগকারী মন্ত্রোচ্চারণ করে অথবা মন্ত্রপূত বস্তু প্রয়োগ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইচ্ছামত ও সুবিধামত রূপান্তরিত করতে পারে। মন্ত্রের প্রতিকার বা প্রতিরোধ মন্ত্র দিয়েই করতে হয়। মন্ত্রপূত বস্তুর স্পর্শে দেহের রূপান্তর ঘটে, সেটি খুলে নিলে আবার পূর্বরূপ ফিরে পায়। এটি যাদুর মোহমুক্তি (disenchantment) মটিফ রূপে পরিগণিত হয়। আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাস থেকে রূপান্তর গ্রহণের ধারণা জন্মিতে পারে। হিন্দু ও গ্রীক পুরাকাহিনী ও রূপকাহিনীতে দেখা যায়, দেবতারা বিভিন্ন প্রাণীর ছদ্মবেশে মর্তলোকে ভক্তকে ছলনা অথবা পরীক্ষা করে থাকেন।

গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতি ও গোদাযমকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় বিভিন্ন রূপ-রূপান্তর গ্রহণ করতে দেখা যায়। ময়না মন্ত্রজ্ঞানী নাথ-যোগিনী। তিনি ধ্যানবলে দূর-নিকট, ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারেন, যোগলব্ধ অলৌকিক ক্ষমতায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল গমনাগমন করতে পারেন। পল্লীকবি লিখেছেন,

মহামন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি ময়না হৃদয়ে জপিয়া ॥
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া।[১]

এরপর যম ও ময়নার বহু রূপ-রূপান্তরের বর্ণনা আছে, যেমন গোদা যখন 'জংলানি' রূপে আত্মগোপন করেছে, ময়না 'চ্যাঙ্গাবোড়া' রূপে

১. গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ২০

তাকে আক্রমণ করেছেন ; ভয়ে যম যখন ইঁদুর রূপ ধারণ করে গর্তে আশ্রয় নিয়েছে, ময়না বিড়াল হয়ে তাকে তাড়া করেছেন। এরূপে যম ও ময়না যথাক্রমে 'কৈতর' ও 'বাজ', 'সর্ষা' ও 'ঘুঘু', 'ইচিলামাছ' ও 'মইষ' 'টোরাগছি মাছ' ও 'পানকৌড়ি', 'কুড়িয়া লাতুর বৈষ্ণব' (কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বৈষ্ণব) ও 'মাছি' ইত্যাদি কায়ান্তর গ্রহণ করে। শেষ স্তরে সতীময়নার কাছে গোদা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, গোরক্ষনাথের মধ্যস্থতায় বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে।[১]

'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারইয়া রাজা ও বীরসিংহের বিভিন্ন দেহান্তরে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বর্ণনা আছে। উভয় রাজা মন্ত্রসিদ্ধ। তাঁরা এক এক মন্ত্রে এক এক রূপান্তর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এটি একটি মন্ত্রশক্তির লড়াই।[২] পল্লীকবির ভাষায় বর্ণনাটি এরূপ :

তবে ত ভারইয়া রাজা ভালা বদল করে কায়া।
কইতরা হইল রাজা জানে নানান মায়া ॥
মায়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধূলি উড়াইল।
মানুষ ভারইয়া রাজা বিরক্ক হইল ॥
কুড়ালে কাটি সিঙ্গি রাজা করে মার মার।
সপ্প হইয়া ভারইয়া রাজা কায়া বদলাইল ॥
ময়ূর পঙ্খী হইয়া সিঙ্গি না রাজা শূন্যেত উড়িল ॥
বাজ হইয়া সিঙ্গি রাজা থাপা দিয়া ধরে।
মীন হইয়া ভারইয়া রাজা পড়িল সায়রে ॥
ঔদ হইয়া সিঙ্গি রাজা পশ্চাতে চলিল।
চিলা হইয়া ভারইয়া রাজা শূন্যেত উড়িল ॥
তুরবী মন্তরে রাজা ভালা কোন কাম করে।
সাচান হইয়া রাজা শূনিপথে উড়ে ॥

---

১. ঐ, পৃঃ ২৫-৩১
২. লোকগল্পের এটি একটি মটিফরূপে পরিগণিত। Baring Gould বলেছেন, এ শ্রেণীর লোককাহিনী 'Magical conflict Root'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে দুজন যাদুকর জীবন-মরণ সংগ্রাম করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। Ibid., JDL, Vol.VIII, Calcutta, 1922, p. 177

ধূলা হইয়া পন্থে পড়ে রাজা না দেখি উপায় ।
বাতাস বাকুণ্ডি সিঙ্গি রাজা তাহারে উড়ায় ।।
তবেত বীরসিংহ রাজা মারণমন্ত্র পড়ে ।
পাষাণ করিবে রাজা এহি মন্ত্রের জোরে ।।
তিন ফুঁ দিয়া সিঙ্গি রাজা ডাকিনী সারিয়া ।
ভারইয়া রাজার গায়ে দিল ধূলা উড়াইয়া ।।
বাও বাতাসে ধূলা অঙ্গেত লাগিল ।
আছিল মানুষ রাজা পাষাণ হইল ।।[১]

ভারইয়া রাজা আত্মরক্ষায় কখন গাছ, কখন সাপ, কবুতর, মাছ, চিল ও ধূলার রূপ গ্রহণ করেছেন, বীরসিংহ রাজা ময়ূর, বাজ, উদ, শকুনি, বাতাস ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে তাঁকে আক্রমণ করেছেন। শেষবার মারণমন্ত্রে বীরসিংহ তাঁকে 'পাষাণে' পরিণত করেছেন। বীরসিংহ এ মন্ত্র শিক্ষা করেন কামিনীমুল্লুকে মাইয়ানা বুড়ির কাছে। মাইয়ানা বুড়ি কেমন করে 'মানুষ গাছালী হয় পঙ্খী হইয়া উ'ড়' তার মন্ত্র জানে। মন্ত্রের মূল বিষয় বড়ি। পল্লীকবি এর দ্রব্যোপচার ও দীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন,

এই কথা শুনিয়া মাইয়ানা বুড়ি কোন কাম করিল ।
যত যত চিজ বস্তু দলা যে করিল ।।
হারে দেখ কানা মশা, ভালা মাছি,
ভালা বাঘ ভালুকের আঁখি ।
কাকড়ার টেং লৈয়া কনটুড়াতে রাখি ।।
শনিবারের পেঁচার হাড়ি লৈল শেজামেজার কাটা ।
শকুনার পিত্তি লইয়া বানাইল বড়ি ।।
শব শ্মশানে মাটি লইয়া মাইয়ানা কোন কাম করিল ।
নানা জাতির কাষ্ঠে দেখ আগুনি জ্বালাইল ।।
আসনে বসাইয়া নিশিকালে রাজায় মন্তর দিল দান ।[২]

মন্ত্রপূত বড়ির উপচারগুলি মশা, মাছি, বাঘ ও ভালুকের চোখ, কাঁকড়ার ঠ্যাং, পেঁচার হাড়, শজারুর কাঁটা ও শকুনের পিত্তি। এর সঙ্গে শ্মশানের

১. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৭-৭৪
২. ঐ, পৃঃ ১৭৫

মাটিও দরকার। নানা রকম কাঠের আগুন জ্বালিয়ে গভীর রাত্রে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া হয়।

উপরের সব বিষয়ই তামসিক তন্ত্রাচারভুক্ত। দীক্ষার কাল রাত্রি, মন্ত্রের দ্রব্যগুলি কোনটা অশুভসূচক, কোনটা দুর্লভ, কোনটা নিকৃষ্ট। প্রেততন্ত্রের সময় ও বস্তুর দিক থেকে এসবের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরমার ঝুলির 'শীত বসন্ত' গল্পে সুয়োরানী দুয়োরানীর মাথায় এক 'ওষুধের বড়ি' জড়িয়ে দিলে দুয়োরানী টিয়াতে পরিণত হয়। অনেক কাল পরে এক রাজকন্যা টিয়ারূপী দুয়োরানীকে স্নান করাতে গিয়ে মাথা থেকে বড়িটি খুলে ফেললে সে মানবী রূপ লাভ করে।[১] 'কিরণ মালা' গল্পে অরুণ ও বরুণ মায়া-পাহাড়ে 'হীরার গাছ' আনতে গিয়ে দৈত্য-দানোর মায়াবলে 'পাথরে' পরিণত হয়। রাজকুমারী কিরণমালা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে।[২] পূর্ববঙ্গ গীতিকায় 'জিরালনী' পালাগানে মন্ত্রপূত কবচের গুণে রাজকুমার 'হরিণে' পরিণত হয়েছে। বিমাতার কুচক্রে রাজকুমারের এরূপ দশা হয়। রাজকন্যা হরিণের মাথা থেকে কবচ খুলে নিলে রাজকুমার মানবরূপ ফিরে পায়।[৩] এগুলি প্রেত-তন্ত্রের তেলেসমাতির দৃষ্টান্ত। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসে এ ধরণের 'ভোজবাজি'র দৃষ্টান্ত প্রতুল। এক মায়াপুরীতে রক্ষিত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিকে তীরবিদ্ধ করতে না পারায় পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা আছে 'হাতেম তাই' গল্পে।

জীবন প্রতীক

রূপকথার রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাক্ষসপুরীর রাজপ্রাসাদে মৃতবৎ রাজকন্যাকে দেখল। 'সোনার কাঠি' ছোঁয়ালে সে জেগে উঠে, 'রূপার কাঠি' ছোঁয়ালে মৃতবৎ পড়ে থাকে। রাক্ষসপ্রধানের কাছে রাজকন্যা জানতে পারে—সমস্ত রাক্ষসের জীবন আছে একটি জীবন্ত 'ভ্রমরে'র মধ্যে। পুকুরের তলায় কুয়ার নীচে সোনার কৌটায় সে ভ্রমর আছে। রাজকুমার ভ্রমর হত্যা করে রাক্ষসদের নিধন করে এবং

১. ঠাকুরমার ঝুলি : 'শীত বসন্ত' গল্প দ্রষ্টব্য।

২. ঐ, 'কিরণমালা' গল্প দ্রষ্টব্য।

৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪২৯, ৪৪৯

রাজকন্যাকে উদ্ধার করে স্বদেশে ফিরে আসে। এদেশের বহুল প্রচলিত এই রূপকথায় 'সোনার কাঠি-রূপার কাঠি' এবং 'ভ্রমর' যথাক্রমে 'রাজকন্যা' ও 'রাক্ষসে'র 'জীবন-প্রতীক'। লোককথার এটি একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ।[১] বাংলার রূপকথায় ও লোককথায় এ ধরণের জীবন-প্রতীকের (life token) নানা দৃষ্টান্ত আছে। 'ডালিমকুমার' গল্পে ডালিমকুমারের জীবন-প্রতীক হল একটি 'সোনার হার'। কৌটাসহ হারটি ছিল প্রাসাদ-পুকুরে একটি বোয়াল মাছের পেটে। দুয়োরানী হার হস্তগত করে গলায় পরা মাত্রই ডালিমকুমার মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। পরে হার উদ্ধার করে আনলে সে জীবন ফিরে পায়। এই হার হল ডালিম-কুমারের জীবন-প্রতীক।[২] বাংলার লোককথায় গাছকেও জীবন-প্রতীক কল্পনা করা হয়েছে। গাছ শুকিয়ে গেলে প্রতিভূর মৃত্যু, সজীব ও সতেজ থাকলে তার নির্বিঘ্ন-নিরোগ জীবনাবস্থাকে সূচিত করে। সাধারণতঃ নায়কের বিদেশ-গমনে ও প্রবাস-বাসে তার জীবন-প্রতীক আত্মীয়-পরিজনের কাছে উক্ত প্রতিবেদন জ্ঞাপন করে। 'শঙ্খকুমার' গল্পে গাছ এরূপ একটি জীবন-প্রতীক।[৩] রামায়ণে রাবণের জীবন-প্রতীক হল একটি 'বাণ'। হনুমান মন্দোদরির কাছ থেকে এ বাণ নিয়ে এসে তা দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ ও নিহত করা হয়। মহাভারতে কর্ণের রক্ষাকবচ ছিল একটি 'কুণ্ডল'। কুণ্ডল স্বাধিকারে থাকা অবধি তিনি ছিলেন অবধ্য। কুণ্ডল-হারা হলে তবেই তিনি যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। এখানে কুণ্ডল তাঁর জীবন-প্রতীক। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়—লক্ষীন্দরের জীবন-প্রতীক হল একটি জলন্ত 'প্রদীপ'। ভেলায় লক্ষীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বেহুলা শাশুড়ি সনকার কাছে প্রদীপ রেখে বলেছিলেন—ছ'মাস যাবৎ প্রদীপ যদি জলতে থাকে তবে জানতে হবে লক্ষীন্দর বেঁচে উঠেছে, আর নিভে গেলে বুঝতে হবে তার জীবনাবসান হয়েছে।[৪] ক্ষেমানন্দ সতের শতকের কবি। 'গোপীচন্দ্রের

১. স্টিথ থমসন একে ই ৭৬১ মটিফ বলেছেন।
২. বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৫
৩. ঐ, পৃঃ ৭১৭-১৮
৪. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ২০৭

গানে'র নায়ক গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে 'সত্যের পাশা' রেখে গিয়েছিল ; পাশার গুটি উল্টে যাওয়ার অর্থ হল রাজার মৃত্যু।[১] এই পাশার গুটি গোপীচন্দ্রের জীবন-প্রতীক। গোপীচন্দ্রের গান নাথগীতিকা যা লোকগাথা আকারে আঠার শতকে সংগৃহীত। বিষয় ও ঐতিহ্যের দিক থেকে মনসামঙ্গল ও গোপীচন্দ্রের গান প্রাচীন যুগের সম্পদ।

থমসন সাহেবের মতে জীবন-প্রতীক ই৭৬১ সংখ্যার মটিফ। মনুষ্য আত্মা অমর এবং মানবদেহ ছাড়া জড়-জীব যে কোন পাত্র আশ্রয় করে অস্তিত্ব রাখতে পারে—এখানে সেই ধারণা পরিস্ফুট। আত্মার রূপান্তর গ্রহণে ভোজবিদ্যার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ; জীবন-প্রতীকে যাদুবিদ্যার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় না, তবে অন্তধর্মে তা যাদুলক্ষণাক্রান্ত।

অপ্রাকৃত জীব

রূপকথা, উপকথা, লোককথা প্রভৃতি রচনায় অবাস্তব প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। নীতিকথার রূপকগল্পের বাস্তব প্রাণীরা মানুষের মত কথা বলে ও আচরণ করে। গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, বানর, টিয়া, তোতা, ময়না, শুক প্রভৃতি পাখির মুখে ভবিষ্যৎ আজগুবি উক্তির উল্লেখ কেবল রূপকথায়, নীতিকথায় নয়, মধ্যযুগের উচ্চ সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। এগুলি বাস্তব প্রাণীর অবাস্তব ক্রিয়াকলাপের কথা ; আবার অবাস্তব প্রাণীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপও লোক-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভেতর দিয়ে লোকসমাজে-চলে আসছে। এগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক অপ্রাকৃত জীব ; মানুষের ইচ্ছার ও ভাবনার প্রতীক মাত্র।

জীন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতি শরীরী-অশরীরী জীব ছাড়াও বিমিশ্র দেহধারী কতক অতিকাল্পনিক প্রাণীর কথা লোককাহিনীতে আছে, যেমন ড্রাগন, ফেনিক্স, গ্রীফিন, স্ফিংস, ট্রিটন, সেন্টর, হার্পি, সিরেন প্রভৃতি।[২] হিন্দু পুরাকাহিনীতে মৎস্যকুমারী অর্ধমানবী, অর্ধ মৎস্য। এটা সমুদ্রপরী। মুসলমানেরা বোররাকের যে কল্পনা করেছে

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ২২৭
২. The English Duden—A Pictorial Dictinary, London, 1960, p. 556

তাতে তার মুখ মানবীর ও বাকী অংশ অশ্ব সদৃশ্য। 'রুখ'ও পাখি সদৃশ্য অলৌকিক জীব। এটি স্বর্গীয় পাখি।

বাংলার রূপকথা ও কাহিনীতে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দরিয়াবাজ ঘোড়া ইত্যাদির ছবি পাওয়া যায়। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী পরোপকারী পক্ষীজাতীয় প্রাণী। তারা গাছের কোটরে বাস করে এবং ভূত-ভবিষ্যতের খবর রাখে। দুর্গত মানুষ অথবা বিভ্রান্ত পথিককে সাহায্য করা তাদের কাজ। লোককাহিনীতে দেখা যায়, তারা গল্পের নায়ককে অজ্ঞাত ঠিকানা বাতলে দিচ্ছে অথবা অনাগত রহস্য ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে। এমন কি, তাকে কৃপাবশতঃ পিঠে করে দুর্গম স্থলে পৌঁছে দিচ্ছে। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী মানুষের বুলি বলতে পারে।

পক্ষীরাজ ঘোড়া রূপকথা জগতের সজীব ঘোড়া। সে পাখির মত আকাশে উড়তে পারে ; শুধু তাই নয়, আকাশেই বিচরণ করে, কেবল পানি খেতে ভূতলে নেমে আসে। 'হীরার লাগাম' পরিয়ে তাকে বশ করা যায়।[১] কোন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার চাবিকাঠি থাকে কানে — এক কান ঘুরালে আকাশপথে উড়াল দেয়, অপর কান ঘুরালে ধরাতলে নেমে আসে। দ্রুত বেগে গমন এবং দুর্গম পথে গমনের জন্য মানুষ এর কল্পনা করেছে। প্রাচীনকালে রথও ছিল এর তুল্য যা মন্ত্রবলে চলত।

দরিয়াবাজ ঘোড়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার সমগোত্র। দরিয়াবাজ ঘোড়া সওয়ার নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়। গুলেবকাওলীর লৌকিক সংস্করণে খোয়াজ খিজির (দরিয়ার অধিপতি) কর্তৃক তাজুলমুলুককে পরীরাজ্যে গমনের জন্য দরিয়াবাজ ঘোড়া দেওয়ার কথা আছে।[২] দরিয়াবাজ ঘোড়া যে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মুসলমানি সংস্করণ তা সহজেই অনুমান করা যায়। মটিফের দিক থেকে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দরিয়াবাজ ঘোড়া হল marvelous creature বা বিস্ময়কর প্রাণী। থমসন সাহেবের মটিফের শ্রেণীবিন্যাসে এগুলি এফ ২০০-এফ ৬৯৯ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

আলেয়া, মামদো, কন্ধকাটা প্রভৃতি অলৌকিক জীব ও জীবাত্মার সংস্কার বাংলাদেশে আছে।[৩] আলেয়া আলোর মূর্তি, গ্রাম্য কথায়

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২১

২. আশরাফ সিদ্দিকী—কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, পৃঃ ৮৫

৩. লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৬ (ভূমিকা : ডঃ শহীদুল্লাহ কৃত)।

একে 'ভুলা' বলে। ভুলা নারীভূত। তবে সে যে কোন মূর্তি ধারণ করে মানুষের সহিত ছলনা করতে পারে। সাধারণতঃ জলাশয় সংলগ্ন পথে-ঘাটে-মাঠে ভুলার দৌরাত্ম্য বেশি। হিন্দু প্রেতাত্মা 'নিশি'র মত রাত্রিবেলা ভুলার দৌরাত্ম্যের সময়। গৃহস্থকে ঘর থেকে ধোকা দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত ধরে তাকে নাজেহাল করেছে, এমন কথা লোকমুখে শোনা যায়। এজন্য কারও সাথে মাছ ধরা, মাঠে যাওয়া, আটা পেষা বা ধান ভানা ইত্যাদি কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে রাত্রে শুতে নেই। ভুলা মানুষের কণ্ঠ নকল করে ডেকে নিয়ে যেতে পারে এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলতে পারে।[১] রাত্রিবেলা ঘুমের সময় মানুষের উপর ভর করে এমন প্রেতাত্মার নাম 'বোবা'। সাধারণতঃ চিত হয়ে শুলে 'বোবায় পায়'। স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে মানুষ বিকৃত স্বরে গোঙাতে থাকে, কিন্তু সহজে জাগতে পারে না। একেই 'বোবায় পাওয়া' বলে। বোবা শয়তানের শ্রেণীভুক্ত অনিষ্টকারী অশরীরী আত্মা। 'মামদো' হল ভূতের শ্রেণীভুক্ত প্রেতাত্মা। এটি পুরুষ ভূত। লালবিহারী দে একে মুসলমানের ভূত বলেছেন।[২] ষোল শতকের কাব্য কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে 'মামদো' ভূতের কথা আছে।[৩] মামদো বাতাসে মিশে থাকতে পারে। সে লোকালয়ের কাছে গাছ-গাছড়াকে আশ্রয় করে বাস করে। ভুলার মত মামদোও অনিষ্টকারী ভূত। 'কন্ধকাটা' অলৌকিক জীব; অঞ্চল বিশেষে তা 'গলাকাটা মঙ্গলা' নামেও পরিচিত।[৪] কন্ধকাটা মানুষকে আস্ত গিলে খায়— এরূপ লোকভীতি আছে। সে পথের পাশে ঝোপ-ঝাড়ে গর্তে বাস করে।

১. মুর্শিদাবাদে আলেয়া সম্পর্কে এরূপ লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার আছে। নিজস্ব সংগ্রহ।

২. Lal Bihari De—Bengal Peasant Life, London, 1909, p. 105
মামদো আরবী 'মমদূহ' শব্দজাত। ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ' দ্রষ্টব্য।

৩. আকাশে কুমুদা আছিল মামুদা
ধরিয়া পুরিল গালে।
উদ্ধৃত: ঐ, পৃঃ ২৯৯

৪. মুর্শিদাবাদে এ নাম শোনা যায়। নিজস্ব সংগ্রহ।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'কানকাটা হাপা'র উল্লেখ আছে।[১]

জুজু বা জুজুবুড়ি স্ত্রীভূত, বৃদ্ধা পিশাচী। দুরন্ত শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য জুজুবুড়ির নাম করা হয়। শিশুরা তাকে ভীষণ ভয় করে। সংস্কৃতে 'জুঃ' শব্দ আছে, অর্থ পিশাচী; ফারসীতে 'জু' শব্দ আছে, অর্থ অনুসন্ধানকারী; পশ্চিম আফ্রিকার লৌকিক ভাষায় juju শব্দ পাওয়া যায়, অর্থ ছেলে ধরা।[২] তিন ভাষার শব্দই প্রায় সমার্থবাচক। ছেলের খোঁজ করে এবং ধরে নিয়ে যায় এমন বুড়িই জুজুবুড়ি। শব্দটি যে কোন ভাষা থেকে এসেছে, তা ঠিক করে বলা যায় না। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার প্রভাব বাংলাদেশে গভীরভাবে পড়েছে। মধ্যযুগে আফ্রিকার হাবসী দাস ও সৈন্য রাজকার্যে নিয়োজিত ছিল। অনেক হাবসী ভারতে রাজত্ব করে গেছে। বাঙালীর দেহে নেগ্রিটো রক্তধারা আছে। অতএব আফ্রিকার সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন এদেশে পড়তে পারে। বাংলা সাহিত্যে প্রামাণিকভাবে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' জুজু শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়: 'এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা।'[৩] তিনি আঠার শতকের প্রথমার্ধের কবি। উনিশ শতকে ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারিচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের রচনায় 'প্রেতাত্মা' অর্থে জুজু শব্দের ব্যবহার আছে।

চোরাচুন্নি, শাঁখচুন্নি স্ত্রীজাতীয়া এবং সমগোত্রীয়া প্রেতাত্মা। 'গোর্খবিজয়ে' (যুগীকাচ অংশে) চোরাচুন্নির উল্লেখ আছে।

স্বপ্নেতে যেবা নারী ছেলে প্রসব করে।
নিশ্চয় জানিবা তাহা চোরাচুন্নি ধরে ॥[৪]

শাঁখচুন্নি প্রেতযোনিপ্রাপ্তা সধবা নারী। চোরাচুন্নির মত শাঁখচুন্নিরও শিশুর উপর লোভ। এরা গাছের আড়ালে আবডালে থাকে, একা পেলেই

---

১. তোর বাপে আন গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কানকাটা হাপা।

'মানসিংহ-ভবানন্দ' অংশ দ্রষ্টব্য।

২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৬৩

৩. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের 'মানসিংহ-ভবানন্দ' অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. উদ্ধৃত: শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—গোর্খ-বিজয়, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২০০

শিশুর উপর ভর করে। কোন শিশু ক্রমশঃ শুকিয়ে গেলে এবং অনবরত কাঁদলে লোকে ধারণা করে যে তাকে চোরাচুন্নিতে বা শাঁখচুন্নিতে পেয়েছে। পানি পড়া দিয়ে এ দোষ দূর করতে হয়। রংপুরে 'সোবোচুন্নি' নাম পাওয়া যায়। সামীয়ুল ইসলাম সাহেব লিখেছেন, "সোবোচুন্নি নামক একটি পেত্নী আছে সে মেয়ে লোকের পেছনে লাগলে আর ছাড়তে চায় না।"[১] 'ভ্যাটার ফুল' দিয়ে সোবোচুন্নির প্রভাব দূর করতে হয়। মেয়েলীগীতে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

দেমোঁ ভ্যাটার ফুল ছাড়েক দূয়ের।
সারেক রই সোবোচুন্নি ছাড়েক দূয়ের ॥[২]

শিশুখাদক প্রেতাত্মা 'টাকরা-টাকরী'র নামও পাওয়া যায়। এরা অশরীরী প্রেতাত্মা। ব্রহ্মদৈত্য পরোপকারী ভূত। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে, এজন্য সে শিষ্ট ভূত (benevolent ghost)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে 'ব্রহ্মদৈত্য' শিরোনামে একটি লোককাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তাতে 'আলাউদ্দীনের প্রদীপে'র অনুগত দৈত্যের মত ব্রহ্মদৈত্য একজন দুঃস্থ ব্রাহ্মণকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে। সে অভিশাপগ্রস্ত স্বর্গলোকবাসী; ব্রাহ্মণকে সাহায্য করায় তার প্রেতজীবনের অবসান ঘটে। সে স্বর্গে চলে যায়।[৩] আশুতোষ বাবু বলেছেন, মানুষের সহিত সম্পর্কিত ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য-দানব ভারতীয় পুরাণকাহিনীতে নেই; তারা দেবতার শত্রু। তারা দুরাত্মা রূপেই চিত্রিত। আরব্য-পারস্য কাহিনীগুলিতে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দৈত্য-দানবের কথা আছে। অতএব মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ভূত-প্রেতাদি আরব-পারস্য সংস্কৃতির প্রভাবজাত।[৪]

আকাশ ও স্থলের মত পানিতেও অপ্রাকৃত প্রাণী আছে। 'কিচনী' 'জলকাওরী' প্রভৃতি পানির জীব। কিচনী বদ্ধ পুকুর অথবা জলাশয়

---

১. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৭০
২. ঐ, পৃঃ ২৭০
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৮
৪. ঐ, পৃঃ ২১৩-১৪

এবং নদীর দহে বাস করে। যে স্থানের পানি গভীর এবং কাজল কাল সে স্থানে কিচনী থাকার সম্ভাবনা বেশি। কিচনীর লম্বা লম্বা কাল চুল থাকে বলে এরূপ হয়। জলকাওরী (<জলকুমারী) স্ত্রীজাতীয় অপ্রাকৃত জীব। সে নদীতে বাস করে। খাদ্যাদি ভোগ দিয়ে কিচনী ও জলকাওরীর গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

লৌকিক খেলাধুলা

মানুষ কেবল ব্যবহারিক জীবনে জীবিকাবহুল কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর প্রয়োজন। নিস্পৃহ বিশ্রাম আবার বেদনাবহ। এজন্য মানুষের অবসর উপভোগ নিমিত্ত আমোদস্ফূর্তি চাই। মানুষ এযাবৎ চিত্তবিনোদনের বহু উপায় ও উপকরণ আবিষ্কার করেছে। নাচগান, খেলাধুলা, গল্পগুজব, ভ্রমণ, শিকার প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। উপযোগিতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলাধুলাই এগুলির মধ্যে উত্তম। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে মানবজীবনের দুটো প্রধান উপকার সাধিত হয়। এক : দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতার মাঝে আবিষ্ট মনের মুক্তি—এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবনযাত্রার পথে নবশক্তির সঞ্চার করে। দুই : শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ; কায়িক শ্রম-সাপেক্ষ খেলাধুলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়। জীবনযাপনের উভয়বিধ উপযোগিতা থেকে মানুষ খেলাধুলার চর্চা করে আসছে।

মূলতঃ জৈবিক প্রয়োজনবোধ থেকে খেলাধুলার রীতি ও কৌশল মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। কয়েকটি খেলার আদি উৎস ও বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় যে, পূর্বে খেলা অবসর বিনোদনের জন্য নয়, জীবিকার্জন ও আত্মরক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই গণ্য হত। আদিম অরণ্যচারী মানুষ পশুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতো ; পশু ও মৎস্য শিকার করে আহার্য উপকরণ সংগ্রহ করত। কিন্তু অধুনা পশু শিকার হবিতে পরিণত হয়েছে। কুস্তি ও লাঠিখেলা একসময় আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যক উপায় ছিল, পরবর্তীকালে খেলার অঙ্গরূপে অনুশীলিত হয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। জীবনরক্ষা ও জীবিকার্জনের নতুন উপায় উদ্ভাবনের

সাথে সাথে এগুলির অপরিহার্যতা ক্রমে ঐচ্ছিক ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দোপভোগের বিষয় হয়ে পড়েছে। দাবা কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা।[১] বাস্তব যুদ্ধের কৌশল ও রহস্য এতে প্রচ্ছন্ন।

কেবল মানসিক আমোদস্ফূর্তি ও জৈবিক প্রয়োজনসিদ্ধি নয়, কোন কোন খেলার উৎসমূলে ধর্মীয় প্রেরণা আছে। বাংলার কতক আনুষ্ঠানিক ও ছড়ার খেলায় লোক-বিশ্বাস ও মন্ত্রশক্তির প্রভাবেব সূত্র পাওয়া যায়। যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক ছড়ার খেলা। বৃষ্টির ছড়ায় আকাশের মেঘকে আবাহন করা হয়। এতে যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে।

চিত্তবিনোদন ও শরীর চর্চা খেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কোন কোন খেলার ভেতব দিয়ে বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানেব চর্চা হয়। ধৈর্য এবং সংযম ভাল খেলোয়াড়ের প্রধান গুণ। ধৈর্যের সহিত অনুশীলন যেমন খেলার দক্ষতা অর্জনের উপায়, সুচিন্তিত কৌশল তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সহায়ক। ধাঁধার খেলায় মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়। কোন কোন খেলায় গণিত শিক্ষার উপকরণ আছে। বিশেষতঃ লৌকিক খেলায় এ গুণটি অধিক লক্ষীভূত হয়। এক্কা-দোক্কা, ষোলগুটি প্রভৃতি খেলায় সংখ্যা গণনার অভ্যাস হয়।

কতকগুলি খেলাধুলা আছে যা অন্তর্নিহিত স্বরূপে জীবনের অনুকরণ করে থাকে। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ খেলার মধ্যে 'অভিনয়ে'র আদি উৎস অনুসন্ধান করে থাকেন।[২] নাগরিক খেলায় অভিনয় ধর্মটি লুপ্ত, কিন্তু লৌকিক খেলায় তা অব্যাহত। 'রাজার কোটাল', 'চোর চোর', 'মোগল পাঠান' প্রভৃতি গ্রাম্য খেলার মধ্যে জীবনের ছবি আবিষ্কার করা যায়। তবে এখানে জীবন রূপের প্রতিফলনটি সজ্ঞান প্রসূত নয়। খেলার স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ ছেড়ে অভিনয়ের কৌশল দেখানর জন্য কেউ খেলায় মনোযোগী হয় না। খেলোয়াড়ের অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত স্থূলভাবে তা ঘটে থাকে। ছড়ার খেলায় কেবল ক্রিয়াগত অভিনয়ের ধর্ম নয়, সংলাপগত ধর্মটিও যুগপৎ সংরক্ষিত। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "অভিনয়ের মধ্যে যেমন দৈহিক ক্রিয়া এবং মৌখিক সংলাপ উভয়েই এক সঙ্গে

১. SDFML, Vol. 1, p. 432
২. ERE, Vol. VI, p. 167

ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছড়াযুক্ত খেলাতেও তাহাই করিতে হয়, সুতরাং ইহার মধ্যেই যে নাটকের আদিরূপ প্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।"[১] 'কানামাছি' খেলায় ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে খেলাও চলতে থাকে। 'আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।'[২] বলে ছড়াটি আবৃত্তি করতে করতে চোখ-বাঁধা অবস্থায় ছেলে অথবা মেয়ে যে ভাবে হাত-পা নেড়ে অন্যান্যদের ছোঁয়ার চেষ্টা করে তাতে মনে হয়, সত্য সত্যই অপরের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি তার নজর অল্পই। মুখের কথাকে সে আঙ্গিক ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলে। হাডুডু খেলতে খেলতে কোন কোন সময় ছড়া বলা হয়। হাডুডু বীরত্বের খেলা। ছড়ার মধ্যে বীরত্বসূচক মন্তব্য করতে করতে খেলোয়াড় দৈহিক অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তার ভাবটিও প্রকাশ করে থাকে। 'এক হাত বোলতা তিন হাত শিং। উড়ে যায় বোলতা ধা তিং তিং।'[৩] হাত প্রসারিত করে দীর্ঘ 'শিং' এবং বীরোচিত পদক্ষেপে 'ধা তিং তিং' এর আঙ্গিক রূপায়ণ বক্তার ভঙ্গিতে ফুটে উঠে। অবশ্য এ ভঙ্গির মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং উচ্চ কলার নিদর্শন নেই। কথার অর্থ ধরে ভাব ফুটিয়ে তোলা গ্রাম্য খেলা দূরের কথা, অধিকাংশ লৌকিক নাচেও নেই। ছড়ায় খেয়ালি মনের তরল ভাবকল্পনা আছে। ছড়ার সংলাপেব মত খেলার ক্রিয়াও অসংলগ্ন ও পারম্পর্যহীন। সূক্ষ্ম ও সুবিন্যস্ত কলাকৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে। জীবনরূপকে বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে জীবনচর্যার সুষ্ঠু নিয়ম।

খেলাধুলার মাধ্যমে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সাহস ও বিক্রম প্রকাশ পায়। প্রতিযোগিতার খেলায় খেলোয়াড়ের মনোবল ও সাহসিকতা অত্যাবশ্যক গুণ। জীবজন্তুর সাথে খেলাধুলাতেও সাহস ও শক্তির প্রয়োজন হয়। বানর খেলা, সাপ খেলা, ভালুক খেলা, শিকার এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কুস্তি, লড়াই, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে সবল ও সাহসী মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে। বাজি খেলায় ধৈর্য, সাহস ও কৌশল

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪
২. উদ্ধৃত : ঐ, পৃঃ ২৬৫
৩. ঐ, পৃঃ ২৫৩

দরকার। এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে এসব খেলা অধিক চর্চা করে।

খেলামাত্রই দলবদ্ধ। একক খেলায় আনন্দ নেই। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে ভোগের মধ্যে আনন্দ বেশি। একক খেলায় অবসরযাপন হয়, অবসরবিনোদন হয় না। দক্ষতা প্রকাশের আগ্রহ খেলাধূলার অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে নেই সেখানে দক্ষতা প্রকাশ করা যায় না। একক খেলার আসক্তিহীনতার এটা একটা কারণ। ক্রীড়া কৌতুকাবহমাত্র নয়, ফলাকাঙ্ক্ষী। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর দিয়ে জয়-পরাজয়ের ফল বৈষয়িক সম্পর্ক অপেক্ষা মানুষের তৃপ্তি-অতৃপ্তির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এতে নিস্পৃহতা, অসমর্থতা ও শিথিলতা অবাঞ্ছিত। সংঘবদ্ধ খেলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বলে খেলোয়াড় একাধারে পায় অপার আনন্দ, মিলনের অফুরন্ত সুযোগ, নিঃসঙ্গতার পীড়ামুক্তি আর দৈহিকচর্চার প্রাণপ্রাচুর্য।

দলবদ্ধতার জন্য খেলাধূলায় ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ অত্যাবশ্যকগুণ। এতে পারস্পরিক স্বার্থোপলব্ধি, সহযোগিতাবোধ ও নীতিশৃঙ্খলাজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সকল খেলার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়ম-নিষ্ঠা ও সময়জ্ঞানের জন্য খেলার একটা নৈতিকমূল্যও স্বীকৃত হয়। খেলায় খেয়ালখুসিতা সর্বদা সর্বথা সর্বৈব বর্জনীয়। যেখানে সহযোগিতা আছে, সেখানে সহনশীলতা আছে। ঐক্য ও শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, সংযম ও সহযোগিতা নৈতিকজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। খেলাধূলায় মানুষ এ সম্বন্ধে দীক্ষা নিতে পারে। মৈত্রেয় জ্ঞান ও সামাজিকবোধ খেলার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে।[১]

খেলার প্রাঙ্গণ একটা মিলনতীর্থ। নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত। পরস্পরের ভাব বিনিময়ে মনের জড়তা কাটে, দীনতা দূর হয়। এতে স্বীয় দলের এবং প্রতিপক্ষ দলের সহিত মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের ফলে সুহৃদ সম্পর্ক গড়ে উঠে ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

---

১. সমালোচক বলেছেন, 'To begin with, a game must be a social activity. SDFML, vol. 1, p. 432

ক্রীড়ার উদ্দেশ্য, উপযোগিতা ও অন্তর্নিহিত গুণধর্মের বিচারে পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞগণ একে তিন ভাগে ভাগ করতে চান। যথা,

ক. Games of skill
খ. Games of chance
গ. Games of imitation[১]

তাঁদের মতে skill বা দক্ষতার খেলায় দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণগুলির অনুশীলন হয়। অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ, কলাকৌশল, ক্ষিপ্রতা, সম্প্রীতি, সহনশীলতা অর্জিত হয়। chance বা ভাগ্যের খেলায় কৌশল প্রয়োগের সুযোগ অল্প। খেলার উপকরণ ও পদ্ধতির জন্য এরূপ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, 'পাশা' খেলায় ছয়তল বিশিষ্ট গুটির চালের উপর খেলোয়াড়ের হাত যতখানি, দৈবের হাত তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এসব খেলার জয়-পরাজয় দক্ষতার উপর নয়, দৈবের উপর নির্ভরশীল। অবসরবিনোদন ছাড়া এতে অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। Imitation বা অনুকরণধর্মী খেলায় অভিনয়গুণ বড় এবং অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ এর মূল উদ্দেশ্য। আনুষ্ঠানিক ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা নেই কিংবা থাকলেও গৌণ এবং নগণ্য।

খেলাধুলার প্রকৃতি, অনুশীলন পদ্ধতি এবং স্থান নির্বাচনের দিক থেকে সাধারণভাবে এগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পাশ্চাত্ত্য ক্রীড়াবিদগণ এর নাম দিয়েছেন Indoor games এবং Outdoor games। Outdoor games শ্রমের ও শক্তির খেলা। শক্তির প্রয়োগ আছে বলে বিপদের ঝুঁকিও আছে। খেলার পদ্ধতি ও উপকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন। আধুনিক আন্তর্জাতিক খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, গল্ফ প্রভৃতি খেলা এ শ্রেণীভুক্ত। Indoor games লঘুশ্রম বা শ্রমহীনের খেলা।[২] শক্তির চেয়ে বুদ্ধির কলা-

১. ERE, Vol. VI, p. 167
২. বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত একটি প্রবন্ধে শব্দ দুটির পরিভাষা হিসেবে 'চলতি খেলা' ও 'বসতি খেলা' ব্যবহার করেছেন। তিনি 'শরীর খেলা' ও 'মানস খেলা' শব্দ দুটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ধরণের বাংলা পরিভাষা মূলের পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক নয়। দ্রষ্টব্য: বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪, পৃ: ১১৫-১৬

কৌশল প্রদর্শনই এ খেলার মূল লক্ষ্য। এ খেলার বস্তু উপকরণ এমন যে রৌদ্র-বাতাসে তা সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্প বাতাস টেবিল-টেনিস খেলার অনিষ্ট করে। তাস, দাবা, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলায় ঈষৎ বৃষ্টি হলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং গৃহচ্ছায়ায় এসব খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উপরের খেলাগুলি নাগরিক এবং অধিকাংশই বিদেশীয়। বাংলার দেশীয় খেলাধূলারও উক্ত বিভাগ সমর্থন করা যায়। হাডুডু, ডানগুলি, লাঠিখেলা প্রভৃতি Outdoor games এবং বাঘবন্দী, কড়িখেলা, বৌ-বাসন্তি, পুতুলখেলা প্রভৃতি Indoor games। খেলায় এ প্রকার বিভাগ স্থূল। দেশজ খেলায় নিয়ম কানুনের নিবিড় আনুগত্য এবং বস্তু-উপকরণের উৎকৃষ্টতা নেই যার জন্য স্থান নির্বাচনের অপরিহার্যতা আছে। খড়, মাটি, লাঠি, কাঠি, গুটি, কড়ি, বীচি প্রভৃতির সাহায্যে গ্রাম্যখেলা অনুষ্ঠিত হয়। আবার কতক খেলার বৈশিষ্ট্য এমন যাতে ঘর-বাইরের বাছ-বিচার করা হয় না। দুচারটি খেলা ছাড়া এ নিয়ে তর্ক বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ছড়ার খেলায় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। মৌখিক আবৃত্তি করে নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য বালকবালিকারা তা খেলে থাকে। বাংলার গ্রাম্য খেলার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন পদ্ধতি, খেলার বিষয়গুণ এবং স্থানধর্ম অনুধাবন করে নিম্নরূপ বিভাগ করে আলোচনা করা হল :

(১) শ্রমসাপেক্ষ শরীর চর্চার খেলা—হাডুডু, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, নুনতা, চিক্কা, এ্যাঙ্গাএ্যাঙ্গা, ডানগুলি, লাঠিখেলা, গাইগোদানি, সোলঝাপ্টা প্রভৃতি।

(২) শ্রমহীন আমোদের খেলা—বাঘবন্দী, ষোলঘুঁটি, চামড়িখেলা, এক্কা দোক্কা, বউরানী, কড়িখেলা, ঘুঁটিখেলা, কানামাছি, ছি-ছত্তর, রুমালচুরি, কুমীর কুমীর খেলা ইত্যাদি।

(৩) পানির খেলা— হোলডুগ, লাই, তইতই খেলা, পানিঝুপ্পা, ছিল্কি, হট্টিহট্টি।

(৪) ছড়া ও ধাঁধার খেলা—আগডুম বাগডুম, ইকড়ি মিকড়ি, ঘুণি খেলা, রাজার কোটাল, ব্যাঙ্গের মাথা প্রভৃতি।

(৫) আনুষ্ঠানিক খেলা—কাদামাটি, পাতা খেলা, চুঙ্গা খেলা, চোপের খেলা।

হাডুডু

হাডুডু বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। জনপ্রিয়তার জন্য একে বাঙালীর জাতীয় খেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। হাডুডু শক্তির খেলা। সেজন্য তরুণ ও যুবকেরা এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। অল্প বয়সের বালকেরাও হাডুডু খেলতে পারে। কিন্তু দল গঠনে কিশোর ও যুবকের সংমিশ্রণ অনুচিত। শক্তির ও বীরত্বের খেলায় অসম বিভাগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তরায়, আবার খেলোয়াড়ের অঙ্গহানির সম্ভাবনায় পরিণতিও অশুভজনক হয়। মেয়েরা এতে অংশ গ্রহণ করে না।

বিশেষজ্ঞ মনে করেন, 'হাঁটু' শব্দ থেকে হাডুডু নামটি এসেছে।[১] হাডুডুর নানা আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়। যেমন রাজশাহীতে 'কপাটি' ময়মনসিংহে 'চিক্করানী', রংপুরে 'টিকটিক'।[২]

হাডুডু দুটি নিয়মে খেলা হয়, মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা বেঁধে এবং সীমানা ছাড়া। প্রথমটি 'কোটবন্দী' ও দ্বিতীয়টি 'ছাড়া কপাটি'।[৩] কোটবন্দীর খেলায় কোট বা ঘরের দৈর্ঘ-প্রস্তের নির্দিষ্ট মাপের দিকে পল্লীবাসীরা খুব কমই নজর দেয়, কেবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত সীমানা দেওয়া হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই ছকের পরিমাপ দিয়েছেন ২১ × ১৪ বর্গহাত।[৪] ঘরটি মাঝের একটি সরল রেখা দ্বারা সমান দু'ভাগে বিভক্ত। অঞ্চল বিশেষে এ রেখাটির বিভিন্ন নাম, খুলনায় 'গাং', যশোহরে 'থান', কুষ্টিয়ায় 'ডোঁড়' প্রভৃতি। কোটবন্দী হোক, ছাড়াকপাটি হোক এ রেখাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সীমানা নির্দেশক

১. Traditional Culture in East Pakistan, p. 143
হাঁটু > হাডু + ডু। হাঁটু বা উরুর উপর হাতের তাল দিয়ে যেমন খেলোয়াড় ডুগ দেয়, আবার প্রতিপক্ষের দল তার হাতে ও হাঁটুতে টান ও প্যাঁচ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করে। এদিক থেকে খেলাটির নামের সার্থকতার অনুসন্ধান যথার্থ।

২. মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮০
গোবিন্দলাল দাস—রংপুরে গ্রাম্য খেলার মেলা, পূর্বদেশ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

৩. Traditional Culture in East Pakistan, p. 143

৪. Ibid., p. 143

সীমান্ত রেখাটির পারাপারের উপর খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা ও স্বাধিকার নির্ভর করে। ঘর দুটিতে দুপক্ষের সমান সংখ্যক খেলোয়াড়গণ আশ্রয় নিয়ে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে নিজেদের সজ্জিত করে নেয়। কোটবন্দী খেলায় বাইরের সীমানার বাধ্যবাধকতা মানতে হয়, অর্থাৎ খেলার অন্তবর্তী-কালীন সময়ে সীমানা রেখা অতিক্রম করা যে কোন অবস্থায় অবিধেয়। ছাড়াকপাটি খেলায় কেবল গাং ছাড়া বাইরের সীমরেখার বাঁধন নেই।

খেলা শুরু হলে পর এক পক্ষের যে কোন একজন মাঝ রেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপর পক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে। একে খুলনায় 'ডুগ', নোয়াখালিতে 'বোল' দেওয়া বলে। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে হাডুডু বা হা টিকটিক বা কপাটি কপাটি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি অথবা দুচার চরণের ছড়া আবৃত্তি করতে হয় ছড়াগুলি সাধারণতঃ স্বীয় বীরত্বব্যঞ্জক অথবা প্রতিপক্ষের প্রতি অবমাননাকর ও বিদ্রূপাত্মক হয়ে থাকে।[১] সম্পূর্ণ শ্বাস রেখে ডুগ দেওয়ার সময় বিপরীত পক্ষের যে কোন একজনকে ছুঁয়ে গাং পার হলে পর যাকে ছুঁয়েছে, সে মারা

---

১. বীরত্বব্যঞ্জক বোলের দৃষ্টান্ত:

চি চাটকা আমের বোল,
গাছে উঠি মারি শোল।
শোলের কপালে ফোঁটা
খেড়ু মারি গোটা গোটা। —ঢাকা

উদ্ধৃত: বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪

আমি যাই পুরে,
বাঁশ কাটি কুপে,
বাঁশের নাই আগ
আমার নাম বাগ।

উদ্ধৃত: গোলাম কাদির—আমাদের লোকসাহিত্যের একদিক, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, পৃ: ১৭৬

অপমানজনক বোলের দৃষ্টান্ত:

হাডুডু পেয়ারা পাতা।
দুগালে দুটি ছেড়া জুতা॥ —২৪ পরগণা

উদ্ধৃত: বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৯

যাবে অর্থাৎ সে খেলায় অধিকার হারাবে। আর যদি নিজেই আটকা পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ডুগ দিতে আসবে অপর পক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়। একে পাল্টা ডুগ বলা হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি বা ধরা পড়ার ফলাফল একই রকম। না ছুঁয়ে বা ধরা না পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলে ফল অমীমাংসিত ও অপরিবর্তিত থাকে। হাডুডু খেলার লক্ষণীয় একটা দিক হল: বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের মরা খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে 'জীবিত' করতে পারে। কোন এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা পড়লে একটা 'গেম' হয়। আঞ্চলিক ভাষায় গেমকে 'চাঁদ' (রাজশাহী), বা 'পাট্টি' (ঢাকা) বলে। সকল ও সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলাটি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং পূর্ববৎ চলতে থাকে।

খেলার পদ্ধতি প্রমাণ করে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণই এর প্রশস্ত ক্ষেত্র। এতে বীরত্ব ও পুরুষত্ব প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শরীরচর্চার দিক দিয়েও খেলাটির গুরুত্ব স্বীকার্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "এই খেলায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া যেভাবে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহাতে একদিক দিয়া শরীর-চর্চা এবং অপর দিক দিয়া বুদ্ধি বৃত্তিরও অনুশীলন হইয়া থাকে।"[১]

দু'পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলবদ্ধ হাডুডু খেলার অন্তর্নিহিত গুণ বিচারে কৌমজীবনের সংগ্রামশীল একটা মনোভাবের পরিচয় অনুসন্ধান করা যায়। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিপক্ষদের মেরে ফিরে আসা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ধরা পড়া যুদ্ধের কৌশল ও পরিণতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আক্রমণকারীকে ধরার জন্য আক্রান্তদল পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে একটা ব্যূহ রচনা করে। সাহসী যে, কুশলী যে সে ব্যূহ ভেদ করে শত্রুকে মেরে চলে আসে, দুর্বল আর দক্ষহীন যে সে ধরা পড়ে, বন্দী হয়। প্রাচীন যুগে এদেশে যুদ্ধের কৌশলটা ছিল ঐরূপ। তখন দৈহিক শক্তি, মনোবল ও কুশলতার দ্বারা জয়-পরাজয় নির্ভর করত।

---

১. ঐ, পৃঃ ২৫৪

বউছি

হাডুডুর কোন কোন বৈশিষ্ট্য বউছি খেলায় আছে, আবার নতুনত্বও আছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ও স্পর্শ করে ফিরে আসায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মারা পড়া ইত্যাদি বিষয়ে মিল আছে। এজন্য বউছির আঞ্চলিক নাম 'বুড়িকপাটি' পাওয়া যায়।[১] তবে সামগ্রিক ভাবে মিলের চেয়ে পার্থক্য অনেক বেশি। খেলার বর্ণনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। দৌড়ের এবং শ্রমের খেলা হলেও বউছি হাডুডুর মত পুরুষকারের খেলা নয়। এতে আক্রমণটা একপক্ষীয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা প্রতিরোধ করে না, পালিয়ে স্পর্শ বাঁচায়। গায়ের জোরের চেয়ে পায়ের দৌড়ের উপর খেলাটি অধিক নির্ভরশীল। সুতরাং হাডুডুর আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের আঘাত খেয়ে অঙ্গহানির সম্ভাবনা এতে কম। নিরাপত্তাবোধে বালক বালিকা উভয়েই একত্রে অথবা আলাদাভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। বয়স্ক পুরুষেও বউছি খেলতে পারে। দল নির্বাচনে ও সংগঠনে সমান বয়স্ক খেলোয়াড় না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে না।

বুড়িকপাটি ছাড়া বউছির আরো অনেক আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়, যেমন 'ছিধরা' (ময়মনসিংহ), 'বুড়িছুট' বা 'ছিরানী' (ঢাকা), 'বুড়িয়ার চু' বা 'নাগোদাড়া' (যশোহর), 'খেটে' (মুর্শিদাবাদ), 'থুম' (নোয়াখালি), 'বউগোলা' (বরিশাল) প্রভৃতি। নামের বিভিন্নতা নিয়েও স্থানবিশেষে সামান্য তারতম্য ছাড়া খেলাটিতে দেশব্যাপী একটা অভিন্ন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

বউছি দুপক্ষের সংঘবদ্ধ খেলা। সমান সংখ্যক খেলোয়াড় (প্রায় ৮/১০ জন) নিয়ে দল গঠিত হয়। সমতলভূমিতে ২০/২২ হাত ব্যবধানে দুটো ঘর কাটা হয়—একটি 'বউঘর' অপরটি খেলোয়াড়ের ঘর। এটি 'জুরিঘর' (বরিশাল), 'খল্লা' (পাবনা) বা 'কালকোট' (খুলনা) নামে পরিচিত। বউঘর আকারে ছোট ও গোলবৃত্ত, জুরিঘর আকারে বড় ও চৌকোণা।

টস অথবা আপোষে কোন দল প্রথম খেলার সুযোগ পাবে তা স্থির করা হয়। একে 'দান' বা 'ঘাই' পাওয়া বলে। দলের মধ্যে

১. রাজশাহী জেলায় এ নামটি প্রচলিত। নিজস্ব সংগ্রহ।

অধিকতর চালাক ও সমর্থ খেলোয়াড় 'বউ' বা 'বুড়ি' বসে। সমস্ত খেলাটিতে বুড়ির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বউঘর থেকে জুরিঘরে পৌঁছতে পারলে এক পয়েন্ট হয়। রাজশাহীতে একে 'বুড়ি', খুলনায় 'গোল্লা', যশোহরে 'পাড়' বলে। প্রয়োজনবোধে গোল্লা শেষে বুড়ি পাল্টাতে পারে।

বউঘরে বুড়ি, জুরিঘরে অন্যান্য খেলোয়াড়, বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা উভয় ঘরকে ঘিরে সুবিধা ও প্রয়োজনমত স্থান করে নেয়। লক্ষ্য হল বুড়িকে জুড়িঘরে আসতে না দেওয়া। বুড়িকে ঘরের বাইরে স্পর্শ করতে পারলে তারা দান পাবে। বিপক্ষরা যেমন সতর্কভাবে পাহারা দেয়, বুড়ি তেমনি সতর্কতার সহিত দৌড় দেয়। বিপক্ষের অবরোধ ভেঙে দেওয়ার জন্য স্বপক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড় শ্বাস রেখে জুরিঘরের বাইরে এসে তাড়া করে। তার মুখে অর্থহীন ধ্বনি অথবা ছড়ার বোল।[১] দম নিয়ে এভাবে বাইরে যাওয়াকে 'ছি' দেওয়া বলে। এ থেকেই খেলাটির নাম বউছি হয়েছে। ছি দিয়ে কাউকে স্পর্শ করে দম রেখেই যদি জুরিঘরে ফিরে আসতে পাবে তবে উক্ত খেড়ু মারা যাবে। আর যদি আগেই শ্বাস ছেড়ে দেয় তবে সে'ই মারা পড়বে। দম শেষ হয়ে এলে সে প্রয়োজনবোধে বুড়ির ঘরে আশ্রয় নিতে পারে। বউছি খেলায় যে একবার মারা পড়ে, পাড় না হওয়া পর্যন্ত সে আর জীবিত হতে পারে না। হাডুডুর সঙ্গে বউছির এখানেই পার্থক্য। যখন ছি দেওয়া হয় তখন নিরাপদ বুঝে বউ জুরিঘরে চলে আসতে পারে। বিপক্ষের সবাই মারা পড়লে বউ-এর পথ নিরঙ্কুশ হয়। ছি দিতে গিয়ে যদি স্বপক্ষের সবাই মারা পড়ে, তবে বুড়িকে ব্যূহ ভেদ করে দৌড় দিয়ে আসতে হয়। কোন কোন স্থানে নিয়ম আছে, স্বপক্ষের খেড়ু মারা গেলে বুড়িকে এক নিঃশ্বাসে দু'ঘরের মাঝের দূরত্ব দু'বার অতিক্রম করতে হয়। সফল হলে তার দল গোল্লা পায়, যাইও

১. দৃষ্টান্ত : কাঁচা কলা পাকা আম,
বউ ছুঁইতে গেছিলাম। —রংপুর

চুক গাব না চৌরী গাব,
পাতিনেবুর বাতি খাব। —যশোহর

উদ্ধৃত : পূর্বোক্ত, পূর্বদেশ. ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

পায়। ব্যর্থ হলে বিপক্ষরা ঘাই নিয়ে খেলা শুরু করে। মোটামুটি বউছি খেলার এটাই নিয়ম।

বউছি ব্যায়ামসর্বস্ব ও অত্যন্ত আমোদজনক খেলা। এতে কোন বস্তু-সরঞ্জাম নেই। বউকে ঘিরে বিপক্ষদলের অবরোধ এবং স্বপক্ষের সহায়তায় সে অবরোধ ভেদ করে বউ-এর মুক্তির চেষ্টার মধ্যে প্রাচীন কালের বিবাহরীতির ছায়াপাত থাকতে পারে। এদিক থেকে এটি বেশ কৌশলপূর্ণ ও সতর্কতামূলক খেলা।

গোল্লাছুট

গোল্লাছুট আঞ্চলিক খেলা। ঢাকা ও খুলনা জেলায় এ খেলার চল আছে। পরিমিত সীমানায় দৌড়ের দ্রুততার উপরেই খেলাটির সাফল্য নির্ভর করে। হাডুডু বা বউছির মত দৌড়ানোর সময় শ্বাস রুদ্ধ করতে হয় না। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪/৬ থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত হতে পারে। খোলা মাঠ বা বাগান খেলার প্রশস্ত স্থান।

একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা; ৪০/৫০ হাত দূরে ইট-পাথর অথবা কোন গাছ বহিঃসীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটা কাঠি থাকে, তাকে 'গোল্লা' বলে। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছটিকে ছোঁয়াই হল এ খেলার মূল লক্ষ্য। আর এ থেকেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে।

দলের একজন প্রধান থাকে। অন্যান্যরা 'গোদা' নামে পরিচিত। যে পক্ষ প্রথম দান পায় তারা গর্তের গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়, গোদারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান ব্যক্তিকে ধরে ঘুরতে থাকে বিপক্ষের খেড়ুরা সুবিধামত যে যার স্থান নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যার বা যাদের হাত ছুটে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের সীমা স্পর্শ করতে। বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের ছুঁয়ে বাধা দেওয়া। দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই, এলোমেলোভাবে ছুটে লক্ষস্থলে এসে পৌঁছতে পারলেই হল। বিপক্ষেরা ছুঁলেই খেড়ু মারা পড়ে। যতক্ষণ গর্ত ছুঁয়ে আছে ততক্ষণ নিরাপদ। গর্ত ছেড়ে

শেষ পর্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকেও ছুটতে হয়। যারা সফলকাম হয় তারা গোল্লা থেকে জোড় পায়ে একটা করে লাফ দেয় বহিঃসীমার দিকে। সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌঁছতে পারলে এক 'পাটি' হয়। না পারলে অথবা সবাই স্পর্শদোষে মারা পড়লে বিপক্ষরা দান পাবে, এ পক্ষের কোন পাটি গণ্য হবে না। পর্যায়ক্রমে গোল্লা পাওয়া এবং প্রতি-রোধ করার ভেতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। পাটির সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

গোল্লাছুটে শ্বাসরোধ করতে হয় না। দৌড়াদৌড়ির ফলে এতে উত্তম শারীরিক ব্যায়াম হয়। সাধারণতঃ কিশোর বালকেরা এতে অংশ গ্রহণ করে।

দাড়িয়া বান্ধা

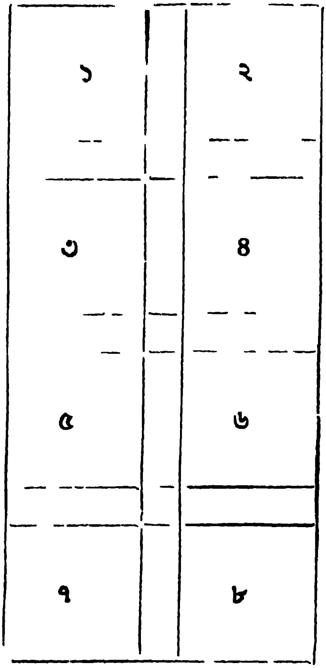
হাডুডুর মত দাড়িয়া বান্ধা বাংলার সর্বাঞ্চলীয় জনপ্রিয় গ্রাম্য খেলা। খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ঘর কেটে দাড়িয়া বান্ধা খেলা হয়। বালক বালিকা এমনকি বয়স্করাও এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এ খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে। ফলে দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল প্যাঁচের উপযোগিতা অধিক। সংযত দৌড়ের এ খেলাটিও শরীরচর্চার প্রকৃষ্ট উপায়।

সাধারণতঃ ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এ খেলায় ছক বাঁধা ঘর থাকে। মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়। স্থান বিশেষে ঘরের কিছু পার্থক্য আছে। দাড়িয়া বান্ধা ঘরের দুটি রেখাচিত্র দেওয়া হল।

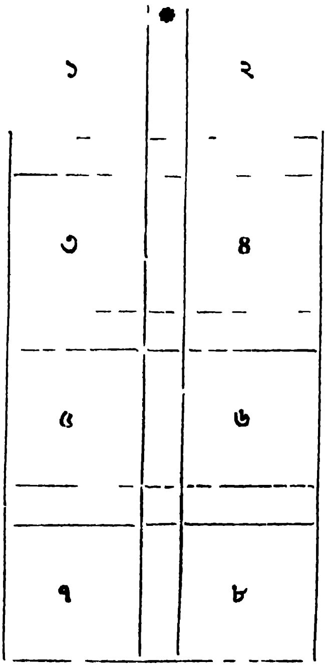
ক অথবা খ চিত্রে দু'দলে চারজন করে মোট আটজন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করতে পারে। ক চিত্রে ১ নং ঘরের স্থানবিশেষে বিভিন্ন নাম, যথা 'বদন ঘর' (রাজশাহী), 'গাদি ঘর' (মুর্শিদাবাদ), 'রেডি ঘর' (খুলনা), 'ফুল ঘর' (কুষ্টিয়া) ইত্যাদি। ঘরের নামানুসারে খেলাটি ঐসব অঞ্চলে 'বদন' 'গাদি' 'রেডি' ও 'ফুল' খেলা নামে পরিচিত। ২নং ঘরটিকে 'লবণ ঘর' বা 'পাকা ঘর' বলা হয়। স্থানবিশেষে লবণ ঘরের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে তা পাহারা

দেওয়া হয়। এ ঘরের গুরুত্ব থেকে খেলাটি 'নুনদাড়ি' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

ঘরের মাঝ বরাবব লম্বা বেখাটিকে 'দৌড়ছি', 'শিড়দাড়া' বা 'খাড়াকোট' বলে। প্রস্ত ববাবব বেখাগুলিব নাম 'পাথল কোট'। খাড়া কোট ও পাথল কোটে বিপক্ষের খেলোযাড়বা দাঁড়িয়ে বাধা দেয। খ চিত্রে তাবকা চিহ্নিত স্থানে যে পক্ষ প্রথম ঘাই পায়, তাবা দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষেব কাছে 'দাইড়া' চায়। তার সম্মতি পাওযাব সাথে সাথে খেলোযাড়বা



ক চিত্র



খ চিত্র

অন্যান্য ঘর ঘুবার জন্য বেবিয়ে পড়ে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে কোন একজন সব ঘর ঘুরে এসে বদন ঘরে প্রবেশ করলে এক পয়েন্ট হয়। ঘাই তাদের দখলেই থাকে। কিন্তু বিপক্ষদলের কেউ যে-কোন একজনকে ছুঁতে পারলে, তাদের ঘাই হারাতে হয়।

দাড়িয়াবান্ধায় কোন ছড়া নেই। এতে সকল খেড়ুর সমান দায়িত্ব। একজনের অসতর্কতা বা অক্ষমতার জন্য সমস্ত দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দলীয় স্বার্থে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে কৌম সমাজ জীবনের আদর্শের পরিচয় আছে।

নুনতা

নুনতা দলবদ্ধ খেলা। মাটির উপর গোলাকার বৃত্ত এঁকে খেলার ঘর করা হয়। খেলার শুরুতে এ ঘরের মালিক হবে মাত্র একজন। প্রথমে সে থাকবে ঘরের বাইরে, অন্যান্যরা ঘর দখল করে বসবে। বৃত্তের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে মালিক নুনতা গাইবে। প্রথমবার 'নুনতা' বললে ঘরের মধ্যে সবাই বলবে 'এক'। পরেরবার নুনতা বললে উত্তর হবে 'দুই'। এরূপে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, শেষবার সাত বলার সাথে সাথে ঘরের খেলোয়াড়রা ছুটে বেরিয়ে যাবে, মালিক ফাঁকা ঘরে প্রবেশ করেই শ্বাস নিয়ে ওদের ছোঁয়ার জন্য তাড়া করবে। সে যে শ্বাস নিয়ে আছে তা প্রমাণ করার জন্য তাকে ছড়া আবৃত্তি অথবা অর্থহীন ধ্বনি করতে হয়। সে যাকে প্রথম ছুঁবে তাকে টেনে ধরে নিয়ে আসে এবং নিজ দলভুক্ত করে নেয়। সে নুনতা গেয়ে মালিককে সাহায্য করে। এরূপে বাইরের সবাইকে একে একে ঘরে আনার চেষ্টা চলে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে সবশেষে যে বাইরে থাকে সে-ই পরের বারের খেলায় ঘরের মালিক হয়। এভাবে চক্রাবর্তনে খেলা চলতে থাকে।

অঞ্চলভেদে খেলার নামভেদ আছে, তবে এর পদ্ধতিটি অভিন্নপ্রায়। খুলনা-যশোহর জেলায় এটা 'কুতকুতে' খেলা নামে পরিচিত। নুনতার স্থানে এখানে 'কুতরে' বলে প্রথমবার ডাক দেওয়া হয়। বালকেরা তখন 'একরে', 'দুইরে'...'সাতরে' বলে উত্তর দেয়। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

অল্প বয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে নুনতা খেলে থাকে। বউছির মত এ খেলায় কোনরূপ বিপদের ঝুঁকি নেই। দম বন্ধ করে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা এতে পাওয়া যায়।

চিক্কা

চিক্কা পুরোপুরি শক্তির খেলা। দু'দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাতে বিপদের খুব ঝুঁকি থাকে। অল্প বয়সের বালকদের পক্ষে এটি খেলা উচিত নয়। মাটির উপর ১০/১২ হাত লম্বা দাগ কেটে চিক্কার ঘর করা হয়। এতে ৫/৬ জন করে দুটি দল একত্রে খেলতে পারে। খেলার শুরুতে একদল দাগের উপর দাঁড়ায়, অপর দল দাগের একই পাশে বাইরে থাকে। যারা দান পায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হাত বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ দেয়, একে কুষ্টিয়ায় 'হেন্তেল' দেওয়া বলে। হাতে হাত মিললে টানাটানি শুরু হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর কেউ অপর দলের কোন একজনকে টেনে অথবা ঠেলে দাগ থেকে সরাতে পারলে সে মারা যাবে। বিজয়ী খেলোয়াড় দলের অন্যান্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এভাবে সবাইকে দাগ থেকে সরাতে পারলে তারা দান পায়। যারা দাগের উপরে আছে তারা নিজ স্থানে অটল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পায়ে পা লাগিয়ে ছুঁতে চেষ্টা করে। একে 'ল্যাং' মারা বলে। সে কৃতকার্য হলে প্রতিদ্বন্দ্বী মারা পড়ে। বাইরের সবাইকে ল্যাং মারতে পারলে তারা এক 'চিকা' বা পয়েন্টের অধিকারী হয়। বিপক্ষের যে কোন খেলোয়াড় ল্যাং বাঁচিয়ে দাগটি একবার পারাপার করতে পারলে তার দল চিকা পায়। ল্যাং মারার সময় প্রতিপক্ষকে সাবধানে থাকতে হয়। হাত দিয়ে ল্যাং প্রতিরোধ করা হয়। অনেক সময় মাথা পেতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে আঘাত পেয়ে জখম হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে।

চিক্কা খেলাটি যেন সীমানার দখল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের যুদ্ধপদ্ধতি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। এ খেলায় কুশলীর চেয়ে বলীর জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা

এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলায় নুনতা ও চিক্কার মিশ্রণ আছে। নুনতা খেলায় ঘরের মালিক ডুগ দিয়ে অন্যদের ছুঁয়ে আসে। এখানে সে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে খেলোয়াড়দের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলার পদ্ধতিটা এরূপ: একটা বৃত্তাকার ঘরে

খেলোয়াড়রা জড়ো হয়— এরা ছাগলের ভূমিকা নেয়। বৃত্তের বাইরে থাকে মাত্র একজন খেলোয়াড়—সে নেয় বাঘের ভূমিকা। খেলার শুরুতে বাঘ কপট কান্নার বোল তুললে ছাগলগুলি তার কারণ জিজ্ঞেস করে। এরপর কিছুক্ষণ ছড়ার সংলাপ চলে। যশোহরে প্রচলিত একটি ছড়ার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

বাঘ—এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা (ক্রন্দনের সুরে)।
ছাগদল—কাঁদ ক্যাঁ (সমস্বরে) ?
বাঘ—গরু হারাইছে।
ছাগদল—কি গরু ?
বাঘ—নাঙ্গা গরু (ঘরের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে)।
ছাগদল—শিঙ্গি কি ?
বাঘ—কুষ্টার আঁশ।
ছাগদল -একটা গান গাওছিন।

গান
(নাচের ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে)
এতি চোর, বেতি চোর,
এতি চোর, বেতি চোর।
চলে আয় আমার সিয়ানা চোর।

গান শেষ করেই বাঘ লাফ দিয়ে বৃত্ত থেকে একটা ছাগলকে ধরে টানতে থাকে। বাঘ নির্দ্বিধায় টেনে নিতে পারে না, দলের অন্যান্যরা বাধা দেয়, হাত-পা ধরে ঘরের মধ্যে তাকে টেনে রাখতে চায়। ঘরের বাইরে টেনে আনতে পারলে সে বাঘের দলভুক্ত হয় এবং খেলার পুনরাবর্তনের সময় অন্য ছাগলকে টেনে আনতে চেষ্টা করে। শেষ ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, সেই বাঘ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এরূপে খেলাটি চলতে থাকে।

আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অভিনয়ে এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা খেলার প্রথমাংশ বাকসর্বস্ব কিন্তু এর দ্বিতীয়াংশে শক্তির পরীক্ষা আছে। এতে বাঘ-ছাগলের অভিনয়ে ছদ্ম-শিকারের ছবি আছে। চিক্কায় আছে যুদ্ধের রীতি, এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গায় আছে শিকারের রীতি। এদিক থেকে এ্যাঙ্গা

এ্যাঙ্গা খেলাটি চিক্কা থেকেও প্রাচীন হতে পারে। কারণ সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে শিকারোপজীবিকা আদিমতম স্তর ছিল।

ডাংগুলি

ডাংগুলি বাংলার খাঁটি দেশজ এবং সর্বাঞ্চলীয় খেলা। পাঁচন আকারের শক্ত ও ঋজু শাখার তৈরি একহাত পরিমাণ লাঠি বা 'ডাণ্ডা' এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের এক বিঘত পরিমাণ কাঠি বা 'গুলি' এ খেলার বস্তু উপকরণ। প্রশস্ত রাস্তা বা মাঠ ডাংগুলি খেলার উপযুক্ত স্থান। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দু'জন অথবা দু'দলের মধ্যে এ খেলা হয়। ডাংগুলি কৌশলের খেলা নয়, এতে কোন ছড়াও বলা হয় না। এটি মূলতঃ বাহুবলের খেলা।

ডাংগুলির আঞ্চলিক নানা নামান্তর আছে, যেমন রাজশাহীতে 'ডাণ্ডাফুত্তি', যশোহরে 'গুলবাড়ি', ঢাকায় 'ফুত্তিবাড়ি', ময়মনসিংহে 'গুট-বাড়ি', কুমিল্লায় 'ট্যামডাং', বরিশালে 'ডাংবাড়ি', রংপুরে 'ভ্যাটাডাণ্ডা' ইত্যাদি। ডাণ্ডা ও গুলির নামান্তর থেকেই এরূপ বিভিন্নতা এসেছে।

খেলার পদ্ধতির এবং ফলাফলের সামান্য তারতম্য নিয়ে দু'রকম ডাংগুলি খেলা হয়—'ফুলবাড়ি' এবং 'ঘাইচাম্পা' খেলা। ফুলবাড়ি খেলায় একটা ছোট গর্ত এবং ঘাইচাম্পা খেলায় দাগকাটা চৌকোণা ছোট ঘর প্রয়োজন। প্রথমটিতে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান সংখ্যক খেলোয়াড়ের আবশ্যক। দ্বিতীয়টিতে সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। গুলি মাটিতে না ফেলে শূন্যে তুলে ডাণ্ডার সাহায্যে যতবার স্পর্শ করা যাবে ততবার খেলার সুযোগ পাবে খেলোয়াড়। একে রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ভুজ' বলে। জোড় সংখ্যক ভুজ এক দল ও বিজোড় সংখ্যক ভুজ অন্য দলভুক্ত হয়ে খেলা শুরু করে।

ফুলবাড়ি খেলায় টসে বিজয়ী দল গর্ত নেয়, অন্যদল বাইরে যায় 'খাটতে'। যে কোন একজন গর্তে গুলি রেখে ডাণ্ডার সাহায্যে তুলে বিপক্ষের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দেয়। ওদের যে কোন একজন ক্রিকেটের বলের মত মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিতে পারলে ডাণ্ডাধারী দান হারায়। দলের অন্যব্যক্তি ঐ নিয়মে ছোঁড়ার জন্য এগিয়ে আসে।

লুফে নেওয়ার আগে গুলি মাটিতে পড়ে গেলে বিপক্ষের যে কোন একজন ওটাকে গর্তের দিকে ছুঁড়ে দেয়, লক্ষ্য হল গর্তের উপর পাতান ডাণ্ডাটিকে স্পর্শ করা। ডাণ্ডায় গুলি লাগলে ডাণ্ডাধারী দান বা হাত হারায়। না লাগলে সে ডাণ্ডার সাহায্যে গুলিকে উপরে তুলে মেরে যতদূর সম্ভব পাঠিয়ে দেবে। গুলি থেকে গর্তের সোজা দূরত্ব ডাণ্ডার সাহায্যে মাপতে থাকে। প্রতি ডাণ্ডাব মাপের অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম আছে, যেমন

নোয়াখালি—এরি, দুরি, তেরি, ছুরি, চাম্পা, জেক, জান।
রাজশাহী—বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চাঘল, চাম্পা, ঝোঁক, মেক।

অথবা

এরি, দুরি, থেরি, চাউল, চম্পা, ঝিমক, ঝয়া।
ময়মনসিংহ—গায়া, দুয়া, তেনা, চারা, পাঞ্জা, ছুইল, ভইল।
রংপুর—গাইদোন, ধলি, চক্কোর, চালি, পাণ্ডু, বিরেন, গোট।

সর্বত্র সাত পর্যন্ত গোনাই লক্ষ্য। সাত পর্যন্ত গোনা হলে এক ইউনিট ধরা হয়। অঞ্চল বিশেষে এর বিভিন্ন নাম, যথা 'ফুল' (নোয়াখালি), 'মোহব' (মুর্শিদাবাদ), 'গুট' (ময়মনসিংহ) ইত্যাদি। সাত ফুলে এক 'লাল' বা 'গজ' হয়। বিশ মোহরে এক 'নাতি' ধরা হয়। যে কোন পক্ষের যে কোন খেলোয়াড় আগে লাল বা নাতি করতে পারবে সে পর পর সাতটা হাতের সুযোগ পাবে। প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজ নিজ মাপের হিসাব রাখে। প্রত্যেক মাপের পৃথক পৃথক মারার ভঙ্গিও আছে। যেমন বাড়ি বাম পায়ের উপরে গুলি রেখে, দুড়ি বাম হাতের মুঠিতে রেখে, তেড়ি গুলি শূন্যে ডিগবাজিরূপে ঘুরিয়ে, চাঘল ডান হাতের মুঠিতে, চাম্পা বাম হাতের তালুতে, ঝোঁক বাম হাতের দু'অঙ্গুলিতে। শেষ মাপে গর্ত এসে গেলে একটি ফুল পায় কিন্তু হাত হারায় কারণ মারের কোন পদ্ধতি মেক বা শেষ ডাণ্ডায় নেই।

ঘাইচাম্পা খেলার শুরুতে একজন খেলোয়াড় ডাণ্ডার সহিত গুলিকে ধরে দূরে ছুঁড়ে দেয়। বিপক্ষরা ধরতে পারলে যে ছুঁড়েছে তার হাত হারায়। না পারলে একজন খেলোয়াড় গুলিকে ঘরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ঘরের ভেতরে অথবা দাগের এক বিঘত দূরত্বের মধ্যে পড়লে

উক্ত খেলোয়াড়ের হাত যায়। বাইরে পড়লে ডাণ্ডার সাহায্যে গুলিকে যতদূর সম্ভব ছুঁড়ে দেয়। ভুজের সংখ্যানুপাতে এভাবে মেরে মেরে ছোঁড়ার সুযোগ সে পায়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা যে পর্যন্ত হাত না নিতে পারছে ততক্ষণ এভাবে খেলা চলতে থাকে।

ক্রিকেট খেলার সাথে ডাংগুলি খেলার একটা মিল দেখা যায়। ক্রিকেটে বোলারের চেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের দায়-দায়িত্ব বেশি। ডাংগুলি খেলায় ডাণ্ডাধারীরও দায়িত্ব অধিক। ব্যাট ও বল ডাণ্ডা ও গুলিব সমতুল। পিচ আর গর্ত প্রায় অভিন্ন। ব্যাটস্‌ম্যান নানাভাবে আউট হতে পারে। ডাংগুলিতেও আউট করার নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বলা যায়, এটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য-সংস্করণ।

গাইগোদানি

সাধারণতঃ রাখাল বালকেরা গাইগোদানি খেলে থাকে। একপ্রান্তে সূচাল একটি লাঠি নিয়ে খেলা হয়। ভেজা এঁটেল মাটি খেলার উপযুক্ত স্থান। পাঁচ-সাত জন একত্রে মিলিত হয়ে খেলা শুরু করে। টসে যে হারে তাকে প্রথমে নিজের লাঠি উপর থেকে ছুঁড়ে মাটিতে পুঁততে হয়। যত শক্ত এবং সোজা করে লাঠিখানা গাঁথা পড়বে খেলোয়াড়ের পরাজয়ের ভয় তত কমবে। মাটিতে এভাবে লাঠি পোঁতার আঞ্চলিক নাম 'গোদানি' (রাজশাহী)। যে টসে হারে তাকে বলে 'গাই'। গাই প্রথমে মাটিতে লাঠি গাঁথে বলে খেলাটির নাম গাইগোদানি হয়েছে। ময়মনসিংহে এটি 'ফলাখাউট' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বালক নিজ লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করে প্রথম বালকের লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা এমনভাবে ছুঁড়ে পুঁতে দেয় যাতে প্রথম লাঠির গা ছুঁয়ে থাকে। সে সফল হলে প্রথম লাঠিখানা তার দখলে আসে। আর যদি ব্যর্থ হয় তবে প্রথম ব্যক্তি নিজের লাঠি মাটি থেকে তুলে অনুরূপভাবে ছুঁড়ে পুঁতে দ্বিতীয় লাঠিখানা নিজ দখলে আনার চেষ্টা করে। যে জয়লাভ করে সে দুখানা লাঠি দিয়ে তৃতীয় বালকের সাথে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পায়। তৃতীয় বালক নিজের লাঠি দিয়ে একই ভাবে দ্বিতীয় বালকের কাছ থেকে লাঠি নিজ অধিকারে আনার চেষ্টা করে। যার হাত শূন্য হবে সেই আউট হবে। এভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত

খেলা চলতে থাকে। একে একে সবাইকে হারিয়ে যে খেলোয়াড় সব লাঠি নিজের দখলে আনে সে-ই জয়ী হয়। বিজয়ী খেলোয়াড় এবার নিজের লাঠি রেখে অপরের লাঠিগুলি যতদূরে পারে ছুঁড়ে দেয়। ছোঁড়ার সাথে সাথে বালকেরা নিজ নিজ লাঠি আনার জন্য ছুটে যায়। ইত্যবসরে সে আপন লাঠিখানা গোপন করে রাখে। বালকেরা তা খুঁজে বের করবে। যে সব শেষে সন্ধান পাবে তাকে লাঠিখানা বয়ে নিয়ে আসতে হবে। পরবর্তী খেলায় সেই হবে গাই। গোইগোদানি খেলার এটাই নিয়ম। বলা বাহুল্য, হাতের শক্তির উপর খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। শক্তির প্রয়োগে এবং দৌড়াদৌড়িতে ব্যায়ামের উপকারিতা পাওয়া যায়। খেলার পদ্ধতিতে জুয়ার ধর্ম আছে।

সোলঝাপটা

পল্লীর বালকেরা এবং রাখালেরা এ খেলা খেলে থাকে। মাত্র একখানা লাঠি নিয়ে সোলঝাপটা খেলা হয়। গোইগোদানির মত এটিও সংঘবদ্ধ খেলা, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষিত হয়। আম-লিচুর বাগান খেলার উপযুক্ত স্থান। খেলা চলা কালে গাছের ডালে অথবা গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করতে হয় ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানোর জন্য।

দলের একজনকে প্রথমে 'চোর' করা হয়। সে পায়ের তলায় লাঠি স্পর্শ করে দাঁড়ায়। অন্য বালকেরা কেউ গাছের উপরে অথবা নীচে নিরাপদ দূরত্বে থেকে চোরকে স্থানচ্যুত করার প্রলোভন দেখায়। চোরের লক্ষ্য হল, লাঠি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যে কোন একজনকে ছুঁয়ে এসে আগেভাগে তা চুমে নেওয়া। সফল হলে সে যাকে ছুঁয়েছে সে'ই চোর হবে। চোর লাঠির দখল ছাড়লেই অন্য বালকেরা ছুটে এসে চুমে নিতে চেষ্টা করে। চোর ফিরে আসার আগে চুমে নিলে তার হার হয়। রাজশাহী-মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহে এটি নামান্তরে 'গাছছুয়া গাছছুয়া' খেলা।[১] এখানে লাঠির পরিবর্তে গাছের গুঁড়ি ছুঁতে হয়। ঢাকার বিক্রমপুরে সামান্য পরিবর্তিত আকারে এটি 'ডগারে ডগা' নামে পরিচিত।[২]

১. লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ৮১
২. ঐ, পৃঃ ৮১

ছুটাছুটির আনন্দ এর মূল লক্ষ্য। শক্তি অথবা কলাকৌশলের প্রয়োগ এতে নেই। কেবল গাছে ওঠা-নামার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন। গাছ নিয়ে খেলার মধ্যে আরণ্যজীবনের ছায়াপাত থাকতে পারে। এতে ব্যবহৃত ছড়াটি এমত সমর্থন করে। ছড়াটি এরূপ :

গাছছুয়ারে গাছছুয়া,
গাছ্ ক্যারে ?
বাঘেব ডরে।
বাঘ কই ?
মাটির তলে।
মাটি কই ?
এই তো।
তোরা কয় ভাই ?
সাত ভাই।
এক ভাই দিবে ?
ছুঁইতে পারলে নিবে।[১] —নেত্রকোনা

সাপ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আদিতে মানুষ গাছের উপরে ঘর তৈরি করে বাস করত। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এ উপদ্রব দুর্বিষহ ছিল। 'ধর্মমঙ্গলে' ব্যাঘ্রদেবতার কথা আছে। মধ্যযুগের কালুগাজী বাঘের পীর বলে পরিকল্পিত হয়েছেন। গাছছুয়া গাছছুয়া খেলায় জাতির জীবনের এ ধরণের কোন অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে।

চামড়ি খেলা

উত্তরবঙ্গে ঈদ-পরবের দিন গাঁয়ের যুবকেরা চামড়ি খেলা খেলে। খেলার প্রথমে পুকুরের মত দাগ কাটা হয়। পনের বিশজন লাঠিধারী যুবক দাগ ঘিরে জমায়েত হয়। তারাই খেলোয়াড়। একজন সাহসী যুবক লাঠি দিয়ে পুকুর বন্ধ করতে যায়— তখন অন্যেরা তাকে বাধা দিতে আসে, আর তখনই কৃত্রিম লড়াই বেধে যায়। তারা বিভিন্ন

---

১. পূর্বোক্ত, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃঃ ২৩৫

প্রকার অঙ্গভঙ্গিতে খেলা দেখায়। সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যের তালে তালে লাঠি খেলার মহড়া রীতিমত জমে উঠে। খেলার বিভিন্ন কৌশল যখন শেষ হয়ে আসে এবং অঙ্গ ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে তখন সকলে একই সঙ্গে উপরে লাঠি তুলে ধরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে; আর তখনই আপসে খেলা সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এটি লাঠিখেলারই সমতুল্য। চামড়ি খেলার এটি প্রথমাংশ; দ্বিতীয়াংশে আছে ঐ পুকুরে কৃত্রিম মাছ ধরার অভিনয়। পানি ঢেলে কাদা করা হয় অভিনয়কে জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য। শিং মাছের কাঁটা বিঁধেছে বলে একজন চীৎকার করে কাতরাতে থাকে। ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক শুরু করে। মা, বোন আসে শুশ্রূষার জন্য। কিছু-তেই কিছু হয় না, শেষে আসে সুন্দরী যুবতী। কাঁটার বিষ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। সে-সঙ্গে দর্শকের হাস্যকোলাহলের মধ্যে খেলার পরি-সমাপ্তি ঘটে। বলা বাহুল্য, এ অংশের পুরো খেলাটাই কৃত্রিম এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকেই কেউ ওঝা, কেউ মা-বোন-প্রেমিকার ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসে।

স্পষ্টতঃ সমস্ত খেলাটি একটি অভিনয়— প্রথমাংশ যুদ্ধের, দ্বিতীয়াংশ মাছ ধরার। পুকুর দখল, ভূমি দখল, রাজ্য দখল নিয়ে প্রাচীন যুগে প্রায়ই লড়াই হত। তারই অনুকরণে এ খেলার প্রথমাংশের পরিকল্পনা। তার পর পুকুর দখল হয়ে গেলে মাছ ধরে ভোগের পালা। রাজ্য জয় করেও ধনসম্পত্তি ভোগদখলে আসে। সুতরাং প্রথমাংশের সাথে দ্বিতীয়াংশের যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মাছ ধরা নিরঙ্কুশ নয়, মাছের কাঁটা ফুটে, বেদনা হয়, তার চিকিৎসাও হয়। জনজীবনের একটি অধ্যায়ের অভিনয় চামড়ি খেলার মধ্যে নিহিত আছে। অতীত ইতিহাস ও সামাজিক জীবনচিত্রের দিক থেকে এ খেলার গুরুত্ব অনেক।

লাঠিখেলা

লাঠিখেলা শক্তি ও কৌশলের খেলা। আত্মরক্ষার জন্য লাঠির ব্যবহার মানুষ আদিমকালেই আবিষ্কার করেছিল। শিকার ও যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে লাঠির ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ধাতু ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের পর যুদ্ধক্ষেত্র হতে লাঠির উপযোগিতা

ফুরিয়েছে। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত জমিদারগণ লাঠিয়াল দল রাখতেন যোদ্ধা হিসেবে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরানোর পর লাঠি নিয়ে শৌর্যবীর্য ও কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র দাঁড়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আখড়াগুলি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে মহরম উপলক্ষে লাঠিখেলা অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যাক অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। এদেশে মহরম উৎসব প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে এ প্রথা চলে আসছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মহরমেব লাঠিখেলায় যে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়, তা সহজেই বুঝা যায়। মহরম ছাড়া ধনীগৃহে বিবাহ উপলক্ষেও লাঠিখেলার আয়োজন হয়।

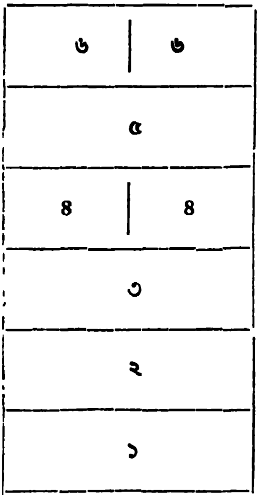
তিন-চার হাত লম্বা ও পরিমিত ব্যাসার্ধের বাঁশের তৈলাক্ত মসৃণ লাঠি এ খেলার উপকরণ। আসরে একজন খেলোয়াড় কখন এক হাতে, কখন দুই হাতে বিভিন্ন কৌশলে লাঠি ঘুরিয়ে খেলা দেখায়। বিভিন্ন চালে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে লাঠি ঘুরানোতেই একজন খেলোয়াড়ের দক্ষতার পরিচয় আছে। কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়ায় দ্বৈত লাঠিখেলা হয়। এখানেও সাহস, কৌশল ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন আছে। একক লাঠি-খেলায় সামনে, পেছনে, পাশে, আড়াআড়ি ভাবে, মাথার উপরে, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লাঠি ঘুরানোতেই প্রকৃত সৌন্দর্য ও আনন্দ নিহিত আছে। এটি শ্রমসাপেক্ষ খেলা। এজন্য এতে শরীরচর্চার উত্তম সুযোগ আছে। একমাত্র পুরুষ ও বয়স্ক ব্যক্তিই এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। মহরমের লাঠিয়াল দলে তরুণরা থাকে শিক্ষানবীশ হিসেবে।[১]

একা দোক্কা

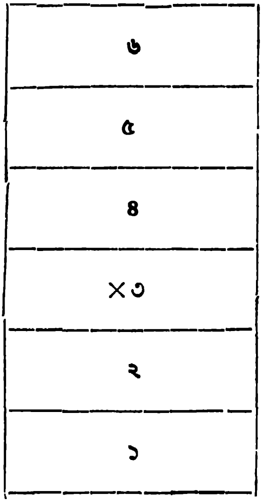
একা দোক্কার আঞ্চলিক নামের বিভিন্নতা আছে এবং খেলার পদ্ধতিতেও সামান্য প্রকারভেদ আছে। মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব এর নাম দিয়েছেন 'সাত খোলা'।[২] উত্তরবঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে খেলাটির

১. বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের (লোকনৃত্য) 'লাঠিনাচ' অংশ দ্রষ্টব্য।
২. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১২১-২৩

নাম 'চিরিয়া'। মাটি বা মেঝের উপর দাগ কেটে ঘর করা হয়। ঘরের প্রচলিত দুটি রেখাচিত্র নিম্নরূপ :



*
ক চিত্র



*
খ চিত্র

ক চিত্রের ঘরগুলির ক্রমিক নাম যথাক্রমে এক্কা দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা, পক্কা, লাষ্ঠি। (ময়মনসিংহ)। খ চিত্রে ৩নং ঘরটি চিরিয়া, ৪নং বিশ্রামঘর এবং ৫নং ও ৬নং হল যথাক্রমে 'ছোটগাং' ও 'বড়গাং'। ক চিত্রে সব ঘর সমান হয়, খ চিত্রে বড়গাং সাধারণতঃ বড় এবং চিরিয়া ছোট হয়ে থাকে। বরিশালে ৩নং থেকে ৬নং ঘরের নাম যথাক্রমে পদ্মা, ইরানী, জিরানী ও কুলা। প্রথম দু'টি এক্কা, দোক্কা নামেই অভিহিত। ভাঙা হাঁড়ি-কলসির গোলাকার টুকরা খেলার উপকরণ। টুকরাটিকে অধিকাংশ স্থানে 'চাড়া', স্থানবিশেষে 'ঘুটি' (রাজশাহী), 'ডিগা' (দিনাজপুর), 'খোপলা' (মুর্শিদাবাদ), 'চাকতি' (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে ডাকা হয়।

দু'জনে অথবা দলবদ্ধভাবে এক্কা দোক্কা খেলতে পারে তবে প্রত্যেকের স্বার্থ স্বতন্ত্র, প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে খেলতে হয়। খেলার

শুরুতে বাইরে থেকে (*চিহ্নিত স্থান হতে) এক এক ঘরে চাড়া ছুঁড়ে ফেলে এক পায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফ দিয়ে পেরিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সেটি বাইরে নিয়ে আসতে হয়। এ খেলায় সতর্ক থাকতে হয় পদে পদে। নির্দিষ্ট ঘরে চাড়া ছুঁড়ে রাখতে না পারলে সে দান হারায়। বিশ্রামঘর ছাড়া অন্য ঘরে দু'পা একত্রে মাটিতে ফেললে আউট হয়। পা অথবা চাড়া দাগের উপরে থাকলেও আউট। প্রথম বালিকা আউট হলে দ্বিতীয় বালিকা একই পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে। শেষ বালিকা দান হারালে আবার প্রথম বালিকাটি তার অসমাপ্ত স্থান থেকে আরম্ভ করে। এভাবে চক্রাবর্তনে খেলার সুযোগ আসে। কোন একজন খেলোয়াড় সব ঘরে চাড়া রেখে ফিরিয়ে আনতে পারলে ৬নং ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে ফিরে না দেখেই তাকে চাড়া ঘরের দিকে ফেলতে হয়। হাতের তাকমাফিক চাড়াটি যে ঘরে ঠিকমত পড়বে খেলোয়াড় তার অধিকারিণী হবে। এভাবে সব ঘর অধিকারে আনতে পারলেই জয়। 'জেতাঘর' প্রতিপক্ষকে ডিঙিয়ে চলতে হয়। একই ঘর অন্যরাও দখলে আনতে পারে। যে পিছিয়ে পড়ে তারই দুর্ভোগ বেশি। অঞ্চলভেদে 'ছি' বা 'চু' দিয়ে চাড়া পায়ের আঙুলে তুলে ঘরের বাইরে আনার নিয়ম প্রচলিত আছে। ময়মনসিংহে একে 'খুঁদখুঁদ' খেলা বলে। এটা এক্কা দোক্কার প্রকারভেদ মাত্র।

এক পায়ে পাখির মত লাফিয়ে চলার ফলে শারীরিক ব্যায়াম হয়। এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। বুদ্ধি অথবা কৌশল প্রয়োগও করতে হয় না। মেয়েরা এ খেলায় বেশি আগ্রহ দেখায়। খেলাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে আবদুল হাই সাহেব মন্তব্য করেছেন, The interest of the game (Ekka-Dokka) centres round winning of rooms. The game hints at the eternal craving of a woman to build up a house of her own and a feeling of satisfaction from the fulfilment of her desire as a mother—a craving hardly the characteristic of a man.[১] জীবনবোধ এবং মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় মন্তব্যটি যথার্থ। নারী নীড়াশ্রয়ী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষকে ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল এবং ঘর-কন্নায় নারীর

---

১. Traditional Culture in East Pakistan, p. 156

ভূমিকা আজও সক্রিয়। সুতরাং এক্কা দোক্কায় প্রাচীন সংস্কারের ও অভ্যাসের পরিচয় থাকতে পারে।

কানামাছি

চিত্তবিনোদন তথা আমোদস্ফূর্তি কানামাছির মৌল আবেদন। একজনের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে চারদিক থেকে তার গায়ে টোকা অথবা লঘু ধাক্কা দেওয়া হয়। দু'চোখ বাঁধায় তার ভূমিকা হয় অন্ধ বা কানার মত। অন্যান্যরা চারদিক থেকে মাছির মত তাকে উত্যক্ত করে। খেলার এ পদ্ধতি ও ধর্ম থেকে কানামাছি নামকরণ হয়েছে। নামটি যথার্থ। এদিক থেকে একটি জীবন-অভ্যাসের অনুকরণ এতে আছে।

খেলার শুরুতে প্রথমে 'কানা' নির্বাচন করা হয়। ১, ১০, ২০, ৩০...ইত্যাদিরূপে গুণতে গুণতে যে ১০০ সংখ্যায় পড়ে সে খালাস পায়। পুনঃপুনঃ গণনায় একে একে খালাস পেয়ে কেবল শেষ খেলোয়াড় দোষী সাব্যস্ত হয়। তারই চোখ বাঁধা হয়। কানা অপর একজনকে ধরতে ও চিনতে না পারা পর্যন্ত মুক্তি পায় না। যাকে ঠিকমত ধরতে পারে তারই চোখ বেঁধে একই পদ্ধতিতে খেলা আরম্ভ হয়।

কানামাছি নিরাপদ ও নির্বিবাদের খেলা। এজন্য মেয়েরা এটি অধিক ভালবাসে। ছেলেরাও খেলতে পারে। বাংলার সব অঞ্চলেই খেলাটি প্রচলিত। সব ঋতুতে কানামাছি খেলা যায়।

কানামাছি ছড়াযুক্ত খেলা। ছড়াকাটার সাথে সাথে দৈহিক অঙ্গভঙ্গির ক্রিয়াগত সামঞ্জস্যে নাটকীয় গুণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। কানা এবং অন্য খেলোয়াড়দের স্বতন্ত্র ছড়া আছে। খেলার শুরুতে কানাকে ঘিরে সবাই 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ।'—ছড়াটি উচ্চারণ করে এবং তার গায়ে টোকা দেয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় কানা হাত বাড়িয়ে অপরকে ধরতে চেষ্টা করে, আর মুখে বলে—'আন্ধা গোন্ধা ভাই, আমার দোষ নাই।' অথবা 'আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।' ছড়া আবৃত্তিতে এবং ক্রীড়াভিনয়ে কানামাছি খেলার প্রকৃত আকর্ষণ ও আনন্দ নিহিত আছে।

রুমাল-চুরি

রুমাল-চুরি দলবদ্ধ খেলা। প্রথমে দলের একজন 'চোর' হয়। অন্যরা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। চোর হাতে রুমাল নিয়ে চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে কোন একজনের পেছনে সাবধানে এবং অলক্ষ্যে সেটি রেখে দেয়। যার পেছনে রেখেছে সে টের না পেলে চোর ঠিক এক পাক ঘুরে এসে তার পিঠে কিল-চাপড় বসিয়ে দেয়। আগেভাগে জেনে ফেললে রুমাল নিয়ে সে সরে পড়ে। চোর তার স্থানে বসে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একই রূপে ঘুরতে ঘুরতে যে কোন এক-জনের পেছনে রুমাল রেখে মারার সুযোগ নেয়। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে পারলে মারের চোট কমে। এভাবে রুমাল-চুরি খেলা চলতে থাকে। কিশোরগঞ্জে এর একটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়, তা হল 'মুড়াখেলা'। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে একত্রে অথবা পৃথকভাবে রুমাল-চুরি খেলে থাকে। চিত্তবিনোদন ও অবসরযাপন ছাড়া অন্য উপকারিতা এতে নেই।

রুমাল-চুরি খেলায় গ্রাম্য সমাজের ছবি আছে। রুমাল-চুরি আইনের চোখে অপরাধজনক। মার-ধোর করে চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়। সমাজ-জীবনে এরূপ একটা ঘটনা বালক-বালিকারা খেলার ভেতর দিয়ে অভিনয় করে থাকে।

ঢাকা জেলায় খেলাটি হয় সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে দুই দলের মধ্যে। দল দুটি ২০/২৫ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়ায়, মাঝখানে থাকে রুমাল। উভয় দলেই ১, ২,···করে সংখ্যায় খেলোয়াড়দের নাম থাকে। রুমালের কাছে দাঁড়িয়ে রাজা কোন এক সংখ্যা ধরে ডাক দিলে দুই দল থেকে দুই জন এসে রুমাল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একজন রুমাল তুলে নেওয়ার পর অন্য জন যদি তাকে ছুঁয়ে নেয়, তবে সে 'মারা' পড়ে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে বিপক্ষ জন মারা যাবে। এভাবে খেলা চলতে চলতে কোন এক দলের সবাই মারা পড়লে তাদের এক 'পার্টি'তে হার হয়। খেলা শেষে পার্টির সংখ্যা দিয়েই দলের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়। আগের নিয়মটিতে আছে ব্যক্তির স্বার্থ, কিন্তু এখানে আছে দলীয় স্বার্থ।

লুকোচুরি

লুকোচুরি খেলায় দলের একজনকে প্রধান করা হয়, তাকে বলা হয় 'রাজা'। লটারির পদ্ধতিতে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তার নাম 'চোর'। রাজা চোরের চোখ বন্ধ করে রাখে; দলের আর সবাই সুবিধামত আড়াল দেখে আত্মগোপন করে। তারপর রাজা চোখ খুলে দিলে চোর তাদের খুঁজে বের করে। আত্মগোপনকারীদের যে-কোন একজনকে খুঁজে ধরে আনলে অথবা তাকে ছুঁয়ে এসে রাজাকে স্পর্শ করলে সে পরবর্তী খেলায় চোর হবে। কিন্তু সে যদি ছোঁয়া বাঁচিয়ে অথবা ছোঁয়ার পরও দৌড়ে এসে আগেভাগেই রাজাকে ছুঁয়ে নেয় তবে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে না। এভাবে সবাই সুযোগ বুঝে রাজাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। চোর যতক্ষণ পর্যন্ত সফল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার চোখ বন্ধ করে পালাক্রমে খেলা চলতে থাকে। লুকোচুরির আঞ্চলিক নাম যশোহরে 'পলাপলি', নোয়াখালিতে 'চোখপলানি'। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষেই এ খেলা শোভনীয়। অবসরযাপন ও ছুটাছুটির আনন্দ এতে আছে। কোথাও কোথাও বাসর ঘরে নতুন বর-বধূকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার নিয়ম আছে। নিছক হাসিতামাসা ও আমোদস্ফূর্তি এর লক্ষ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের অভিমত, অতীতে রাজঅন্তঃপুরেও লুকোচুরি খেলা হত। এতোদ্দেশ্যে হেরেমে বিশেষ ঘর থাকতো।[১]

আত্মগোপনপ্রবণতা থাকায় খেলাটি প্রাচীন হতে পারে। 'hide and seek' নামে খেলাটি পাশ্চাত্যদেশেও প্রচলিত আছে। এদিক থেকে এটির আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনপ্রিয়তার কথা স্বীকার করতে হয়।

বউরানী

বউরানীর আঞ্চলিক নাম 'টুকাটুকি' (ময়মনসিংহ), 'চড়নখেলা' (রাজশাহী), 'গোলাপ টগর' (কুষ্টিয়া) ইত্যাদি। সমান সংখ্যক দু'দলের প্রতিযোগিতায় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধানদ্বয়কে 'রাজা' বলা হয়। অনুশীলন পদ্ধতিতে বউরানী ভাগ্যের খেলা (game of chance)। ছদ্ম নামের প্রকৃত খেলোয়াড়কে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর

১. Traditional Culture in East Pakistan, p. 157

করে চিনতে হয়। খেলার শুরুতে রাজা ফুল-ফলের নামে নিজ দলের বালকের ছদ্ম নাম রাখে। ১৫/২০ হাত দূরত্বে উভয় দল মুখোমুখি বসে। রাজা বিপক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়ের চোখ দুহাতে আড়াল করে প্রতীক নাম ধরে স্বপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে আহ্বান করে। সে সন্তর্পণে এসে বিপক্ষের যে কোন একজনের কপালে আঙুলের মৃদু টোকা দিয়ে যায়। তার চোখ ছেড়ে দেওয়াব পর যে ছেলেটি টোকা দিয়েছে তাকে ঠিকমত চিনতে পারলে সে সামনের দিকে সাধ্যমত এক লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। না পারলে যে টোকা দিয়েছিল সে'ই লাফ দেওয়ার সুযোগ পায়। এবাব দ্বিতীয় বাজা বিপক্ষের খেলোয়াড়ের চোখ বন্ধ করে গোপন নাম ধরে স্বপক্ষেব খেলোয়াড়কে ডাকে। খেলার পরিণাম পূর্ববৎ। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই খেলোয়াড়ের গোপন নামকরণ করা হয়। গোপন নাম বেখে খেলা হয় বলে এর একটি নাম পাওয়া যায় 'নাম পাতাপাতি' খেলা।[১] যতক্ষণ না একদল মধ্যবর্তী সীমানা অতিক্রম কবে প্রতিপক্ষের জমি দখল কবছে ততক্ষণ খেলা চলে। খেলা শেষে বিজয়ী দলের বাজাকে পদ্মাসন অবস্থায চ্যাং দোলা কবে সীমানা একবার পাবাপাব করতে হয়। এ সময় ছড়া বলা হয়,

> বাজা যায় হেলিতে দুলিতে,
> পানের পিচ ফেলিতে ফেলিতে।[২]

বলা বাহুল্য, বাহকের কাজটি বিজিত দলের খেলোয়াড়রাই করে।

কোথাও নিয়ম আছে— যে টোকা দেয় তাব নাম নির্ভুলভাবে বলতে পারলে তার দলের সবাই (বাজা ছাড়া) বিপক্ষদলের আপন আপন জুটির পিঠে চড়ে। এ অবস্থায় দু'দলেব মাঝের দূবত্বটি পারাপার কবতে হয়। ঠিকমত চিনতে না পারলে বিপক্ষের সবাই এদের পিঠে চড়ে। পিঠে চড়ার জন্য এর নাম চড়নখেলা হয়েছে।

অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা বউরানী খেলে থাকে। বড়দেব পক্ষে তা শোভনীয় নয়। খেলায় সামান্য কায়িক শ্রম আছে, তবে অবসরবিনোদনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দলবদ্ধ খেলায় ব্যক্তির চেয়ে সংঘের স্বার্থ অধিক।

---

১. বাংলাব মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২৫৫
২. ঐ, পৃঃ ২৫৬

একের জয়-পরাজয় দলেরই জয়-পরাজয়। নির্বিবাদে এর পরিণামে আত্মসমর্পণের মধ্যে গোষ্ঠীজীবনের আদর্শ ধরা পড়ে। প্রতিপক্ষের জমি-দখল এবং বন্দীদের শ্রমের কাজে ব্যবহার করা রাজ-রাজড়ার রাজ্যজয়ের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এ খেলায় তার প্রতিফলন থাকা খুবই স্বাভাবিক।

কড়িখেলা

বাংলাদেশে প্রাচীনকালে মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার ছিল। মুসলমান আমলে সোনা-রূপা-তামার মুদ্রা প্রচলিত হলেও খুচরা লেনদেনে কড়ির প্রচলন বলবৎ ছিল। ইংরেজ আমলে বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা ও কাগজের টাকা প্রচলিত হলে কড়ির ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায়। মুদ্রা হিসেবে যা ছিল দুর্লভ এবং দুর্মূল্য, উপযোগিতা ফুরিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীকালে তা খেলার উপকরণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ খেলার উৎপত্তির একটা সময় অনুমান করা যায়।

সমান আকারের চারটি কড়ি নিয়ে খেলা চলে। দুজন বা ততোধিক একত্রে বসে খেলতে পারে। পাশার ঘুটির মত মাটিতে ছুঁড়ে দিলে চারটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়লে খেলার হাত পায়। মাটিতে ফেলার পর কড়ি গায়ে গায়ে লেগে থাকলে খেলোয়াড় দান হারায়। জোড়ে জোড়ে মারতে পারলে দু'পয়েন্ট লাভ করে, না পারলে সেবারের মত দান হারায়। কারো চালে চারটি কড়িই 'চিৎ' হয়ে পড়লে যে কেউ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চুমে নিলে প্রতিটির জন্য একটি করে পয়েন্ট পায়। এভাবে যার আগে কুড়ি পয়েন্ট হয় সে-ই প্রথমে জয়লাভ করে। শেষ পর্যন্ত কুড়ি পয়েন্ট পুরেনি এমন খেলোয়াড়ের হার হয়। এ পর্যন্ত খেলার প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে 'জোড়-বিজোড়' ধরা হয়। দু'হাতের মুঠিতে জোড়-বিজোড়ের এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর। হাত শূন্য হওয়ার আগে পর্যন্ত সে যত পয়েন্ট লাভ করে, পরাজিত খেলোয়াড়কে তত কিল মারার সুযোগ সে পায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিজয়ী খেলোয়াড়রা তাকে শাস্তি দেয়। কড়ি মেয়েদের খেলা। অবসরবিনোদন এবং কৌতুক উপভোগ ছাড়া এর অন্য কোন উপকারিতা নেই। খেলার

উপকরণ, খেলার পদ্ধতি ও স্থান নির্বাচনের দিক থেকে এটি Indoor game-এর পর্যায়ভুক্ত।

ঘুঁটি খেলা

ঘুঁটিখেলা পল্লীর মেয়ে মহলে অবসরবিনোদনের খেলা। পাঁচটি গোলাকার পাথরঘুঁটি খেলার উপকরণ। বিচিত্র ও জটিল পদ্ধতিতে এটি খেলা হয়। হাতের দক্ষতায় ও ক্ষিপ্রতায় খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। পাঁচটি ঘুঁটির একটি হয় 'ডাগ'। কখন এক হাতে, কখন দু'হাতে ডাগের সাহায্যে অন্য ঘুঁটি লোফালুফির ভেতর দিয়ে খেলা চলতে থাকে। লোফালুফির সময় কোন ঘুঁটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। কড়ি খেলার মত চক্রাবর্তনে ঘুঁটি খেলা চলে। নানা প্রক্রিয়া শেষ করে যে আগে 'পাকে' তার একটি পয়েন্ট হয়। এরূপে সাত কি দশ পয়েন্ট পেলে সে জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত যে হারে তাকে জোড়-বিজোড় ধরে কিল মারার সুযোগ পায়। অভ্যাস ও সংযম আছে বলে একে দক্ষতার খেলা বলা যায়।

কোন কোন অঞ্চলে এটি 'খেইর খেলা' নামে পরিচিত।[১] রওশন ইজদানী সাহেব এর নাম করেছেন 'থাপা খেইড়' খেলা।[২]

ছি-ছত্তর

ছি-ছত্তর শিশুদের খেলা। দৌড়াদৌড়ি এবং হৈ-হুল্লোড়ের আনন্দ এর প্রধান আকর্ষণ। খেলার প্রথমাংশে ছড়ার প্রাধান্য, দ্বিতীয়াংশে দৌড়ের পালা। ছড়ার বোল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যধর্মী। ছড়ায় শিশুদের মন ভুলিয়ে অবরোধ ভেঙে পালানোর চেষ্টা করা হয়। ছি-ছত্তর খেলার অভ্যন্তরে অভিনয়ধর্ম আছে।

দশ-পনের জন ছেলেমেয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। একজন বৃত্তের মাঝখানে থাকে। রংপুরে তাকে 'চিল' বলে।

১. আইওরে ছোটতা খেইর খেলিতে যাই
যেমনি গেলাম খেইর খেলিতে অমনি অইল বিয়া
আরত খেইর খেলতাম না পরের ঘর গিয়া।

উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৭৬

২. মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭৯

অন্যদের 'মোরগ' বলা হয়।[১] চিল ভেতরে বদ্ধ থেকে হাতের শিকল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করে। চিল মুক্তির জন্য প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে। সে বীরত্বের ভাব দেখায় এবং ছড়া আবৃত্তি করে। ছড়াটি এরূপ :

ছি-ছাই ঘোড়া দাবড়াই।
ঘোড়া না ঘুড়ি চাবুক ছুড়ি ।।
চাবুক দিয়া মারলাম বাড়ি।
ধুলা উঠে কারি কারি ।।[২]

ছড়া বলতে বলতে সে হাতে টান দেয়, ফাঁক পেলেই দৌড় দেয়। না পারলে সে কৌশলের আশ্রয় নেয়। এবার ছড়ার বোলে মন ভুলানোর চেষ্টা—

মুই গেনু উতি,
পড়ি পানু ধুতি,
সে ধুতি রাঙ্গা
ছড়াই ঠ্যাংগা।

অথবা

ওই যে চান্দ গামছা বান্ধ।
গামছা নিয়া গেল চোরে
বুক ধরফর করে ।।[৩]

'রাঙ্গা ধুতি' আর আকাশের 'চান্দ' শিশুর কাছে লোভের সামগ্রী। হাতের বাঁধন হয়ত আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে। সে সুযোগ পেলেই দৌড় দেয়। মোরগেরা তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে, যতক্ষণ না ছুঁতে পারে, ততক্ষণ দৌড় আর হুল্লোড়। যে খেলোয়াড় প্রথমে ছুঁতে পারে, পরবর্তী খেলায় সে চিলের ভূমিকা গ্রহণ করে। ছোঁয়ার সময় মোরগেরা ছড়া বলে। ছড়ায় আছে মন আকর্ষণের ভাব :

ছি ছাত্তা কচুর বই
চ্যাংড়া প্যাংড়ার নানা হই।

১. পূর্বোক্ত, পূর্বদেশ, ২৮শে মে, ১৯৬৭
২. ঐ।
৩. ঐ।

টাকের ওপর আয়না
পুঁটির মাছ খায়না।
টাকেব উপর গোস্ত
ছোঁয়া দিলে দোস্ত।[১]

চিল-মোরগের নাম-ভূমিকায় খেলাটিতে বন্দীর পলায়ন ও ধর-পাকড়ের অভিনয় হয়ে থাকে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আছে আমোদ-উল্লাস, দৌড়া-দৌড়ির মধ্যে শরীরচর্চার উপকারিতা আর ছড়া আবৃত্তির মধ্যে কৌতুক-আনন্দ।

কুমীর কুমীর খেলা

'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' প্রবাদটি প্রমাণ করে বাঙালীর লোক-জীবনে বাঘ এবং কুমীর বিড়ম্বনার কারণ ছিল। দক্ষিণবঙ্গে খাল-জঙ্গলে বাঘ-কুমীরের উপদ্রব বরাবর চলে আসছে। নদীনালা ও খালবিলের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—পারাপারে, মৎস্য শিকারে, বাণিজ্য যাত্রায়, তীর্থ যাত্রায় এবং স্নানাদি ব্যবহারিক নিত্য কর্মে। এসব কাজে নানা বিপাকে পড়ে কুমীরের কবলে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। স্নানের সময় কিভাবে কুমীর মানুষ শিকার করে তার কৃত্রিম অভিনয় করে 'কুমীর কুমীর খেলা' হয়। সুতরাং এতে লোকজীবনের অভিজ্ঞতার ছায়া আছে।

খেলাটি দলবদ্ধ। দশ-পনের জন বালক-বালিকা একত্রে খেলতে পারে। উঠান ও বারান্দার উঁচুনীচু জায়গা নদী ও ঘাটের কৃত্রিম পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। দলের একজন প্রথমে কুমীরের ভূমিকা নেয়। সে নীচে সামান্য দূরে ওঁত পেতে থাকে। অন্যরা স্নান করতে নামে। তারা স্নানের ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়ে এবং মুখে 'হাপুস হুপুস' শব্দ করে। অথবা 'কুমীর, তোর জলে নেমেছি' বলে ছড়া কাটে। কুমীর সুযোগ পেলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পালাবার চেষ্টা করে। যে ধরা পড়ে সে কুমীর হয়, আগের কুমীর ছাড়া পায়। কুমীর কুমীর খেলার এটাই নিয়ম। এতে খেলা এবং অভিনয় একত্রে

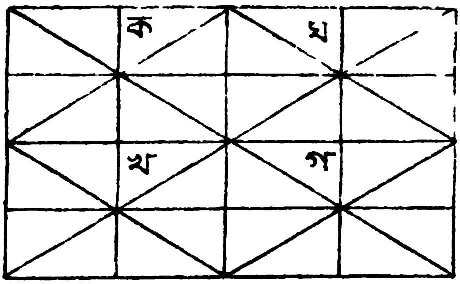
১. রাজশাহীর ছড়া, পৃঃ ৬৫

মিশে আছে। সরলমতি শিশুরা এটি খেলে অবসর যাপন ও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। নকল কুমীরকে আসল কুমীরজ্ঞানে ভয় করা এবং তার কাছে সহজে ধরা না পড়ার অভিনয়ে স্নায়ুবিক সতর্কতায় আত্মরক্ষার দীক্ষা ও অভ্যাস গড়ে উঠে তাদের।

বাঘবন্দী

বাঘবন্দী যুদ্ধের খেলা। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেমন দাবার ঘুঁটির চাল দিতে হয়, বাঘবন্দীরও তা'ই। দাবায় আছে যুদ্ধের কৌশল, বাঘবন্দীতে আছে শিকারের কৌশল। ঘুঁটির চাল দিয়ে 'বাঘ' নামের ঘুঁটি বন্দী করা হয়। এ থেকে খেলাটির নাম বাঘবন্দী হয়েছে। বাঘের চালে ঘুঁটি মারা পড়ে। রাজশাহীতে ঘুঁটির প্রতীক নাম 'বকরী'। এজন্য ঐ অঞ্চলে খেলাটি 'বাঘ-বকরী' নামে পরিচিত।[১] কুমীরের মত বাঘের কবলে মানুষ ও গবাদি পশু প্রাণ হারায়। উপক্রত অঞ্চলে আত্মরক্ষার জন্য তো বটে আবার ব্যবসায়ের কারণেও লোকে জীবন্ত বাঘ শিকার করে। বাঘ শিকারে যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গর্ত করে ও গরু-ছাগল বেঁধে ফাঁদ পেতে বাঘ-শিকারের রীতি এদেশে প্রচলিত আছে। সমাজজীবনের এ ছবি থেকে বাঘ-বকরী বা বাঘবন্দী খেলার উদ্ভাবন হয়ে থাকতে পারে।

মাটির উপর দাগ কেটে বাঘবন্দীর ঘর করা হয়। ঘরের একটি রেখা চিত্র এরূপ :



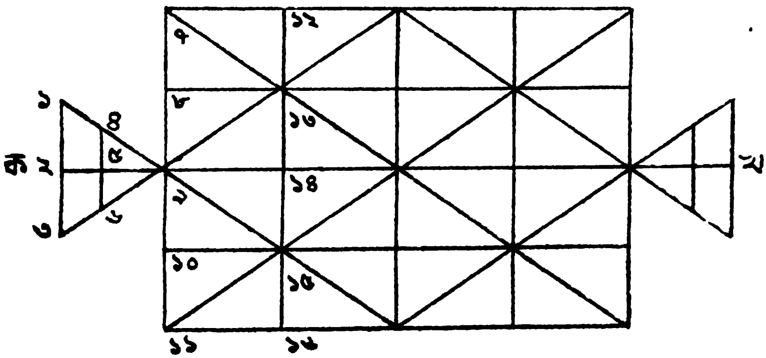
বাঘবন্দীর ছক

১. নিজস্ব সংগ্রহ।

চিত্রের ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত স্থান ছাড়া সরল রেখার যে কোন সন্ধিস্থলে বাঘের ভূমিকায় দুটি ঘুঁটী বসে। উক্ত চারটি স্থানে ৫টি করে মোট ২০টি ঘুঁটি বসে। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন বাঘের চাল দেয়, অপরজন ঘুঁটির চাল দেয়। সরলরেখা বরাবর ঘুঁটিব বিপরীত পাশে শূন্য ঘর পেলে বাঘ লাফ দিতে পারে, এতে একটি ঘুঁটি মারা পড়ে। কিন্তু পর পর দুটি ঘর ঘুঁটি দখল করে রাখলে বাঘের গতিপথ রুদ্ধ হয়। ঘুঁটির চালে বাঘ মরে না, ঘুঁটিগুলি কেবল আত্মরক্ষা করতে পারে। দাবাখেলায় রানীর চাল বন্ধ করতে পারলে যেমন কিস্তি মাত, তেমনি পালাক্রমে ঘুঁটি চালতে চালতে বাঘের চাল বন্ধ করতে পারলে বিপক্ষের জয়। কিন্তু বাঘ সব ঘুঁটি খেয়ে ফেললে তার জয় হয়। খুব সতর্কতার সহিত বাঘবন্দী খেলতে হয়। ভুল ও খেয়ালি চালে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অবসরবিনোদন নিমিত্তে খেলাটি indoor game-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ষোলঘুঁটি

ষোলঘুঁটি খেলায় প্রতিযোগী দুজন। প্রত্যেকের ষোলটি করে ঘুঁটি থাকে। বাঘবন্দীর ঘর থেকে ষোলঘুঁটির ছকের সামান্য পার্থক্য আছে। এর ছকটি নিম্নরূপ:



ষোলঘুঁটির ছক

চিত্রে 'ক' পাশের খেলোয়াড়ের ঘুঁটির স্থান ১, ২, ৩,...১৬ সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে। 'খ' পাশের খেলোয়াড় অনুরূপভাবে নিজ ঘরে

ঘুঁটি বসায়। প্রথমে একজন একঘর সামনে ঘুঁটি ঠেলে দিয়ে খেলা শুরু করে। এরপর সুবিধা মত আগে-পাছে চাল আছে। উভয় খেলোয়াড় পরস্পরের ঘুঁটি মারতে পারে। কেবল লাফ দ্বারা চালের সুযোগ এলে ঘুঁটি মারা পড়ে। ঘুঁটি মেরে একপক্ষের ঘর শূন্য অথবা তার চালের গতি রোধ করতে পারলে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। বলা বাহুল্য, এটিও বুদ্ধিপ্রধান খেলা। খেলার পদ্ধতিতে ছদ্মযুদ্ধের কৌশল প্রচ্ছন্ন আছে। এদিক থেকে খেলাটি দাবার সমধর্মী। বলা যায়, এটি দাবা খেলার গ্রাম্য সংস্করণ। দাবায় কয়েক নামের মোট ষোলটি ঘুঁটি থাকে। এক এক শ্রেণীর ঘুঁটির চালের পদ্ধতি ও গতিবিধি ভিন্ন ভিন্ন। ষোল ঘুঁটি খেলায় সব ঘুঁটির নাম ও মান এক, একই পদ্ধতিতে ঘুঁটিগুলি চালতে হয়। ধৈর্য, সতর্কতা এবং কৌশলের সঙ্গে খেলতে হয় বলে বয়স্করা এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। সময়সাপেক্ষ এ খেলাটি অবসরযাপনেরও অন্যতম উপায়। এটাই বিখ্যাত 'মোগল-পাঠান' খেলা।[১] যুদ্ধবিদ্যার ছায়াতে খেলাটি উদ্ভাবিত হয়েছে উক্ত নাম থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য। ষোল শতক এ-যুদ্ধের কাল। যুদ্ধের স্মৃতি-আশ্রিত এ খেলা ঐ সময়ের পর থেকে এদেশে চালু হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

নৌকা বাইচ

নৌকা বাইচ নদীনালা খালবিলে ভরা বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলা। নদী ও নৌকা বাংলার প্রাণস্বরূপ। বাঙালীর ব্যবহারিক ও আর্থনীতিক জীবনের মত সাংস্কৃতিক জীবনেও নদী-নৌকার প্রভাব গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পারাপারে নৌকা, মাছ শিকারে নৌকা, জলযুদ্ধে নৌকা, পণ্য-বহনে নৌকা, প্রমোদবিহারে নৌকা, বসবাসে নৌকা। মাঝি, জেলে, বেদে, নৌ-সেনা, সদাগরের জীবন নৌকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খেলাধূলার আনন্দোৎসবেও নৌকার ব্যবহার। নৌকা বাইচ এরূপ একটি খেলা। এটি শ্রমের খেলা, শক্তির খেলা, কৌশলের খেলা (games

১. পূর্বোক্ত, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃঃ ২৪০

of skill)। বাইচ ফারসী বাজী (بازی) শব্দজাত। মূল অর্থ খেলা।[১] যারা দৈহিক কৌশল বা যাদুর খেলা দেখায় তারা 'বাজীকর'; পণ রেখে খেলার নিয়ম আছে, একে 'বাজিধরা' বলে, আবার খেলায় জয়লাভ অর্থে 'বাজিমাত' আছে। 'আতসবাজি'র খেলা আছে, তাতে 'বাজিপোড়ান' হয়, এটি বারুদের খেলা। দাঁড় টানার কসরত দ্বারা, নৌকা চালনার কৌশল দ্বারা প্রতিযোগিতায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে আমোদ-প্রমোদমূলক এ খেলার নাম নৌকা বাইচ খুবই সার্থক। কোন কোন নৌকা বাইচ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগঠিত হলেও অনুষ্ঠানের সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়; অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও নিছক আমোদ-প্রমোদের উৎসবে নৌকা বাইচ হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের অনুষ্ঠানে (১লা ভাদ্র) নৌকা বাইচ হয়, কিন্তু মনসা পূজার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। কারণ নৌকা বাইচ না হলেও মনসা পূজার অঙ্গহানি হয় না। অনেক স্থলে এ উপলক্ষে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমান সমাজের কোন নির্দিষ্ট উপলক্ষ নেই। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন খালবিল, নদীনালা ভরাট ও শান্ত থাকে তখন কোন লোকোৎসব অথবা জাতীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে নৌকা বাইচের আয়োজন হয়। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় 'আড়ং' মেলা হত—তার মূল অঙ্গই হল নৌকা বাইচ।[২] মনসা ভাসান উপলক্ষে হোক, লৌকিক মেলা অথবা জাতীয় উৎসব উপলক্ষে হোক নৌকা বাইচের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা হিন্দু-মুসলমান জেলে-হেলে মাঝিমাল্লা; দর্শক সর্বস্তরের নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা। মাঝিমাল্লারা প্রধানতঃ পেশাদার; গ্রামের সৌখিন যুবকেরাও থাকে। যারা দাঁড় টানে তারা 'বাচেলদার', আর যারা গান-বাজনা করে তারা 'সারিদার'। নৌকার দুপাশে জোড়ে জোড়ে বসে বাচেলদাররা দাঁড় টানে, পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিদাররা গান করে। বিশ-পঁচিশ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন বাচেলদার ও সারিদার থাকতে পারে। প্রতিযোগিতার নৌকার

১. বাজি>বাইজ (অপিনিহিতি)>বাইচ।
বাঙ্গালা সরল অভিধান, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৫২৯

২. মৈমনসিংহ গীতিকা : দেওয়ানা মদিনা, পৃঃ ৩৬৫
আরং<আড়ং<আড়ঙ্গ—মূল অর্থ হাট, গঞ্জ; দেশী অর্থ মেলা।
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান দ্রষ্টব্য।

কোন পাল-মাস্তুল থাকে না। বাইচের দিন নৌকাকে সুসজ্জিত করা হয়—চালের গুঁড়া ও সিঁদুর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় নৌকায় গায়ে ও গলুই-এ। পানির খেলা বলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় তারা আঁট-সাঁট পোশাক পরে।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগীরা নাচ-গান করে ফূর্তি করে। সারিগানের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, লৌকিক প্রেম, নিমাই সন্ন্যাসের পালা। বীরত্বব্যঞ্জক, আক্রমণাত্মক এবং আত্মম্ভরিতা-জ্ঞাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গানও আছে। তালে, মানে, ভাবে, সুরে এগুলি পুরোপুরি নৌকা বাইচেরই গান। কোন কোন গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ আছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে মাঝিমাল্লারা যে পীরের দোহাই দিয়ে নৌযাত্রা করে, সে পীর হলেন বদরপীর। বৈঠার টানে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলে আর বৈঠার তালে তালে সমানে গান চলে।

(ওই) চলে চলে চলে নাও হেইও।
চল্ চল্ চল্ ভড়াল দিয়া চল্ ॥
বদর বদর রবে চল্ হেইও চল্ চল্।
হো হো দ্যাখ দেখি কেবা যায় আগে ॥
বদর বদর রবে ধইর‍্যা ফ্যাল তারে।
আরে ও চল্ চল্ চল্, বদর বদর রবে চল ॥[১]

দাঁড়ের জোরই জয়ের প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া নৌকার ভারসাম্য রাখা এবং কুশলী চালনাও একান্ত উপযোগী। দাঁড়ির ও মাঝির মনোযোগ এবং শৃঙ্খলাবোধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দাঁড়ের প্রতিটি ক্ষেপের সাথে তালবোধ না থাকলে জয়ের সম্ভাবনা দূরে থাক ভয়ের সম্ভাবনাই বেশী —ভরাডুবির ভয়। মাঝি ঠিকমত চালাতে না পারলে নৌকায় নৌকায় ঠোকাঠুকি লাগে। অনেক সময় ঠোকাঠুকি, পথরোধ, পরাজয় ইত্যাদি কারণে প্রতিযোগীদের মধ্যে মারামারি এবং তা থেকে খুনাখুনিও হয়। নৌকা বাইচ সমষ্টির খেলা বলে এতে গোষ্ঠী মনোভাব ও গোষ্ঠী স্বার্থ প্রকাশ পায়।

---

১. উদ্ধৃত: বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২২৪

দৌড় শেষে বিজয়ী নৌকা ও প্রতিযোগীদের ধানদূর্বা ও বরণডালা দিয়ে বরণ করা হয়। নদীর অধিপতি পবন দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হয়। সব নৌকা যখন ঘরে ফেরে তখনও নানাভাবের নাচ-গান হয়—বিজয়ীর কণ্ঠে উল্লাসের সুর, বিজিতের কণ্ঠে বেদনার সুর। দৌড়ের আগে, দৌড়ের কালে এবং দৌড়ের পরে এসব কিছুকে নিয়েই একটি পূর্ণ নৌকা বাইচ।

নৌকা বাইচ (boat race) কমবেশী সব দেশে আছে। ভারতের কেরল প্রদেশে 'ওগম' উৎসবে নৌকা বাইচ হয়।[১] সেখানেও বেশ ঘটা এবং জৌলুস হয়।

বাংলাদেশে কবে থেকে কোন উদ্দেশ্যে নৌকা বাইচের চল হতে পারে তা সঠিক বলা যায় না। নদীনালার দেশে নৌকার ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে। নৌকার সমতুল গাছের গুঁড়ির তৈরি 'ডিঙ্গি-ডোঙ্গা' অস্ট্রিক শব্দ। নৌকার ব্যবহার সুপ্রাচীন হলেও নৌকা বাইচের চল প্রাচীন নাও হতে পারে। নৌকা বাইচের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে শঙ্কর সেনগুপ্ত দুটি জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। একটি জনশ্রুতি জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রাকে কেন্দ্র করে। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময় স্নানার্থীদের নিয়ে বহু নৌকার হুড়াহুড়ি ও দৌড়া-দৌড়ি পড়ে যায়। এতেই মাঝি-মাল্লা-যাত্রীরা প্রতিযোগিতার আনন্দ পায়। এ থেকে কালক্রমে নৌকা বাইচের শুরু।[২] শঙ্কর বাবু এ জনশ্রুতি কোথা থেকে পেলেন তা বলেননি। আমাদের মনে হয়, এটা কষ্টকল্পিত জনশ্রুতি, কারণ জগন্নাথদেব ও স্নানযাত্রার সাথে নৌকা বাইচের কোন কিছুতেই যোগসূত্র নেই।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি পীর গাজীকে কেন্দ্র করে। শঙ্কর বাবুর ভাষায় "জনৈক গাজী নদীর ওপারে বসে এপারের ভক্তকে তার কাছে ডাকছেন। গাজীর আদেশ প্রতিপালন করতে পারছে না ভক্ত, নদীর ভীষণা মূর্তি তাকে নদী পার হতে দিচ্ছে না। তবুও গাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভক্ত ছোটে, কিন্তু কোন নৌকা নেই। কে তাকে নদীর

১. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২২৫
২. ঐ, পৃঃ ২২৬

ওপারে নিয়ে যাবে। অনেক খোঁজ করে একখানা ডিঙ্গি জোগাড় করল ভক্ত, সে নৌকা যতই ওপারের দিকে যেতে চেষ্টা করে ততই স্ফীত হয়ে ওঠে নদী, নৌকা ডুবে যায় যায়। নৌকার দুর্দশা দেখে তার উদ্ধারে একে একে অনেক নৌকা ছুটে এল। ছুটে এল বিপদগ্রস্ত ডিঙ্গির মাঝি, যাত্রী ও নৌকাকে সাহায্য করতে। সকলে গাজীর চরণে প্রণাম করে, গাজীর নাম নিতে নিতে এগিয়ে চলল। নদী ক্রমেই শান্ত হয়ে এল। ভক্ত নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছাল। শান্ত নদীতে নৌকার সারি মনের প্রশান্তিতে তখন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। এই পাল্লার নেশা থেকেই নাকি নৌকা রেসের বা বাইচের উৎপত্তি।"[১]

শ্রীশঙ্কর এ জনশ্রুতি কোথা থেকে, কার কাছ থেকে পেলেন তা'ও বলেননি। উক্ত গাজী এবং তাঁর কেরামতি নৌকা বাইচের কারণ কিনা তাও স্থির করে বলা যায় না। লোকজীবনে এক গাজী পীরের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা আছে, কিন্তু তিনি নদী-নৌকার উপর কর্তৃত্ব খাটান না। তিনি বাঘের দেবতা।[২] বরং বদরপীরই নদীর দেবতারূপে গণ্য হয়ে থাকেন। সুতরাং নৌকা বাইচের উৎস কল্পনায় গাজীপীরের কেরামতির কাহিনীও কাল্পনিক এবং অমূলক। নৌকাজীবনকে কেন্দ্র করে সারিগান প্রাচীনকালে ছিল, কিন্তু তার সাথে নৌকা বাইচও ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিপ্রদাস ও বংশীদাসের মনসামঙ্গলে সারিগানের উল্লেখ আছে কিন্তু নৌকা বাইচের উল্লেখ নেই।[৩] বিপ্রদাস পনের শতক এবং বংশীদাস সতের শতকের কবি। অতএব মনসা ভাসান উপলক্ষে অধুনা নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হলেও মনসা পূজা নৌকা বাইচের

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭

২. বর্তমান গ্রন্থের 'লৌকিক পীরবাদ' অধ্যায়ের 'গাজীপীর' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. নানা বাদ্য বাজনে পাইকে গায় সারি।
বুহিত্র মেলিয়া ঝাটো চাঁদ যায় ধড়ি॥ —বিপ্রদাস

চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায়
পাইক সবে সাইর গায়। —বংশীদাস

উদ্ধৃত : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১৫২, ২৮৮

উদ্ভব-উৎস নয়। নদী ও নৌকাকে নিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটি অংশ ব্যক্ত হলেও এবং সারিগানের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে নিয়ে রচিত হলেও কৃষ্ণভক্তরা সারিগান বা নৌকা বাইচের উদ্‌গাতা নয়। এমন কি 'নিমাইসন্ন্যাস' সারিগানের বিষয়ভুক্ত হয়েছে, তথাপি বৈষ্ণব সমাজে আলাদাভাবে নৌকা বাইচের চল নেই। 'বাইচ' শব্দমূল থেকে অনুমিত হয়, মধ্যযুগের মুসলমান নবাব-সুবেদার-ভূস্বামীরা নৌকা বাইচের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের নৌবাহিনী নৌকা বাইচের উৎসস্থল হতে পারে। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে নৌশক্তি রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যজয়ের অন্যতম উপায় ছিল। বাংলার বার ভুঁইয়ারা নৌবল নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মোগল-সুবেদাররা নৌশক্তির দ্বারা মগ ও হার্মাদ দস্যুদের পরাভূত করেছিলেন। ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সঙ্গে নৌকা পরিচালনার উপর যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকত। এদের রণতরীতে দীর্ঘাকৃতি 'ছিপ' নৌকা থাকত। এ শ্রেণীর নৌকা বাইচের পক্ষে আজও উপযোগী। অবসরকালে নৌবাহিনীর মধ্যে উৎসব-অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ বাইচের আয়োজন হত। এছাড়া মহড়া আছে, বিহার আছে। এতেও প্রতিযোগিতামূলক দৌড়পাল্লার অবকাশ ছিল। বাংলার রাজনীতির আকাশে ক্রমে সামন্তযুগের অবসান হলে এবং দাঁড় বাহিত নৌকার স্থলে বাষ্পচালিত রণতরীর আমদানি হলে পূর্বের ঐ প্রকার নৌবাহিনী লোপ পায়। কিন্তু পূর্বের সে আচার ও অভ্যাস নৌবাহিনী ছেড়ে জনগণের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে নৌকা বাইচের মাধ্যমে বিরাজ করতে থাকে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সারিগান তথা নৌকা বাইচের উদ্ভব বিকাশের মোটামুটি এ ধরণেরই অভিমত পোষণ করেন।[১]

হোলডুগ খেলা

হোলডুগ পানির খেলা। পানির খেলা সাঁতার সাপেক্ষ। ভাল সাঁতার না জানলে ছোটদের পক্ষে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে। কেবল স্নানের সময় বালকেরা মুহূর্তখানেক খেলায় মেতে উঠে। এ খেলা খুব সাধারণ এবং বৈচিত্র্যহীন।

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৯

একদল বালক একত্র হয়ে হোলডুগ খেলা শুরু করে। আপোষে অথবা টপে প্রথমে একজন দান পায়। তারপর উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক ছড়া দিয়ে খেলা শুরু হয়। ছড়ায় থাকে নিজ বীরত্বের ভাব অথবা অপরের প্রতি অবমাননাকর উক্তি।[১] যে দান পায়, সে হাতে পানি নিয়ে প্রশ্ন করে, অন্যরা উত্তর দেয়। প্রশ্নকর্তা শেষ বাক্যটি বলে ডুব দিয়ে পালিয়ে যায়। অন্যদের কাজ হল তাকে ধরা বা ছোঁয়া। যে প্রথম স্পর্শ করে পরের খেলায় সে'ই ডুব দেওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে হোলডুগ খেলা চলতে থাকে। ফরিদপুরে 'হৈলডুবি',[২] রাজশাহীতে 'হেল্লু', ময়মনসিংহে কোথাও 'মলই', কোথাও 'ঝালুকা',[৩] নোয়াখালিতে 'হুটিহুটি', বগুড়ায় 'হরিহরি'[৪] প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে খেলাটি প্রচলিত আছে। খেলার পদ্ধতি সহজ। সাঁতারে ক্ষিপ্রতা ও শ্বাসের দীর্ঘতা খেলার পক্ষে সহায়ক। ছেঁায়া বাঁচিয়ে যে যতক্ষণ সাঁতার দিতে পারবে, তারই অধিক কৃতিত্ব। সাঁতারের আনন্দ এ খেলার প্রধান আকর্ষণ। এতে ব্যায়ামের উপকারিতাও আছে।

লাই খেলা

নাভি থেকে 'লাই' শব্দটি এসেছে।[৫] কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে লাই খেলার প্রচলন আছে। প্রেমতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের গানে লাই খেলার নাম পাওয়া যায়।[৬] বালকদের খেলা গুহ্য প্রেমতত্ত্বের

১. দৃষ্টান্ত :

এট্যা কি ?	এট্যা কি ?
দুধ।	মরিচ।
এট্যা কি ?	বাপ বলে ধবিস। —রাজশাহী
ত্যাল।	

নিজস্ব সংগ্রহ।

২. জসীমউদ্দীন—জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২

৩. লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭২, পৃঃ ৩০

৪. রোস্তম আলি—পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী সংগঠন, পৃঃ ৪৭

৫. নাভি>নাহি>লাই। গ্রাম্য উচ্চারণে 'ন' 'ল' প্রায় স্থান বদল করে, যথা—লাল>নাল, নাড়ি>লাড়ি, লবণ>নুন।

৬. (ক) বাউল গান : পরম না চিনলে জীবের মুক্তি নাই
কে বিরাজে দেহের মধ্যে
দম সায়রে খেলায় লাই।—ময়মনসিংহ

মোমেনশাহী লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৭

প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় খেলাটি সমাজজীবনে নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছে। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী লাই খেলার এরূপ বিবরণ দিয়েছেন: "একটি ছেলে বুক পানিতে দাঁড়াইয়া এক হাতে পানি লইয়া অন্যান্য ছেলেকে দেখায় আর বলে:

আমার হাতে কি ?
জলই।
এক ডুবে তলই।
তরে যদি পাই।
এক গেরাসে খাই ।।

এই বলিয়া প্রথম ছেলে ডুব দিয়া পলাইয়া অন্ততঃ নাভি-পানিতে আসিয়া দাঁড়াইবাব চেষ্টা করে, আর অন্য ছেলেরা তাহাকে নাভি-পানি পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইবার আগেই ডুব দিযা ধরিবার প্রয়াস পায়। যদি প্রথম ছেলেটি ধরা পড়িবার আগে নাভি-পানিতে আসিয়া নাভি দেখাইয়া 'আঙ্গা-আঙ্গা' বলিতে পারে, তবে তাহার জয় হইল। সে যদি নাভি-পানিতে আসিবার আগেই ধরা পড়িয়া যায়, তবে তাহার পরাজয় হইয়া থাকে; অন্য ছেলে উপরি উক্ত ছড়া বলিয়া আবার লাই খেলা শুরু করিবে।...প্রথম ছেলে ডুব দিয়া ধরা পড়িবার আগে ভাসিতে পারে, আবার ডুব দিতে পারে, তবে ডুবের অবস্থা ব্যতীত তাহাকে ছুঁইলে মারা পড়িবে না, পানির নীচেই ধরা চাই।"[১]

খেলাটি হোলডুগের মতই, এখানে কেবল নাভি দেখিয়ে খেলা হয়।

তই তই খেলা

'তই তই' খেলায় ডুব অথবা সাঁতার অত্যাবশ্যক নয়। সাধারণতঃ কোমর পানিতে সকলে গোল হয়ে দাঁড়ায়। একজনের হাতে থাকে

(খ) মেয়েলীগীত: আমি যদি যাই গোছল করতাম
আমার সঙ্গে সঙ্গে যায় গো তাই।
লোকের কাছে বলে গো তাই
আমি বলে লাই খেলাইয়া লাই।—কুমিল্লা।

লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭২, পৃঃ ৩৪৯

১. লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃঃ ৮২

একটা ভাসন্ত ফল। উপর থেকে ছুঁড়ে দিলে কাড়াকাড়ি শুরু হয়—কে আগে দখল নেবে। হৈ-হুল্লোড় করে ফলটা হস্তগত করাতেই খেলার আনন্দ। তই তই ছড়াযুক্ত খেলা। ছেলেরা হাতে পানি টেনে মাতামাতি করে আর মুখে ছড়া বলে।

তই তই
বগা মারিয়া তলিত থই।
বগা আইল কুঁইয়া
ভূষ্ণায় খায় চুঁইয়া।[১] —ময়মনসিংহ

ডুব-পানির বিপদ অথবা সাঁতারের শ্রম নেই বলে অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা তই তই খেলে থাকে। ফরিদপুরে খেলাটি 'ঝাপড়ি' নামে পরিচিত।[২] বৃষ্টি আবাহনমূলক একটি ছড়ায় 'ঝাপ্পুরি' নাম পাওয়া যায়:

ঠাকুরদাদার ভাঙ্গা ঘর।
বিষ্টি নামে আড়াইফর।
ঠাকুরদা ও ভাই—
ছিটি ছিটি জল দেরে ঝাপ্পুরি খেলাই।[৩]

ঝাপ্পুরি, ঝাপড়ি অভিন্ন নাম। ঝাপটা/ঝাপটি শব্দ থেকে ঝাপড়ি, ঝাপ্পুরি শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

পানিঝুপ্পা

পানিঝুপ্পার অপর নাম 'ব্যাঙ লাফানো' খেলা। পাতলা চ্যাপ্টা মাটির টুকরা বা ভাঙা হাঁড়ির চাড়া ডাঙা থেকে পানির উপরে বিশেষ কায়দা করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। যেভাবে ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে যায় সেভাবে চাড়াটি পানির উপরে কিছু দূর গিয়ে ডুবে যায়। এ দৃশ্যটিই প্রকৃত উপভোগ্য। কে কতক্ষণ ধরে কতদূর পাঠাতে পারে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। চাড়া দেখতে খলসে মাছের মত বলে কোন কোন

১. নিজস্ব সংগ্রহ।
২. জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩
৩. উদ্ধৃত: বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৬৫

স্থানে এটি 'খলসা মাছের খেলা' নামেও পরিচিত। চাড়ার নাম 'খোলামকুচি' থেকে অঞ্চলবিশেষে 'খোলামকুচি খেলা' নামও পাওয়া যায়।[১]

ইকড়ি মিকড়ি

ইকড়ি মিকড়ি ছড়ার খেলা। ছড়ার চরণ থেকেই খেলার নামকরণ হয়েছে। ছড়ার কথার অর্থ ধরে খেলার বাহ্যরূপ ফুটে উঠে না। তবে কতক ছড়ার সহিত খেলার সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এসব স্থলে বীরত্বের ভাব অথবা অবমাননাকর উক্তি থাকায় খেলার প্রধান আকর্ষণ যে প্রতিযোগিতা তার ধর্ম প্রকাশ পায়। অন্যত্র অসঙ্গতি বেশি।

ইকড়ি মিকড়িতে ছড়া বলার সাথে সাথে খেলাও চলতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চক্রাকারে হাঁটু মুড়ে বসে—সামনে মাটিতে দুহাত উপুড় করে রাখে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন 'প্রধান' হয়—সে'ই ছড়া আবৃত্তি করে। ছড়াটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ; কোথাও 'ইছন বিছন',[২] কোথাও 'ইচিং বিচিং'[৩] প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ সমষ্টি দিয়ে

---

১. মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে এরূপ নাম প্রচলিত আছে। নিজস্ব সংগ্রহ।

২. ইছন বিছন দবগা বিছন,
উঠ উঠ বউ গো,
মোমেব ছাতি ধব গো,
মোমের ছাতি উভবা
ফাল দিয়া ধব দুধবা
এলপাত বেলপাত
নেও গো তোমার সোনার হাত। —ময়মনসিংহ

বাংলাব লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ· ৩৫১

৩. ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
ভায় পল্লো মাকড় বিছিং।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে,
সাত কুমড়ায় ডিম পাড়ে।

খলসে মাছেব চোকা,
উড়ে বসে পোকা। —ঢাকা

ঐ, পৃঃ ২৫০

ছড়া শুরু হয়। প্রধান খেলোয়াড় এক একটি শব্দ বা শব্দাংশ উচ্চারণের সাথে সাথে এক একটি হাতের পাঞ্জা স্পর্শ করে। ছড়ার শেষ শব্দটিতে যার যে হাতে স্পর্শ করে সে হাত তুলে নিয়ে পেট বা বগলে চেপে রেখে গরম করে। ছড়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা শেষ হাত পর্যন্ত তুলতে হয়। এবার প্রধানের কাজ হল সবার হাত পরীক্ষা করে দেখা গরম হয়েছে কি না। যার হাত ঠাণ্ডা থাকে সে 'চোর' হয়। চোর হওয়া অপমানকর ব্যাপার। এতেই তার পরাজয়।

কোন কোন অঞ্চলে হাত গরম না করে মুষ্টিবদ্ধ করে পেছনে রাখতে হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সকল খেলুড়েরই দুইটি হাতই এইভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইলে প্রত্যেকেই মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি সম্মুখে লইয়া আসে ; তখন সর্দার খেলুড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এই হাতে কি আছে'? নানা উত্তর প্রত্যুত্তরের পর সর্দার খেলুড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি যখন 'তরোয়াল দিয়া কাটিতে উদ্যত হয়, তখন উচ্ছ্বসিত কলহাস্যের মধ্যে খেলুড়ে 'ভুয়া' এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া হাতের মুঠি দুইটি খুলিয়া দেয়।"[১]

ইকড়ি মিকড়ির প্রথমাংশ game of chance-এর পর্যায়ভুক্ত। শেষাংশে চোর সাব্যস্ত করা এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার অভিনয়ের মধ্যে সামাজিক প্রথার অনুকরণ আছে। চোরের হাত কেটে শাস্তি দেওয়া মুসলমানদের একটা সামাজিক বিধি।[২] বাংলার উপজাতি চাকমা সমাজে এ খেলাটি প্রকারভেদে 'ইজিবিজি খারা' নামে পরিচিত।[৩]

---

১. ঐ, পৃঃ ২৪২

২. চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় চোরের হাত কাটার উল্লেখ আছে। যথা,

ইসকি মিসকি দুযা মিসকি,
ধান-চৈল বিলাই পোক।
পক্ষীরাজা মাছ ধরে,
খোবা হাবে লেজ নাড়ে।
এল বাদ বেল বাদ
বাজা কইয়ে চুবি
হাত কাট।

আতোয়ার রহমান—চট্টগ্রামের ছড়া, মাহে-নও, চৈত্র, ১৩৭০, পৃঃ ১৫৭

৩. আরণ্য জনপদে, পৃ ৬৫

আগডুম বাগডুম

আগডুম বাগডুম খেলার ছড়াটি বাঙালীর রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের এক ঐতিহাসিক স্মৃতিকে আশ্রয় করে আছে। প্রাচীন বাংলায় হিন্দু রাজাদের আমলে সামরিক বিভাগে ডোমসৈন্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। 'আগডুম' অর্থ অগ্রবর্তী ডোমসৈন্যদল, 'বাগডুম' পার্শ্বরক্ষী ডোমসৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল। এককালে ডোমসৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করত। বিষ্ণুপুর, রাজনগর প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ ডোমসৈন্য রাখতেন।[১]

ছড়ার ভাব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'বিবাহ-যাত্রা'র বর্ণনা বলে মনে করেছেন।[২] আশুতোষ ভট্টাচার্য তা সমর্থন করে বলেছেন, "কিছুদিন পূর্বপর্যন্তও পল্লীজীবনের অভিজাত পরিবারের বিবাহের শোভাযাত্রা যুদ্ধযাত্রারই একটি অধঃপতিত রূপমাত্র ছিল। কারণ, যখন সমাজে বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ কবিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন যুদ্ধযাত্রা ও বিবাহযাত্রায় কোনও পার্থক্য ছিল না।"[৩] সুতরাং খেলাটিতে বাস্তব সমাজজীবনের ছায়া আছে। ডোমসৈন্যের প্রভাব যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখন স্মৃতিকে আশ্রয় করে খেলা গড়ে উঠে।

খেলার পদ্ধতি ইকড়ি মিকড়ির মত; এখানে হাতের স্থলে হাঁটু স্পর্শ করা হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাঁটুতে এসে শেষ হয় সে গুটিয়ে রাখে। যার দু'হাঁটু আগে গুটান হয় তার স্থান প্রথম। শেষ খেলোয়াড়েব পরাজয় হয়। ছড়ার শেষ কথাটি শোনার জন্য সকলের আগ্রহ থাকে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত একটি ছড়া নিম্নরূপ:

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল কমলাপুলি॥

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮
২. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫৩
৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮

কমলাপুলির টিয়েটা।
সূর্যিমামার বিয়েটা ॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই ॥
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওবে খুকু গা তোল ॥
... ...
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তাবার নামে টগর ফুল ॥[১]

ঘূর্ণিখেলা

ঘূর্ণি প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়ার খেলা। এর একটি ছড়া নিম্নরূপ :

টেকে রে
কি রে।
কনে গিইলি ?
শ্বশুর বাড়ী।
কি দেখে এলি ?
শোলির পোনা।
ধরলিনে কেন ?
ছাবাল কোলে।
তোর ছাবালের নাম কি ?
আপাল দুলাল।
তোর নাম কি ?
বুড়ো গোপাল।
দে পাখাল ॥[২] —যশোহর

খেলাটির বর্ণনায় শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখেছেন, "ঘূর্ণি খেলায় একটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়।...ছেলেটি প্রত্যেকবার উঁচু হয়ে উঠে উত্তর দেয়—এই সময় ছেলেটির কোমর পর্যন্ত অংশটা সুকৌশলে ধরে রাখা হয়। শেষে সকলে একত্রে 'দে পাখাল' বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে ঘুরান হয়।"[৩]

---

১. লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫১-৫২
২. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত—যশোর-খুলনার ছড়া, পৃঃ ১৪-১৫
৩. ঐ, পৃঃ ১৫-১৬

বাতাসের ঘূর্ণির মত ঘুরান হয় বলে খেলাটির নাম ঘূর্ণি হয়েছে। নিছক আমোদপ্রিয়তা এর লক্ষ্য।

রাজার কোটাল

রাজার কোটাল ছেলেমেয়ে একত্রে খেলতে পারে। দলের একজন প্রধান হয়, তার নাম 'রাজা'। অন্য একজন 'কোটাল' হয়।[১] রাজা সকলকে নিয়ে একস্থানে গোল হয়ে বসে। রাজার হাতের উপরে সবাই মুঠো করে হাত রাখে। কোটাল বৃত্তের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এর পর রাজা-কোটাল প্রশ্নোত্তরে ছড়া বলে :

> কান্‌টার পিছে কে ঘুরে ?
> রাজার কোটাল।
> কিসের জন্য ?
> এক ছড়ি কলার জন্য।
> কাল যে লিয়া গেছিলা ?
> ঘোড়ার লাদ পড়েছে।
> ধুয়্যা ধুয়্যা খাওনি ?
> ছি ছি থু।
> তবে এক ছড়ি লিয়া যাও।[২] —রাজশাহী

শেষ বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে কোটাল একজনের দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ হাত কলার কাঁদির মত করে কেটে কিছু তফাতে রাখে। সে আবার চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। রাজায়-কোটালে ছড়ার পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে কোটাল সবাইকে নিয়ে যায়। আর এতে একবার খেলা শেষ হয়।

রাজার কোটাল খেলাটি স্বরূপতঃ একটা অভিনয়। ছলাকলায় রাজার কোটাল গৃহস্থের কাছ থেকে কখন কলা, কখন পেঁপে, আম-কাঁঠাল, তরিতরকারী নিয়ে যায়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এ ছবি বাস্তবে দেখেছে, খেলার মধ্যে তারই অনুকরণ করে থাকে।

---

১. কোটাল হল রাজার নিম্ন কর্মচারী। গ্রামের চুরি, মারামারি প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ তদন্ত করার ভার কোটালের উপর থাকে।

২. নিজস্ব সংগ্রহ।

ব্যাঙের মাথা

ব্যাঙের মাথা প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়ার খেলা। প্রতিপক্ষকে অপমানকর উক্তিতে ঠকানই এর মূল আকর্ষণ। আঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ এতে নেই। মৌখিক কতকগুলি বোল কাটাকাটি হয়। স্বচ্ছন্দ ও গতিময় ছড়ায় শ্রুতিস্বরের আনন্দোপভোগে অবসরবিনোদনের সুযোগ আছে। রাজশাহী জেলায় প্রচলিত একটি ছড়ার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

এক কথা
কি কথা ?
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ ?
সরু ব্যাঙ।
কি সরু ?
বামন গরু।
কি বামন ?
হাটের বামন।
কি হাট ?
ঘোড়া ঘাট।
কি ঘোড়া ?
নীল ঘোড়া।
কি নীল ?
আগা চিল।
কি আগা ?
বকের পাখা।
কি বক ?
কানি বক।
কি কানি ?
ধান ভানি।
কি ধান ?
ফাউ ধান।
কি ফাউ ?
গু খাও ॥[১]

খেলাটি দু'জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নকর্তার পরাজয় অবধার্য, কারণ তার প্রশ্নগুলি উত্তরদাতার কথার সূত্র ধরেই নির্বাচিত হয়। উত্তরদাতা সুবিধামত কথাচিত্রের জাল বোনে। প্রশ্নকর্তা মন্ত্রমুগ্ধের মত তার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। নিতান্ত অবাঞ্ছিত অখাদ্যবস্তু খেতে বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবমাননা করা হয়। এখানেই খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতার ধর্ম এসে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, ছড়াটি খেলার সময় উপস্থিত বুদ্ধিমত রচিত হয় না। প্রচলিত ছড়াই স্মৃতি থেকে বলা হয়।

---

১. রাজশাহীর ছড়া, পৃঃ ৭৭

ধাঁধার খেলা

ধাঁধার খেলায় ছড়া আবৃত্তির আনন্দই অধিক। ধাঁধা স্বরূপতঃ রূপকধর্মী। বাচ্যার্থে ধাঁধার অর্থ উদ্ধার করা যায় না, ব্যঞ্জনার্থে উদ্দিষ্ট বস্তু-সূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। ধাঁধার রহস্যাবৃত উত্তরের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় শিশুর আঙ্গিক ক্রিয়াকৌশলের চেয়ে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বেশী হয়। 'হুকা' নিয়ে রচিত ধাঁধার একটি ছড়ার নিদর্শন এরূপ :

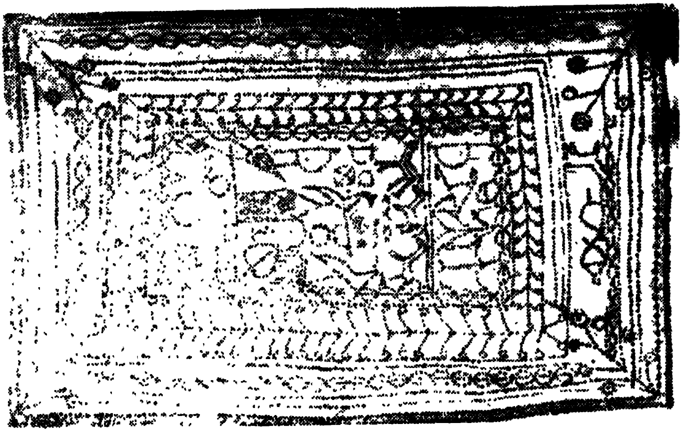
জলপিপি জলপিপি জলে করে বাসা
সমুদ্রে আগুন ল্যাগাছে ফিরে কর বাগা।
জলের আগুন নিভ্যান
পিপির বাসা থাকন।
মামু য্যাবে বিহ্যা করতে
শিয়াল যাইবার আশা।
শিয়াল করে চাতুর চতুর
মরা মানুষের মাথা।[১] —রাজশাহী

ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা এবং তার উত্তর দেওয়ার ভেতর দিয়ে খেলা চলতে থাকে। অনেক সময় ধাঁধা বলার জন্যই বলা হয়, উত্তর অপরিহার্য নয়। ধ্বনিসুষম ছড়া আবৃত্তিতেই শ্রুতিসুখকর আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

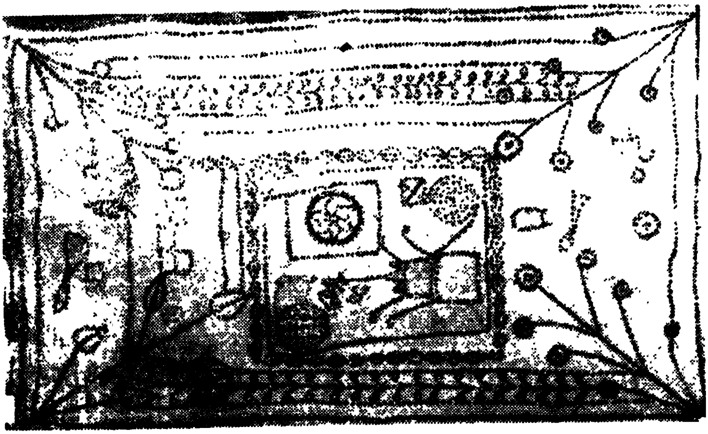
কাদামাটি খেলা

কাদামাটি নামে খেলা হলেও প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্যধর্মী ও সংস্কার-জাত লোকাচারের মধ্যে পড়ে। এজন্য খেলার গুণের চেয়ে আনুষ্ঠানিক মূল্য অধিক। বৃষ্টির আবাহনই মূল লক্ষ্য। এ খেলার ছড়ায় বৃষ্টিকে আমন্ত্রণ জানান হয়। সময়মত ও পরিমিত বৃষ্টি না হলে ভাল ফসল হয় না। এ থেকে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, বৃষ্টির শস্যোৎপাদনশক্তি আছে। অনাবৃষ্টির সময় মেঘকে আমন্ত্রণ জানালে তা মাটির বুকে নেমে আসবে এবং শস্য ফলবে। যাদুবিশ্বাস থেকে এ চেতনার উদ্ভব। যাদুবিশ্বাস আদিবাসীর কাছে ছিল ধর্মতুল্য। পরবর্তীকালে এটাই

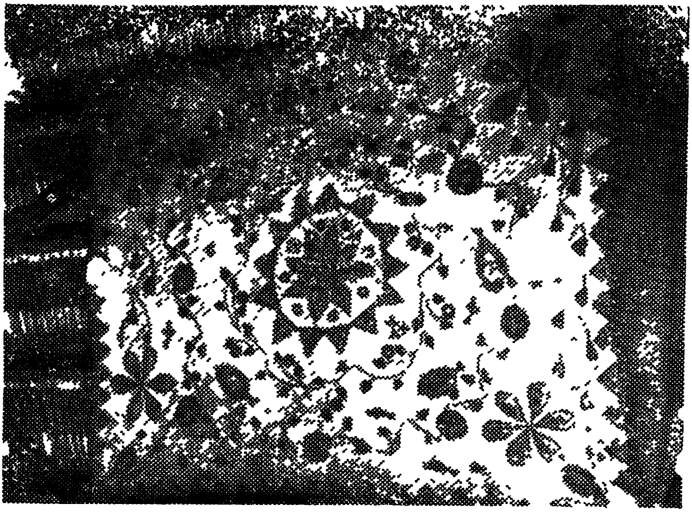
১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯



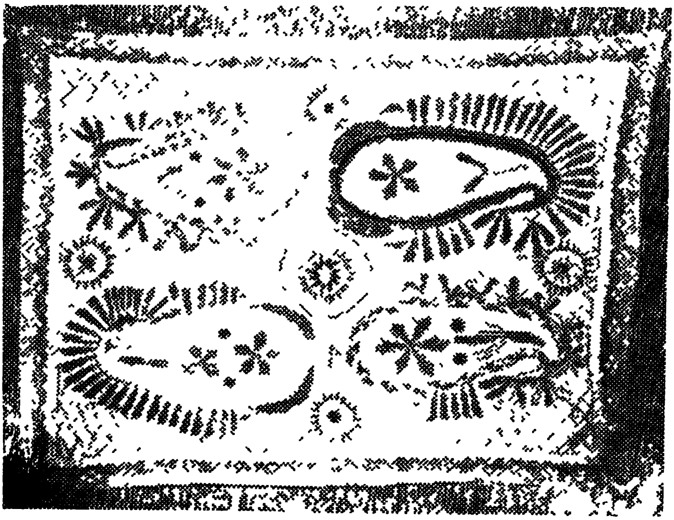
লেপ কাঁথা



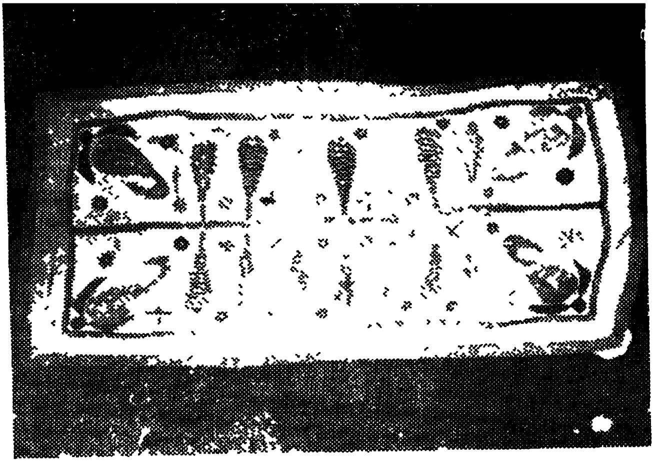
বিছানা কাঁথা



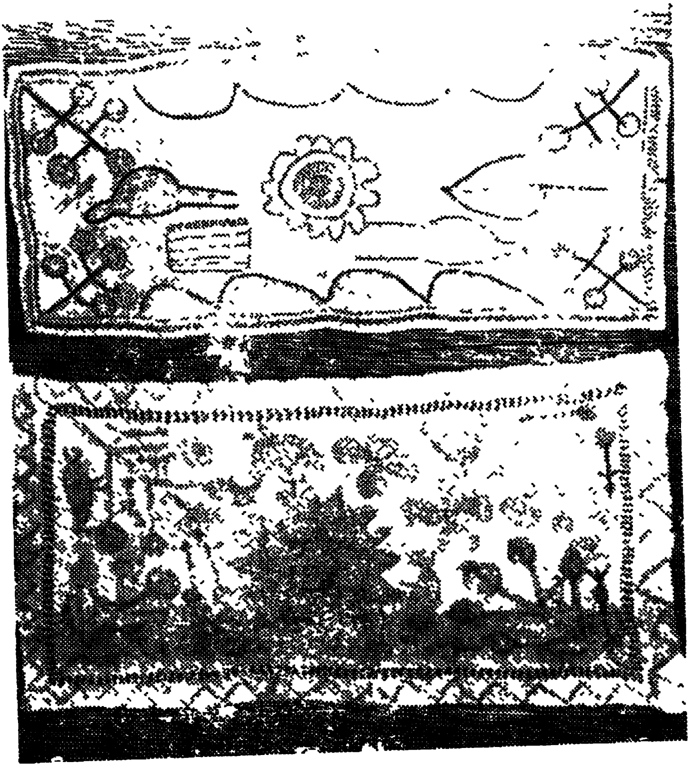
বিছানা কাঁথা



বস্তানী

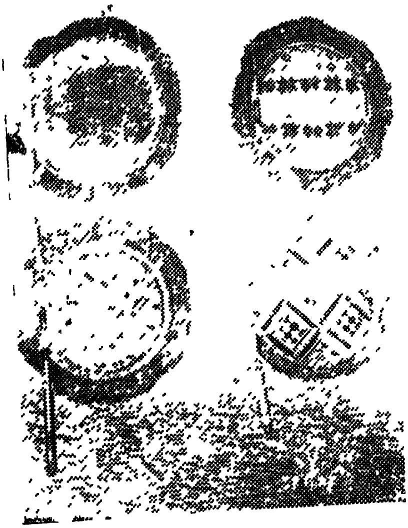


জায়নামাজ

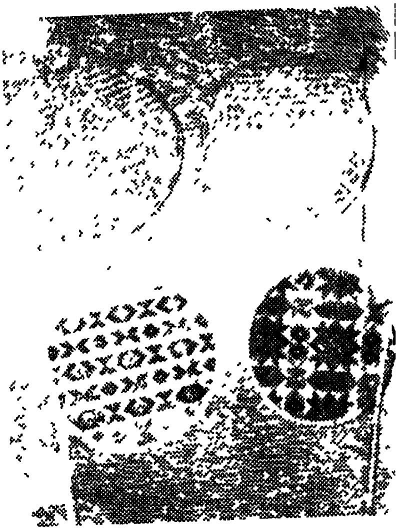


গাঁটবি

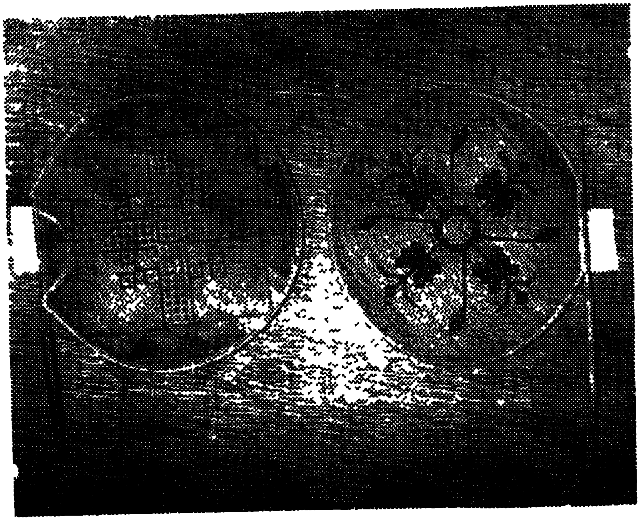
চিত্র ৪



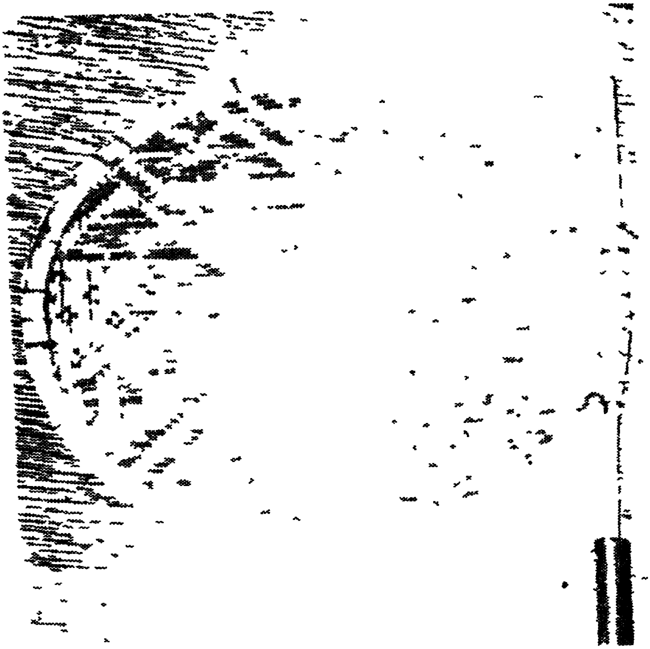
নকশী পাখা (সুতার তৈরি)



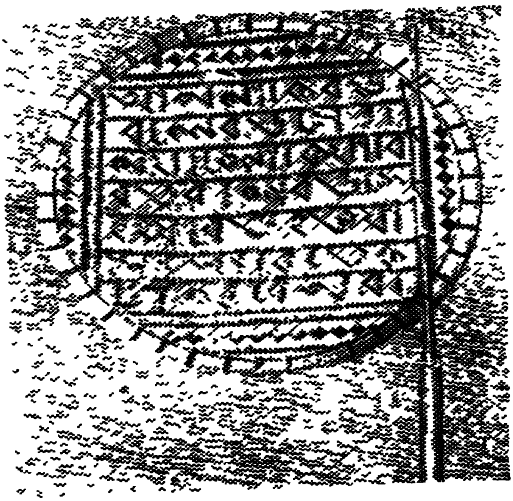
নকশী পাখা (বাঁশের তৈরি)



নকশী পাখা (বেতের তৈরি)

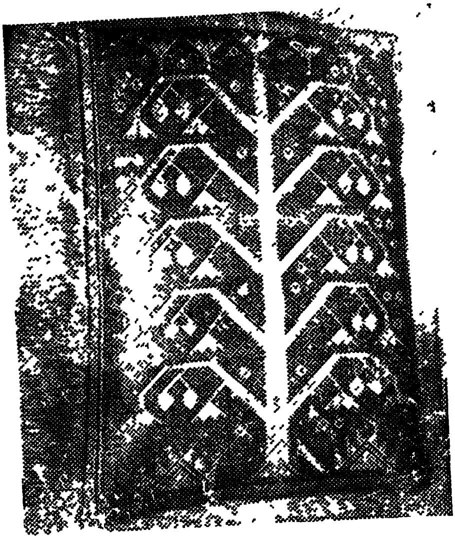


নকশী পাখা (মানুষ-হাতি-ফুল)



লেখা পাখা

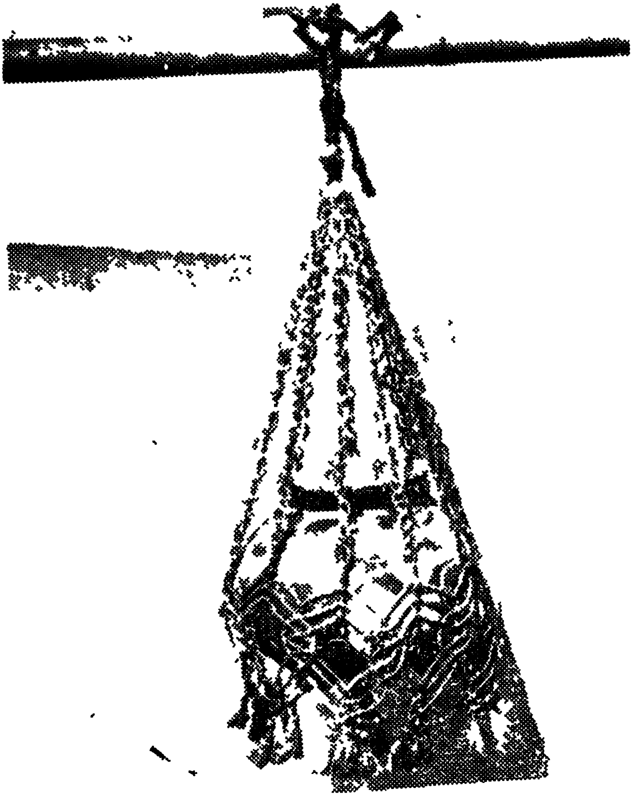
চিত্র ৬



নকশী পাটি

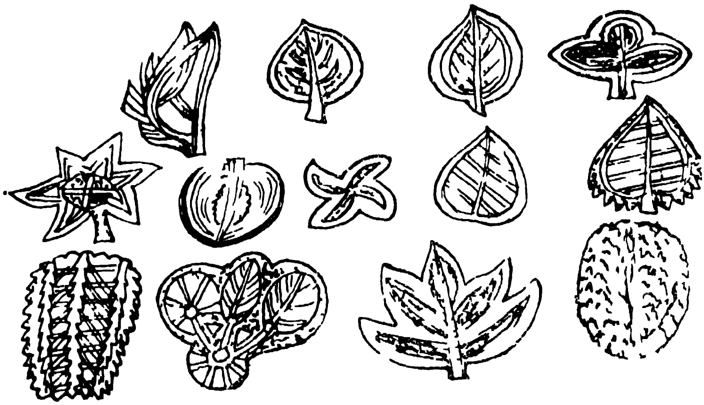


নকশী পাটি



নকশা শিকা

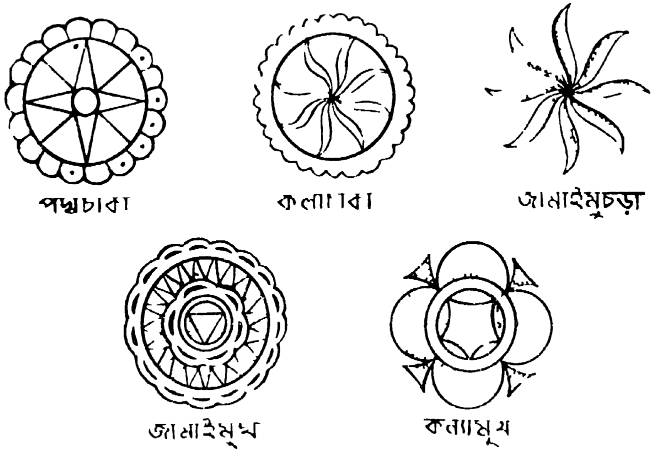
চিত্র ৮



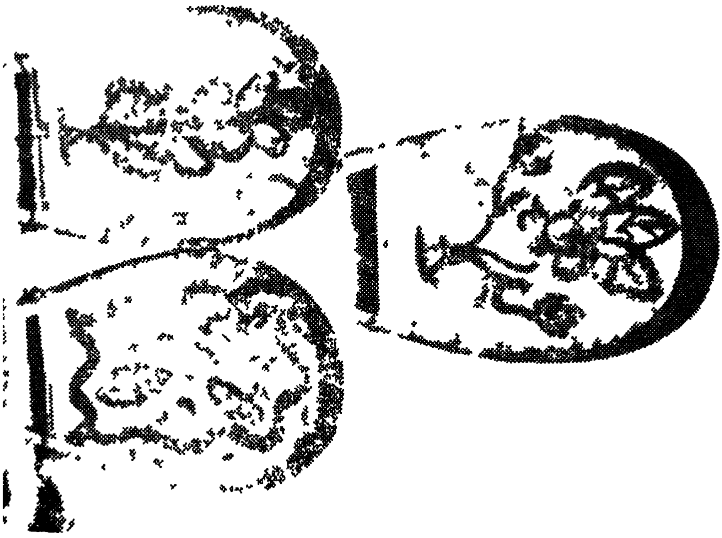
নকশী পিঠা



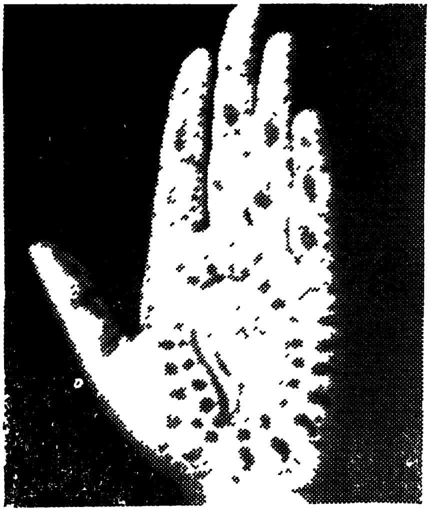
নকশী পিঠা



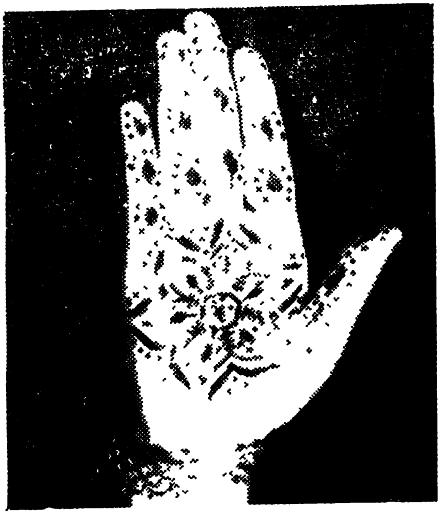
নকশা পিঠা (নকশা)



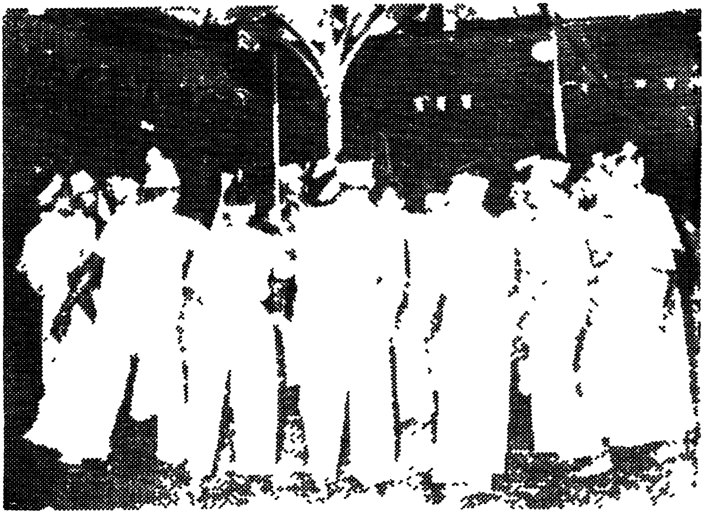
আলপনা (কুলা)



অঙ্গচিত্র



অঙ্গচিত্র



জারিনাচ

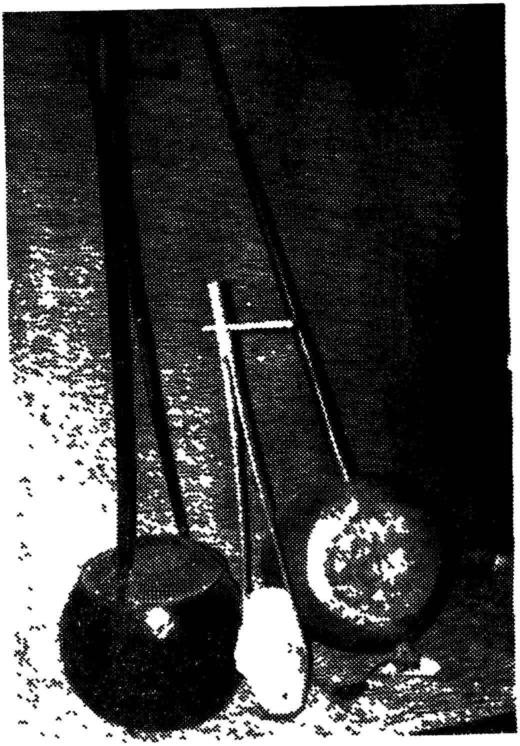


ঘাটুনাচ

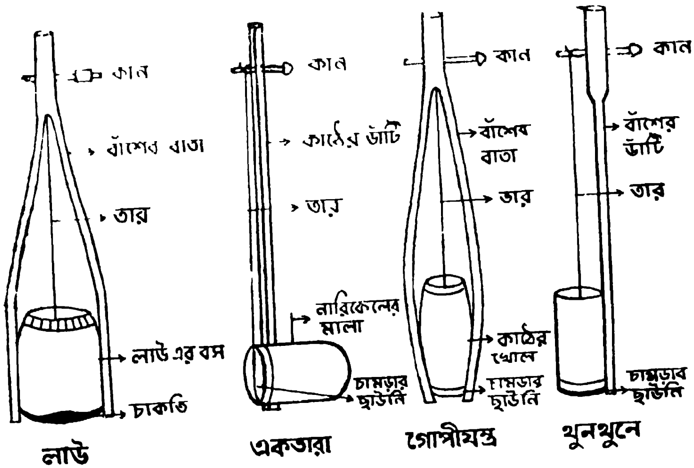


লাঠিনাচ

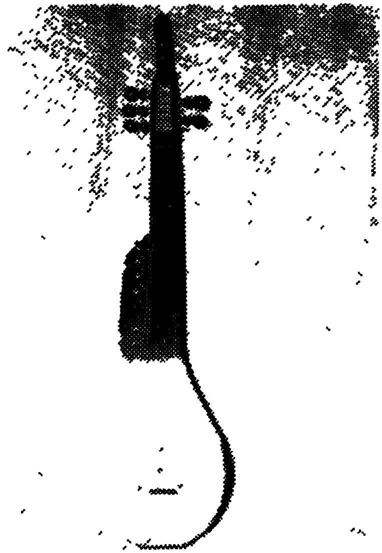
চিত্র ১৬



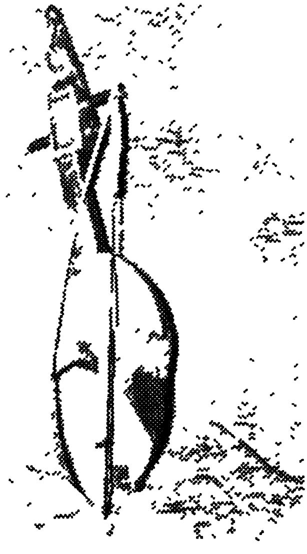
একতারা



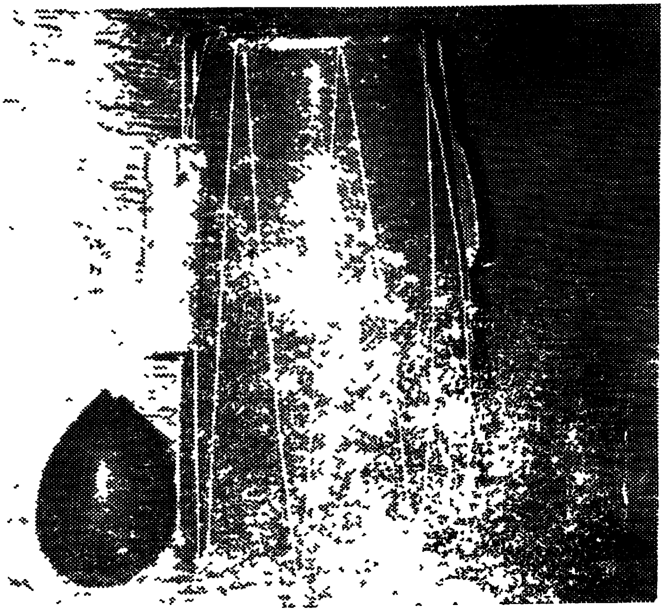
বাংলার লোক-বাদ্য



দোতারা



সারিন্দা



খমক



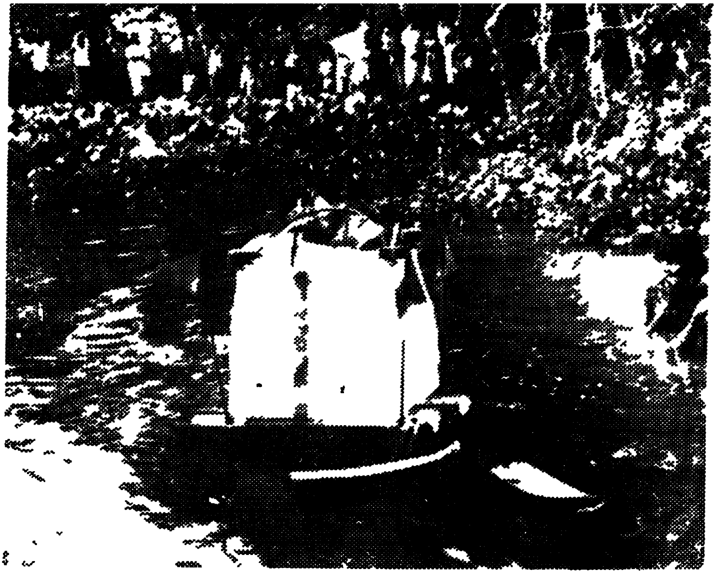
খঞ্জরী



চাইট্যাবা অনুষ্ঠান



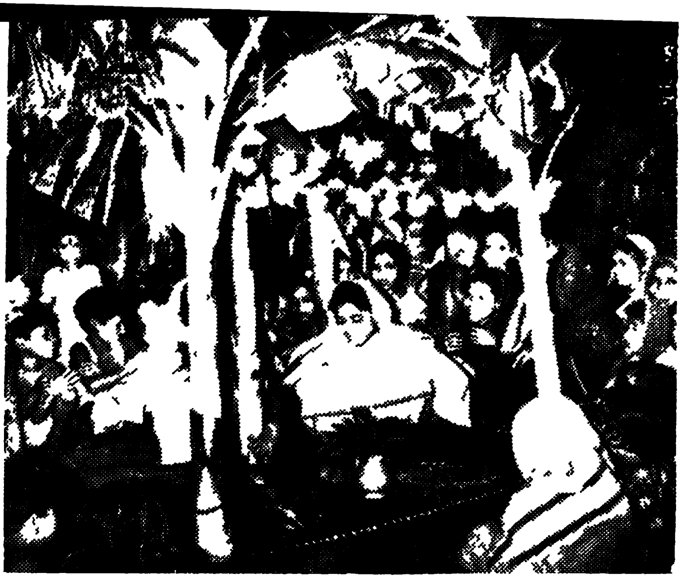
চিত্র ১৬



বেরা ভাসান



ষষ্টি মাগন



বেঙ বিয়া



চিত্র ৪২

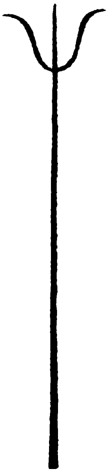


হিরানী

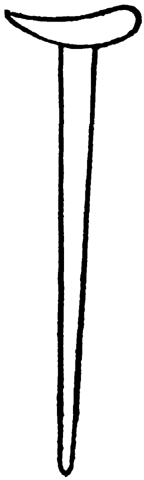




গাজীপীর (পটচিত্র)



[illegible]



আসাদণ্ড (নকশা)

চিত্র ২০

লোক-সংস্কারের অঙ্গরূপে খেলার ভেতর দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। আবদুস সাত্তার সাহেব খেলার কাল, উপলক্ষ ও অনুশীলন পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :

"গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টিতে সারাদেশ যখন জলে পুড়ে ছারখার হওয়ার উপক্রম হয়—তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে বাড়ী বাড়ী এই ছড়াটি আবৃত্তি করে আর গৃহস্থ তাদের গায়ে পানি ঢেলে দিলে তারা উঠানের মধ্যে গড়াগড়ি যায়। এই গড়াগড়ি যাওয়াকে গ্রামের লোকেরা 'পেঁক-খেলা' বা 'কাদামাটি খেলা' বলে।"[১]

কাদামাটি খেলার সময় ছড়া বলা হয়। ছড়ায় আছে বৃষ্টি আবাহন মন্ত্র :

তেঁতুল-বিচি পেত্থম ধর
গুড়ুম গুড়ুম বাদল ঝর।
ফাটা আসমান ছিলাইয়্যা দে
গুটি সূতা নাই।[২] —ঢাকা

দলবদ্ধভাবে ছড়া আবৃত্তি ও কাদামাটিতে গড়াগড়ি যাওয়ার মধ্যে গ্রাম্যশিশুদের আদিম উল্লাসের ছবি পাওয়া যায়। ছড়ার খেলা যেমন আধা খেলা, আধা ছড়া, আনুষ্ঠানিক খেলা তেমনি খেলা-ছড়া-লোকাচারের ত্রয়ী সমন্বয়।

ঢোপের খেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঢোপের খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলেছেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। তাঁর মতে, টাঙ্গাইলে এ খেলার প্রচলন আছে। খেলার পদ্ধতি ও উপলক্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "একটি কাঠের খণ্ডে দড়ি বুনিয়ে তৈরী হ'ত ঢোপের বল—শিকড়সহ বাঁশের দণ্ড দিয়ে বিপরীত খেলোয়াড়দের দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অর্থাৎ এইভাবে পুরাতন বর্ষকে ঢোপের আঘাতে বিদায় করে দিচ্ছি।"[৩]

১. আরণ্য জনপদে, পৃঃ ৬৬-৬৭
২. ঐ, পৃঃ ৬৬
৩. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী—বাঙালীর নববর্ষ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা বৈশাখ, ১৩৮১

পাতা খেলা

পাতা খেলার মধ্যে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব আছে। একে যাদুর খেলাই বলা যায়। ছদরুদ্দীন সাহেব খেলার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, "তুলা রাশির কোন লোক বেছে নিয়ে করা হতো 'পাতা'। মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেই পাতার হাত কাঁপতে শুরু করতো। দুধার থেকে গুণীরা মন্তর আওড়াতো। মন্তরের টান যেদিকে বেশী হতো পাতা সেই দিকেই ছুটতো।...এমনো দেখা গেছে, দূরে আড়াল থেকে গুণী মন্তর আওড়াচ্ছে, পাতা অন্য গুণীদের ফেলে খেত খামার ডিঙ্গিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির। এতে কখনো কখনো হরিষে-বিষাদ ঘটতো। পাতার প্রাণ যায় যায়, মুখে ফেণা। শরীর বানের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। শেষে মূর্চ্ছাহত।"[১] গ্রন্থকারের মতে রংপুরে খেলাটির প্রচলন ছিল, অধুনা তা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেছে, পাতা খেলা এখনও চালু আছে, এবং অঞ্চল বিশেষে বেশ ঘটা করে তা অনুষ্ঠিত হয়। এর আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ বা সময় নির্দিষ্টতা নেই; বছরের যে কোন সময় একবার অথবা একাধিকবার এ খেলার আয়োজন হয়। প্রধানতঃ চাষাবাদের ফাঁকে ফাঁকে অবসরবিনোদন উদ্দেশ্যে খেলাটি জমে উঠে। বাড়ির উঠান, রাস্তার মোড়, বাগান, খেত-খামার, মাঠ—যে কোন স্থানে পাতা খেলার আসর বসে। ছদরুদ্দীন সাহেবের বিবরণটি পূর্ণাঙ্গ নয়। পাতা খেলার মন্ত্রগুণী, তুলারাশির 'পাতা' ছাড়াও আর একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল ঢুলী। ঢুলীর বিশেষ বাদ্য ছাড়া পাতা খেলার আসর জমানো তো দূরের কথা, খেলাই চলতে পারে না। 'গ্রামের 'লড়না' উৎসবে কুস্তি খেলায় ঢুলীর এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়।[২] কুস্তির সমস্ত তাল ও কৌশলটা ঢুলীর বাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। আবার মহরমের সময় যে লাঠিখেলা হয় তাতেও ঢুলীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এসব ক্ষেত্রে ঢুলী পেশাদার (চামার), অপেশাদার যেই হোক না কেন তাকে বিশেষভাবে তালিম নিতে হয়—তাকে তালজ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ বাজিয়ে হতে হয়। পাতা খেলার ঢুলী

---

১. দেশকালপাত্র, পৃঃ ৪২

২. মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় বার্ষিক লড়নার কুস্তি খেলায় এরূপ বাদ্যের প্রচলন আছে। নিজস্ব সংগ্রহ।

সাধারণতঃ অপেশাদার কোন সৌখিন ব্যক্তিই হয়ে থাকে। সে অভিজ্ঞ ও পটু। কেবল ঐ কাজের জন্যই তার ঢোল। ঢোলটি মন্ত্রপূত। লোক সংস্কার আছে, বিশেষ তালে ঢোলের শব্দ যতদূর পেঁৗছে তার অন্তবর্তী এলাকার তুলারাশির যে কোন মানুষ (নর এবং নারী উভয়ই) মন্ত্রমুগ্ধ হয় এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই আসরে নীত হয়। সেই হয় 'পাতা'। আলাদা-ভাবে পাতা নির্বাচন করতে হয় না। এরপর গুণীরা জড় হয় নিজ নিজ যাদুবিদ্যা ও মন্ত্রশক্তি ফলাবার জন্য। মন্ত্রগুণীরা প্রকাশ্যে অথবা গোপণে থেকে মাটিতে দাগ কেটে কিংবা হাত চালিয়ে পাতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে মন্ত্রগুণে পাতাকে টেনে আনে এবং নিজের কাছে ধরে রাখে তারই জোর বেশি, দক্ষতা বেশি, জয়মাল্য তারই। খেলার শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঢোল বাজতে থাকে। চারপাশে উৎসুক উৎকণ্ঠিত জনতা ঢোলবাদ্যের সাথে মন্ত্রশক্তির খেলা দেখে ও উপভোগ করে। বিজয়ী গুণী পারিতোষিক ও ঢুলী পারিশ্রমিক পায়।

ফলতঃ পাতা খেলায় শারীরিক শক্তির প্রয়োগ অথবা আঙ্গিক কৌশলের প্রতিযোগিতা নেই, আছে সম্মোহনী শক্তির প্রকাশ ও প্রতিযোগিতা। যাদুবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় এর উদ্ভবকাল খুব প্রাচীন হওয়া সম্ভব।

চুঙ্গা খেলা

চুঙ্গা আতসবাজির খেলা। চট্টগ্রামে এর প্রচলন আছে। শবে-বরাতের রাত্রে মাঠে-ময়দানে চুঙ্গা খেলা হয়। এর প্রস্তুতি ও মহড়া চলে দিন কতক আগে থেকেই; কেবল উক্ত রাতে বাজি পোড়ার মাতামাতি চরমে উঠে। দু'দলে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিপক্ষের দিকে বাজি ছুঁড়ে ঘায়েল করতে পারলে খেলায় বাজিমাত হয়। নানা প্রকার বাজি তৈরি করে কায়দামত ও মোকামত তা প্রয়োগ করতে আনন্দ বেশি, দক্ষতা বেশি। দু'দলের প্রতিযোগিতায় চুঙ্গা খেলা একটা ছদ্ম-যুদ্ধের নকল। জনৈক প্রবন্ধ লেখক বলেছেন, মোগলযুদ্ধের গোলাবারুদ নিয়ে কামান-বন্দুকের যে যুদ্ধ হত তার অনুকরণে এ খেলাটি রূপ পেয়েছে।